বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস



বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীভূদেব চৌধুরী

পূর্বাভাষ

'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এর এটি পঞ্চম সংস্করণ। এ লেখার পরিকল্পনা ছিল, উৎসুক সাধারণ পাঠকদের জন্য বাংলা সাহিত্য-বিকাশের একটি জীবন ভিত্তিক মোটা খসড়া গড়ে দেওয়া। খুঁটিনাটি খবরের ভার এড়িয়ে সাহিত্যের উন্মোচনের ছকটি যাতে প্রথম জিজ্ঞাসু মনের কাছে স্পষ্ট হতে পারে। বাংলা ভাষার সাহিত্য রচনার সূচনা সময় থেকে রবীন্দ্রযুগের পরিসমাপ্তি, তথা পঞ্চাশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত, কালের পরিসরে সাহিত্যের ধারাপ্রবাহের রূপরেখায়িত একটি ছবি।

ইতিহাস একান্তভাবেই তথ্যভিত্তিক। তবু সকল তথ্য নিঃশেষে জড়ো করে দিলেই ইতিহাস গড়ে ওঠে না। দেশ কাল মানুষের যোগাযোগে জীবন বিচিত্ররূপ ধরে। এক দেশ কাল পাত্রের মেলবন্ধনের সঙ্গে আরো একটি জীবন চরিত্রের যে তফাত, তার মূলে রয়েছে উৎস গত বিভিন্নতা। এক দেশে এক বিশেষিত সময়সীমায় এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর হাতে ওদের ধরন নিয়েই জীবনের গড়ন। আর সেই গড়নের আনুপূর্বিক রূপায়ণের দিশারি প্রেরণা ধরতেই ইতিহাস। সাহিত্য আর জীবন অভিন্ন নয়। সাহিত্য আসলে জীবন সম্ভব। জীবনের ওই প্রভাব টানাপোড়েনে মানুষের আকাঙ্ক্ষার রূপ বদল হয়। জীবনের অভিজ্ঞতার বিবর্তন বারে বারে নূতনতর বাসনা ও প্রত্যাশার উদ্রেক করে। সাহিত্যের শিল্পী সেই বিবর্তনশীল বাসনা প্রত্যাশার রূপ গড়তেই রচনাকর্মে নিয়োজিত হন। এদিক থেকে সাহিত্য এক বিশেষ দেশ কালবদ্ধ বিশেষ মানব গোষ্ঠীর বিবর্তমান জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবন বাসনা প্রত্যাশারই মন্থক অভিব্যক্তি। সাহিত্যের ইতিহাস সেই অভিব্যক্তির ধারাপাত। একটা নির্দিষ্ট সময় সীমায়, আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যসীমা থেকে বিশ শতকের মোটামুটি মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অভিব্যক্তির ধারাপাত এর একটি চুম্বকই কেবল ধরা আছে এ বই এর দুই মলাটের মাঝখানে।

একটা কথা স্পষ্ট করে নিতে হয় শুরুতেই। প্রায় বারো শ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে যত রচয়িতার যত রচনা পুঞ্জিত হয়েছে, লেখা নয়—কেবল লেখকেরও, তার কোনো তালিকা পরিচয়ও এ বই এ মিলবে না। শেষের দিকে, অপেক্ষাকৃত পরিচিত মহলে এসে তাকালে, বারে বারেই চোখে পড়বে, কত পরিচিত হয়ত বা কত প্রিয় নামেরও উল্লেখ নেই। তেমনটি করতে চাইলে এ বই এর আকার মাত্রাছাড়া হত। তাই প্রথম থেকেই ভেবে নেওয়া হয়েছিল, এ বই সকল লেখক, কিংবা তাঁদের সকল বা আংশিক লেখার পরিচয় খুঁজবেই না। সাহিত্যের আধার ধরে জীবনের বিবর্তন পথের ক্রমিক যে দিশেটুকু চোখে পড়ে, তাকেই কেবল খুঁজবে। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে যেমন বলেছিলেন, বিভিন্ন কাল, তথা বিভিন্ন যুগের সব চেয়ে উজ্জ্বল রচনাগুলির ভেতর হতে চলমান জীবন-বাসনা-প্রত্যাশার দিশে খোঁজা।

সেই চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে যে কোনো সময়ের সকল শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বা রচনার আংশিক বা আনুপূর্বিক উপস্থাপনার চেষ্টাও সম্ভব হয়নি। এ বই-এর একটাই উদ্দেশ্য ক্রমবিকাশমান সাহিত্যের গহনে নিয়তবহমান জীবনের চলচ্ছবিটিকে তুলে ধরা। বলাই বাহুল্য, তাও তো সংক্ষেপে। এর বেশি কৈফিয়ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এইটুকু প্রাথমিক

পরিচয় ধরে কৌতূহলী পাঠক রচনার ভেতরে একবার ঢুকে পড়লেই ত্রুটিবিচ্যুতি সহ এ লেখার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন বলে ভরসা করি। আসলে এই পুরোপুরি চেষ্টার সঠিক দাম তো সন্ধানী পাঠকেরই সহৃদয় বিবেচনায়!

মনে পড়ছে, প্রায় চার শতক হতে চলল, এ লেখার চাহিদা প্রথমে তুলে ধরেছিলেন আমাব প্রথম প্রকাশক প্রয়াত জানকীনাথ বসু। তিনি অগ্রজপ্রতিম ছিলেন। বিনম্র শ্রদ্ধায় এই পঞ্চম সংস্করণের মুখবন্ধে তাঁকে স্মরণ করি।

পুস্তকের প্রকাশনায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন, অনুগ্রহ কবে, বোলপুরের পুস্তক প্রতিষ্ঠান : 'বর্ণপরিচয়' ও 'পুঁথিঘর'। তাঁদের কৃতজ্ঞ নমস্কার নিবেদন করি।

শ্রীভূদেব চৌধুরী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য

বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের নামের মূলে রয়েছে বঙ্গ জাতির প্রভাব। বঙ্গ জাতির বাসস্থান বঙ্গদেশ বা বাংলা দেশ নামে পরিচিত হয় ; আর বাংলা দেশের লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাকেই আজ আমরা বাংলা ভাষা নামে অভিহিত করি। বঙ্গ জাতি মূলত আর্যেতর বংশজাত ছিলেন বলে মনে হয়। সুপ্রাচীন 'ঐতরেয় আরণ্যকে' এঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া গেছে।

বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষা

'ঐতরেয় আরণ্যক' ঋগ্‌বেদের আরণ্যকগুলির একটি , আর ঋগ্‌বেদের গ্রন্থনকাল খ্রিস্টপূর্ব অন্তত ১৫০০ বছরের পরবর্তী নয়। এর থেকেই বঙ্গ জাতিব প্রাচীনতার পরিচয় অনুমান করা যেতে পারে। বাংলা দেশের যে অঞ্চলকে আজ আমরা বাংলাদেশ বলি. বঙ্গ জাতির বাস আসলে ছিল সেখানে ; এবং কেবল ঐ অঞ্চলকেই তখন বঙ্গদেশ বলা হত। এখনকার পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল রাঢ় ও সুহ্মদেশ। এ-নামগুলোও আসলে জা।তবাচক। এখনকার উত্তরবঙ্গের নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ; পুণ্ড্র নামে এক অনার্য জাতি ছিল সেখানকার সুপ্রাচীন অধিবাসী। ক্রমে বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্মদেশ এবং পুণ্ড্রবর্ধন মিলে বর্তমান বাংলাদেশের পত্তন হয়েছে।

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীরা সকলেই ছিলেন অনার্য , তাঁদের ভাষাও ছিল অনার্য ভাষা।

আদিম বাঙালিব ভাষা-পবিচয

সেই প্রাচীন ভাষা বাংলার মাটি থেকে আজ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে ; কেবল দু-একটি পুরাতন জায়গার নাম অথবা নিত্যব্যবহার্য দু-একটি জিনিসের নামের মধ্যে ঐ সব ভাষাব ছিটে-ফোঁটা নিদর্শন এখনও এক-আধটা টিঁকে আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, ঐ-সব লোকেরা "কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা" বলত।

আমাদের এখনকার কালের বাংলা ভাষায় ঐ সব অনার্য ভাষার কোনো ছাপ. নেই ; এ-ভাষা পুরোপুরি আর্য-সন্তান। আর্যগণের ভারতে আগমনের কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে

বাংলাদেশ ও ভারতীয় আর্যভাষা

না ; তবে খ্রিস্টজন্মের অন্তত ১৫০০ বছর আগে যে তাঁরা এদেশে এসেছিলেন, তাতে কোনো সংশয়ই প্রায় নেই। অবশ্য বাংলাদেশে আর্য আগমনের কাল আরো অনেক পরে—খ্রিস্টজন্মের মাত্র দুই-তিন শতাব্দী আগে। এই আর্যদের সুপ্রাচীন ভাষা থেকেই বর্তমান বাংলা ভাষার জন্ম ; এবং হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিযা ইত্যাদি উত্তর-ভারতীয় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাই জন্মসূত্রে ভারতীয় আর্য-ভাষা।

বেদ আর ব্রাহ্মণের ভাষাই ছিল আর্য-ভারতীয়দের প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা। তাছাড়া আটপৌরে জীবনের কাজ চালাবার জন্যে তাঁদের একটি মৌখিক ভাষাও ছিল। কালে কালে সাহিত্যিক বৈদিক ভাষা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। তখন ঐ মৌখিক ভাষাব সংস্কার সাধন করে উদ্ভব হয় নূতন এক সাহিত্যিক ভাষার। সেই ভাষাই আমাদের একালের পরিচিত সংস্কৃত ভাষা। বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাসমষ্টি কিন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রত্যক্ষ সন্তান নয়। প্রাচীন আর্য সমাজে যাঁরা শিক্ষিত অভিজাত ছিলেন, তাঁরা বেদের গুরু-গম্ভীর ভাষায় সাহিত্য রচনা

করতেন ; কথাও বলতেন শোভন মার্জিত ভাষার মাধ্যমে। পরবর্তী কালে এঁদের মুখের ভাষাকে সংস্কার করেই সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয়। কিন্তু আর্য-ভারতে আরো একপ্রকার মৌখিক ভাষা ছিল বলে অনুমান করা হয়,—অনভিজাত লোক-সাধারণের মুখের সেই ভাষাকে বলা হত 'প্রাকৃত'। 'প্রাকৃত' অর্থে এখানে বুঝি 'প্রকৃতি-পুঞ্জ' বা প্রজা-সাধারণের ভাষা। অভিজাত সমাজের মৌখিক ভাষার তুলনায় 'প্রাকৃত' ছিল অপেক্ষাকৃত অমসৃণ ও রুক্ষ। শিক্ষিত মনের শোভনতার ছাপ তাতে লাগে নি। প্রদেশ-ভেদে এই মৌখিক ভাষার প্রকারভেদ ঘটে :— (১) শৌবসেনী, (২) মহারাষ্ট্রী, (৩) মাগধী, এবং (৪) পৈশাচী। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা এই প্রাকৃত ভাষারই বংশজাত।

সংস্কৃত বনাম প্রাকৃত

অশিক্ষিত অমার্জিত-রুচি মানুষের মুখের ভাষা ছিল বলে, লোকমুখের প্রাকৃত ভাষায় প্রথম থেকেই কোনো সা ত্য রচিত হতে পারে নি। ভারতীয় লৌকিক ভাষায় সবার আগে রচিত হয় পালি-সাহিত্য। 'ত্রিপিটক' এবং অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য পালি ভাষায় লিখিত। পালিভাষা কারো মাতৃভাষা বা মৌখিক ভাষা নয়। এই ভাষার জন্ম-কথা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের পার্থক্য রয়েছে। মোটামুটি মনে করা যেতে পাবে যে, নানারকমের প্রাকৃত কথ্য ভাষাকে একত্র বিমিশ্রিত করে পালি ভাষার প্রথম উদ্ভব ঘটে। ক্রমশ মৌখিক প্রাকৃত ভাষা বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে এবং চার রকমের প্রাকৃত ভাষাতেই পৃথকপৃথকসাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়। শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী এবং মাগধী প্রাকৃতের কিছু কিছু ব্যবহার প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যেও পাওয়া যায়। কালে কালে এই সব প্রাকৃত ভাষার ব্যবহারে বিশৃঙ্খলা ও শিথিলতা দেখা দিল , তার ফলে জন্ম নিল চার রকমের অপভ্রংশ ভাষা। এই অপভ্রংশ ভাষাসমষ্টি থেকেই আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাবলির উদ্ভব হয়েছে। শৌরসেনী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয় হিন্দি ভাষা ; —আমাদের বাংলা ভাষা এবং সেই সঙ্গে ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিল প্রভৃতি আরো অনেক ভাষার জন্ম মাগধী অপভ্রংশ থেকে। পণ্ডিতদের মতে এই নবীন ভাষা-সমষ্টির জন্মকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীতে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেরও সূত্রপাত এখান থেকেই।

ভাষাব ক্রমবিবর্তন ও বাংলা ভাষাব জন্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের আদিকথা

বাংলা সাহিত্যেব জন্ম-উষা অস্পষ্ট বহস্যে আচ্ছন্ন। এই সময়ে বচিত গ্রন্থাদির পরিচয় সুলভ নয়। দু-একটি বচনার আংশিক সন্ধান যা-ও বা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে বাংলা ভাষাব স্পষ্ট বূপ বড একটা চোখেই পডে না। বাংলা ভাষায বচিত প্রাচীনতম যে গ্রন্থখানিব পবিচয় আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তাব নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয'। সাধাবণভাবে এই গ্রন্থ 'চর্যাপদ' নামে পবিচিত। 'পদ' বলতে স্থূলতম অর্থে বুঝি গীত বা কবিতা, বাংলা ভাষাব এই প্রাচীনতম গ্রন্থও গীত-কবিতাব একখানি সংকলন।

বাংলা ভাষাব আদিগ্রন্থ 'চর্যাপদ'

কিন্তু এই কাব্য মোটেই বাংলা ভাষায় বচিত কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। 'চর্যা'-কবিতাব একটি উদাহবণ দিলেই এই সংশয়েব কাবণ বোঝা যাবে —

'চর্যাপদ' এ বাংলা :

' সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ।।
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুডই কইসেঁ ।।
খুন্টি উপাডী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ।।
মাঙত চড্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ।।
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গ।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গ ।।

'-- সোনায় ভর্তি আমাব করুণা নৌকো, বুপো বাখবার ঠাঁই নেই তাতে ওরে কম্বলিপাদ, গগনের (নির্বাণেব) উদ্দেশে তুমি বেয়ে চলো। যে জন্ম গেছে, সে ফিববে কেমন করে?

'(নৌকো বাইতে গিয়ে) খুঁটি উপ্‌ড়ে ফেলো, কাছি মেলে দাও। সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে, হে কম্বলিপাদ, তুমি বেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে যেয়ো কেডুয়াল ছাড়া কেউ কি বাইতে পাবে? বাম-ডানে চেপে চেপে পথ বেয়ে গেলে ঐ পথেই মহাসুখের সঙ্গে মিলে যাবে।'

বাংলা দেশের চিরদিনেব মনেব কথায় ভবা কবিতাটি, নদীর বুকে প্রাণেব সুখে নৌকো বেয়ে চলার মধুময় একটি চিত্র! ফাঁকে ফাঁকে 'সদ্‌গুরু' 'নির্বাণ' 'মহাপুরুষ-সঙ্গ' এমনি সব মরমিয়া লোকগীতির সংকেতে-আভাসে ভবা কথা। সবই মনে হয় একান্ত চেনা-জানা। কিন্তু মূল কবিতার ভাষাকে কি চিনি? সঙ্গের 'গদ্যানুবাদ' না থাকলে এমন সুন্দর কথাগুলোর কিছুই বোঝা যেত না। অথচ ভাষার দিক থেকে উদ্ধৃত কবিতাটি সবচেয়ে সহজ-বোধ্য একটি 'চর্যাপদ', আর চযাপদাবলি নাকি প্রাচীনতম বাংলা ভাষাতে লেখা কবিতার সংকলন। এ-কালের বাংলা ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য কত দূরগত!

'চর্যা'ব জীবনাবেদন

এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেছেন, 'চর্যা' পদাবলির প্রধান অংশ অপভ্রংশ ভাষায় লেখা। আব

তাতে মাগধী অপভ্রংশের চেয়ে শৌরসেনী অপভ্রংশের পরিমাণ অনেক বেশি। অথচ ঐ মাগধী অপভ্রংশই বাংলাভাষার পূর্বসূরী। শৌরসেনী আসলে হিন্দির পূর্বপুরুষ। এ-সব সত্ত্বেও ড সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করে প্রমাণ করেছিলেন, 'চর্যা'পদাবলিতে এমন কিছু পরিমাণ শব্দ ও প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কেবল বাংলা ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে,—অন্য কোনো ভাষায় হয় না। তাই মনে করা হয়েছে যে, অপভ্রংশ ভাষা যখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত, আর যখন সেই অপভ্রংশের কাঠামোতেই একটি-দুটি করে বাংলা শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গির পরিচয় অঙ্কুরিত হচ্ছিল,—বাংলা ভাষার সেই ঊষালগ্নের সাহিত্যিক নিদর্শন এই 'চর্যাপদ'।

ভাষা-বৈশিষ্ট্য

মোটামুটি একই সময়ে প্রায় অভিন্ন ভাষায় লেখা আরো তিনখানি প্রাচীন পুথির পরিচয় পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে এই চারখানি পুথিই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে একসঙ্গে আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে চারখানি পুথিই একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল,—'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে। পুথি চারখানির নাম যথাক্রমে :—(১) (সংস্কৃত টীকা সহ) 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', (২) (সংস্কৃত টীকা সহ) সরোজ বজ্রের 'দোহাকোষ', (৩) (সংস্কৃত টীকাযুক্ত) কৃষ্ণাচার্যের 'দোহাকোষ', এবং (৪) (সংস্কৃত রচনাংশ সহ) 'ডাকার্ণব'।

'চর্যাপদ' ছাড়া অপর তিনটি গ্রন্থেরই মূল অংশ মাগধী-মিশ্র শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় লেখা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভাষাগত সাধারণ সাদৃশ্য দেখে প্রথমে সব কয়খানি গ্রন্থকেই 'পুবাণ বাঙ্গালা ভাষা'র বচনা বলে মনে কর্বেছিলেন। পরে ড. সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় প্রতিপন্ন করেছেন, কেবল 'চর্যাপদ'ই বাংলা ভাষাব সাহিত্য, অন্য তিনটি গ্রন্থে বাংলা শব্দ বা বাগ্‌ভঙ্গির কোনো অঙ্কুর পবিচযও লক্ষিত হয় না।

কেবল ভাষার দিক থেকেই নয়, ভাবের বিচারেও 'চর্যা'পদাবলি বাংলার লোক-জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে বাঁধা। ওপরের কবিতাটিই তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আসলে 'চর্যাপদ' ধর্ম সম্বন্ধীয় কবিতা। বৌদ্ধ মহাযান সাধকদের মধ্যে একদল ছিলেন 'সহজিযা পন্থী'। দেহেব সহজাত বৃত্তিগুলির সুকৌশলী আচরণকেই যাঁরা ধর্মসাধনার উপায় বলে মনে করেন, তাঁদের সহজিযা সাধক বলা হয। এদিক থেকে কেবল বৌদ্ধ নয়,—বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'সহজ'-সাধক রয়েছেন, মধুব মবমিয়া সংগীতের আকর বাউলরাও 'সহজ' সাধনপন্থী। এই বকমই এক বৌদ্ধ সহজ-সাধক বজ্রযানী সম্প্রদায়ের গোপন সাধনাব ইঙ্গিত লুকোনো রয়েছে, 'চর্যা'-কবিতাবলির অন্তরালে। অনেক কয়টি কবিতারই দুটি করে অর্থ হয়:—একটি স্পষ্টার্থ—বাংলাব লোক-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচিত্র মধুর ছবিতে তা ভরপুর। অপর অর্থটি একান্ত গুহ্য—সাধকেবা গুরু-পরম্পরায় তাব তাৎপর্য জানতে পারতেন। তাছাড়া 'চর্যাপদ'-এব পুথির মধ্যে বিভিন্ন পদের সংস্কৃত টীকা পাওয়া গেছে। তা থেকে এই গোপন অর্থের আভাস কিছু কিছু অনুভব করা চলে। মূল অর্থটিকে সাংকেতিক ভাষার আবছায়া আবরণে ঢেকে বাখা হয়েছে বলে 'চর্যা'র ভাষাকে বলা হয় সন্ধ্যা-ভাষা। সন্ধ্যাভাষার রহস্য উদ্ভেদ করতে না পাবলেও সাহিত্য-পাঠকের ক্ষোভের কারণ থাকে না। বাংলার লোক-জীবনের একটি চিরপরিচিত মধুর জীবন-চিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তোলার আনন্দে 'চর্যা'পদাবলি সরস-জীবন্ত হয়ে আছে।

'চর্যাপদ'-এ ধর্মতত্ত্ব ও জীবন-রূপ

আগে বলেছি, 'চর্যাপদ' গীত-কবিতার সংকলন। বাংলায় লেখা ৪৬টি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে এতে। মূল পুথি 'খণ্ডিত' ছিল বলে আরো কিছু সংখ্যক পদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পরে

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, 'চর্যা' সংকলনে মোট কবিতাসংখ্যা ছিল ৫১। এই সকল পদের ভণিতায় ২৪ জন কবির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন, অনেক সয়ে একই কবি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ পদে পৃথক্ পৃথক্ নামের ভণিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন শান্তিদেব, ভুসুকু এবং রাউতু একই কবির বিচিত্র নাম বলে অনুমিত হয়েছে ; আবার লুইপাদ আর মীননাথ নামেও একই ব্যক্তি পরিকল্পিত হয়ে থাকেন। এই সব কবিদের কেউ কেউ ইতিহাস-কীর্তিত ব্যক্তি ; যতদূর জানা গেছে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী কালের মধ্যে এঁদের অনেকে বর্তমান ছিলেন। এই কারণেই 'চর্যা'পদাবলির রচনাকাল—তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিকাশের সময় আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে করা হয়।

'চর্যা'র পদ-পরিচয়

চর্যাগীতির কথা ছেড়ে দিলে এই 'আদিকালে' রচিত বাংলা সাহিত্যের অপরাপর প্রামাণিক নিদর্শন প্রচুর নয়। ড. সুনীতিকুমার এই ধরনের একটি দুর্লভ তথ্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল ছিলেন মহারাষ্ট্রের চালুক্য বংশীয় নরপতি। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতায় ১১২৯ খ্রিস্টাব্দে 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি' নামে একখানি বিশ্বকোষ গ্রন্থ সংকলিত হয়। তাতে সংগীত বিষয়ক একটি আলোচনা আছে। নাম 'গীতবিনোদ'। এই আলোচনার কিছু কিছু শ্লোক আদিম কালের বাংলা ভাষায় লেখা বলে ড. চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য পদগুলো কৃষ্ণের অবতার বা গোপী-লীলা বিষয়ক।

'মানসোল্লাস'-এর রচনাংশ

তা ছাড়া খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি প্রাকৃত ছন্দ আলোচনার জন্য 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কেউ কেউ ভাবেন, গ্রন্থকারের নামই ছিল পিঙ্গল। তাতে অপভ্রংশ কবিতার উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি রচনায় ড. সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার অঙ্কুরাভাস লক্ষ করেছেন।

'প্রাকৃত পৈঙ্গল'

ড. সুকুমার সেন নীচের পদটিকে এই ধরনের রচনার এক সার্থক নিদর্শন বলে উদ্ধার করেছেন :—

"আরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোটি ডগমগ কুগতি ন দে।
তই ইথ নইহি সন্তার দেই জো চাহহি সো লেহি ॥"
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পদটি কৃষ্ণের নৌকালীলা বিষয়ক ॥

এই সব সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণাঙ্গ উপাদান ছাড়া আলোচ্য কালের বাংলা ভাষায় লেখা আর কোনো প্রামাণিক রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। কেবল ড. দীনেশচন্দ্র সেন এই যুগের রচনা হিশেবে আরো কিছু কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর লেখা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখনীয় প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে আলোচিত প্রাচীন বাংলা রচনার তালিকায় আরো আছে 'শূন্যপুরাণ', 'ময়নামতীর গান' ও 'গোরক্ষ বিজয়' ইত্যাদি কাব্যের নাম।

'শূন্যপুরাণ' রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে পূজিত ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি। সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই প্রথমে এই দেবতার ভক্ত পূজারি ছিলেন। অতএব পূজা-পদ্ধতি ছিল স্থূল লোকাচার-প্রধান, মন্ত্রাদিও ছিল লৌকিক ভাষায় লেখা। এই গ্রন্থের বহুলাংশে রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় লেখা। রামাই পণ্ডিত ধর্ম-পূজক সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গুরু। তাঁর আবির্ভাবের সময় অনুমান করা হয়েছিল খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী বা তার নিকটবর্তী কালে। ফলে আলোচ্য কাব্যটিও এই সময়েই রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। পরবর্তী গবেষণায় এই মতের বিরোধিতা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই কাব্যের যে তিনখানি পুথি পাওয়া গেছে, তার কোনোটিই খুব প্রাচীন নয়, কাব্যের ভাষা বিচার

করে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন, এর কোনো অংশই ষোড়শ শতকের আগের লেখা নয়,— বহু অংশ আবার অষ্টাদশ শতকেও লিখিত। ভণিতা বিচার করে বলা হয়েছে, 'শূন্যপুরাণ' কোনো এক ব্যক্তির লেখা নয়, বিভিন্ন কবি এর নানা অংশ রচনা করেন,— রচনা-কাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে হওয়া সম্ভব। এ সব তথ্য সত্ত্বেও অনুমান করা যেতে পারে যে, 'শূন্যপুরাণ'-এর মূল কাঠামোটি হয়ত রামাই পণ্ডিতের হাতেই গড়া হয়েছিল, এবং তিনি একাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। 'শূন্যপুরাণ 'এর কোনো পুথিই পূর্ণাঙ্গ নয়, ফলে কাব্যের মূল নাম জানা যায় নি। সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যের বিষয়-সম্মত নামকরণ করেন। ১৩১৪ বাংলা সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'শূন্যপুরাণ'-এর উল্লেখ্য সাহিত্য মূল্য কিছু নেই।

'শূন্যপুরাণ'

'ময়নামতীর গান'-এর কাহিনী সম্বলিত প্রথম কাব্য আবিষ্কার করেছিলেন ড. গ্রিয়ার্সন,— ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা ভাষার এই কাব্যখানিকে তিনি রোমান হরফে প্রকাশ করেন 'The Song of Manic Chandra' নামে। লৌকিক নাথ-সিদ্ধা সম্প্রদায়ের আচার্যদের জীবনকথার উপভোগ্য আলোচনা, ও সেই সঙ্গে নাথধর্মের মহিমা কীর্তন করাই এই শ্রেণীর কাব্যপ্রবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। ময়নামতী ছিলেন মানিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী এবং শ্রেষ্ঠ নাথসিদ্ধাদের একজন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও অলৌকিক শক্তিবলে তিনি পুত্রের জননী হতে পেরেছিলেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁর সেই সন্তান। ময়নামতী ছেলেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে উৎসুক। কারণ তিনি জানেন,—নাথ-সাধনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধদেহের অধিকারী হতে না পারলে পুত্রের অকালমৃত্যু অনিবার্য! কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র অপরিণত যৌবনেই অদুনা ও পদুনা নামে দুই স্ত্রীর সঙ্গে সুখে বিহ্বল হয়েছিলেন। পুত্র এবং পুত্রবধূদের প্রতিরোধকে জয় করে ময়নামতী দুঃসহ কষ্টে গোপীচাঁদকে হাড়িপা-র শিষ্যত্বে বৃত করেন; সন্ন্যাসী গোপীচাঁদ অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে 'সিদ্ধাই' লাভের তপস্যা করে সার্থক হয়েছিলেন,— এইটুকুই 'ময়নামতী' বা 'মানিকচাঁদের গান' এর মূল কথা। ড দীনেশচন্দ্র এবং ড. গ্রিয়ার্সন দুজনেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আলোচ্য কাব্যের নায়ক এবং 'বঙালরাজ গোপীচন্দ্র' অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁদের মতে এই গোপীচাঁদ ছিলেন "একাদশ শতাব্দীর লোক"। অতএব আলোচ্য কাব্যটিও এর পরে অন্তত এক শতাব্দী কালের মধ্যে রচিত হতে পেরেছিল,— এই যুক্তিতে ড. দীনেশচন্দ্র এই কাব্যের প্রাচীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

'ময়নামতীর গান

পরবর্তী পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করেছেন। কারণ গ্রিয়ার্সনের পরেও একই কাব্যের নানা রকম পুথি আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এদের কোনোটিরই লিপিকাল সপ্তদশ শতকের পূর্বের নয়; ভাষাও অর্বাচীন। তা হলেও এই শ্রেণীর কাব্যের মূল কাঠামো খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সুগঠিত হয়েছিল— এমন অনুমানের ঐতিহাসিক সমর্থন আছে।

'গোরক্ষবিজয়'-ও নাথধর্ম বিষয়ক কাব্য। নাথ সম্প্রদায়ের আদিগুরু ছিলেন মীননাথ। ভবানীর শাপে তিনি মহিলা-রাজ্য কদলী দেশে গিয়ে অসংযত-চিত্ততার বশে 'সিদ্ধাই'-ভ্রষ্ট হন। শিষ্য গোরক্ষনাথ-ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে কৌশলে গুরুকে সচেতন করে উদ্ধার করে আনেন। 'গোরক্ষবিজয়'এর মূল গল্প এইটুকুই। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ এঁরা দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি; খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী ছিল এঁদের আবির্ভাব কাল। এই যুক্তিতেই ড. দীনেশচন্দ্র এই কাব্যসমষ্টিকে প্রাচীনতম কালের কাব্য প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু 'গোরক্ষবিজয়'-এর যত পুথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সব কয়টিরই লিপিকাল ও ভাষা অর্বাচীন। এই যুক্তিতে ড. সুকুমার সেন আলোচ্য কাব্যধারাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই কাব্যেরও আদিম কাঠামো খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ

'গোরক্ষবিজয়'

শতাব্দীতে গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে; ড. নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ এই অনুমানের পোষকতা করেছেন।

'ময়নামতীর গান'-এর জীবন-চিত্র স্থূলতাধর্মী হলেও তার মানবিক আবেদন মর্মস্পর্শী। কিন্তু 'গোরক্ষবিজয় মূলত ধর্মগ্রন্থ,—একে 'বায়ুবিজয় শাস্ত্র' বলা হয়েছে। ফলে 'ময়নামতীর গান'-এ কাব্যের উপাদান প্রচুর হলেও 'গোরক্ষবিজয়' সাহিত্য-রসে তেমন পুষ্ট নয়।

এই সব ধর্মকথার অনুমান-নির্ভর আলোচনা ছেড়ে দিলে বাংলা ভাষার আদি যুগে রচিত মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ কাব্য-সাহিত্যের পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। 'সেকশুভোদয়া' নামক একখানি ইতিকথাশ্রিত গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এই পুস্তকের ঊনবিংশ অধ্যায়ে একটি বাংলা প্রেম-গীতি পাওয়া গেছে ; গানটির ভাষা মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অনুরূপ। তা হলেও ড. সুনীতিকুমার নানা যুক্তিবিন্যাস করে সিদ্ধান্ত করেছেন, এটি বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণের পূর্বকালের লেখা ; অর্থাৎ এই গানেরও রচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীসীমার মধ্যে।

প্রেম-গীতি

বাংলা ভাষায় বাঙালির গল্প রচনার প্রয়াসও এই সময়েই শুরু হয়েছিল; একথা অনুমান করেছিলেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর মতে বাংলা রূপকথা-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল মুসলমান আক্রমণের পূর্বে।

রূপকথা

ডাক ও খনার বচন নামে প্রচলিত সুভাষিতাবলি-ও এই 'প্রাক্‌তুর্কী আমলের প্রবাদ-সংগ্রহ' বলে অনুমিত হয়েছে। যদিও এ-সবেরই ভাষা অর্বাচীন কালের।

ডাক ও খনার বচন

এই সব রচনার আদিরূপের কোনো নিশ্চিত নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় নি। ফলে সাহিত্যের ইতিহাসে এদের সঠিক মূল্য নির্ণয় সম্ভব নয়। তবু আনুমানিক বিচারের দ্বারা যতটুকু জানা গেছে, তার থেকেই আলোচ্য সময়ে বাঙালি মনের বিচিত্র-চারিতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লৌকিক বাঙালির ধর্মসাধনা সেদিন ছিল বহুমুখী ; আর সেই ধর্মকথার প্রতি অনুরাগ-বিশ্বাস সাহিত্যের জগতে নানাধরনের শিল্পরূপ গড়ে তুলেছিল। কেবল ধর্ম-বিষয়েই নয়, প্রেম গীতি রচনাতে গালগল্পে, এমন কি কৃষি ও সমাজ বিষয়ে সুভাষিত রচনায় সেদিনকার বাঙালি মন যথেষ্ট উৎসাহী হয়েছিল। বাঙালির কণ্ঠে বাংলা ভাষার পরিস্ফুট রূপ যখন জাগে নি, তখনো সাহিত্যের সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে বাঙালির মন জেগেছিল বহুমুখী প্রসার কামনায়। আদিপর্বের সাহিত্যের এইটুকুই ঐতিহাসিক মূল্য।

আদিযুগের ইতিহাসের মূল্যায়ন

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের মধ্যপর্যায়

বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম সাহিত্যগ্রন্থ 'চর্যাপদ'। আগেই বলেছি, 'চর্যা'-কবিতাবলির রচনাকাল আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। ঐ সময়-সীমাকে বাংলা সাহিত্যের আদি পর্যায় বলা যেতে পারে। 'চর্যাপদ' ছাড়াও এ যুগে রচিত বলে আরো যত কাব্য-কবিতার অস্তিত্ব অনুমান বা আবিষ্কার করা হয়েছে, পূর্ব অধ্যায়ে তাদেরও পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পরে দীর্ঘ দেড়শ বছরের বেশি সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চলেছিল সম্পূর্ণ এক শূন্যতাময় যুগ। পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত আদিম রচনাবলির পরে যেসব সাহিত্য-কর্মের সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার কোনোটির রচনাকালই চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝির আগে বলে মনে হয় না। অথচ মধ্যবর্তী প্রায় দেড়শ বছরের বাংলা ভাষায় কোনোকিছুই লেখা হয় নি, একথা মনে করা সহজসাধ্য নয়। কিছু কিছু অপ্রধান রচনার উদ্ভব সম্ভবত হয়েছিল, কালের হাতে যা নষ্ট হয়ে গেছে। তবে একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিবেশ উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির উপযোগী ছিল না। বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মজীবনে তখন ভারসম স্থিতিস্থাপকতার অভাব প্রায় সীমাহীন হয়েছিল , আর তার মূলে ছিল বহিরাগত তুর্কি মুসলমানদের দ্বারা বাংলাদেশ আক্রমণ।

যুগান্তরের সূত্র

১২০২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজি প্রথমে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। গৌড়ের রাজা তখন বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন। বাংলাদেশে এক কালে সেন বংশের রাজারা ছিলেন অমিত প্রতাপশালী হিন্দু-গৌড়াধিপ ; লক্ষ্মণ সেন ছিলেন তাঁদেরই শেষ উত্তরসূরী। নবদ্বীপে তাঁর শেষ বয়সের আবাস ছিল ; সেখানেই বখতিয়ার প্রথম আক্রমণ করেন। অতর্কিত আঘাতে বিমূঢ় বৃদ্ধ রাজা পলাতক হন। তার পরেই সারা বাংলাদেশে অরাজকতা প্রবল হয়ে ওঠে। সেন রাজাদের আগে বৌদ্ধ পাল-রাজারা ছিলেন বাংলার দণ্ডাধিকারী, তাঁরা রাজ্য লাভ করেছিলেন হিন্দু-বর্মণ বংশকে পরাজিত করে। ফলে রাজশক্তির পরিবর্তন বাংলাদেশে পূর্বাবধিই কিছু আকস্মিক ছিল না। কিন্তু পুনঃপুন এই রাজবংশের পরিবর্তনের প্রভাবে বৃহত্তর বাঙালি সাধারণের জীবনযাত্রায় খুব বেশি কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। কারণ রাজারা যে-কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী হোন না কেন, সাধারণ বাঙালি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি সকলেরই ছিল সমান আনুগত্য। সমাজের যুগ-প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের মর্যাদাবোধ ছিল গভীর। তাই কোনো রাজশক্তিই চিরাগত জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ওপরে আঘাত করেন নি, বরং সকলেই তার পোষকতা করেছেন। কিন্তু তুর্কি মুসলমানেরা এদিক থেকে কেবল ভিন্নধর্মাবলম্বী ছিলেন না, ছিলেন বিদেশীও। বাংলার জীবনধারা অথবা বাঙালি ঐতিহ্য কোনোটির প্রতিই তখনো তাঁদের কোনো মমতা ছিল না। ফলে আক্রমণের প্রায় প্রত্যেক স্তরেই লুণ্ঠন ও নির্যাতন অবধারিত হয়েছিল ; আগ্রাসী মনোভাবের প্রকাশ ইতিহাসে চিরকালই নিষ্ঠুর, বীভৎস। এবারেও অর্থ, মান, প্রাণ—ধর্ম, আচার, নিষ্ঠা সব কিছুর ওপরেই নির্মম আঘাত এসে পড়ায় বাঙালির বিবেক তখন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এবং এখানেই বিনষ্টির শেষ হয় নি। আক্রমণকারী যতই অত্যাচারপ্রবল হোক, প্রয়োজনের

তুর্কি আক্রমণ

তাগিদেও শাসনকর্তাকে মাঝে মাঝে সহৃদয় হতে হয়। বস্তুত বখতিয়ার খিলজিও আক্রমণকালের এক বছরের মধ্যে শাসকের ভূমিকায় বসে দেশে শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মন্দির ভেঙে মসজিদ, পাঠশালার বদলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল ; তবু তাঁর রাজত্বের স্বল্প সময়ের মধ্যে সাধারণের প্রাণের ভয় কমে এসেছিল। কিন্তু প্রায় তিন বছরকালের মধ্যেই ক্ষমতালোলুপ, সহচর এক আততায়ীর হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়। তারপরে নবীন শাসক-সমাজে হত্যা ও প্রতি-হত্যার পাপচক্র পুনঃপুন আবর্তিত হতে থাকে। ফলে বনেদি বাঙালি অধিবাসীরা ধন-মন-প্রাণ তথা জাতির ভয়েও পালিয়ে গিয়েছিলেন, বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্তের দুর্গম ভূমিতে। স্বয়ং লক্ষ্মণসেন পদ্মার পরপারে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের দুর্গমতায় নতুন আক্রমণের দ্বারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য ছিল না,—তাই দীর্ঘ কাল হিন্দুরা সেখানে স্বস্তির আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই ধরনের আর একটি নিশ্চিত আশ্রয় ছিল বাংলার শিরোভূমিতে হিমালয়ের গহন প্রদেশে। দেশ ছেড়ে যাবার সময়ে বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের পুঁজিপাটাসহ পুথিপত্রও সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রধানত এই কারণেই সুপ্রাচীন বাংলা কাব্য-কবিতার বহু দুর্লভ নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে পেরেছে পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্ত দেশ থেকে ; এই কারণেই 'চর্যা'পদাবলিও বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে নেপাল ভূমির সাংস্কৃতিক আতিথ্যে। এসব কথা পণ্ডিতদের ইতিহাস-নির্ভর অনুমান।

আক্রমণের বিনষ্টি

যাই হোক, এই সার্বিক বিধ্বংস ও পলায়ন-ত্রস্ততার মধ্যে উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্বযুগের অনেক সম্পদ এবং এ-যুগের বহু রচনাও পলায়নের পথে পথে বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। প্রধানত এই সব কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০২ থেকে প্রায় ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি এই দেড়শ বছর নিষ্ফলা হয়ে আছে বলে মনে করা হয়। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহি বংশের রাজ্যাধিকার লাভের পর থেকে বাংলা দেশে আবার সুস্থ জীবনযাত্রা ক্রমশ ফিরে আসতে থাকে। জীবনের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে নূতন আশ্বাসে নবীন শিল্প-রচনার উদ্যম আবার অঙ্কুরিত হতে থাকে।

বিনষ্টি-উত্তর নবজীবনাঙ্কুর

ভাবে এবং ভাষায় এই নূতন সাহিত্য 'চর্যাপদ'-এর সমকালীন রচনাবলি থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দেড়শ বছরে ভাষা সুগঠিত হয়েছে ; অপভ্রংশ কণ্টকিত অস্পষ্ট বাকলির পরিবর্তে এবার স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলা ভাষায় কাব্য রচিত হতে পারল। বাংলা বাগ্‌ভঙ্গি এবং ছন্দ-শৈলী এই সব কবিতায় স্বকীয় চরিত্রে বিমূর্ত। এই ভাষাগত পরিণতির ঐতিহাসিক পরিচয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে।

ভাবের দিক থেকেও, তুর্কি আক্রমণের দুর্যোগদিনের অভিজ্ঞতা বাঙালির নূতন সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের সুর যোজনা করেছিল। তুর্কি আক্রমণের পূর্বে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল দ্বিধা বিভক্ত। বিশেষ করে অব্যবহিত পূর্ববর্তী সেন রাজাদের আমলে সমাজের উচ্চমঞ্চে আসীন ছিলেন অভিজাত বংশ-জ ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুগণ; তাঁদের সাহিত্য-শৈলীর বাহন ছিল 'দেবভাষা' সংস্কৃত। অপর পক্ষে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ, হিন্দু নাথ-সহজিয়া লোক-সাধকেরা তাঁদের অস্বচ্ছ জীবনবোধকে মুক্তি দিয়েছেন আড়ষ্ট, অপূর্ণ অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়ে। ফলে 'চর্যা'পদাবলি রচনার প্রায় একই সময়ে অভিজাত বাঙালি কবি জয়দেব তাঁর 'মধুর কান্ত' 'শ্রীগীতগোবিন্দ' পদাবলির অমৃতময় সুরঝংকার সৃষ্টি করলেন বিদগ্ধ সংস্কৃত ভাষায়, যদিও তাঁর ভাবনা ছিল লোকসংস্কারের অনুভবে ঘনিষ্ঠ। তুর্কি আক্রমণোত্তর যুগে এই সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিভেদ সম্পূর্ণ দূর হল। এ-যুগে কবি

নবীন রচনা-সম্ভাব

অনুবাদ সাহিত্য

কৃত্তিবাস ছিলেন সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ; পাণ্ডিত্যের দম্ভও ছিল তাঁর অশেষ। নিজের সম্পর্কে লোক-মুখের প্রশস্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ।।"

কৃত্তিবাসের নিজের মনের কথাও ছিল এটি। কিন্তু এই মহাপণ্ডিত কৃত্তিবাসও বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন,—

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ।।"

এই লোক বো' 'নোর আকাঙ্ক্ষাই তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের তথ্য থেকে জানা যায়, প্রায় দেড়শ বছরের তুর্কি-নিপীড়নের কালে বাঙালিরা কোনো উল্লেখ্য প্রতিরোধ রচনা করতে পারে নি। অসহায় প্রাণীর মতোই তাদের দিগ্বিদিকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। এই অসহায়তাব প্রধান কারণ ছিল বাঙালি সমাজে ঐক্যের অভাব। দীর্ঘদিন ধবে অভিজাত ও অনভিজাতদেব মধ্যে বিভেদের দরুন সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল: চবম প্রয়োজনের দিনে আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা একতাবদ্ধ হতে পারেন নি। আক্রমণেব পরবর্তী পুনর্গঠনেব যুগে বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা এই সঠিক ত্রুটির কথা অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয়। ফলে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ও সাহিত্যের সাধনা এ-যুগে একই সঙ্গে চেষ্টা করেছে নিখিল বাঙালি জাতিকে একতাবদ্ধ করতে। তখন বাংলা দেশের অভিজাত সমাজে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মেরই একাধিপত্য ছিল। এবার হিন্দু সমাজপতিগণ দেশের বাহুস্বরূপ তথাকথিত অন্ত্যজদের আহ্বান করে আনলেন নিজেদেব ধর্ম-ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে। মানুষের মনকে স্পর্শ করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম শিল্প-সাহিত্য। তাই এতদিনেব উপেক্ষিত, অশিক্ষা-পীড়িত মনের কাছে হিন্দু-অভিজাতরা সংস্কৃত শাস্ত্রের জ্ঞান মনীষাব পসবা সাজিয়ে আনলেন বাংলা সাহিত্যের আধাবে। আলোচ্য যুগের বাংলা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ সম্পদ সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর অনুবাদিত বাংলা ভাগবত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এই অনুবাদ সাহিত্যেব প্রধান উপাদান।

কিন্তু কোনো মিলনই এক তরফা হলে পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই আলোচ্য যুগের অভিজাত হিন্দুরা নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ও জ্ঞান-সম্পদকে বাঙালি সাধারণের মনের কাছে পৌঁছে দিয়েই থামেন নি। অপর পক্ষের ধর্ম এবং পূজাচারকে নিজেদের উন্নত রুচি-কল্পনাব দ্বারা পরিশোধিত করে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এই চেষ্টাব ফলেই বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যেব পরিণত রূপ সুগঠিত হয়ে ওঠে। সর্প-দেবতা মনসা, এবং পশু-দেবতা মঙ্গলচণ্ডী আর ধর্মঠাকুর, মূলত এঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের দ্বারাই পূজিত হয়েছিলেন। এবারে এঁদের নিয়েও সংস্কৃত ভাষায় ধ্যান-মন্ত্র রচিত হতে লাগল। —পুরাণে মনসা শিবের কন্যা এবং মঙ্গলচণ্ডী শিবের পত্নী রূপে স্বীকৃতি পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এঁদের মঙ্গলকরী শক্তির মহিমাগান করে রচিত হতে লাগল বাংলা মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য

এই যুগে আর এক শ্রেণীর গীতি-সাহিত্য রচিত হয়েছিল রাধাকৃষ্ণ প্রেমের মধু-নির্ঝরকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা ; চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তিতে তাঁর আরাধনা সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার অভিজাত হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। গোপী-সঙ্গে কৃষ্ণের মধুররস-লীলাও 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণ-কাব্যে পুরা-কথিত হয়েছিল। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ের বিশেষ রূপটি বাংলা দেশের লোক-সমাজের কল্পনাতেই প্রথম জন্ম নিয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান। সেই লৌকিক প্রণয়-কাহিনীকে হিন্দু-পুরাণের কৃষ্ণ-কথার সূত্রে গেঁথে নতুন গীতি-কবিতার ধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে পরবর্তী কালে এই কাব্যগাথা বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য নামে কীর্তিত হয়েছে। আলোচ্য যুগে এই রাধাকৃষ্ণ-লীলাকীর্তনের চারণ-শ্রেষ্ঠ ছিলেন কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। অতএব দেখছি, অনুবাদ কাব্য, মঙ্গল-কাব্য, এবং রাধাকৃষ্ণ লীলাকাব্য মধ্য পর্যায়ের বাংলা কাব্যপ্রবাহ এই ত্রিধারায় প্রবাহিত ছিল। পরবর্তী আলোচনায় এই সব রচনার বিস্তৃত পরিচয় সন্ধান করা যাবে।

বৈষ্ণবপদ

তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময়।।
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইলাম তাঁর বংশের হাত।।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় হয় অন্যে বহু দূর।।"

মালাধরের ঐশ্বর্যগুণ-প্রধান কাব্য মহাপ্রভুর এই স্বীকৃতির প্রভাবে বৈষ্ণব ভাবুক জনের কাছে ভক্তি-সিক্ত মধুর রসে মণ্ডিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য সহৃদয় হৃদয়ের সৌন্দর্যানুভবের মাধ্যমে সুন্দরতর মূল্য লাভ করে এমনি ভাবেই।

পঞ্চম অধ্যায়

মধ্যপর্যায়ের মঙ্গলকাব্য

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনায় মঙ্গলকাব্য নামে এক ধরনের প্রাচীন বাংলা কাব্যকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মধ্যে তিন রকমের কাব্য কাহিনী প্রধান .—(১) পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, (২) মঙ্গলচণ্ডীর গীত বা চণ্ডীমঙ্গল এবং (৩) ধর্মমঙ্গল। বিভিন্ন দেবতা এবং বিচিত্র রকমের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এই সব কাব্য গড়ে উঠেছে। তা হলেও এইসব কাব্যকেই যে একই নামের বন্ধনে বাঁধা হয়ে থাকে, তার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত এই সব কাব্যের উদ্ভব হয়েছে সমাজের একই অনভিজাত স্তর থেকে, দ্বিতীয়, এদের বাহ্য রূপাঙ্গিকেও একটা মোটামুটি সাদৃশ্য রয়েছে। মনসা এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সে সাদৃশ্য আরো বেশি।

আগে বলেছি, এ পর্যায়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য— সমাজের উঁচু এবং নিচু স্তরের ভাব কল্পনার মধ্যে মিলন সাধন। এই সময়েই অভিজাত হিন্দুর শ্রেষ্ঠ পুরাণ কাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, পূর্বের অধ্যায়ে তার পরিচয় গ্রহণ করা গেছে। অন্যদিকে আলোচ্য মঙ্গলকাব্য সমূহে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী এবং ধর্মঠাকুর প্রভৃতি সমাজের অপেক্ষাকৃত নীচের তলার মানুষের পূজিত দেবতাদেরই মাহাত্ম্য গান করা হয়েছে। এই সব দেবতারা হিন্দু অভিজাত সমাজে আগে ছিলেন অপাংক্তেয়। এবারে তাঁদের নিয়ে অর্বাচীন পুরাণাদিতে সংস্কৃত শ্লোক গাথাও রচিত হতে লাগল। অনুমান করা হয়, এই সব লোকদেবতাদের মহিমা নিয়ে ছোট ছোট আকারে পাঁচালিকাব্য আগে থেকেই রচিত হয়ে আসছিল। এবারে উচ্চকোটির হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষায় এই সব দেবতাদের ভক্তগণ নিজ নিজ দেব গুণ গান করে বড় বড় কাব্য রচনা করতে লাগলেন। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এ কাব্যসমষ্টিকেই 'মঙ্গলকাব্য' নাম দেওয়া হয়েছে।

এই কাব্যের স্বরূপ

এই নাম করণের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে বলে মনে হয়। তুর্কি আক্রমণের পরে সমগ্র বাংলাদেশের সমাজে অভাবিত অমঙ্গলের আশংকা বহুব্যাপক হয়েছিল। তাই আলোচ্য দেবগুণ গায়ক কবিরা লিখতে লাগলেন তাঁদের পূজিত দেবতার আরাধনা করলে, কিংবা তাঁর মহিমা কাব্য পাঠ করলে, না হয়ত গান করলে বা করালে, এমন কি তা ঘরে রাখলেও লোকের সবিশেষ মঙ্গল হতে পারে, আর তা না করলে হয় অশেষ অমঙ্গল। অতএব সাধারণ অর্থে মঙ্গলকারী দেবতার যেসব মাহাত্ম্যকাব্য পাঠ, গান বা রক্ষণ করলেও জীবের মঙ্গল হয়, সেই সব কাব্যকেই **'মঙ্গলকাব্য'** বলা হয়েছে।

রূপাঙ্গিক

এই সমস্ত কাব্যের বহিরঙ্গ রূপেও একটা সাধারণ সমতা লক্ষ করা যায়। মঙ্গল কবিরা তাঁদের রচনায় সংস্কৃত পুরাণের কাঠামো কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন। ফলে প্রতি কাব্যেই পুরাণের মতো সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে আছে দেব ও নরলোক ব্যাপ্ত করে দেবতার বিচিত্র লীলার কাহিনী। প্রায় সকল মঙ্গল কাব্যেই খুব মোটা রকমের চারটি ভাগ দেখা যায়- (১) **বন্দনাংশ** - কাব্যারম্ভে প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন

দেবদেবীর বন্দনা ও কৃপা কামনা করা হয়। (২) **গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও কবির আত্মপরিচয়** :—প্রাচীন পুরাণাদির মতো এই অংশে কবিরা দাবি করছেন যে, তাঁরা স্বেচ্ছায় কাব্য রচনা করেন নি। আলোচ্য দেবতার প্রত্যক্ষ নির্দেশ, স্বপ্নাদেশ, অথবা দৈববাণী শুনে দেব-কৃপার বশেই তাঁরা কাব্য রচনা সাঙ্গ করতে পেরেছেন। এরূপ বর্ণনার ফলে কাব্য-কথার প্রতি সরল বিশ্বাসী শ্রোতাদের ভক্তি ও অনুরাগ বেড়ে যেত। আর দেবতা যে যথার্থই গ্রন্থ-রচনার মূলে ছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য কবিরা তাঁদের জীবন-চরিতের একটি খুঁটিনাটি বাস্তব বর্ণনাও প্রায়ই উপস্থিত করতেন এই অংশে। দেখাতে,—জীবনের কোন অবস্থায়, কখন, কী ভাবে দেবতা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারই একটি বিশ্বাস্য চিত্র। এই প্রয়াসের কল্যাণে বহু প্রাচীন কবির জীবনের প্রামাণিক ইতিহাস আমাদের গোচর হতে পেরেছে। (৩) **দেবখণ্ড ও সৃষ্টিতত্ত্ব** :—এই অংশে পুরাণের আদর্শ মতো জগৎ ও জীব-সৃষ্টির কাহিনী, এবং দেবলোকে আলোচ্য দেবতার লীলা-কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব কাহিনী প্রায়ই সাধারণ লোক মনের অলৌকিক বিশ্বাসের অনুসরণে লেখা ; ফলে এদের সঙ্গে পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের কোনো যোগ নেই, এবং, অনেক সময়ে গল্পগুলি অদ্ভুত মনে হয়। (৪) **নরখণ্ড**—-এই অংশে নরলোকে মঙ্গলদেবতার পূজা প্রচারের গল্প সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই সংগঠনের কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া, কবি ও কাব্য ভেদেও রচনার আকৃতি-প্রকৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণত আসরে গাইবার জন্য পালা গানের মতো সাজানো হত। প্রায়ই আট দিনরাত্রি ধরে পালাগান চলত বলে এই কাব্যপ্রবাহকে 'অষ্টমঙ্গলা'ও বলা হয়।

১। মধ্যপর্যায়ের মনসামঙ্গল কাব্য

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলই হয়ত রচনাকালের বিচারে সুপ্রাচীন। এই কাব্যের গল্প লোক-বাংলার মর্ম মন্থন করে জন্ম নিয়েছিল ; এর জীবনাবেদন তাই বাঙালির মনোলোকে প্রায় চিরস্থায়ী হয়েছে। তার ফলে পরবর্তী কালে অন্যান্য লোককাব্যে এই কাহিনীর ছায়াপাত ঘটেছে। মনসামঙ্গলের সুপরিচিত গল্পে মনসার দৈবী মহিমার চেয়ে বণিক চন্দ্রধর, আর তার পুত্রবধূ বেহুলার মানবী শক্তির জয়গানই শেষপর্যন্ত বেশি প্রকট হয়েছে।

চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর ছিল চম্পকনগরের ধনশ্রী-পুষ্ট বণিক। ছয় পুত্র, ছয় পুত্রবধূ, আর পতিপ্রাণা স্ত্রী সনকাকে নিয়ে সুখে তার দিন কাটে। দেবী মনসা শিবের কন্যা, কিন্তু তাঁর জন্মের অনৈসর্গিক কাহিনী দেব-সমাজে তাঁকে অপাংক্তেয় করেছিল। অবশেষে স্থির হয়, চন্দ্রধর মনসাকে পূজা করলে তবেই পৃথিবীতে তাঁর দেবমহিমা স্বীকৃত হবে ; দেবলোকেও তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে। কিন্তু চাঁদ সদাগর শিবের পরম ভক্ত ; মনসার পূজা করতে সে অস্বীকৃত হল। ফলে চাঁদে-মনসায় বাধল বিবাদ।

মনসামঙ্গলের কাহিনী

মনসা সর্প-দেবী। চাঁদ সদাগরের রাজত্বে তিনি সাপের উপদ্রব সৃষ্টি করতে লাগলেন। ধন্বন্তরী ছিল চাঁদ সদাগরের পরম বন্ধু, এবং শ্রেষ্ঠ সর্পবৈদ্য। সাপে-কাটা মানুষকে বারে বারে সে বাঁচিয়ে দিতে লাগল। শেষে একদিন কৌশলে ধন্বন্তরীরও জীবন নাশ করলেন মনসা। তারপর চাঁদের ছয়টি ছেলে সাপের বিষে মারা গেল ; পুত্রবধূরা বিধবা হল। সনকা আর্তনাদ করে উঠলো। চাঁদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো দিকে। সনকার গোপন মনসা পূজার ঘট সে গুঁড়ো করে দিল ; হিন্তাল লাঠির আঘাতে মনসার কাঁকাল দিল ভেঙে ; সাপে-কাটা ছয় ছেলের শবকে ভাসিয়ে

দিল নদীব জলে

ঘবেব শান্তি তখন নষ্ট হযেছে। চৌদ্দ ডিঙা সাজিযে চাঁদ সদাগব এবাবে বাণিজ্যে চলল সমুদ্রেব পথে। কালিদহেব জলে প্রবল ঝড তুলে মনসা লোকজন ধনবত্ন পসবা সহ তাব সব কযটি নৌকা ডুবিযে দিলেন। ঝডেব সমুদ্রে একা ভেসে চলল চাদ। মনসা দৈববাণী কবলেন তাব পূজা কবতে স্বীকৃত হলে এখনই সব কিছু সে ফিবে পাবে তাব দুর্গতিব অবসান হবে। দুবন্ত চন্দ্রধব কঠিন বাক্যে মনসাব সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবল। অকূল সমুদ্রে হাতেব কাছে এগিযে আসা পবমাশ্রয পদ্মবনেব ওপবে কুলকুচি ছুঁডে ফেলল, কাবণ পদ্মা-নামেব সঙ্গে যোগ বযেছে পদ্মব। তাবপব একাকী ভেসে চলল সে উত্তাল ঢেউ-এব তালে তালে। প্রায মুমূর্ষু অবস্থায অবশেষে তীবেব ওপবে আছডে পডল চাঁদ পথে মনসাব হাতে অকথ্য নির্যাতন সযে অনেক বছব পবে ফিবে এল নিজেব বাডিতে। তাব বাণিজ্য যাত্রাব সময়ে সনকা ছিলেন সন্তান সম্ভবা, বাডি ফিবে এবাবে চাঁদ তাই নবযুবক সপ্তম পুত্রেব মুখ দেখতে পেল। লক্ষ্মীমন্ত ছেলে, নাম তাব লক্ষ্মীধব বা লখিন্দব। চাদ এবাব লখিন্দবেব বিবাহেব আযোজনে তৎপব হযে উঠল।

উজানি নগবেব ধনবান শাহবেনেব কন্যা বেহুলা অপূর্ব রূপ গুণবতী তাব সঙ্গে লখিন্দবেব বিযেব সম্বন্ধ স্থিব হল কিন্তু বিযেব বাতে দেখা দিল দুর্যোগ বাববাব তিনবাব লখিন্দব সংজ্ঞা অজ্ঞান হযে পডল বিযেব পিঁডিতে প্রতিবাব বেহুলা আপন শক্তিতে তাব প্রাণ ফিবিযে আনল তবু চন্দ্রধব বিবাহেব অনুষ্ঠান কোনো বকমে শেষ কবে চম্পক নগবে লোহাব বাসবে নিযে এল বব বধূকে। মনসা আগে থেকে শাসিযে বেখেছিলেন তাকে পূজা না কবে লখিন্দবেব বিয়ে দিতে গেলে বিযেব বাসবেই সাপে কাটবে তাকে। চাদ লোহাব বাসব তৈবি কবেছিল সাপেব প্রবেশপথ বন্ধ কবাব জন্যে। কিন্তু দেবতাব কূটকৌশল এমনি যে লোহাব বাসবেব গোপন কোণেও ছিদ্র বচনা কবে ঊষা পূর্বলগ্নে বেহুলাব ক্ষণিক তন্দ্রালুতাব সুযোগ নিযে কালনাগ কেটে গেল লখিন্দবকে। স্বামীব মৃতদেহ কলাব ভেলায নিযে বেহুলা ভেসে গেল দেবলোকে দেবতাদেব তুষ্ট কবে স্বামী ও ছয ভাসুবেব জীবন এবং সেই সঙ্গে লোক-লস্কবসহ শ্বশুবেব চৌদ্দ ডিঙ্গা উদ্ধাব কবে আবাব স্বদেশে ফিবে এল সে মনসা সঙ্গে এলেন একটি আব্দাব নিযে – চাঁদেব হাতে তাঁকে পূজা পাইযে দিতে হবে। দেবতাব নির্যাতনে চাঁদ এখনো মাথা নত কবেনি, কিন্তু বিডম্বিতা বধূব প্রতি মমতায মন তাব টলল স্থিব হল, বাঁ হাতে পিছন ফিবে মনসাকে একটি পুষ্পাঞ্জলি ছুঁডে দেবে সে,—মনসা তাতেই বাজি। এমনি কবে দেব মানবেব বিবোধেব অবসান হল মানব শক্তিবই জয ঘোষণা কবে। পাবশেষে মনসা পূজা প্রচাব কবে লখিন্দব ও বেহুলা স্বর্গে গেল সশবীবে। তাবা ছিল স্বর্গেব গন্ধর্ব গন্ধর্বী অনিরুদ্ধ ঊষা।

মনসামঙ্গলেব আদিকবি রূপে কানা হবিদত্তেব নাম উল্লেখ কবা হযেছে। মনসামঙ্গলেব একাধিক কবি তাকে আদিসূবীব মর্যাদা দিযেছেন। কানা হবিদত্তেব আবির্ভাবেব সময বা তাঁব

আদি কবি কানা হবিদত্ত

বচনাব কোনো নিশ্চিত পবিচয এ পর্যন্ত পাওযা যায নি। পণ্ডিতেবা নানা জনে কবিকে নানা সমযেব অন্তর্ভুক্ত কবেছেন। তবে ইনি যে ত্রযোদশ শতাব্দীব আগে অথবা চতুর্দশ শতকেব পবে আবির্ভূত হন নি,—এমন কথা বলা যেতে পাবে। কেউ কেউ মনে কবেন, কবি মযমনসিংহ জেলাব লোক ছিলেন।

হবিদত্তব বচিত কাব্যেব কোনো পৃথক পূর্ণাঙ্গ পুথি পাওযা যায নি। অন্যান্য কবিব নামে প্রচলিত কাব্যে এখানে ওখানে হবিদত্তেব ভণিতায একটি-দুটি বচনাংশ পাওযা গেছে। ঐ সব টুকবো লেখা থেকে কবিব প্রকাশভঙ্গিব সবল সবসতা আব সাবলীলতা সম্পর্কে নিঃসংশয

হওয়া যেতে পারে :--

"ওলা শুনি আদ্যের কাহিনী।
মুই হেন সেবক শবণ লইলাম গো
ঘটে লামি লও ফুল পাণি।।
নেতা বলে বিষহরি এথা রহিয়া কি করি
মর্তা ভুবনে চল যাই।
মর্ত্য ভুবনে যাইয়া ছাগ মহিষ বলি খাইয়া
সেবকেরে বর দিতে চাই।।"

(হরিদত্তের পরেই মনসামঙ্গলের স্মরণীয় প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব। ইনি মনসামঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীও। এঁর জনপ্রিয়তা বাংলার প্রাদেশিক সীমাকে অতিক্রম করে কালজয়ী হয়েছে। আসামের সুদূর প্রত্যন্তে অসমীয়া ভাষায় লেখা পদ্মাপুরাণের পুথি নারায়ণ দেবের নামে প্রচলিত হয়ে আছে) কবির আবির্ভাব এবং গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মহলে দূরপ্রসারী মতভেদ রয়েছে। তবে নারায়ণ দেব যে মনসামঙ্গলের আরো একজন বিখ্যাত কবি বিজয় গুপ্তের পূর্ববর্তী ছিলেন, এমন অনুমান অসংগত বলে মনে হয় না, বিজয় গুপ্ত পনেরো শতকের শেষ ভাগের কবি ছিলেন।

নারায়ণ দেব

নিজের পরিচয় সম্পর্কে নারায়ণ দেব কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখেন নি। তাঁর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে, মৌদগোল্য গোত্রের কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, পিতার নাম ছিল নরসিংহ, মা ছিলেন রুক্মিণী। কবির পূর্বপুরুষেরা আদিতে ছিলেন রাঢ়ের, পরে এঁদের বসতি হয় বোরগ্রামে। এই গ্রাম এখন বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন।

গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে কবি বলেছেন —

"পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণ দেবে তারে পাঁচালী রচিছে।।"

এর থেকে মনে হয়, নারায়ণ দেব হয়ত সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদির সূত্র থেকে নিজের রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির মৌলিক কল্পনা। এই কল্পনার মধ্যে আদিমতার স্বভাব বর্তমান ছিল। নারায়ণ দেবের ভাষায় সূক্ষ্ম কারুকার্য নেই কিন্তু স্থূল রুক্ষ বাচনভঙ্গির মধ্যে জড়িয়ে আছে মহাকাব্যোচিত দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা। লখিন্দরের মৃত্যুতে শোকার্ত চন্দ্রধরের ক্ষোভের উত্তাপ চিত্রিত করে কবি বলেছেন --

"কথোক্ষণ থাকি চান্দে স্থির কৈল মন।
পদ্মাকে মন্দ বলে কঠোর বচন।।
পুত্র মৈল খোটা জদি দেয় মোরে কানি।
তাহার যতেক গুণ আমি তারে জানি।।
পদ্মবনে পরিহাস্য করিল শঙ্করে।
সেই দুরাক্ষর বানি ঘোষয়ে সংসারে।।
পথে আনিতে রছাই করিতে চাইল বল।
ঘরে আসি খাইল তবে সতাইর ঠোকর।
দেব করিয়া বুলিতে লজ্জা নাহি কানি।
এক রাত্রি রিহা করি ছাড়ি গেল মুনি।।

হাসান হোসেন লাজ দিল বিধি মতে
* * *
হেমতালে কাকালি ভাঙ্গিল মোর হাতে।।
যদি কানির লাইগ পাম একবার
কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার।।
জে করিমু কানিরে আমার মনে জা না।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিসা গাঙে।।'

প্রবল শোকের সঙ্গে উৎকট অসূয়া বুদ্ধির এই বিমিশ্রতা চাঁদ সদাগরের চরিত্রকে আদিম রুক্ষতার সঙ্গে মহাকাব্যিক উদাত্ততায় উদ্ভাসিত করেছে। কেবল ক্ষুব্ধ বিদ্বেষ বর্ণনাতেই নয়, করুণরসের রচনাতেও নারায়ণ দেবের কবিকৃতির গম্ভীর সংহতি একটুও নষ্ট হয় নি। আর পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন 'করুণ রসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই।'

নারায়ণ দেবের পরেই মনসা মঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি বিজয় গুপ্ত। তিনি নিজেই তাঁর কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করে গেছেন —

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।।'

১৪১৬ শকে সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। ঐ শকে অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহও গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পণ্ডিতেরা বিজয় গুপ্তের প্রদত্ত এই তারিখের প্রামাণিকতা মেনে নিয়েছেন। কাব্যাংশের আত্মবিবরণী থেকে কবির ব্যক্তিগত পরিচয়ও জানা যায়। বর্তমান বাংলাদেশে বাখরগঞ্জ জেলার গৈলাফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের জন্ম হয়। তার পিতার নাম সনাতন মা ছিলেন রুক্মিণী এবং বৈদ্য বংশজাত। ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের পূজিত মনসা মূর্তি দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত রক্ষিত ছিল।

বিজয় গুপ্তের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য অলংকারশাস্ত্র সম্মত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস। তার কাব্যে নারায়ণ দেবের রচনার স্থূলতা যেমন নেই তেমনি গাম্ভীর্যেরও অভাব আছে। কিন্তু গল্প বলার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল বিজয় গুপ্তের। মনসামঙ্গলের টুকরো টুকরো উপাখ্যান যে তিনি একটি করে পূর্ণাঙ্গ সরস গল্প গড়ে তুলেছেন। তার বাচনভঙ্গিতে পণ্ডিতের বিদগ্ধতা ছিল সেই সঙ্গে ছিল হাস্যকৌতুক আর রসবোধ। মাঝে মাঝে এই রসিকতা সুরুচির মাত্রাও যে অতিক্রম করেনি এমন কথা বলা চলে না। তাহলেও, রচনার দৃঢ় বাঁধুনি সুমিত শব্দ প্রয়োগের সুষমা আর কবি চিত্তের সহজ সহৃদয়তা, সব কিছু মিলে বিজয় গুপ্তের কাব্যের প্রসন্ন পরিচ্ছন্নতা কোথাও নষ্ট হয় নি। ফলে রসিক কবির হাতে সকরুণ বেদনা চিত্রও আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

'জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম্মফলে।।
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্ম্মফল।

দেব কন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল।।
ডাকিবার লক্ষ্য নাই শুন গো জননী।
বিধাতা করিল মোরে জনম দুঃখিনী।।"

বেহুলার বিলাপের এই বর্ণনা কেবল দক্ষ রচনাশৈলীর প্রভাবেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে! বিজয় গুপ্তের রচনার মুন্সিয়ানার এক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, তাঁর কাব্যের বহু অংশ আজও লোক-প্রবচনের মর্যাদা নিয়ে সাধারণ বাঙালির মুখে মুখে ফিরছে :—

"অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাঁটে পড়ে চর।।"
"যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে।"

মধ্য প' য়ের বাঙালি মঙ্গল-কবিদের মধ্যে বচনার মুন্সিয়ানায়, এবং আলংকাবিক প্রকাশরীতির দক্ষতায় বিজয় গুপ্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

এই সময়কার মনসামঙ্গলের আর একজন কবি ছিলেন বিপ্রদাস পিপিলাই। এঁর লেখা কাব্যের দুখানি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে। দুটি পুথিই খণ্ডিত। কোনোটিতেই বেহুলা-লখিন্দরের গল্প আরম্ভও হতে পারে নি। কিন্তু আত্মবিবরণী-অংশ থেকে কবির নিঃসংশয় পরিচয় এবং কাব্য-রচনাকালের সন্ধান পাওয়া গেছে। বচনাকাল সম্বন্ধে কবি লিখেছেন,—"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ"। এই তারিখ ঠিক হলে বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' রচিত হয়েছিল বিজয় গুপ্তের কাব্যেব মাত্র এক বছর পরে। হুসেন শাহ তখনও গৌড়ের সুলতান ; কবি নিজেও তাঁর উল্লেখ করেছেন।

বিপ্রদাস পিপিলাই

নিজের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে বিপ্রদাস জানিয়েছেন,—তিনি সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, তাঁর গোত্র বাৎস্য, কৌথম শাখা, পাঁচ প্রবর এবং পিপিলাই গাঁই। তাঁর পূর্বপুরুষেরা অনেক দিন ধরে বাদুড্যা বটগ্রামে বাস করছিলেন। কবির রচনার যৎসামান্য পরিচয় যা পাওয়া গেছে, তাঁর থেকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার অধিকার তাঁর ছিল বলে মনে হয় না।

২। মধ্যপর্যায়ের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল অর্থে বুঝি মঙ্গলচণ্ডীর লীলাকাব্য। মূলত ইনি অনার্য-কল্পিত দেবতা ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তী কালে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী, আর দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে এই দেবী শিবের গার্হস্থ্যের অধিকার দাবি করেছেন। ফলে, চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং শিব-দুর্গার পরিবার-চিত্র বর্ণনায় আর্য-অনার্য কল্পনার বিমিশ্রতা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, 'নরখণ্ড'র কাহিনীতেও এই মিশ্র স্বভাব সহজেই লক্ষ করবার মতো।

চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গলের 'নরখণ্ড'তে দুটি গল্প। প্রথমটি কালকেতু-ফুল্লরার। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এইটিই আলোচ্য বিষয়ে প্রাচীনতর গল্প ; শিল্পকর্ম —তথা জীবন-রূপায়ণের দিক থেকেও এই কাহিনীটিই নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। কালকেতু এবং ফুল্লরা ব্যাধ-দম্পতি ; দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনে তাদের সুখ না থাকলেও শান্তির অভাব ছিল না। পশুবধে কালকেতু ছিল অব্যর্থলক্ষ্য ; ফুল্লরাও পরিশ্রমে ছিল অকুণ্ঠ। দিনান্তে অনেক বন্যপশু বধ করে কালকেতু ঘরে ফিরত, গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পশুমাংস বিক্রয় করে ফুল্লরা স্বামীকে

চণ্ডীমঙ্গলের দুটি গল্প

সাহায্য করত। দিন তাদের ভালই কাটছিল। কিন্তু বনের পশুরা কালকেতুর হত্যাকাণ্ডে ভীত হয়ে মঙ্গলচণ্ডীর শরণ ভিক্ষা করল। দেবী তাদের অভয় দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন কালকেতুর দৃষ্টির অন্তরালে। দিনে দিনে ব্যাধের ভাগ্যে শিকার জোটে না ; ঘরের বাসি মাংসও নিঃশেষিত হয়ে যায়। ক্ষুধার তাড়নায় কালকেতুর হিতাহিতজ্ঞান প্রায় লুপ্ত ! এমন সময়ে স্বর্ণ-গোধিকার বেশ ধরে দেবী আসেন তার ঘরে। কালকেতু-ফুল্লরার কর্তব্য ও সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হয়ে তিনি তাদের অনেক সম্পদ দান করেন ; সেই ধন দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে নূতন নগর পত্তন করে কালকেতু রাজা হয়ে বসে। সম্পদ এবং সুখ এবারে সত্যিই অকল্পনীয় হয়েছিল। কিন্তু সুদিনে দেবীর কৃপা বিস্মৃত হল কালকেতু। ফলে, ভাড়ু দত্ত নামক বঞ্চকের কৌশলে কলিঙ্গরাজ এসে আক্রমণ করলেন নূতন নগরী; কালকেতু পরাজিত এবং বিড়ম্বিত হল। দুর্দিনে আবার দেবীর করুণার কথা মনে পড়ে। তখন মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করে কালকেতু-ফুল্লরা আবার হারানো রাজ্য ফিরে পায় ; দেবী-মহিমারও ঘটে প্রকাশ। এমনি করে মর্ত্যে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচার করে সপত্নীক কালকেতু সশরীরে স্বর্গে ফিরে যায়। আসলে সে ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের শাপভ্রষ্ট পুত্র নীলাম্বর, আর ফুল্লরা ছিল নীলাম্বর-পত্নী।

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় গল্পটি সমাজের অসুস্থ জীবন-ব্যবস্থার চিত্র। তা ছাড়া, এই গল্পে মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর উপাখ্যানেরও ছায়া পড়েছে ; অথচ তা-ও খুব দুর্বল। ধনপতি সদাগর যেমন ধনবান ছিল তেমনি ছিল বিলাসী ভোগাতুর। পায়রা ওড়ানো ছিল তার অবকাশ কালের এক সুখক্রীড়া। একদিন পায়রা একটি উড়ে গিয়ে পড়ল তার জ্ঞাতি শ্যালিকা খুল্লনার কোলে। পায়রা ছাড়াতে গিয়ে সদাগর ধনপতি বালিকা খুল্লনার রূপে মোহিত হয় এবং তাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। বিয়ের পরেই ধনপতিকে বাণিজ্যযাত্রা করতে হয় দূরদেশে। প্রথমা স্ত্রী লহনার হাতে খুল্লনাকে সঁপে দিয়ে সে দেশ ত্যাগ করে। এদিকে দুষ্টা দাসী দুর্বলার দুর্বুদ্ধি পেয়ে সপত্নী খুল্লনার ওপরে অত্যাচার করতে থাকে লহনা। চেলি পরিয়ে তাকে বনে পাঠানো হল ছাগল চরাতে। সেখানে চরম ক্লেশ ও দুর্যোগের মধ্যে বন-নারীদের মঙ্গলচণ্ডী পুজো করতে দেখে খুল্লনা। দেবীর মহিমায় তার মন সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, এবং সে-ও দেবীর পূজা করে বিপদ থেকে মুক্ত হয়। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে বিলাসমত্ত ধনপতিও দেশে ফিরে আসে। স্বামীর প্রেম-সহৃদয়তায় খুল্লনার জীবন এবার ভরপুর হয়ে উঠল। সে সন্তান-সম্ভবা হয়। এই সময়ে ধনপতি আবার বাণিজ্যযাত্রা করে। যাবার সময়ে খুল্লনার পূজিত 'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা' মঙ্গলচণ্ডীকে সে উপেক্ষা করে যায় ; আসলে সে ছিল শিবের ভক্ত। কিন্তু চণ্ডীকে উপেক্ষা করার ফলে বিদেশে গিয়ে ধনপতি কারারুদ্ধ হয়। এদিকে চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার নবজাত পুত্র শ্রীমন্ত দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে। দেবীর প্রতি তার অশেষ ভক্তি। অবশেষে বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে সে-ই নিখোঁজ পিতাকে উদ্ধার করে আনে। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীর কৃপা-মাহাত্ম্য দেখে ধনপতিও সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে; দেবীর পূজা প্রচারিত হয় পৃথিবীতে।

আগে বলেছি, দ্বিতীয় গল্পটিতে সমাজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার ছবি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। ধনপতির বিলাসিতা এবং নারী-রূপলোলুপতা নীতিজ্ঞান-হীনতারই নামান্তর। অথচ, কালকেতু ও ফুল্লরা দরিদ্র নিষাদ হলেও তাদের দাম্পত্য-জীবন ছিল সহৃদয় বিশ্বস্ততায় পূর্ণ। বাংলা দেশের কবি সংসার জীবনের সেই মধুর চিত্রই অক্ষয় অক্ষরে রচনা করেছেন 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে।' সামাজিক দুর্নীতি আর গ্লানির রূপায়ণে তাঁদের লেখনী স্বভাবত কুণ্ঠিত হয়েছিল।

যাই হোক, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোনো প্রাচীন নিদর্শন প্রায় পাওয়াই যায় নি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন চক্রবর্তী মুকুন্দ। সমগ্র মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যেরও সর্বশ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা এঁরই প্রাপ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব কাল। কাব্যমধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজে বলেছেন,—

মাণিক দত্ত,—চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি (?)

"মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত পথ পরিচয়।।"

মনে করা হয়, মাণিক দত্তই ছিলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি। এঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে তিনি পঞ্চদশ শতকের পরের কবি নন বলে মনে করা যেতে পারে। মাণিক দত্তের কাব্যের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে; তাও নিতান্ত অর্বাচীন কালের লেখা। সে-পুথির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। যাই হোক, ঐ পুথিতে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি অংশ থেকে জানা যায়,—কবির বাস ছিল ফুলুয়া নগরে। অনেকে ফুলুয়া অর্থে মালদহ জেলার ফুলবাড়িকে নির্দেশ করে থাকেন। কবি জানিয়েছেন, প্রথম জীবনে তিনি কানা এবং খোঁড়া ছিলেন। দেবীর কৃপায় তাঁর বিকল অঙ্গ সমূহ সুস্থ হয়ে ওঠে। দেবীর আদেশেই তিনি কাব্য-রচনায় বৃত হয়েছিলেন।

উপকরণের অভাবে মাণিক দত্তের কবি-কর্মের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। একখানি মাত্র যে পুথি পাওয়া গেছে, তাতেও অপরাপর কবিদের রচনার পরিমাণই বেশি।

৩। মধ্যপর্যায়ের ধর্মমঙ্গল কাব্য

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জনপ্রীতি বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই ব্যাপক ছিল। এদিক থেকে ধর্মঠাকুরের পূজা, এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনা ও প্রসার, ছিল সবিশেষ সীমাবদ্ধ। রাঢ় ভূমির বাইরে এই দেবতা ও কাব্যের বিস্তার কখনোই ঘটেনি। আর রাঢ় বলতে তখন বোঝাত,—

ধর্মপূজার ঐতিহাসিক পটভূমি

"পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি" দিয়ে ঘেরা ভূভাগকে। সেদিনকার রাঢ় এখন হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে আছে। এই রাঢ় অঞ্চলে বহুদিন অনার্য আচার একচ্ছত্র অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে রাঢ়দেবতা ধর্মঠাকুরের রূপ-কল্পনা এবং পূজা-পদ্ধতিতেও অনার্য ঐতিহ্যের ছাপ ব্যাপক। মূলত তথাকথিত অন্ত্যজদের দ্বারাই ধর্মঠাকুর পূজিত হতেন। মনসা বা চণ্ডী যখন হিন্দু পৌরাণিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, ধর্মঠাকুর তখনো উচ্চকোটির সমাজে ছিলেন অপাংক্তেয়। এমন কি খ্রিস্টীয় সতেরো শতকেও ব্রাহ্মণ কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনা করার অপরাধে সমাজে পতিত হয়েছিলেন।

বাংলা ভাষায় ধর্মদেবতাকে নিয়ে রচিত কাব্য-সাহিত্য প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত: —(১) ধর্মপূজার পদ্ধতি এবং (২) ধর্মমঙ্গল কাব্য। রামাই পণ্ডিতকে ধর্ম পূজক আদি পুরোহিতের সম্মান দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতিও আসলে তাঁর লেখা বলেই কথিত হয়ে থাকে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনাকালে 'শূন্যপুরাণ'-এর প্রসঙ্গে রামাই পণ্ডিত এবং ধর্মপূজা-বিধির পরিচয় দিয়েছি।

ধর্মঠাকুর সম্পর্কে বাংলা দেশে প্রথম উল্লেখ্য আলোচনা করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 'ধর্ম'কে তিনি বৌদ্ধ দেবতা বলে মনে করেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ধর্ম'-র প্রতীক রূপে

একটি কূর্মাকৃতি পাথর পূজিত হয়ে থাকেন। আর সেই পাথরটি অনেক সময়ে আরো তিনটি পাথরের পায়ার ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্রীমশায় ঐ তিনটিকে বৌদ্ধদের ত্রিশরণের প্রতীক বলে মনে করেছিলেন; 'ধর্ম' নামটিও তো বৌদ্ধ ত্রিশরণের একটি! পরবর্তী কালের পণ্ডিতেরা কিন্তু ধর্মঠাকুরের ধ্যান কল্পনার ব্যাখ্যা করে তাতে বৈদিক সূর্য, এবং পৌরাণিক বিষ্ণু,যম প্রভৃতি হিন্দু দেবতার স্বভাব-ধর্ম আবিষ্কার করেছেন। আসল কথা, ধর্ম মূলত ছিলেন অনার্য, তথাকথিত অন্ত্যজদের দেবতা। তাই তাঁর রূপ-কল্পনায় নানা রকম আজগুবি কাহিনী ও তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে মূল অনার্য দেবতার উপাখ্যানের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-কল্পনা যুক্ত হয়েছে।

ধর্ম-দেবতার উৎস পরিচয়

ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনীর নায়ক লাউসেন। তবে কোনো কোনো কাব্যে হরিশ্চন্দ্র রাজার স্ত্রী মদনার ধর্মপূজার কাহিনীও প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে; তিনি নাকি ধর্মকে তুষ্ট করবার জন্যে 'শালে ভর' দিয়ে আরাধনা করেছিলেন। অবশ্য অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়া এই গল্পের আর কোনো বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, রামায়ণ কাব্যের হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করে ধর্মপূজার এক লৌকিক উপাখ্যান প্রথমে প্রচলিত ছিল। পরে লাউসেনের গল্প জনপ্রিয়তা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন গল্প ক্রমশ লুপ্ত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

লাউসেন-এর কাহিনী আকারে দীর্ঘ; এবং বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। গল্পের মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে গৌড়ের রাজা, তাঁর শ্যালক মন্ত্রী মহামদ পাত্র, মহামদের অনুজা রঞ্জাবতী, এবং রঞ্জাবতীর বয়োবৃদ্ধ স্বামী কর্ণসেনকে কেন্দ্র করে। রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন-এর জন্মের পরে সে-ই গল্পের অদ্বিতীয় নায়ক হয়ে উঠেছে।

কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের বিশেষ অনুগত অমাত্য; ত্রিষষ্ঠীর গড়ে তিনি রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। অন্যপক্ষে গৌড়ের রাজধানীতে সোমঘোষ নামে রাজভক্ত এক প্রজা মন্ত্রী মহামদের হাতে কেবলই পীড়িত হচ্ছিল। রাজা তাকে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কালক্রমে সোমঘোষের ছেলে ইছাই ঘোষ পার্বতীর বর পেয়ে দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। গড়ের শাসক কর্ণসেনকে পদচ্যুত করে সে স্বাধীন শাসকের পদবি গ্রহণ করে; ত্রিষষ্ঠীর নূতন নামকরণ করে ঢেঁকুর। স্বয়ং গৌড়েশ্বর ইছাইর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে পরাজিত হন। কর্ণসেনের ছয়টি পুত্র সেই যুদ্ধে প্রাণ হারায়, এবং তাদের পত্নীরা অনুমৃতা হয়। কর্ণসেনের স্ত্রীও পুত্রশোকে মৃত্যু বরণ করেন।

বৃদ্ধ কর্ণসেনের দুঃখে রাজা ও রানী বেদনা বোধ করেন; রানীর অনুজা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তারা আবার কর্ণসেনের বিবাহ দেবার সংকল্প করেন। কিন্তু বুড়ো বরের সঙ্গে ছোটবোনের বিয়ে দিতে মহামদ-র প্রবল আপত্তি; তাই রাজধানী থেকে তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাজারানী একদিন কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর বিয়ে দিয়ে তাদের সুদূর ময়নাপুর রাজ্যে পাঠিয়ে দেন। ফিরে এসে একথা জেনে মহামদ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হন, প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে আর কখনো তিনি রঞ্জাবতীর মুখ দেখবেন না।

এদিকে কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর দিন সুখেই কাটছিল; এক মাত্র দুঃখ কেবল তাদের কোনো সন্তান হয় না। কর্ণসেন একবার রাজধানীতে এসেছিলেন। মহামদ তখন রাগে অন্ধ হয়ে রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে বিদ্রূপ করে। ব্যথিতচিত্তে কর্ণসেন ময়নাপুরে ফিরে যান। স্বামীর মুখে অগ্রজের ব্যঙ্গ-কথা শুনে রঞ্জাবতী পুত্র প্রার্থনায় ধর্মের আরাধনায় ব্রত হন। হরিশ্চন্দ্র রাজার স্ত্রী মদনার

মতো তিনি শালে ভর দিয়ে ধর্মকে সন্তুষ্ট করেন; এবং তাঁর কৃপায় লাউসেন নামক পুত্রের জননী হন। মহামদ-র নির্দেশে শিশু লাউসেনকে ইন্দামেটে চুরি করে। কিন্তু ধর্মের হুকুমে হনুমান তাকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন। লাউসেনের খেলার সাথী রূপে ধর্মঠাকুর এবারে কর্পূরসেন নামে তার নূতন এক সহোদর পাঠিয়ে দিলেন।

দুই ভাইকে মল্লবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুললেন হনুমান। লাউসেন নিজের চরিত্রবলে পার্বতীকে খুশি করে তাঁর কাছ থেকে এক অজেয় অসি লাভ করে। তারপর সে গৌড়ে চলল ছোটভাই কর্পূরসেনকে সঙ্গে নিয়ে। পথে বাঘ এবং কুমির তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। জামতি আর গোলাহাটে রূপবিলাসিনী নারীরা পেতে ধরল রূপের দুরপণেয় ফাঁদ। কিন্তু দেহ, মন, এবং চরিত্রের শক্তিতে সকল বাধাকে অতিক্রম করে লাউসেন গৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে পৌঁছাতেই মহামদ তাকে চোর বলে কারারুদ্ধ করে; দাদাকে ছেড়ে কর্পূর তখন পালিয়ে গেল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় লাউসেন অবিলম্বে মুক্ত হয়. এবং অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে রাজার কাছ থেকে একটি বল-দৃপ্ত অশ্ব আর কালু প্রভৃতি বারোজন ডোম-বীরকে সঙ্গী হিশেবে লাভ করে।

এবার বাড়ি ফিরে লাউসেনকে রাজার আদেশে কামরূপ যেতে হয়। দৈবী শক্তিতে বলবান কামরূপ রাজ্যকে জয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। একথা জেনেও লাউসেনকে ধ্বংস করবার জন্যেই মহামদ তাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল। ধর্মের কৃপায় লাউসেন অনায়াসে কামরূপ জয় করে, এবং রাজকুমারী কলিঙ্গাকে লাভ করে পত্নীরূপে। ফেরার পথে মঙ্গলকোট ও বর্ধমানের রাজকন্যা অমলা আর বিমলাও লাউসেনের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়।

এবারে লাউসেনের জীবনে নূতন দুর্বিপাক সৃষ্টি করতে চায় মহামদ। সিমুলার রাজকন্যা কানড়া ছিল অপূর্ব রূপ-গুণবতী। গৌড়েশ্বর তাকে বিবাহ করতে চান; কিন্তু রাজা বৃদ্ধ হয়েছিলেন বলে কানড়া সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর নবলক্ষ সৈন্য নিয়ে সিমুলায় যুদ্ধযাত্রা করেন। কানড়া যুদ্ধের আগেই একটা লৌহগণ্ডা উপস্থিত করে বলে, এক আঘাতে যে এই গণ্ডা দুভাগ করতে পারবে, তাকেই সে পতিরূপে বরণ করবে। বৃদ্ধ রাজা ব্যর্থ চেষ্টা করে উপহাসের ভাজন হন। অথচ লাউসেন অনায়াসে সেই গণ্ডা দুভাগ করে। প্রথমে অবশ্য রাজার ঈর্ষা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় আবার সব ঠিক হয়ে যায় ; লাউসেন কানড়াকে বিবাহ করে।

এবার ইছাই-পরাভবের পালা। লাউসেন প্রবল যুদ্ধ করে ইছাইর সেনাপতি লোহটাবজ্জরকে বধ করে। মৃত লোহটার মুণ্ড দিয়ে মহামদ কৌশলে লাউসেনের ছিন্নমুণ্ড প্রস্তুত করে ময়নাপুরে পাঠিয়ে দেয়। কর্ণসেন আর রঞ্জাবতী শোকে অভিভূত হয় ; বধূরা প্রস্তুত হয় অনুমৃতা হতে। এমন সময়ে হনুমান এসে সত্য প্রকাশ করে দেন।

এদিকে ইছাইর সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ চলতে থাকে; ইছাইর রথে পার্বতী, আর লাউসেনের পক্ষে ধর্মঠাকুর লড়তে থাকেন। অবশেষে লাউসেনের জয় হয়। এই যুদ্ধে কালুডোম প্রবল বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

সবশেষে লাউসেনের চরম পরীক্ষা হয় পশ্চিমোদয় সাধনে। গৌড়েশ্বর ধর্মপূজার আয়োজন করেন। কিন্তু নানা কারণে ধর্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হন, রাজ্যে দেখা দেয় ঝড় বৃষ্টির প্রবল দুর্যোগ। সেই পাপ বিদূরণের জন্য লাউসেন 'হাকন্দ' যান পশ্চিম-উদয় সাধনে। এই সুযোগে মহামদ লাউসেনের রাজ্য আক্রমণ করে। লাখাই ডোম্‌নী এবং লাউসেন-পত্নী কানড়ার বীরত্বে মহামদ-র সৈন্যদল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। মহামদকে বন্দী করে কানড়া তার গালে চুনকালি মেখে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এই যুদ্ধে লাউসেনের ভক্ত কালুডোমের প্রাণান্ত ঘটে।

এদিকে লাউসেনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর অমাবস্যার রাত্রে সূর্যকে পশ্চিম আকাশে

উদিত হতে আদেশ করেন, পশ্চিমোদয় সাধিত হয়। কিন্তু দুরাশয় মহামদ এবারেও লাউসেনের সিদ্ধি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে। ফলে ক্রুদ্ধ ধর্মঠাকুর তার সারাদেহে গলিত কুষ্ঠ ছড়িয়ে দেন। লাউসেনের প্রার্থনায় তার রোগমুক্তি ঘটে। কিন্তু পাপের চিহ্নরূপে মুখে কুষ্ঠরোগের একটি দাগ থেকে যায়। লাউসেন ধর্মপূজা প্রচার করে সশরীরে স্বর্গে গমন করে। এখানে ধর্মমঙ্গলের 'নরখণ্ড' শেষ হয়েছে।

ধর্মমঙ্গলের শিল্পগুণ

মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের গল্পে বাঙালি জীবনের স্পর্শকাতর অনুভূতি ও আবেগ কাব্যরূপ পেয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে তেমন শিল্প-রচনার অবকাশ প্রচুর ছিল না। যুদ্ধ-ঝঞ্ঝার ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্ত এই কাব্য-কথায় ডিটেকটিভ গল্পের স্বাদই বেশি। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টায় রাঢ়ের বীর্যবান শিল্পীরা প্রায়ই অসার্থক হননি।

চণ্ডীমঙ্গলের মতো ধর্মমঙ্গলেরও প্রথম কবির নিশ্চিত পরিচয় জানা যায় না। এই কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের 'বন্দনা' অংশে লিখেছেন,—

"ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন :—

"হাকন্দপুরাণ মতে ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মসভায়।"

ময়ূর ভট্ট ধর্মমঙ্গলের আদ্য কবি (?)

এর থেকে [illegible] করা হয়েছে ময়ূর ভট্ট ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ছিলেন, আর তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'হাকন্দপুরাণ'। ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য একাধিক কবিও ময়ূর ভট্টের বন্দনা করেছেন দেখে এ অনুমান আরো দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু কবির আবির্ভাবকাল বা রচনার নিশ্চিত কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চদশ শতকে অনুলিখিত ময়ূর ভট্টের কাব্যের একখানি পুথি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু পরে সে পুথির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ইদানীং ময়ূর ভট্টের ধর্মমঙ্গলের আর একটি পুথি প্রকাশিত হয়েছে। তাতেও কবি কিংবা কাব্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় ঘোচে না। অনেকে সংস্কৃত 'সূর্যশতক'-এর কবি ময়ূর ভট্ট এবং ধর্মমঙ্গলের আদি কবিকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। এই অনুমান কতদূর সংগত বলা কঠিন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মধ্যপর্যায়ের বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য

'বৈষ্ণব' অর্থে বুঝি 'বিষ্ণু সম্বন্ধীয়'। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব পদাবলি-সাহিত্যের উপজীব্য পৌরাণিক বিষ্ণু-কথা নয়—কৃষ্ণলীলা, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাধা কৃষ্ণলীলা। কৃষ্ণ হিন্দুপৌরাণিক দেবতা ; কিন্তু রাধার উল্লেখ কোনো প্রাচীন পুরাণেই পাওয়া যায় না। কাব্যে

বৈষ্ণব পদে বৈষ্ণবতা

রাধা কৃষ্ণলীলার প্রাচীনতম বর্ণনা পাই 'গাথাসপ্তশতী'র একটি মাত্র পদে। অন্তত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের আগে যে এই পদটি রচিত হয়েছিল, তাতে সংশয় নেই। এই পদ অপভ্রংশ-প্রাকৃত ভাষায় লেখা। এর থেকে মনে হওয়া অসংগত নয় যে, রাধার কল্পনা প্রথম জন্ম নিয়েছিল 'প্রাকৃত', লৌকিক সমাজেই। পণ্ডিতেরাও এই অনুমান সমর্থন করেছেন; তাঁদের মতে সেন আমলের লোক-বাংলাতেই রাধা-প্রেমকথার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল।

ঐ পর্যায়ের রাধা-কৃষ্ণলীলায় অসামাজিক প্রণয়ের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। স্বামি-শাশুড়ী-ননদে পরিপূর্ণ গৃহধর্ম থেকে পালিয়ে গৃহিণী নারীর পরপুরুষের সঙ্গলুব্ধতার অবৈধ কাহিনী আস্বাদনই

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-কথার উৎস

লৌকিক রাধা কথার মুখ্য বিষয় ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম-চিন্তা এই গল্পের মূলগত অবৈধতার লৌকিক উত্তেজনাকে পরিস্রুত করে দেহাতীত প্রেমের এক অলৌকিক আবেদনের রসরূপ দিয়েছে। এদিক থেকে রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক যে-কোনো কবিতাকেই বৈষ্ণব কবিতা বলা চলে না। দেহের বাসনা এবং অবৈধ প্রণয়ের উত্তেজনা যেখানে আত্মদানের উৎকণ্ঠা এবং সর্ব সমর্পণের দৃঢ়তায় অচঞ্চল প্রশান্তি পেয়েছে, সেখানে লোক-কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ স্বরূপ। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রাচীন লোকগাথায় নবীন ভক্তির প্রাণসঞ্চার করার শ্রেষ্ঠ গৌরব মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.)। তাঁর জীবন লীলাকে আশ্রয় করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচিন্তার বিকাশ এবং পরিণতি ঘটেছে। চৈতন্য-পরবর্তী কালের বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় এই ধর্মতত্ত্বের ছাপ পড়েছে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের সমকালে রচিত বৈষ্ণব কবিতারও ভাব-প্রেরণা ছিল তাঁর প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ জীবন-সাধনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের জন্ম তখনো হয় নি।

কিন্তু গৌড়ীয় ধর্ম-চিন্তা, এবং বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির পরমাশ্রয় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেও বাংলা বৈষ্ণব কবিতার অস্তিত্ব ছিল বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে। অবশ্য এই

গৌড়ীয় বৈষ্ণব চেতনার পরমাশ্রয় শ্রীচৈতন্য

বিশ্বাসের মূলেও চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব যুগে জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে পদ রচনা করেছিলেন। জয়দেবের মধুরকান্ত পদাবলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা ; চণ্ডীদাস পদ লিখেছিলেন বাংলায়। বিদ্যাপতি বহু গ্রন্থের লেখক ছিলেন- তিনি ছিলেন বিচিত্র ভাষার শিল্পী। রাধাকৃষ্ণ-লীলার কয়েকটি পদ তিনি লিখেছিলেন নিজের মাতৃভাষা মৈথিলিতে ; বাকি অধিকাংশ পদ পাওয়া গেছে অবহট্‌ঠা-ব্রজবুলি ভাষায়। বিদ্যাপতি আগাগোড়া অ-বাংলা ভাষার কবি হলেও, পদাবলি রচনার গুণে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠা অক্ষয়

হয়ে আছে। এরা তিন জনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বৈষ্ণব কবিতার আদিগুরু রূপে বন্দিত। চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ

[illegible]

অন্যান্য চৈতন্য জীবনী এবং বৈষ্ণব ইতিহাসেও এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় লৌকিক রাধাকৃষ্ণ গীতিকে মহাপ্রভু ভক্তিরসে সঞ্জীবিত করে লোকাতীত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। চৈতন্য পূর্ব কবিত্রয় জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভবের দ্বারা তার প্রথম অভিব্যক্তি সাধন করেন। এই অর্থেই বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের উৎস গোমুখী জয়দেব চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি। চৈতন্য জীবন সাধনার সাগর সঙ্গমে এই ধারার মহত্তম পরিণতি।

১। জয়দেব

[illegible] বংশের শেষ প্রতিভূ লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৫ খ্রি) সভাকবি ছিলেন জয়দেব। এদিক থেকে তিনি চৈতন্য [illegible] পূর্বকালের কবি। আগেই বলেছি তাঁর পদাবলি রচনার ভাষা [illegible] তবে [illegible] দেখিয়েছেন শ্রীগীতগোবিন্দ [illegible] পদ রচিত হয়েছে তার সবটুকুই বাগভঙ্গী রচনাশৈলী ও ছন্দ প্রকৃতিতে বাংলা কবিতার স্বভাব বিশিষ্ট। আর শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদন মহিমার প্রভাবে আজও তা বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর শিরোমণি হয়ে আছে। সাধারণ বাঙালির কাছেও [illegible] উচ্চারিত এই সংস্কৃত কবিতার স্বাদ একান্ত মর্মস্পর্শী

ত্বমসি মম ভূষণ ত্বমসি মম জীবন
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্ন
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং।।

২। চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস পদাবলির কাব্যাস্বাদ বাঙালির হৃদয় মনোহারী।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।।

অথবা,

"রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহাঁরু কথা।।"

ইত্যাদি নিত্যশ্রুত মধুগীতি অজস্র প্রবাহে বাংলার আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করে ফিরছে অজ্ঞাত কাল থেকে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ নরনারীর পরম প্রীতিবসে মণ্ডিত চণ্ডীদাস-পদাবলি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাই বহু 'মন্দঃ কবি-যশঃপ্রার্থী' বাংলা পদ রচনা করে চণ্ডীদাসের নামে ত পরিচায়িত করে গেছেন। ফলে, চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহু উৎকৃষ্ট কবিতা যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি তাঁর নামে চালু দ্বিতীয়, এমন কি নিতান্ত তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর নিকৃষ্ট পদেরও অভাব নেই। চণ্ডীদাস প্রতিভার অমূল্যতা, এবং চৈতন্যদেবের চণ্ডীদাস-আস্বাদনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে বাঙালি পাঠকের মনে এককালে ভক্তির উচ্ছ্বাস সকল জিজ্ঞাসার অতীত হয়েছিল। ফলে, চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখলেই সে সময়ে ভালমন্দ নির্বিশেষে সকল পদকেই মহাজন-কবির রচনা বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হত। ক্রমশ এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিতে থাকে :—চণ্ডীদাসের নামে চলিত সকল পদই এক চণ্ডীদাসের লেখা নয়, অনেকে এমন সংশয় পোষণ করতে আরম্ভ করেন। ক্রমশ প্রশ্ন দেখা দেয়, চণ্ডীদাস তবে কযজন? বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই জিজ্ঞাসা জটিলতব আকাব ধারণ কবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এককালে প্রাচীন পুথির সন্ধান করে ফিরছিলেন। ১৩১৬ বাংলা সালে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুথি আবিষ্কার করেন। পুথির আদি এবং অন্ত খণ্ডিত, মাঝেরও কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায় নি। তাই কাব্যের নাম, রচনাকাল, এবং বিস্তারিত কবি-পরিচয়, কিছুই জানা যায় না। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা কাব্যের উপজীব্য, এবং গোটা কাব্যটি পদকীর্তনের আকারে লেখা, প্রত্যেকটি পদের ওপরে গেয় সুরেরও উল্লেখ রয়েছে। এই সব দেখে সম্পাদক বসন্ত-রঞ্জন কাব্যের নাম রাখেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।' ১৩২৩ বাংলা সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে পুথিখানি প্রকাশিত হয়ে সর্বজনের গোচর হয়। তখন কাব্যটির প্রাচীনতা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায়, 'চর্যাপদ'-এর ঠিক পরবর্তী স্তরের ভাষার বিকাশ-লক্ষণ এই কাব্যে প্রস্ফুট। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কাব্যের ভাষাকে খ্রিস্টীয় বারো থেকে পনেরো শতকের বাংলা ভাষার প্রতিনিধি বলে মনে করেছেন। লিপিতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুথি "১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত" হয়েছিল। অথচ পুথির লিপিতে একাধিক হাতের লেখা রয়েছে। তাতে মনে হয়, পুথিটি কবির হাতের মূল রচনা নয়; একাধিক জন কৃত পরবর্তী কালের একটি অনুলিপি। এই সিদ্ধান্ত সত্য হলে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচনা-কাল আরো আগে বলে অনুমান করতে হয়। পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণ অবশ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- পুথির অত প্রাচীনতার দাবি স্বীকার করেন না। তাহলেও পুথির লিপিকাল যখনই হোক, কাব্যখানি আসলে পঞ্চদশ শতকের পরের রচনা নয় বলেই মনে হয়।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর এই প্রাচীনতার দাবি স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র উদ্ভব হয়। কাব্যের আগাগোড়া ভণিতা দেখে জানা যায়, কবির নাম ছিল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এবং

ইনি দেবী বাসলীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। কিন্তু এঁর কাব্যের সঙ্গে পদাবলির চিরাগত রূপ-কল্পনার কোনো সাদৃশ্য নেই। বিষয়বস্তুতেও পার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলির একটিমাত্র পদের আদিম ভাষা-রূপ পাওয়া গেছে এই কাব্যে। তাছাড়া বিখ্যাততম চণ্ডীদাস-পদাবলির একটিও এতে নেই। অতএব, অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস আর পদাবলি-খ্যাত চণ্ডীদাস যে একই ব্যক্তি নন, তাতে সন্দেহ থাকে না। এবারে জিজ্ঞাস্য, চণ্ডীদাস তাহলে কয়জন ছিলেন, আর এঁদের মধ্যে কার রচনা মহাপ্রভু আস্বাদন করেছিলেন!

চণ্ডীদাস সমস্যার মূল

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে রচিত হয়েছিল, অতএব বড়ুচণ্ডীদাসকেই চৈতন্যদেব আস্বাদন করেছিলেন—এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব নয়। কিন্তু বৈষ্ণব রসদৃষ্টির পক্ষ থেকে এ-বিষয়ে প্রবল আপত্তি করা হয়েছে। এঁদের প্রথম কথা, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম-গাথা। এতে দেহের আকৃতিই প্রধান স্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার ভাব-শুদ্ধি এই কাব্যে একেবারেই নেই। মহাপ্রভুর পক্ষে এমন রচনা আস্বাদন করা অসম্ভব। বস্তুত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এগারোটি 'খণ্ড' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে কেবল সর্বপ্রথম জন্মখণ্ডে কৃষ্ণজন্মের একটি পৌরাণিক কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে, পাপ-পীড়িত পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাছাড়া রাধাকেও পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কবি বলেছেন, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই কৃষ্ণ-সুখের জন্য রাধারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই সূত্র ধরে তিনি পরবর্তী বিভিন্ন 'খণ্ডে' রাধাকৃষ্ণের অবৈধ মিলন-চিত্রকে নীতি-অনুমোদিত করার চেষ্টা করেছেন। তা না হলে জন্মখণ্ড এবং যমুনাখণ্ডের 'কালীয়-দমন' অংশ ছাড়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পুরাণ কথার কোনো অস্তিত্ব নেই। বাকি অংশে লৌকিক প্রণয়-কাহিনীর মাধ্যমে দেহ-বুভুক্ষা, বলাৎকার এবং অবৈধ আসঙ্গ-চিত্রই পুনঃপুন উপস্থাপিত হয়েছে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে। এই সব রচনা-চিত্রণের প্রতি লক্ষ রেখেই কেউ কেউ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে সহজিয়া কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'বংশী' ও বিরহ'—এই শেষ দুটি খণ্ড এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। বিরহার্তা রাধার প্রণয় বেদনা দেহসীমাকে অতিক্রম করে এই পর্যায়ে বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্বল ভাষা এবং লৌকিক কল্পনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রেম-ব্যথিত হৃদয়ের ক্রন্দনটি করুণাঘন গভীর সুরে অবিকল ধরা পড়েছে। বংশীখণ্ডে রাধা বলছেন—

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পরিচয়

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন।।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা।।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী।।"

স্পষ্টই বোঝা যাবে, এই ভাবকে একটু ভাষান্তরিত করে নিলেই আমাদের পরিচিত বৈষ্ণব পদাবলির সুর তাতে ধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর আর একটি পদ এইভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্যে অটুট আসন অধিকার করে নিয়েছে। চণ্ডীদাসের ভণিতায় পরিচিত একটি পদের সূচনা হয়েছে নিম্নরূপে :—

"প্রথম প্রহব নিশি সুস্বপন দেখি বসি,
সব কথা কহি হে তোমাবে।
বসিযা কদম্ব তলে, সে কানু কবেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে।।"

বড়ু চণ্ডীদাস বনাম পদকর্তা চণ্ডীদাস

এই পদটিরই আদিরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ : --

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপণ সুন তোঁ বসী
সবকথা কহিআবোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআ কদম তলে সে কাহ্ন করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।"

এর পরে স্বীকাব করতেই হয়,- -'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এব সমাপ্তি পর্যায়ে বৈষ্ণব কবিতাব জন্মলগ্নের শুভ-শঙ্খ নিঃসন্দেহে ধ্বনিত হয়েছে।

তাছাড়া, চণ্ডীদাসের বচিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদিব পবিচয়ও যে বৈষ্ণব গোস্বামীদেব নিকটে অনাদৃত ছিল না, তারও প্রমাণ আছে। মহাপ্রভুব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাবিষদ ছিলেন সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের উদ্গাতা ষড়গোস্বামীব মধ্যেও ইনি একজন। এই সনাতন 'শ্রীমদ্ভাগবত' এব 'বৈষ্ণব তোষণী' টীকা রচনা করেন। তাতে উৎকৃষ্ট কাব্যের নিদর্শন হিশেবে অন্যান্যেব মধ্যে চণ্ডীদাসের বর্ণিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের উল্লেখও রয়েছে। এমন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যই আস্বাদন করেছিলেন, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু যা-কিছু সম্ভব, তাই সত্য হয় না সব সময়ে। বড়ুচণ্ডীদাস ছাড়া আবো একজন পদকর্তা চণ্ডীদাসও ছিলেন চৈতন্য-পূর্বকালে, আর মহাপ্রভু তাঁর বচিত পদই আস্বাদন কবতেন -- এমন অনুমানের সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। 'শ্রীচৈতন্যচবিতামৃত' শ্রেষ্ঠ চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ। তাতে মহাপ্রভুর আস্বাদিত একটি পদাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। পরে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই গোটা পদটি চণ্ডীদাসেব ভণিতায় আবিষ্কার করেন। তাবই অনুসরণে ড বিমানবিহারী মজুমদার নূতন যুক্তি তথ্য সহযোগে প্রতিপন্ন করেছেন—এই চণ্ডীদাস 'বড়ু' থেকে পৃথক কবি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে চৈতন্য আস্বাদিত এই কবি চণ্ডীদাসের এক অনুমান-নির্ভর পদসংকলন তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

চৈতন্য-পূববর্তী পদকর্তা চণ্ডীদাস (?)

এ-ছাড়াও, আরো একাধিক পদকর্তা চণ্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁবা সকলেই চৈতন্য-পরবর্তী কবি বলে অনুমিত হয়ে থাকেন। এই চণ্ডীদাস কবিকুলেব মধ্যে প্রথমে স্মবণীয় কবি দীনচণ্ডীদাস; কাবণ এঁর বচিত পদাবলির একাধিক প্রমাণসিদ্ধ পুথি পাওয়া গেছে।

প্রথম পুথিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ২৩৮৯ সংখ্যা-চিহ্নিত হয়ে আছে। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু এই পুথির পদগুলি অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত আবো বহু চণ্ডীদাস-পদাবলির সঙ্গে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন, 'দীনচণ্ডীদাসের পদাবলি' নামে। মূল পুথির পদগুলি বিভিন্ন পালায় বিভক্ত, প্রায় সর্বত্র চণ্ডীদাসেব ভণিতা আছে। পালাবিভাগেব পদ্ধতি এবং পদ-বিষয়ের কল্পনা-বৈশিষ্ট্য বিচাব করে অধ্যাপক বসু প্রমাণ করেছিলেন, দীনচণ্ডীদাসের পদাবলিতে চৈতন্য-পরবর্তী কালেব বৈষ্ণব দর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের প্রভাব সর্বত্র সংশয়াতীত। ফলে দীনচণ্ডীদাস চৈতন্যোত্তর পদকর্তারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

'দীন চণ্ডীদাসেব পদাবলি

দীনচণ্ডীদাস রচিত সকল পদই তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর নিকৃষ্ট রচনা, উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর পদ তাতে একটিও নেই। উন্নততর রচনার নতুন কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে বর্ধমানের বনপাশ গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত এক পৃথক পুথিতে। এতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ধৃত সব কয়টি পদই আছে। তাছাড়া নূতন পদ আছে ৩৭৭ টি, তাতে উৎকৃষ্টতর রচনাকর্মের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পুথির পদসংখ্যা থেকে জানা যায়, যে-সব পৃষ্ঠা খণ্ডিত, তাতে দীনচণ্ডীদাসের আরো ৬৫০টি পদ খোয়া গেছে।

বনপাশ পুঁথি

চৈতন্য-পরবর্তী আরো একজন চণ্ডীদাস-কবির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়; যদিও তাঁর লেখা পদাবলির কোনো প্রামাণিক পুথি পাওয়া যায় নি। ইনি দ্বিজচণ্ডীদাস নামে পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলিতে অনেক চমৎকার পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গেছে, যেগুলির বিষয়-পরিকল্পনাতে চৈতন্য-পরবর্তী কালের ভক্তি-দর্শনের গভীর প্রভাব রয়েছে :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
সে তো কভু নহে শ্যামরায়।।"...

ইত্যাদি বিখ্যাত পদটিও চৈতন্য-পরবর্তী চণ্ডীদাস-ভাবনার এক সার্থক নিদর্শন। অথচ দীনচণ্ডীদাসের কাব্য-পুথিতে এই সব স্মরণীয় রচনার একটিও নেই। অন্য পক্ষে এই সব পদের অনেক কয়টিতে দ্বিজচণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। এই সব কারণে চৈতন্য-পরবর্তী কালোত্তীর্ণ চণ্ডীদাস-পদাবলির স্রষ্টারূপে দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে।

এই সূত্রে চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত আর একটি বিতর্কের সমাধানও সম্ভব হতে পারে। বিশ্বভারতী পুথিশালার একটি প্রাচীন (অষ্টাদশ শতকের) পুথি থেকে জানা যায়,—নানুর গ্রামের বিশালাক্ষীপূজক কবি চণ্ডীদাসের দেহান্ত হয়েছিল কীর্ণাহার গ্রামে। দ্বিজচণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক কয়টি পদও বীরভূমে পাওয়া গেছে। অতএব এই বিখ্যাত চৈতন্যোত্তর কবি চণ্ডীদাস নানুরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অনুমান সংগতিহীন নয়। অন্যপক্ষে, কবি বড়ুচণ্ডীদাস হয়ত বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে বাসলীর সেবক ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুথি ঐ অঞ্চলেই পাওয়া গেছে; আর সে কাব্যে বাসলীকে কবি বার বার বন্দনা করেছেন। এইভাবে চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার নিয়ে নানুর ও ছাতনার পরস্পরবিরোধী দাবির ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য বিহিত হতে পাবে।

চণ্ডীদাসের বাসভূমি, নানুর বনাম ছাতনা

ড. বিমানবিহারী মজুমদার অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁর অনুমিত চৈতন্যপূর্ব পদকর্তা চণ্ডীদাসই নানুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এইসব ইতিহাস-বিশ্রুত বৈষ্ণব চণ্ডীদাস-কবিদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও আরো অনেক সহজিয়া চণ্ডীদাস-কবি আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম তরণী, অথবা তরুণীরমণ। তাঁর ভণিতাতেই সুদীর্ঘ রামী উপাখ্যান পাওয়া গেছে। মনে হয়, রামীঘটিত কিংবদন্তীর আকর হয়ত ছিলেন এক সহজিয়া চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস ও রামী

ফলকথা, বৈষ্ণব পদসাহিত্যে চণ্ডীদাস নামধেয় বহুসংখ্যক কবির মধ্যে ঐতিহাসিক স্মরণীয়তা চারজনের। এঁদের দুজন চৈতন্য-পূর্ববর্তী এবং অপর দুজন চৈতন্য-পরবর্তী। প্রত্যেক যুগে একজন করে কবির লেখার প্রামাণিক পুথি-পরিচয় পাওয়া গেছে; প্রতি যুগে আরো একজন করে কবির অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়েছে পারিপার্শ্বিক তথ্য-বিচারের সহযোগে। বড়ুচণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্বকালে ছাতনায় আবির্ভূত হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন নানুরের চৈতন্যোত্তর

চণ্ডীদাস সমস্যা ও সমাধান

কবি। 'চণ্ডীদাস-দ্বিজ' চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে আবির্ভূত হয়ে হয়ত চৈতন্যদেবের আস্বাদন-ধন্য পদ রচনা করে রেখে গিয়েছিলেন। দীনচণ্ডীদাস চৈতন্যোত্তর কালের সহস্রাধিক প্রামাণিক পদের রচয়িতা কবি, যদিও পদগুলি উৎকৃষ্ট কলাগুণের অধিকারী নয়। এইরূপেই বহুবিতর্কিত চণ্ডীদাস-সমস্যার আপাত-সমাধান অনুমান করা যেতে পারে।

৩। বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার কবি। তাঁর প্রতিভাও ছিল বিচিত্রমুখী। স্মৃতিশাস্ত্র, পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি ও সাধনগ্রন্থ, ইতিহাস, ভূগোল, অলংকার শাস্ত্র, কথাসাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা ছাড়াও পদগীতি রচনা করেছিলেন হর-গৌরী ও রাধা-কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ নিয়ে। বিভিন্ন ভাষাতেও বিদ্যাপতির অধিকার ছিল গভীর। তাঁর স্মৃতি ও ধর্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, 'পুরুষপরীক্ষা' নামক কথাসাহিত্যও তাই। 'কীর্তিলতা' আর 'কীর্তিপতাকা'—এই দুখানি ইতিহাস-গ্রন্থ লেখা হয়েছিল 'অবহট্‌ঠা' ভাষায়। 'অবহট্‌ঠা' অর্থে বুঝি 'অর্বাচীন' অপভ্রংশ ভাষা। হর-গৌরী বিষয়ক পদ কবি তাঁর মাতৃভাষা 'মৈথিল'-এর মাধ্যমে রচনা করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলার কিছু সংখ্যক পদও মিথিলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে; মৈথিল ভাষায় লেখা। কিন্তু মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদের সংখ্যা একশ-ও নয়; তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষও প্রায় অনুল্লেখ্য। বস্তুত, রস-মধুর যে পদগুলির জন্য বিদ্যাপতি আজ কবি-কুলপতি, তার প্রায় সব কয়টিই বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির নানা প্রাচীন সংকলনে এই পদগুলি এক বিচিত্রতর ভাষায় লেখা আছে; একালে তার নূতন নাম দেওয়া হয়েছে ব্রজবুলি ভাষা।

কবি বিদ্যাপতি

ব্রজবুলি কোনো দেশের, কোনো লোকগোষ্ঠীরই মাতৃভাষা নয়। মূলত "বাংলা মৈথিল পদাবলির মিশ্রণে এবং অবহট্‌ঠার ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি" হয়েছিল। মনে হয়, এই বিমিশ্র ভাষাকে আশ্রয় করেই বিদ্যাপতি অধিক সংখ্যক বৈষ্ণব কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু মূল সে-ভাষা একালে আমাদেব চেনা বিদ্যাপতির পদে যে অনেকটাই পালটে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীনকালে, বাংলাদেশেও, কাব্য-কবিতার চর্চা লিখিতভাবে বড় একটা হত না, যত হত মৌখিক আবৃত্তি বা গানের মধ্য দিয়ে। ফলে, কালে কালে কথ্য ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গায়েনদের কণ্ঠে মূল পদের ভাষাতেও পবিবর্তন ঘটেছে, তাতে লেগেছে বিভিন্ন যুগের কথ্য-ভঙ্গির ছাপ। তবু ব্রজবুলি কবিতার মূল কাঠামোটি হয়ত বিদ্যাপতির হাতেই প্রথম গড়ে উঠেছিল। পরে— চৈতন্য-উত্তর কালে— বাংলার শ্রেষ্ঠ এক বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতির অনুসরণ করে মুখ্যত এই ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে গেছেন ; এই জন্য তাঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই কবির নাম গোবিন্দদাস কবিরাজ। এ ছাড়াও বহু বাঙালি কবি ব্রজবুলি ভাষায় উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ লিখেছেন। বাঙালির লেখা ব্রজবুলি বৈষ্ণব কবিতার আদিগুরু রূপেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির অক্ষয় প্রতিষ্ঠা। মহাপ্রভুর প্রীতি-পক্ষপাত তাঁর পদাবলিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কেবল আস্বাদনীয় নয়, পূজনীয় করে তুলেছিল। এই জন্যই মূল রচনার পটভূমি মিথিলায় বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও, বাংলাদেশে তা সবিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়েছে। বাঙালির ভাব-ভক্তি-বিশ্বাস বিদ্যাপতির কবি-কীর্তিকে বিনাশের হাত হতে রক্ষা করেছে ; তাঁর রচনাশৈলী ও ভাষা-প্রকৃতি

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতিব ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা

বাঙালি কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে নবীন কাব্য-বচনায, এই পাবস্পবিক হৃদ্যতা ও পবিপূবকতাব প্রীতি-সূত্রেই মিথিলাব কবি বাংলাব সাহিত্যে চিবস্মবণীয হযে আছেন।

বিদ্যাপতি কেবল মিথিলাব সন্তানই ছিলেন না, সেখানকাব বাজকুল বংশ পবম্পবায তাঁব পাণ্ডিত্য ও শিল্পসাধনাব ধাত্রীত্ব কবেছিল। তীবভুক্তিব অন্তত পাঁচজন শাসকেব বাজসভা তিনি অলংকৃত কবেছিলেন। এঁদেব মধ্যে প্রথম— কীর্তিসিংহেব শা..কাল খ্রিস্টীয চতুর্দশ শতকেব শেষে বলে অনুমিত হয। সর্বশেষ যে বাজাব সভায বিদ্যাপতিব সন্ধান পাওয়া যায, তিনি নবসিংহ। এই কাল বিচাব এবং অন্যান্য তথ্যাদিব থেকে অনুমান কবা হযেছে যে, "কবি চতুর্দশ শতকেব শেষ ভাগ থেকে অন্তত ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন।" সে যাই হোক, বিশেষ ভাবে বাধাকৃষ্ণ লীলাব পদ বচনাব কালে বাজা শিবসিংহই বিদ্যাপতিব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে মনে হয, অধিকাংশ পদেব ভণিতায কবিব নামেব সঙ্গে বাজাব নাম উল্লিখিত হযেছে। অনেক ক্ষেত্রে আবাব শিবসিংহেব সঙ্গে বানী লছিমাকেও কবি স্মবণ কবেছেন।

কবিব ব্যক্তি পবিচয

সংস্কৃত অলংকাব এবং কাব্যশাস্ত্রে বিদ্যাপতিব প্রগাঢ় অধিকাব ছিল। বাধাকৃষ্ণেব প্রেম চিত্রণে তিনি সেই জ্ঞান সম্পদকে প্রথম শ্রেণীব শিল্পগুণে মণ্ডিত কবেছিলেন। একদিকে প্রণয কলা বিষয়ে সংস্কৃত অলংকাব ও কাব্য কবিতাকে মন্থন কবা সৌন্দর্য এ ম আব এক দিকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দেহাকৃতি ও হৃদযাতিব যুগপৎ জীবন্ত রূপ বিন্যাস তাব বচনাকে বিশিষ্ট কলাগুণে ভবে তুলেছে। তাছাড়া সংস্কৃত কাব্যেব মতো লঘু গুব মাত্রায বিকম্পিত ছন্দ প্রকৃতি কবি চেতনাব পক্ষে অনাযাসে আযত্ত হযেছিল। বিকচযৌবনা বাধাব চল চঞ্চল প্রণয কৌতুক এব কৌতূহল ব্রজবুলিব ছন্দ ক্রমে নেচে ছুটে চলেছে যেন —

'খনে খনে নযন কোন অনুসবঈ
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভবঈ।।
খনে খনে দসন ছুটাছুট হাস।
খনে খনে অধব আগে কব বাস
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।।
হিবদয মুকুল হেবি হেবি থোব।
খনে আঁচব দএ খনে হোয ভোব।
বালা সৈসব তাৰুন ভেট।
লখএ ন পাবিএ জেঠ কনেঠ।।
বিদ্যাপতি কহ সুন ববকান।
তৰুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান।।"

বযঃসন্ধিব কবি ঐতিহাসিক স্বভাব

বিদ্যাপতিকে প্রধান ভাবে 'বযঃসন্ধি'ব কবি বলা হযে থাকে ববীন্দ্রনাথ বযঃসন্ধিব বাধিকাব ছবি এঁকে বলেছিলেন, – "বিদ্যাপতিব বাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে সৌন্দর্য ঢল ঢল কবিতেছে। খানিকটা হাসি খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসেব আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইযা পড়ে। কেবল চম্পক অঙ্গুলিব অগ্রভাগ দিযা অতি সাবধানে অপবিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ কবিযা অমনি পলাযনপব হইতেছে। তখন সকলই বহস্যে পবিপূর্ণ।" এই বহস্যচপল প্রণয-কলাকুতূহলেব একটি উৎকৃষ্ট ছবি –

"খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরী মাঝ।।
শুন শুন মাধব তোরি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখল রাই।।
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।।
লোচন যুগল ভৃঙ্গ অকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ন ন পার।।
ভাঙক ভঙিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু।।
ভণই বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশিল অঙ্গ না যাওত ধরণে।।"

কিন্তু কেবল চপলতার রূপসজ্জাতেই নয়, বিপ্রলব্ধ প্রেমের গভীর বেদনার্তিকেও তিনি ভাষায় মূর্তি-রূপায়িত করতে পেরেছিলেন :—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপতি ভেল।
সেহো মধু বোল স্রবণহি সুনল
শ্রুতি পথ পরস ন গেল।।
কত মধু জামিনি রভস গমাওল
• ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তই হিয় জুড়ন না গেল।।
কত বিদগধ জন রস আমোদঈ
অনুভব কাহু না পেখ
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ-জুড়াএত
লাখ না মিলল এক।।"

কবি-প্রাণের এই ভাব-সমাহিতির পরম পরিচয় রয়েছে তাঁর প্রার্থনা পদাবলিতে। অপরাপর বহু পদে আপন প্রাণের অনুভবকে কবি রাধার হৃদয়ার্তির আবরণে সজ্জিত করে নিবেদন করেছেন। কিন্তু প্রার্থনার পদে তাঁব আত্ম-নিবেদন নিবাবরণ নিরাভরণ ব্যক্তিক রূপে অভিব্যক্তি পেয়েছে :—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দ-এ তুলসী-তিল এ দেহ সোপলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।"

বিদ্যাপতির প্রর্থনা-পদের সংখ্যা বেশি নয়। তা হলেও এই পর্যায়ের পদে তাঁর উপলব্ধির গভীরতা দেখে অনেকে মনে করেছেন, — তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। ইতিহাসের বহিবঙ্গ উপাদান

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অনুকূল নয়। কবির পিতৃবংশ, এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক তীরভুক্তির রাজবংশ, উভয়েরই কৌলিক বিশ্বাস ছিল শৈব ধর্মে। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর পরম পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান শৈব ছিলেন। কবির নিজের পূজিত শিবলিঙ্গ এখনো মিথিলায় রয়েছে। এমন অবস্থায় তাঁকে আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-লীলার প্রতি কবির অন্তরের অনুরাগ যে অকৃত্রিম ছিল, তাঁর কালজয়ী পদ-সাহিত্যেই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর কৃষ্ণচরণারবিন্দের প্রতি কবির ব্যক্তিমনের নিভৃত আকূতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর প্রার্থনা-পদাবলি।

শৈব বিদ্যাপতির কৃষ্ণানুরক্তি

সপ্তম অধ্যায়
মধ্যপর্যায়ের পরিণতি : চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য

মধ্যপর্যায়ের বাংলা সাহিত্যের নূতন পরিণতির সুর জেগেছে মোটামুটি খ্রিস্টীয় যোড়শ শতকের প্রথম দিকে। এ-পর্যন্ত পরিচিত মধ্যযুগের সাহিত্য-কর্মের থেকে এই নূতন রচনা প্রবাহে কোনো পৃথক ভাব, বা অজ্ঞাত-পূর্ব জীবন-প্রকৃতির বিকাশ লক্ষ করা যায় না। কেবল তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলা সাহিত্যের স্বভাব-ধর্ম এই কালসীমায় নূতন পূর্ণতার,—নবীনতর মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। আর এই মুক্তি চেতনার প্রাণকেন্দ্র ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

মধ্যপর্যায়ের সা ·ত্যে জীবনমুক্তি

পূর্বে দেখেছি, তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলা সাহিত্যের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ছিল সার্বিক মিলনের অভিমুখী। সমাজের উচ্চ এবং নীচ, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের বাঁধনে বেঁধে দেওয়াই ছিল সেকালের সাহিত্যের প্রধান চেষ্টা। এই মিলন সাধনের জন্য ধর্ম-প্রেরণা ও দৈবীভক্তির বন্ধন-রচনার দিকেই এ পর্যন্ত আলোচিত বাংলা সাহিত্যের ঝোঁক ছিল মুখ্য। ফলে ধর্মীয় মিলনের নামে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাও কম প্রবল হয় নি। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের কবি শিব-ভক্তের ওপরে নিজ নিজ দেবীর অত্যাচার ও প্রকোপের কাহিনীকে সকল তীব্রতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল,— ভয়াতুর লোক-সাধারণ যেন উৎপীড়নের আশংকাতেও দেবীর ভজনা করে। একই উদ্দেশ্যে ধর্মমঙ্গলের কবি ধর্ম-সাধক লাউসেনের হাতে পার্বতী-ভক্ত ইছাই ঘোষের পরাভবের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ-সময়ে দেব দেবীর মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে যেন এক লড়াই বেঁধে গিয়েছিল। সেকালের সামাজিক বিশ্বাস এবং পরিবেশও অবশ্য এর জন্যে কম দায়ী ছিল না।

মুক্তিদূত শ্রীচৈতন্য

দীর্ঘস্থায়ী তুর্কি আক্রমণের আঘাতে দুর্বল জাতির আত্মবিশ্বাস চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল , আত্মরক্ষার উপায় হিশেবে দেবতার কৃপাকেই তারা একমাত্র সম্বল বলে জেনেছিল। অন্যদিকে নিজেদের যুগ এবং যুগশক্তির ওপরেও কোনো আস্থা তাদের ছিল না। ফলে দেবতার কৃপায়, সম্ভব-অসম্ভব পথে, কোনো এক সত্যযুগের আগমন কামনা করে তারা উন্মুখ, বুভুক্ষু হয়ে থাকত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁর সারা জীবনের সাধনা দিয়ে এই অসম্ভবের প্রত্যাশা,—এই দেব-কৃপা-বুভুক্ষার অন্ধতাকে বিদূরিত করলেন ; জাগিয়ে তুললেন মানব-শক্তির প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা এবং নিজের কাল সম্বন্ধে অসীম বিশ্বাস। তাঁর প্রাণ-ধর্মের শিখায় উদ্দীপিত হয়ে ভক্ত-কবি উদাত্ত কণ্ঠে কলিযুগের বন্দনা করলেন—"প্রণমহো কলিযুগ সর্বযুগসার।" তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি সাধারণ কায়মনে বিশ্বাস করল,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নররলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।"

এই বিশ্বাসে বলিষ্ঠ চৈতন্যোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যে মানব-স্বীকৃতির প্রথম পাদপীঠ রচিত হল ; মানবিক প্রীতির উৎসাহে উজ্জ্বল নূতন সৃজনধারায় এবারে পুরাতন মিলন-বাসনা

নবীন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হল। তুর্কি আক্রমণের প্রতিক্রিয়াপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যোত্তর কালের মোহনায় মুক্তির নূতন প্রেরণা খুঁজে পেল।

মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমার দিনে। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীহট্টের (অধুনাতন বাংলাদেশে)শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ; মা, শচী দেবী। দরিদ্র জগন্নাথ প্রথম বয়সেই সেকালের বাংলার সারস্বত তীর্থ নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন ; নবদ্বীপই মহাপ্রভুর পুণ্য জন্মভূমি। তাঁর পিতার দেওয়া নাম ছিল বিশ্বম্ভর—ডাক নাম ছিল নিমাই। তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণের বালককে গৌরাঙ্গ বলেও ডাকা হত। শিশু গৌরাঙ্গ যেমন অবাধ্য দুরন্ত ছিলেন, তেমনি নির্বাধ ছিল তাঁর মেধা ও বিদ্যোৎসাহ। নিতান্ত অল্পবয়সেই ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে নিজে তিনি টোল স্থাপন করেন; এর মধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বিশ্বম্ভর প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীব পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু পদ্মাতীরের প্রবাসে নিমাই যখন পাণ্ডিত্যের মায়াজাল বিস্তার করে ফিরছিলেন, তখনই একদা সর্পাঘাতে নবদ্বীপে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। পত্নী-বিয়োগের খবর বিশ্বম্ভর জানতে পারেন বাড়ি পৌঁছবার পরে। দ্বিতীয় বার তাঁর বিয়ে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। এর পরে মহাপ্রভু পিতার গয়াপিণ্ড দেবার জন্য গয়া যান। সেখানে ঈশ্বরপুরীর অলৌকিক শক্তি দেখে তিনি অভিভূত হন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপরে আশ্চর্য ভাব-তন্ময় মন প্রাণ নিয়ে বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বৎসর।

চৈতন্য-জীবনী

সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই মহাপ্রভু বাংলা, উড়িষ্যা—তথা সারা ভারতে ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। তাঁর প্রচারের উদ্দেশ্য সর্বাংশে আধ্যাত্মিক ছিল না, সমকালীন জাতির জড়তাগ্রস্ত আধিভৌতিক জীবনও চৈতন্য-চেতনার স্পর্শে জাগরণ-চকিত হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচারের মূলগত প্রেরণাকে ব্যাখ্যা করে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন,—"শ্রীচৈতন্য দেখিলেন যে সমগ্র বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরেও এই ধর্ম প্রচার করা আবশ্যক, বিভিন্ন আচার-ব্যবহারে এবং অনাচার-অধর্মে আচ্ছন্ন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙালি জনসাধারণ জাতিগত ঐক্যলাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। উপরন্তু সমস্ত দেশ ম্লেচ্ছ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।"

আগে বলেছি, তুর্কি আক্রমণের পর থেকেই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্যলাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাইরের আঘাতকে রোধ করার জন্যে যে একতা-বোধের জন্ম, তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। হৃদয়ের সহজ আন্তরিকতায় পুষ্ট না হলে ঐক্যের বন্ধন কৃত্রিম এবং দুর্বল হয়। মহাপ্রভু জাতীয় ঐক্যবিধানের আকাঙ্ক্ষায় বাঙালির মনোবলের উদ্দীপনে ব্রতী হলেন। নানা জাতি ও সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন সমাজকে তিনি জানালেন,—'হরিভক্তিপরায়ণ হলে, চণ্ডালও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হতে পারে' ; অস্বীকার করলেন জন্মগত জাতিভেদ-প্রথার যুক্তিযুক্ততা। 'হরিভক্তি' বলতেও মহাপ্রভু কোনো নৈষ্ঠিক ধর্মাচারণের কথা ভাবেন নি ; বলেছেন,—

চৈতন্য-জীবনে যুগ-বাণী

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।।" ['চৈতন্য চরিতামৃত']

আর চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মের আদর্শে 'প্রেম'-ই হচ্ছে 'সর্বসাধ্য-সার'। 'প্রেম' বলতে অবশ্য

'অ-হেতুক প্রেম'-এর কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সে প্রেমও মানবিক হৃদয়ানুকূলতারই উৎস থেকে জাত—তারই পরমা পরিণতি। 'শুদ্ধভক্তি' তথা 'অহেতুক প্রেম' সাধনার পাঁচটি উপায় নির্দেশ করা হয়েছে—যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবাশ্রিত পাঁচটি পন্থা। 'শান্ত' বলতে বুঝি নিস্তব্ধ মনের অন্তরঙ্গ প্রেমাকৃতি ; 'দাস্যে' রয়েছে প্রিয় এবং প্রীতিমান্-এর মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের আকর্ষণ ; 'সখ্যে' আছে সমতা-বুদ্ধি—সখা-প্রীতি; 'বাৎসল্যে' প্রেমের গরিষ্ঠতাবোধ—প্রিয় এখানে জননীসুলভ স্নেহের বন্ধনে বাঁধা ; সর্বশেষে 'মধুরভাবে'র মধ্যে অভিন্নতার চেতনা সুমহত্তম ; প্রিয় এখানে প্রীতিমান-এর 'দেহে আর মনে-প্রাণে একাকার' হয়ে, তার সারা 'অঙ্গ' জুড়ে 'অপরূপ লীলা' করে ফেরেন। এদিক থেকে বৈষ্ণব প্রেম-সাধনার আশ্রয়স্বরূপ প্রতিটি ভাবই মানবিক অনুভবের উৎস থেকে জাত। কিন্তু মানব-প্রেমের কেন্দ্রে সর্বত্রই সুপ্ত হয়ে রং াছে কোনো-না কোনো 'হেতু'। আমাদের কোনো প্রীতিই একেবারে অকারণ, 'অ-হেতুক' নয়। এমনকি মাতৃস্নেহের অলৌকিক মহিমার মূলেও 'হেতু' রয়েছে বলে মনে করা হয় ; কেবল পুত্রের জন্যেই জননী পুত্রকে ভালোবাসেন না—পুত্রকে ভালোবেসে তাঁর আত্মার পরমানন্দ ; তাই তিনি পুত্রকে ভালোবাসেন। কিন্তু বৈষ্ণবের কল্পিত 'অ-হেতুক' প্রেমের সাধনায় ঐ আত্মার আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষাটুকুও উন্মূলিত হতে চায়। মানবিক অনুভূতিতে প্রেমের এই একান্ত তন্ময়তা সম্ভব নয় ; তবু মানবিক প্রেমকে অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে পরিস্রুত করে-করে সেই অলৌকিক প্রেম-সিদ্ধির জগতে পৌঁছতে হয়। বৈষ্ণব ধর্মের পরিভাষায় সেই পরিস্রুততম প্রেম-রসের বিমূর্ত যুগলরূপ রাধাকৃষ্ণ— "রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।"—শ্রীচৈতন্যদেব নিখিল মানবকে এই পূর্ণ প্রেম-শক্তি সাধনের জীবন-বাণীই দান করেছেন। চৈতন্য-ধর্মের এইটিই সার সত্য।

আর এই ধর্মপ্রচার উপলক্ষে কখনো মহাপ্রভু তত্ত্ব-ব্যাখ্যা বা শাস্ত্রীয় প্রমাণবিচার উদ্ধার করেন নি। তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ছিল ; —"আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।" 'যবন' হরিদাসকে তিনি কেবল কোল দেন নি, তাঁকে ভক্তকুল-শিরোমণির পূজনীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন।—মহাপাষণ্ড নবদ্বীপের হিংসা-মত্ত কোটাল-ভ্রাতৃদ্বয় জগাই-মাধাইকে করে তুলেছিলেন পরম প্রেমিক। তাঁর হেম-জ্যোতি-পুঞ্জিত দেহে অকারণ প্রেমের আকৃতি যেন মূর্তি ধরে ফিরত। তাই একদিকে তাঁর জীবনাচরণে মানব-শক্তির বিকচ মহিমা লক্ষ করে সেকালের আত্মবিশ্বাসে দুর্বল বাঙালি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠল। ফলে বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানব-কেন্দ্রিক কাব্য রচনার ধারা সূচিত হল চৈতন্য-জীবনকে আশ্রয় করে। অন্যদিকে তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ঐক্য-কামনার স্থলে অ-হেতুক প্রেমের সহজ আকুলতায় উদ্বোধিত হল নিখিল বাঙালির মন। ফলে কেবল চৈতন্য-জীবনী বা বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সকল শাখাতেই মানব-প্রেমের উৎকণ্ঠা ঐকান্তিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই মানবিক বিশ্বাস ও মানব-প্রেমের নিরবচ্ছিন্ন একান্ততাই চৈতন্য-উত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যে মহৎ পরিণতি লাভ করেছে।

চৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালি জীবনের ঐতিহাসিক রূপ

চৈতন্য-পূর্ব যুগের তুলনায় চৈতন্য-পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে একটি-মাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন শাখার প্রবর্তন ঘটেছিল। আগে বলেছি, সেটি জীবনী-সাহিত্যের শাখা। মহাপ্রভুর জীবন-বৈভবকে শিরোধার্য করে এই রচনা-প্রবাহের উদ্ভব; —ক্রমশ অদ্বৈত আচার্য, সীতাদেবী প্রভৃতি মহামানব-মানবীর জীবন-কথা জীবনী-কাব্যের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরে রচিত হতে থাকে বৈষ্ণব ধর্ম

চৈতন্য-যুগের বাংলা সাহিত্য

এবং বৈষ্ণব মহাজনের জীবনাশ্রিত কাব্য। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এইভাবে মানব-ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল জাগিয়ে তোলে ; শুরু হয় ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতার রচনা।

কিন্তু কেবল ঐটুকুই বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-চেতনার একমাত্র দান নয়। পূর্ববিধি প্রচলিত বিভিন্ন রচনা-প্রবাহও মানব-স্বীকৃতি এবং প্রেমানুভূতির দ্বারা নূতন ভাব-রূপে সঞ্জীবিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক প্রণোদনায় উদ্বোধিত মঙ্গলকাব্যে দেবতার মহিমাকে ছাপিয়ে মানুষের সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দীপ্ত হয়ে উঠল, মানবিক প্রীতির আনুকূল্যে সর্বধর্মের প্রতি দেখা দিল সহজ সহৃদয়তা। অনুবাদ কাব্যের ঐশ্বর্যের দীপ্তিকে ছাপিয়ে উঠল করুণাঘন মাধুর্যের কোমল সহৃদয় বংশি-নিনাদ। বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে পূর্ণ হয়ে উঠল মানব-মহিমার হৃদয়-মনোহারী মহিমা-গাথা। চৈতন্য-ঐতিহ্যের এইটুকুই শ্রেষ্ঠ দান।

১৫০৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, ষোড়শ শতকের একেবারে প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাবের পরিচয় ক্রমশ প্রস্ফুট হতে আরম্ভ হয়েছে। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৪৮ বছর বয়সে তাঁর তিরোভাব ঘটে। কিন্তু তারও পরে, গোটা যোড়শ শতাব্দী এবং সপ্তদশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ অবধি, বাংলার সমাজ ও সাহিত্য-জীবনে চৈতন্য-প্রভাব নানা পর্যায়ে বিচিত্র পরিমাণে কার্যকর হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের সেই ইতিহাসেরই সন্ধান করা হবে এবারে।

অষ্টম অধ্যায়
বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্য

আগেও বলছি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথাকে আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্যে মানব-কেন্দ্রিকতার সূচনা ; চৈতন্যজীবনীই বাংলা ভাষার প্রথম জীবনী গ্রন্থ। সাধারণত ব্যক্তি-বিশেষের জীবনাবসানের পরেই তা ইতিহাসের সামগ্রী হয়। আর ঐতিহাসিক জীবন-উপাদানের ওপরে অলৌকিক বিভূতি ·ণ্ডিত করে প্রাচীন কাব্যে মানব জীবনকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বের ইতিহাস-দুর্লভ মহিমা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষদর্শীদেব অনুভবকে শ্রদ্ধানত করেছিল ; তাঁর চরিত্রের অতুল্য বৈভব বহু কবির কল্পনাকে করেছিল উদ্দীপিত। একদিকে বৈষ্ণব পদাবলির গৌরচন্দ্রিকা এবং গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতায় সেই লোকোত্তর মানবমহিমা কীর্তিত হয়েছে অজস্র সংগীতের ধারায়। অন্যদিকে চৈতন্যের বাস্তব জীবনের প্রতিদিনকার কাহিনী সুখপাঠ্য কথাসাহিত্যের আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন জীবনী-কাব্যে। অবশ্য এই সকল কাব্য-কবিতায় মানুষের মহিমাকে দেবতার গৌরবে ভূষিত করে চিত্রিত করা হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ব বাংলাদেশে কোনো সদ্‌গুণ— কোনো মহৎ বৈভবের অস্তিত্ব মাত্রই মানুষের মধ্যে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। সকল সম্ভব অসম্ভব গুণ ও শক্তির আধাররূপে সেদিন দেবতার বন্দনা করা হয়েছিল। এবারে, চৈতন্য-চরিত্রে সেই অতুল্য শক্তি ও সম্পদকে প্রত্যক্ষ করে, চৈতন্য-উত্তর কালের বাঙালি মানুষের মধ্যেই দেবগুণকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হল। চৈতন্যদেব তাঁর জীবদ্দশাতেই ভগবানের অবতার রূপে পূজিত হতে থাকেন। ফলে, কি গৌর-পদাবলিতে, কি জীবনী-সাহিত্যে,—তাঁর জীবনের চোখে-দেখা ঘটনার সঙ্গে কবির ভাগবত ধ্যানের আকৃতি যুক্ত হয়ে আশ্চর্য মিশ্র এক শিল্পরূপ গড়ে তুলেছে। চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থে মানুষের দেহে দেবতার বিভা জাগিয়ে তোলার এই শিল্প প্রয়াস প্রথম থেকেই পরিস্ফুট।

চৈতন্য-জীবন ও জীবনী

প্রতীচ্য পারিভাষিক নিরিখে এই শ্রেণীর রচনা hagiography নামে পরিচিত। বিশুদ্ধ বাস্তবিক জীবনী যেমন biography, তেমনি কল্পনা-বিমিশ্র অতিলৌকিক রহস্যজড়িত জীবন-কথার নাম hagiography :— বর্তমান প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণযোগ্য তথ্য এই যে, চৈতন্য-জীবনীগুলির অলৌকিক চিত্র অনায়াসে পরিহার করেও তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাবলির মোটামুটি স্পষ্ট একটি মানচিত্র এই সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। Biography রচনার প্রাথমিক দায়িত্ব অন্তত কয়েকটি চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয় নি।

এই ধরনের প্রথম গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লখা। লেখক ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ মুরারি গুপ্ত। ইনি মহাপ্রভুর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর সহপাঠী ছিলেন; তাঁর মূল নিবাসও ছিল চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্টে। মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' সংস্কৃত মহাকাব্যের আকারে লেখা; মহাপ্রভুর অন্ত্য-লীলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবন-কথার তথ্যানুসারী বর্ণনা রয়েছে এতে। অবশ্য বাস্তব তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কবির কল্পনা চৈতন্য-চরিত্রে অলৌকিক দেব-মহিমারও আরোপ করেছে। মুরারির এই কাব্য পরবর্তী কালের বাংলা চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থের প্রায় সব কয়খানির ওপরেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, উল্লেখ্য

সংস্কৃত ভাষার চৈতন্য-জীবনী

প্রভাব বিস্তার করেছে। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে এই গ্রন্থ সাধারণভাবে পরিচিত। এই কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতপার্থক্য আছে। তবে চৈতন্যজীবনকালের সীমায় না-ও যদি হয়, তাঁর তিরোভাবের স্বল্পকাল মধ্যেই গ্রন্থরচনা নিঃসন্দেহে সমাপ্ত হয়েছিল।

মুরারি গুপ্তের রচনা ছাড়া, সংস্কৃত ভাষায় লেখা, চৈতন্য-কথাশ্রিত রচনা রূপে আরো তিনখানি গ্রন্থ সমুল্লেখ্য। তিনখানিরই লেখক ছিলেন পরমানন্দ সেন—এঁর উপাধি ছিল কবিকর্ণপূর। পরমানন্দের প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য' ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম এগারোটি সর্গে মুরারি গুপ্তের প্রভাব বহু ব্যাপক। পরমানন্দের দ্বিতীয় রচনা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোনো সময়ে রচিত হয়। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কাহিনী থেকে আরম্ভ করে গম্ভীরা-লীলা পর্যন্ত জীবন-কথা। এই নাটকের উপজীব্য বিষয়। কর্ণপূরের তৃতীয় গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'-তে (১৫৭৬ খ্রি) গৌর-প্রবর্তিত ধর্মের দার্শনিক পটভূমি বিস্তৃত ব্যাখ্যাত হয়েছে। গৌর পার্ষদগণের সম্পর্কে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও প্রচুর। কবিকর্ণপূর পরমানন্দ, গৌড়লীলায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র ছিলেন।

বাংলা চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ

১। বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামাণিক চৈতন্য-জীবনী লিখেছিলেন বৃন্দাবনদাস। এঁর কাব্যের নাম প্রথমে ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'; পরে সে নাম পরিবর্তন করে নূতন নামকরণ হয় 'চৈতন্য ভাগবত'। এ সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস' নামক বৈষ্ণব ঐতিহাসিক কাব্যে বলা হয়েছে —

বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনে গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল।।"

নূতন নামটি কাব্য ভাবের পক্ষে সুপ্রযুক্ত হয়েছিল; কারণ বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-লীলার কাহিনী বিন্যাসে 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; আত্মপ্রকাশে কবি স্বভাব কুণ্ঠ ছিলেন। কাব্যের মধ্যে নিজের জননী এবং গুরুর নামোল্লেখ তিনি করেছেন [illegible] থেকে জানা যায়, নারায়ণী ছিলেন তাঁর মাতা, আর কবি নিত্যানন্দ প্রভুর 'সর্বশেষ ভৃত্য', অর্থাৎ, শেষ জীবনের শিষ্য ছিলেন। নারায়ণী ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের 'ভ্রাতৃসুতা'।

কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেও নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। অনুমান করা হয়, ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; আর কাব্য-রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় জন্মে থাকলেও, তাঁর দর্শন লাভে বৃন্দাবনদাস বঞ্চিত হয়েছিলেন। এই ভাগ্যহীনতার কথা সখেদে তিনি উল্লেখও করেছেন,—

"হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে লীলা দরশনে।।"

তাহলেও, বৃন্দাবনের রচনায় মহাপ্রভুর গৌড়লীলার বিশেষ নির্ভরযোগ্য একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়; কারণ অন্তরঙ্গতম প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য আহরণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কবি জানিয়েছেন,—নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশেই তিনি চৈতন্য-জীবন-বৃত্তান্ত রচনায় ব্রতী হন। এই রচনা-প্রসঙ্গে সর্বাধিক তথ্য তাঁকে জুগিয়েছিলেন স্বয়ং প্রভু নিত্যানন্দ। তাছাড়া, জননী

নারায়ণী এবং শ্রীবাসাদির কাছ থেকেও বৃন্দাবন কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। গৌড়লীলায় নিত্যানন্দের চেয়ে অন্তরঙ্গ চৈতন্য-পার্ষদের কথা কল্পনাও কবা যায় না। নারায়ণীও আবাল্য ছিলেন মহাপ্রভুতে সমর্পিতপ্রাণা; শ্রীবাসের তো কথাই নেই। এই কারণে, বৃন্দাবনের কাব্যে গৌড়লীলার বর্ণনা যেমন প্রামাণিক হয়ছে, তেমনি হযেছে অনুপুঙ্খ। তাছাড়া কেবল গৌরজীবন-কেন্দ্রেই 'চৈতন্যভাগবত'-এর বর্ণনা একান্ত সীমাবদ্ধ ছিল না; আসলে বৃন্দাবনদাসের প্রতিভায় ঐতিহাসিকোচিত পরিবেশ-সচেতনতাও ছিল গভীর। ফলে, চৈতন্য-লীলার পটভূমি রূপে নবদ্বীপের অবস্থান এবং সেখানকার সামাজিক ও নৈতিক আচাব অনুষ্ঠানেরও খুঁটিনাটি পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এদিক থেকে চৈতন্য-পূর্ব নবদ্বীপ-বর্ণন বিশেষ মূল্যবান; তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের একটি অখণ্ড প্রতিরূপ যেন চুম্বক আকাবে চিহ্নিত হয়েছে তাতে :—

কাব্য বৈশিষ্ট্য

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পাবে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
বিবিধ বৈসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সভাই মহাদক্ষ।।
সভে মহাঅধ্যপক বলি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।।
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারসে পায়।।"

আবার লিখেছেন :—

নবদ্বীপে— "রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।।
কৃষ্ণ নাম ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচাব।।
ধর্ম কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।।"

তাহলেও, নিছক তথ্য-প্রবল ঐতিহাসিক উপাদানই 'চৈতন্যভাগবত'-এর একমাত্র সম্পদ নয়। বৃন্দাবনদাসের কবি-দৃষ্টি তাঁর রচনাকে সুঠাম মানব-রসের সিঞ্চনে হৃদ্য করেছে। বিদ্যালয়-প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করে কবি লিখেছেন,—

"আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুথি যেন শশধর।।
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারি দিকে ভৃঙ্গে।।
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে, যাই সিনান করিতে।।"

বালক গৌরাঙ্গের দুরন্তপনার বিবৃতি প্রসঙ্গে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা। কিন্তু তাতেই কালি-বিন্দু-বিকম্পিত গৌরমূর্তি যেন জীবন্ত চিত্রিত হয়ে উঠেছে। এখানেই বৃন্দাবনের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য ; অনাড়ম্বর সহজ কথায় তিনি হৃদয়স্পর্শী শিল্প রচনা করতে পেরেছেন।

তাছাড়া লোকোত্তর ভক্তি-রসেব অবতারণাতেও কবির প্রবণতা ছিল আন্তরিক। মহাপ্রভুকে তিনি কৃষ্ণের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। আর সেই কারণে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর কৃষ্ণ-লীলার অনুরূপ করেই চৈতন্য-লীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফলে 'ভাগবত'-এর কৃষ্ণজীবন-কথার মতোই চৈতন্য-জীবনীতেও বহু অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। 'ভাগবত'-পুরাণে দেখি, দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করবার জন্যে স্বর্গের দেবতারা কংসের কারাগারে নেমে এসেছিলেন। বৃন্দাবনদাসও চৈতন্যাধার শচীর গর্ভ বন্দনার জন্যে দেবতাদের মর্ত্যে আবির্ভূত করিয়েছেন তাঁর কাব্যে। এই ধরনেব অলৌকিক গল্প 'চৈতন্য ভাগবত'-এ প্রচুর রয়েছে। তাই পণ্ডিতেরা কেউ কেউ এই কাব্যের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহেব কোনো যুক্তিসংগত কাবণ নেই। ইতিহাসের যথার্থ তথ্যকে লোকহৃদয়ের অন্তরঙ্গ বিশ্বাসের সূত্রে গেঁথে বৃন্দাবনদাস তাঁর জীবনী-কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু সেই কাব্য-মালিকার সূত্র থেকে মণিকে পৃথক করা কঠিন নয়। কাব কোনোই তাঁর ভক্তি দিয়ে বাস্তব তথ্যকে আচ্ছন্ন করেন নি। ফলে, মানবিক সত্য-কাহিনীর পাশে পাশে চলেছে অলৌকিক ভক্তিশ্লোকের ধারা। দেখলেই বোঝা যায়, কোনটি ইতিহাস এবং কোনটি কাব্য। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-জীবন আশ্রয় করে ইতিহাসাশ্রিত কাব্য রচনা করেছেন, বাংলা চৈতন্য-জীবনীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কবি তিনি।

'চৈতন্য-ভাগবত'-এ অলৌকিকতা

অবশ্য প্রামাণিকতার বিচারে বৃন্দাবনের বর্ণিত গৌড়লীলার অংশই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুসরণ করে কবি তাঁর কাব্যকেও তিনটি খণ্ডে ভাগ করেছেন—আদি, মধ্য এবং অন্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর জন্ম থেকে গয়া গমন পর্যন্ত অংশের বর্ণনা আছে, মধ্যখণ্ডে আছে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবন-কথা। অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ ; এতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসোত্তর কাল থেকে আরম্ভ করে নীলাচল-বাসের কিছু কিছু কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আগেই বলেছি, কেবল গৌড়লীলা বিষয়েই কবি প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে বিবরণ পেয়েছিলেন। এমন অবস্থায় নীলাচলবাস-কথাব বর্ণনায় তাঁকে পরোক্ষ সূত্রেব ওপরে অনেকটাই নির্ভর করতে হয়েছিল। এইজন্যে ঐ প্রসঙ্গের অধিকাংশই আবেগপূর্ণ কবি-কর্মে ঋদ্ধ। অনেকটা এই কারণেও, বৃন্দাবনের নীলাচল লীলার পরিচয় যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি তা হঠাৎই খণ্ডিতও হয়েছে। অবশ্য 'চৈতন্যভাগবত'-এর আকস্মিক অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অন্যতর তথ্যও জানা যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রামাণিকতম জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এ-বিষয়ে লিখেছেন,—

'চৈতন্য ভাগবত'-এর প্রামাকতা

"নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।।" ['চৈতন্যচরিতামৃত']

'চৈতন্যভাগবত'-এর অনেক স্থলে বৃন্দাবনদাস নিজের গুরু নিত্যানন্দকে বন্দনা করেছেন,—নিত্যানন্দলীলা বর্ণনা করতে করতে তিনি মূল প্রসঙ্গকেও অনেক সময়ে বিস্মৃত হয়েছেন। কাব্য-শেষে অনুরূপ গুরু-কথা-বর্ণনায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে গৌড়-কথার-প্রসঙ্গ-আর শেষ করে উঠতে পাবেন নি কবি। তবু ঐ অসম্পূর্ণ কাব্য-কীর্তির জনাই তিনি 'চৈতন্যলীলাব ব্যাস' রূপে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অধিকার করেছেন।

২। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এককালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এতে শ্রীচৈতন্যের জীবনের কয়েকটি অপরিজ্ঞাত সংবাদ, এবং সুপরিজ্ঞাত তথ্যের স্থলেও নূতন তথ্য সরবরাহের দাবি, উপস্থাপিত হয়েছে। মহাপ্রভুর তিরোভাবের কোনো বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা এযাবৎ পাওয়া যায়নি। চৈতন্য-ইতিহাসের এটি এক শ্রেষ্ঠ অভাব। যথার্থ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পেরে বিভিন্ন জীবনীকার বিচিত্র অলৌকিক গল্পের অবতারণা করেছেন। কেবল জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এই এ-বিষয়ে একমাত্র বিশ্বাস্য কাহিনীটি পাওয়া যায়। কবি বলেছেন,—

জয়ানন্দের কাব্যের আপাত-বৈশিষ্ট্য

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পা'এ আচম্বিতে॥
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে॥"

এই বহু-কাম্য তথ্যটি পেয়ে বাংলা সাহিত্যের ভক্ত-ঐতিহাসিক ড দীনেশচন্দ্র সেন পুলকিত বোধ করেছিলেন। অপার আনন্দের বশে তিনি জয়ানন্দের কাব্যকে প্রামাণিকতম চৈতন্য-জীবনী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু পরবর্তী বিচারে এই সিদ্ধান্ত যথার্থ মনে হয়নি। ঐ একটি প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য উপলক্ষে জয়ানন্দ আরো কিছু কিছু নূতন তথ্য জানিয়েছেন। চৈতন্যের পিতৃভূমি, তাঁর পূর্ব পুরুষের মূল অবস্থান, ইত্যাদি বিষয়ে জয়ানন্দের প্রদত্ত অনেক তথ্য প্রামাণিক নয় বলে জানা গেছে। এমন অবস্থায় বিশ্বাস্য হলেও চৈতন্যের তিরোভাব-সম্বন্ধীয় কাহিনীও কবির কপোল-কল্পিত কিনা, অসংশয়ে বলা চলে না।

আসল কথা চৈতন্যের জীবনী অবলম্বন করে জয়ানন্দ লোক-বিমোহন কাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন, ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নিরূপণের কোনো বিশেষ আকাঙ্ক্ষা তাঁর থাকবার কথা নয়। চৈতন্য-জীবনীর একজন পেশাদার গায়েন ছিলেন তিনি। কাব্যের কাহিনী যত অভিনব ও বিস্ময়কর হবে, তাঁর উপার্জনও ততই বৃদ্ধি পাবে। এই উদ্দেশ্যে নিছক চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য তিনি সুযোগ বুঝে চৈতন্য-জীবন নিয়ে অভিনব সব কাহিনীর মালা গেঁথেছেন; সচেতন কৌশলে সে সব গল্পকে করতে চেয়েছেন বিশ্বসনীয়। উদ্দেশ্যগত এই দুর্বলতার প্রতি লক্ষ রেখে জয়ানন্দের কাব্যের কোনো নূতন তথ্যকে বিনা বিচারে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারা কঠিন। তাহলেও, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে কেউ কেউ মনে করেছেন, জয়ানন্দের কাব্যে সমসাময়িক সমাজ জীবনের মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটি ছবি পাওয়া যেতে পারে। সে যেমনই হোক, আসরে গীত হবার জন্যে রচিত হয়েছিল বলে কাব্যটি অনেকটা মঙ্গলকাব্যের আকারে লেখা, এবং পালাগানের মতোই বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত।

জয়ানন্দের কবি-স্বভাব

কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়,—বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে কবির জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মা ছিলেন রোদনী। কবির পিতৃদত্ত নাম ছিল গুইঞা। কবির এক বছর বয়সে মহাপ্রভু নাকি সুবুদ্ধি মিশ্রের অতিথি হয়েছিলেন, এবং তিনিই শিশু-কবির নূতন নাম রাখেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের কাব্য ষোড়শ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

ব্যক্তি-পরিচয় ও রচনাকাল

৩। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'

জয়ানন্দের কাব্যের মতোই লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'ও মূলত পালাগান হিশেবে কল্পিত

হয়েছিল। কিন্তু লোচনের চৈতন্য-নিষ্ঠা ছিল আন্তরিক। তাই মহাপ্রভুর ব্যক্তি-জীবন-কথার ওপরে কল্পনার তুলি তিনি যদিও বুলিয়েছেন, তবু কোথাও সে-কল্পনাকে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করেন নি। অপর পক্ষে কবি-মনের ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাস্তব তথ্যকেও লোচন আচ্ছন্ন করে ফেলেন নি কোথাও। তাঁর কাব্যের কাহিনী-বিন্যাস এবং শিল্প-রচনার সকল অভিনবত্বের মূলে রয়েছে তাঁর নিষ্ঠা-পূত পরিকল্পনা, আর গুরু-গত বিশেষ বিশ্বাসের স্বতন্ত্রতা।

কাব্য-পরিচয়

লোচনদাস মহাপ্রভুর পার্ষদ নরহরি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। আর নরহরি ছিলেন 'গৌর-নাগরিয়া' ভাবের প্রবর্তক। গৌরকে 'নাগর' ভাবে ভজনা করা, তথা—ব্রজগোপীরা যেভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ-ভজনা করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই মহাপ্রভুর স্বরূপ আস্বাদন করা নরহরির প্রবর্তিত সাধনের মুখ্য কথা। অথচ চৈতন্য-অবতারে নারী-সংস্পর্শ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছিল, এইটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সাধারণ ধারণা। ইতিহাসের তথ্যও শেষোক্ত সিদ্ধান্তের পোষকতা করে। তাহলেও লোচনদাস গুরুর প্রবর্তিত বিশ্বাসের অনুসরণ করে মহাপ্রভুর জন্ম এবং বিবাহ-প্রসঙ্গে নবদ্বীপ-নারীগণের দেহ-মনোগত বিচিত্র বিভঙ্গের চিত্র এঁকেছেন। মাঝে মাঝে কল্পনার সৌষ্ঠবে তিনি একটি-দুটি মুহূর্তকে গীতি-কবিতার সুষমায় মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু সেই কবি-কর্মের মর্যাদা রাখবার জন্যে তথ্যকে কোথাও আচ্ছন্ন হতে দেননি।

কবি-মনোভাব

লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' বৃন্দাবনদাসের কাব্যের পরে এবং জয়ানন্দের প্রায় সম-সময়ে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কবি স্বয়ং গ্রন্থমধ্যে বৃন্দাবনের ঋণ স্বীকার করেছেন। তাছাড়া, 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র কাহিনী-কল্পনার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য আগাগোড়া কাব্যই পাঁচালির আকারে গীত হবার জন্যে লিখিত।

রচনাকাল

কবির ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়,—তাঁর বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কোগ্রামে; পিতা ছিলেন কমলাকর দাস; সদানন্দী পাঠান্তরে অরুন্ধতী, ছিলেন কবি জননী। এঁরা বৈদ্যবংশীয় ছিলেন।

কবি-পরিচয়

৪। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যজীবনীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ. শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই মহাগ্রন্থ নানা দিক থেকে তুলনারহিত। মহাপ্রভুর জীবনের প্রামাণিক ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে ; বৈষ্ণব নিষ্ঠা-ভক্তির পরাকাষ্ঠা তত্ত্ব-কাব্যের রূপ ধরেছে। সবচেয়ে বড় কথা, দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও মননে এমন সমৃদ্ধ রচনা প্রাচীন বাংলা ভাষায় আর নেই। ড. সুকুমার সেন বলেছেন,—"একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যে এমন অপরূপ সমন্বয় আর কোন দেশের সাহিত্যে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।" তাহলেও ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়ে দার্শনিক বিচারের জন্যই কাব্যটির শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-র অতুল্যতা

সুবৃহৎ কাব্যে কৃষ্ণদাসের ব্যক্তি-পরিচয় সামান্যই রয়েছে। কবি জানিয়েছেন,—তাঁর বাড়ি ছিল নৈহাটির কাছে ঝামটপুর গ্রামে। পণ্ডিতেরা অবশ্য এখন স্থির করেছেন, ঝামটপুর ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে। যাই হোক, ত্রিশ বছর বয়সের নিকটবর্তী সময়ে কবি একদিন স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রত্যক্ষ করেন, এবং তাঁর আদেশেই বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে তখন গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্মের মহাপীঠ রচিত হয়েছে। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে খ্যাততম ষড় গোস্বামী এবং তাঁদের সর্বভারতীয় ভক্ত-পণ্ডিতেরা মিলে চৈতন্য-জীবন-বাণীকে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও কাব্যালংকার শাস্ত্রের পটভূমিতে প্রকাশিত করেছিলেন। নিত্যানন্দের কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে এসে এই ষড় গোস্বামীর চরণাশ্রিত হলেন। ছয় জন গোস্বামি-প্রধানের মধ্যে চার জন ছিলেন বাঙালি, আর দুজন এসেছিলেন দক্ষিণ দেশ থেকে। বাঙালি ক'জন হলেন দুই ভাই রূপ ও সনাতন; তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব, আর ছিলেন রঘুনাথ দাস। আর দক্ষিণী গোস্বামী দু'জন রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট। বৃন্দাবনে পৌঁছে কৃষ্ণদাস রূপ ও সনাতনের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এঁদের তিরোধানের পর তিনি রঘুনাথ দাসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অনেকে মনে করেন, কৃষ্ণদাস রঘুনাথ ভট্টের কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন।

কবি-পরিচয়

চৈতন্যধর্মের প্রতি কৃষ্ণদাসের নিষ্ঠা যেমন ছিল একান্ত, তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিও ছিল তাঁর আন্তরিক আগ্রহ। তাই অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে বৃন্দাবনে পৌঁছেও তরুণ পড়ুয়ার মতো তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করেছিলেন ধ্যানীর একান্ততা নিয়ে। আর সকল চেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল চৈতন্য-ধর্মের তত্ত্বে নিঃশেষ অধিকার অর্জন। কৃষ্ণদাসের পূর্বে সংস্কৃত, বাংলা এবং অপরাপর ভারতীয় ভাষাতেও চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের কোনোটিতেই মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের নীলাচলবাসের কাহিনী যথাযথ বিবৃত হয় নি। অথচ, বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে ঐ সময়কার লীলা-কথাই ছিল সবচেয়ে লোভনীয়। কারণ মহাপ্রভুব প্রায় প্রতিটি দিন তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত দিব্যোন্মাদ আবেশে অতিবাহিত হত; রাধাকৃষ্ণ-রতির পরা-মূর্তি ধারণ করেছিলেন তিনি তখন। এই কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামী ও মহাজনেরা বিশেষ করে মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের জীবন-বৃত্তান্ত রচনার জন্যে কৃষ্ণদাসকে অনুরোধ করেছিলেন। এ-বিষয়ে তথ্য আহরণের দুর্লভ সুযোগও তাঁর ঘটেছিল। রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর তিরোভাব-পূর্ব লীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। রঘুনাথ যখন ছিলেন না, তখনও নীলাচল-লীলার নিত্য-সঙ্গী ছিলেন তাঁর গুরু স্বরূপদামোদর। অতএব চৈতন্যের শেষ জীবনের দুর্জ্ঞেয় তথ্যেরও সন্ধান জানা ছিল দাস রঘুনাথের। কৃষ্ণদাস ছিলেন তাঁর পরিকর; বলা বাহুল্য, এই সুমহৎ সুযোগের সদ্ব্যবহারও তিনি করেছেন.

কবি-প্রতিভা

তাহলেও, সহজলভ্যকে নিয়ে কৃষ্ণদাস সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি; অসাধারণ চৈতন্যনিষ্ঠা তাঁকে দুরবগাহ জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন করেছিল। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ থেকে ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি-শ্রুতির এমন অশেষ অধিকার একজন ব্যক্তির মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে পেরেছিল ভেবেও বিস্মিত হতে হয়। অথচ কবি এই সর্বশাস্ত্র মন্থন-করা জ্ঞানামৃত আহরণ করেছিলেন একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষাবশে। চৈতন্যের জীবনী,—তাঁর জীবন-বাণী, তথা তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম-শাস্ত্রকে তিনি তর্কাতীত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

ফলে 'চৈতন্যচরিতামৃত'তে ঐতিহাসিকের তথ্য-প্রমাণ, দার্শনিক পণ্ডিতের শাস্ত্র বিচার, এবং ভক্তের কবি-প্রাণতার সংযোজন সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন :—

"শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যহ্যাসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।"

অর্থাৎ, ১৫৩৭ শক তথা ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবার দিন বৃন্দাবনে 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাগ্রন্থ রচনা শেষ হয়েছিল। সিন্ধু অর্থে ৭-এর বদলে ৪ ধরে পরবর্তী পণ্ডিতেরা কেউ কেউ ১৫৩৪ শক 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার সমাপ্তিকাল বলে নির্দেশ করেছেন। সে বছরেও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারে পড়েছিল। পূর্বসূরীদের মতোই কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্যের চৈতন্য-

জীবনকথাকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছেন। আদিলীলায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত হয়েছে,—তাতে পরিচ্ছেদ সংখ্যা সতেরোটি। মধ্যলীলায় পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আছে।

কাব্য রচনার কাল

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে মহাপ্রভু দুই দফায় ভারত ভ্রমণ করেছিলেন প্রায় ছয় বছর ধরে। প্রথম বারে গিয়েছিলেন দক্ষিণে, দ্বিতীয়বার কাশী-বৃন্দাবনসহ পশ্চিমভারতে। মধ্যলীলায় এই ছয় বৎসরের ভ্রমণ-কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যলীলাখণ্ডের কুড়িটি পরিচ্ছেদ-ব্যাপী প্রধানভাবে মহাপ্রভুর নীলাচল বাসের অন্তরঙ্গ-লীলার শিল্প-রূপ রচনা করা হয়েছে ভক্তের দৃষ্টিতে। বস্তুত, আগেও বলেছি, চৈতন্য-জীবনের তথ্যপরিবেশন করা কৃষ্ণদাসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমহিমার তর্কাতীত প্রতিষ্ঠাই 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র মহত্তম

কাব্য-পরিচয়

কীর্তি; দার্শনিক বিচার-সিদ্ধান্তের নিঃসংশয় প্রতিপাদনেই কবিরাজ-গোস্বামীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাই, প্রত্যেক লীলা-খণ্ডেই দার্শনিক আলোচনা ও শাস্ত্রীয় বিচার-প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আদি-লীলার সতেরো পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম নয়টি সম্পূর্ণই এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়েছে। তাছাড়া নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই ভয় ছিল, অন্ত্যলীলা বর্ণনা শেষ হবার আগেই যদি তাঁর জীবনান্ত ঘটে। অথচ, ঐটুকু রূপায়ণই তাঁর-কাব্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে, কবি আদি লীলাংশেই মহাপ্রভুর অন্ত্যজীবনের লীলা একবার সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলেন। মধ্য এবং অন্ত্য-লীলাখণ্ডেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পটভূমি এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাতে দীর্ঘ অংশ ব্যয়িত হয়েছে। এই সব আলোচনায় কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য প্রায় নিরবধি। এই কল্পনাতীত ব্যাপ্তির একটি সামান্য উদাহরণ হিশেবে বলা চলে, কবি তাঁর বাংলা কাব্যে ১০১১ বার সংস্কৃত বা প্রাকৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন। কোনো কোনো শ্লোক একবারের বেশিও উদ্ধৃত হয়েছে; তাই নতুন শ্লোকের মোট সংখ্যা আছে ৭৬৩টি। তার ১০১টি স্বয়ং কবির রচনা, বাকি ৬৬২টি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

সর্ব প্রধান হলেও দার্শনিক মূল্যই কৃষ্ণদাসের মহাগ্রন্থের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যও বিজ্ঞান সিদ্ধ প্রয়োগ-বিধির বৈশিষ্ট্যে অনন্য। প্রথমত চৈতন্য-জীবনের শেষ বারো বছরের প্রামাণিক তথ্য কেবল 'চৈতন্যচরিতামৃত'তেই পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য পূর্ব-কবিদের

কাব্য-কর্মে ঐতিহাসিক কীর্তির স্বরূপ

রচনায় যেসব তথ্য যথাযথ উপস্থাপিত হয় নি, কিংবা যে-সব তথ্য বাদ পড়েছে, তার অনেকখানির পাদপূরণ করেছেন কবি কৃষ্ণদাস। আর সকল বিতর্কিত প্রসঙ্গেই তথ্য বর্ণনার পদে পদে তিনি যথাযোগ্য প্রমাণ-সূত্রাদির উল্লেখ করেছেন। কার কাছে, কী ভাবে, কোন তথ্য আহৃত হয়েছে তার বিবরণ অনেক স্থলেই রয়েছে। অপার বিনয়ের বশে কবি নূতন তথ্য আবিষ্কার বা পরিবেশন করার গৌরব কখনো দাবি করেন নি। মহাপ্রভুর গৌড়লীলা বর্ণনা তিনি করলে বৃন্দাবনদাসের কাব্যের মর্যাদা হানি হতে পারে, [অথচ ঐ অংশের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা স্বীকারযোগ্য], এ-কথা ভেবে কেবল পূর্বসূরীর মর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণদাস নিজে সে অংশের বিস্তারিত আলোচনাই করেন নি, সূত্রাকারে বিবৃতিমাত্র উপস্থিত করে বিরত হয়েছেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-র সাহিত্যগত উৎকর্ষই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। রচয়িতা কৃষ্ণদাস প্রধানত ছিলেন জ্ঞানযোগী। একনিষ্ঠ ভক্তের সহজ ভাবানুভূতি তাঁর রচনার স্থানে স্থানে উদ্বেলিত হয়েছে। গোটা কাব্যে তার পরিমাণও খুব কম নয়। তা হলেও দার্শনিকের লেখনী ছিল ভাবচিন্তায় তন্ময়, ধীর-মন্থর। বৃন্দাবনদাস যেমন তাঁর কাব্যে সহজাত অনুভূতিকে নিরাবরণ ভাষায় প্রকাশ করেও স্বভাব-কবিতার সৃষ্টি করেছেন, কৃষ্ণদাসের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। আবেগাকুল মুহূর্তেও তাঁর প্রকাশ চিন্তার ভারে মন্থর।

তাহলেও, মুখ্যত দার্শনিক বিচারে অতুল্য গ্রন্থটির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে

স্বীকার-যোগ্য :— 'চৈতন্য-চরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিক তথ্য, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার, সব দিক দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।"

৫। গোবিন্দদাসের 'কড়চা'

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর মতোই 'গোবিন্দদাসের কড়চা'ও এক সময়ে চৈতন্যচরিত কাব্যের ইতিহাসে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। তাহলেও প্রথম কৌতূহলীদের প্রত্যাশা কাব্যটি শেষ পর্যন্ত পূরণ করতে পারে নি। ড. দীনেশচন্দ্র এই গ্রন্থটিকেই বাংলা ভাষায় চৈতন্যের প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থ বলে নির্দেশ করেছিলেন। যে-গুণে তিনি প্রধানত মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে হল গ্রন্থটিতে চৈত ্যচরিতের দুর্জ্ঞেয় তথ্যের প্রামাণিক উপস্থাপনের দাবি। কবি বলেছেন, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন। 'কড়চা'তে ঐ সময়কার তথ্য দিনলিপির আকারে লিখিত। একথা সত্য হলে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের এটিই একমাত্র প্রামাণিক বর্ণনা ; এই জন্যেই ড. দীনেশচন্দ্রের উৎসাহ অত প্রবল ছিল।

কিন্তু গ্রন্থ-বিষয়ের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়,—'কড়চা'টি একেবারে সম্পূর্ণই জাল যদি না হয়, তবু তাতে প্রক্ষেপের ভার এত জমেছে যে, প্রামাণিক তথ্যের ছিটেফোঁটা খুঁজে বার করাও দুষ্কর।

গোবিন্দদাসেব 'কড়চা'

গোবিন্দদাস তাঁর জীবন-কথা সম্বন্ধে জানিয়েছেন,—জাতিতে তিনি কর্মকার ছিলেন; বাড়ি ছিল বর্ধমানের কাঞ্চনপুরে। তাঁর বাবার নাম ছিল শ্যামদাস কর্মকার ; মা ছিলেন মাধ বী। কবি-পত্নী শশিমুখী ছিলেন পরুষ-স্বভাবা। স্ত্রীর হাতে একদিন লাঞ্ছিত হয়ে কবি মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় পৌঁছে তিনি চৈতন্য-মহিমা জ্ঞাত হন, এবং নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। তখন থেকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় পর্যন্ত তিনি মহাপ্রভুর পরিচারক হয়েছিলেন। দক্ষিণাপথ থেকে নীলাচলে ফিরে আসবার মুখে প্রভুই তাঁকে অদ্বৈত প্রভুর কাছে শান্তিপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে গোবিন্দ তাঁর চৈতন্য-সান্নিধ্যকালের স্মৃতি-কথা 'কড়চা' বা দিনলিপির আকারে লিখে রেখেছিলেন'। শান্তিপুর গমনের মুখে এসে 'কড়চা'টি খণ্ডিত হয়ে আছে।

ইতিহাস হিশেবে গোবিন্দের এই কড়চা-কাব্য যেমন নির্ভর-যোগ্য নয়, কাব্য হিশেবেও তেমনি তা অনুৎকৃষ্ট।

৬। চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'-এর সম্পাদনা করেছেন ড. সুকুমার সেন। তিনখণ্ডে কাব্য সমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রন্থারম্ভেই কবি দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটিতে কেবল প্রথম খণ্ডেরই পুথি পাওয়া গেছে।

চূড়ামণিদাস ও 'গৌরাঙ্গবিজয়'

চূড়ামণিদাস ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। নিত্যানন্দের কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং মাধবেন্দ্রপুরী সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন খবর এই কাব্যে পাওয়া যায়। ড. সেন মনে করেন, 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্য ষোড়শ শতকে রচিত হয়েছিল ; আলোচ্য পুথি অবশ্য সপ্তদশ শতকে লেখা।

অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থ

মহাপ্রভুকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে মানব-কথা রচনার যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তারই

ঐতিহাসিক পরিণতি লক্ষ করি অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থের ক্রমবিকাশে। মহাপ্রভুকে দেবতার অবতার বলে বিশ্বাস করেই বৈষ্ণব কবিরা প্রথমে তাঁর জীবনী রচনায় বৃত হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁদের মানবিক কৌতূহল চৈতন্যপার্ষদ ও পরবর্তী বৈষ্ণব মনুষ্য মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয় ; আরো পরে বৈষ্ণবতার ইতিহাস রচনায় তাঁদের আগ্রহ জন্মে। এমনি করে মহাপ্রভুর জীবনে আলৌকিক মনুষ্যত্ব-পূজনের পথ বেয়ে বাংলা সাহিত্য ক্রমশ নেমে এল সহজ মানব-স্বীকৃতির রাজপথে।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য

চৈতন্য-পার্ষদদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্যকে নিয়ে লেখা জীবনীই বেশি সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ্য ঈশান নাগরের লেখা 'অদ্বৈত প্রকাশ'। কবির মূল বাস ছিল শ্রীহট্টের লাউড়ে। পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁর মা'র সঙ্গে শান্তিপুরে চলে আসেন, এবং অদ্বৈত প্রভুর আশ্রয় লাভ করেন। মাতা-পুত্র দুজনেই আচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ঈশানের শ্রেষ্ঠ গৌরব, —তিনি মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করেছিলেন , তাঁর পদ সংবাহনের অধিকারও পেয়েছিলেন।

'অদ্বৈতপ্রকাশ'

মৃত্যুর পূর্বে অদ্বৈত আচার্য ঈশানকে শ্রীহট্টে ফিরে গিয়ে চৈতন্যলীলা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আরো পরে, প্রায় সত্তর বছর বয়সে, কবি দারপরিগ্রহ করেছিলেন, অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর আদেশে।

'অদ্বৈত প্রকাশ'-এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। ইদানীন্তন কালে কাব্যটির কোনো পুথিও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে মূল রচনার প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছে। মুদ্রিত কাব্যই এখন ইতিহাস আলোচকের একমাত্র ভরসা। তাতে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত প্রচলিত জনশ্রুতিটিরও উৎস আসলে মুদ্রিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ'। কিন্তু এসব তথ্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে আজ আর নিঃসন্দিগ্ধ হবার উপায় নেই।

হরিচরণ দাস অদ্বৈত-জীবনীর আর একজন কবি ; তাঁর কাব্যের নাম 'অদ্বৈতমঙ্গল'। ইনিও শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর শেষ বয়সের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। ফলে তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে কবির কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। বিজয়পুরী নামে প্রভুর এক জ্ঞাতি-মাতুলের কাছ থেকে তিনি এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

'অদ্বৈতমঙ্গল'

হরিচরণের কাব্যে কিছু কিছু নূতন খবর পাওয়া যায়। এরূপ একটি মূল্যবান তথ্য হচ্ছে,—মহাপ্রভু নাকি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে নিয়ে শান্তিপুরেও একবার দানলীলার অভিনয় করেছিলেন। নবদ্বীপে দানলীলা অভিনয়ের সংবাদ একাধিক চৈতন্য-চরিতে রয়েছে। কিন্তু শান্তিপুরের অভিনয়-কাহিনীর কথা কেবল হরিচরণই উল্লেখ করেছেন। এইরূপ আরো কিছু কিছু নূতন খবর সরবরাহ করা ছাড়া 'অদ্বৈতমঙ্গল'-এর উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য আর কিছু নেই।

নরহরি দাসের 'অদ্বৈত বিলাস' এ আচার্যের বাল্যলীলার কাহিনীই কেবল আলোচিত হয়েছে। এই কাব্য সতেরো অথবা আঠারোর শতকে লিখিত হয়েছিল।

'অদ্বৈত বিলাস'

অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর জীবনী নিয়ে লেখা দুখানি সংক্ষিপ্ত কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমখানি লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র'। এই কাব্যে বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ আছে ; তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতিও রয়েছে। এর থেকে মনে হয়, কাব্যটি 'চৈতন্যচরিতামৃত'র পরে লেখা। এই কাব্যের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সীতাদেবী ও তাঁর দুই শিষ্যা নন্দিনী আর জাঙ্গলীর অলৌকিক মাহাত্ম্যের গুণগান করা হয়েছে প্রায় আগাগোড়া।

'সীতাচরিত্র'

'সীতাগুণ-কদম্ব' রচনা করেছিলেন সীতাদেবীর এক শিষ্য বিষ্ণুদাস আচার্য। ফুলিয়ার কাছে বিষ্ণুপুরে কবির নিবাস ছিল , পিতার নাম মাধবেন্দ্র আচার্য। কাব্যের রচনা আরম্ভের কাল ১৪৪৩ শকাব্দ। পণ্ডিতেরা অবশ্য এই তারিখের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

'সীতাগুণ-কদম্ব'

চৈতন্য-পরিকর ছাড়া আরো যে-সকল বৈষ্ণব মহাজনকে নিয়ে জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সমুল্লেখ্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে বাংলাদেশে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিনষ্টি দেখা দিয়েছিল। আলোচ্য ত্রয়ী বৃন্দাবনে গোস্বামিগণের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-শাস্ত্রে বিশেষ দার্শনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সহজ-ভক্তির সঙ্গে বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের যোগসাধন করে তাঁরা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলায় চৈতন্য-ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রবর্তিত দার্শনিকতার আলোকে বঙ্গভূমিতে চৈতন্য-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিধানের পথিকৃৎ এঁরা। বিশেষ করে শ্রীনিবাস আচার্যই বৃন্দাবনে রচিত বৈষ্ণবশাস্ত্রের দুর্লভ পুথিসমূহ বাংলাদেশে বয়ে এনেছিলেন। বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের নব প্রবর্তয়িতা হিশেবে শ্রীনিবাসকে মহাপ্রভুর অবতার বলে কল্পনা করা হয়েছে। নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ শ্রীনিবাসের সঙ্গীই শুধু ছিলেন না, স্বতন্ত্রভাবে তাঁরাও বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবনে সফল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মে ত্রয়ী

মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই শ্রীনিবাসের জন্ম হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর দর্শনলাভ ঘটেনি তাঁর জীবনে। নরহরি সরকারের প্রভাবে ইনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং চৈতন্য-দর্শনের আশায় নীলাচল যাত্রা করেন। কিন্তু পথেই খবর পান, মহাপ্রভু তিরোহিত হয়েছেন। পরে তিনি বৃন্দাবনে গোস্বামীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীজীব তাঁকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসবার পথে গোস্বামিগণ ও অপরাপর মহাজনদের লেখা বহুমূল্য গ্রন্থরাজির মূলপুথি শ্রীনিবাস গাড়ি বোঝাই করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। বাঙালির শিথিল ভক্তি-চেতনাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত কবে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পথে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের অনার্য রাজা বীর হাম্বীরের চরেরা গাড়ি লুঠ করে সকল অমূল্য গ্রন্থ কেড়ে নেয়। শ্রীনিবাস এই জ্ঞানভাণ্ডার নষ্ট হতে দেন নি। বীর হাম্বীরের অরণ্য-রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ক্রমশ রাজা এবং রাজ্যের হৃদয় জয় করেন তিনি ; হিংস্র দস্যু-নেতা বৈষ্ণব-ভক্তিব অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। শ্রীনিবাস সমস্ত পুথিপত্র আবার গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে ফিরে এলেন সমতল বাংলার মাটিতে। প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে আরম্ভ করলেন বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃপ্রচার। তাঁর প্রখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদকর্তাও কয়েকজন ছিলেন। নিজেও তিনি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন।

শ্রীনিবাস

এবারে নরোত্তম-প্রসঙ্গ। এঁর বাড়ি ছিল অধুনাতন বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার খেতুরিতে। প্রখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন নরোত্তম; চৈতন্য-প্রেমে বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। শ্রেষ্ঠ পদকর্তাও ছিলেন তিনি। তাছাড়া, বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম পুনঃপ্রবর্তনেরও এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ যে তিনি ছিলেন, সে কথা বলেছি। এ বিষয়ে তাঁর মহৎকীর্তি 'খেতুরির মহোৎসব'। ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের শুরুতে কোনো সময়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিজের পিতৃভূমিতে ছয়টি দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম যে বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে তা অনন্যতুল্য। সেকালের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি, ধর্মগুরু ও মহাপুরুষেরা প্রায় সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এই উৎসবেই কীর্তন গানের প্রথম প্রচলন হয় বলে জানা যায়।

নরোত্তম

শ্যামানন্দ

শ্যামানন্দেব বাসভূমি ছিল মেদিনীপুবেব দণ্ডেশ্বব গ্রামে। তাঁব বাবা ছিলেন কৃষ্ণমণ্ডল, মা দুবিকা। বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁব নূতন নামকবণ হয় শ্যামানন্দ। বৃন্দাবনেব আদর্শে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মেব পুনরুজ্জীবনে তাঁবও এক প্রধান ভূমিকা ছিল।

ভক্তি বত্নাকব

শ্রীনিবাস নবোত্তম-শ্যামানন্দ এই ত্রয়ীকে নিয়ে যাঁবা জীবনীকাব্য বচনা কবেছিলেন, তাঁদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নবহবি চক্রবর্তী। ইনি বহু গ্রন্থেব লেখক। তাঁব প্রায় সকল বচনাব কেন্দ্রেই ছিলেন গুরু নবোত্তম। নবহবিব গ্রন্থাবলিব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বচনা 'ভক্তিবত্নাকব'। একাধাবে শ্রেষ্ঠ মহাজন-জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্মেব ব্যাপক ইতিহাস হিশেবে গ্রন্থখানি অমূল্য। সুদীর্ঘ পনেবোটি তবঙ্গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে বিচিত্র সব প্রসঙ্গ বর্ণিত বয়েছে। জীব গোস্বামীব পূর্বপুরুষদেব কথা, বৃন্দাবনেব গোস্বামীদেব গ্রন্থ-পবিচিতি, শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁব পিতাব জীবন কাহিনী, বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রেবণ, বীব হাম্বীবেব গ্রন্থ-লুণ্ঠন ও পবিশেষে তাঁব বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ, খেতুবিব মহোৎসব,--এবং আবো বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমকালীন ঘটনা। তাছাড়া বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাব বহু গ্রন্থ থেকে প্রচুব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এই কাব্যে, নানা বাগ বাগিণীব উল্লেখও আছে।

নবোত্তমবিলাস

নবহবিব লেখা দ্বিতীয় উল্লেখ্য গ্রন্থ 'নবোত্তমবিলাস। সংক্ষেপে হলেও নবোত্তমেব গোটা জীবন চিত্রকে জীবন্তরূপ দিয়েছেন কবি এই কাব্যে। সেই প্রসঙ্গে সমকালীন বৈষ্ণবতাব ঐতিহাসিক পবিচয়ও আছে বিস্তব। 'নবোত্তমবিলাস ১২টি 'বিলাস বা অধ্যায়ে সম্পূণ।

শ্রীনিবাস চবিত

নবহবিব গীতচবিত চিন্তামণি সংগীতেব আকাবে লেখা, এবং নানা বাগ বাগিণীব উল্লেখ বয়েছে এতে। শ্রীনিবাস চবিত কাব্যাকাবে শ্রীনিবাসেব জীবন চবিত। এই কবিব অন্যান্য বচনাব মধ্যে বয়েছে— 'গীতচন্দ্রোদয় ছন্দসমুদ্র' 'প্রক্রিয়া পদ্ধতি' ইত্যাদি

প্রেমবিলাস

নবহবিব ঐতিহাসিক বচনাবলিব কথা ছেড়ে দিলে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নিত্যানন্দ দাসেব প্রেমবিলাস। এতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দেব জীবন কথা প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে কবি স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুব বংশধব ছিলেন, বাড়ি ছিল শ্রীখণ্ডে তাঁব পিতাব নাম আত্মাবাম দাস, মা ছিলেন সৌদামিনী। বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ইতিহাস বিষয়ে 'প্রেমবিলাসে বর্ণিত তথ্য প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়।

নবম অধ্যায়
চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলি

মুখ্যত চৈতন্য-জীবনের বাস্তব তথ্যাবলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্যের ভিত্তিভূমি, তেমনি তাঁর লোকোত্তর চরিত্রের ভাব-বিভূতিকে আশ্রয় করেই চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব পদাবলি নবজন্ম নিয়েছিল। আগে বলেছি, নর-নারীর দেহাশ্রিত প্রেমাকৃতির বৈ হ পরিস্রুতি বিধান ছিল চৈতন্য-জীবনের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। আর প্রেম যেখানে দেহের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেখানে বিশেষ নরনারীর দেহকেন্দ্রকে পেরিয়ে তা ব্যাপ্ত হয়েছে সর্বভূতে। মানব-প্রেমের এই সার্বিক প্রসারের পরিণাম মূর্তি ধরেছিল চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রমূলে। আবার এই মানবিক প্রেমের লোকোত্তর ভাব-পরিস্রুতির বিগ্রহ হিশেবেই রাধা-কৃষ্ণের দ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপকে চৈতন্যদেব বন্দনা করেলন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' শ্রীরাধার ভাব-স্বভাব বর্ণনা করে বলেছেন :—

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদের ভাবভূমি

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ ধরে প্রেম নাম।
আনন্দ-বিস্ময় রস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী।।

বলা বাহুল্য, রাধা-রূপের এই আখ্যা চৈতন্য-পরিকল্পনারই অনুসারী। আবার চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ছিলেন 'প্রেমের পরম সার'-স্বরূপ। এই কারণেই ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁকে কৃষ্ণের অবতার, তথা একই দেহে রাধা-কৃষ্ণের সম্মিলিত রস-মূর্তি রূপে অনুভব করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাঁর সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে বলেছে— "রাধা আসলে কৃষ্ণের প্রণয়-'বিকৃতি' কৃষ্ণ-প্রণয়ের ভাবান্তরিত রূপমূর্তি, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি তিনি। এঁরা (কৃষ্ণ এবং রাধা) একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও পুরাকালে দেহভেদ গ্রহণ করেছিলেন। এখন সেই দুইই ঐক্যপ্রাপ্ত হয়ে চৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। রাধার 'ভাবদ্যুতিসুবলিত' সেই 'কৃষ্ণ-স্বরূপ'কে প্রণাম করি।"

বস্তুত মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কখনো তাঁর মধ্যে প্রকট হত কৃষ্ণস্বভাব, কখনো বা প্রকাশ পেত রাধা-ভাব। অতএব, সমসাময়িক ভক্ত কবিরা তাঁর মধ্যে লোকোত্তর প্রেমের বিভূতি অনুভব ও আস্বাদন করে তারই তন্ময় কাব্যরূপ রচনা করেছেন। তাঁদের রচনার বিষয় ছিল দু'রকমের। এক শ্রেণীর কবিতার মধ্যে চৈতন্য-জীবনের প্রত্যক্ষলীলার কথাই রসরূপ পেয়েছে। আরো এক শ্রেণীর রচনার উপজীব্য ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-মহিমা। অবশ্য চৈতন্য-সমকালীন কবিদের বর্ণিত রাধকৃষ্ণ লীলাকথাতেও রাধা অথবা কৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গ রূপের ভাব-জ্যোতিই বিকিরিত হয়েছে। গৌর-ভাবনাই চৈতন্য সমকালীন বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ।

চৈতন্য-তিবোভাবোত্তব কালেব অনেক বৈষ্ণব কবি মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ কবাব সুযোগ পান নি। তাহলেও তাঁদেব সকল বচনাতেই চৈতন্য-মহিমাব ভাব-বিভূতি নববূপে কীর্তিত হযেছে। বৃন্দাবনেব গোস্বামিকুল এবং তাঁদেব শিষ্যানুশিষ্যবা তখন চৈতন্য-জীবনেব তত্ত্ববূপ,—তাঁব দৈবী মহিমাব স্বভাব ব্যাখ্যা কবছিলেন অসংখ্য জীবনী, ধর্মশাস্ত্র অলংকাব গ্রন্থ, স্তব-স্তোত্র মন্ত্র কবিতাবলিব মাধ্যমে। প্রত্যক্ষদর্শীব অভিজ্ঞতা, ভক্ত-হৃদযেব একান্ত নিষ্ঠা, পণ্ডিতেব বিচাব-ব্যাখ্যা, এবং ভাবুকেব ধ্যান তন্ময়তাব সম্মিলনে ঐ সকল বচনায চৈতন্য জীবন যেন নবজন্ম লাভ কবেছিল। চৈতন্যোত্তব কালেব বৈষ্ণব পদকর্তাগণ এই নবীন চৈতন্য-কল্পনাব কল্পতীর্থে অবগাহন কবে তাঁদেব কবিতা বচনায প্রবৃত্ত হযেছেন। এই কাবণে এ-কালেব বৈষ্ণব-পদাবলিতে গৌডীয বৈষ্ণব ধর্মচেতনাব ভাবব্যঞ্জনা, 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি বৈষ্ণব অলংকাব-গ্রন্থেব প্রভাবিত আঙ্গিক সুষমা এবং জ্ঞান নিযন্ত্রিত ভক্তিব সুমিত জ্যোতি এক নবতব শিল্প-বূপেব জন্ম দিযেছে।

চৈতন্য সমসাময়িক প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ছিলেন শ্রীহট্টেব মুবাবি গুপ্ত আগে বলেছি, চৈতন্যেব প্রথম প্রামাণিক জীবনী বচনাব গৌববও এঁকেই দেওযা হয। মুবাবি গুপ্ত প্রধানভাবে বাধাকৃষ্ণ লীলা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাব কবিতাব প্রায সর্বত্র বাধাব প্রেমার্তিব গভীরে আত্মগোপন কবে আছে দিব্যোন্মাদ গৌবাঙ্গেব প্রেম বেদনাব আনন্দ বিভূতি আব তাঁব গৌব পদেও প্রত্যক্ষ অনুভবেব বেদনা উন্মথিত ব্যাকুল রূপ ধবেছে —

'ধব ধব ধব ওবে নিতাই
আমাব গৌবে ধব।
আছাড সময়ে অনুজ বলিযা
বাবেক করুণা কব।
মুবাবি গুপ্ত আচার্য গোসাঞিও দেখিহ নিতাই
আমাব আঁখিব তাবা।
না জানি কি খেনে নাচিতে কীর্তনে
পবাণে হইব হাবা।।
শুনহ শ্রীবাস কৈশোবে সন্ন্যাস
ভূমি তলে গডি যায।
সোনাব ববণ ননীব পুতলি
ব্যথা না লাগযে গায।
শুন ভক্তগণ বাখহ কীর্তন
হৈল অধিক নিশা।
কহযে মুবাবি শুন গৌবহবি
দেখহ মাযেব দশা।।''

একান্ত ভাবে গৌবাঙ্গ-কথা নিয়ে প্রথম বৈষ্ণবপদ বচনাব অতুল্য কীর্তি নবহবি সবকাবেব। অদ্বৈত-প্রভুই গৌব সংকীর্তনেব সর্বপ্রথম প্রবর্তক ছিলেন বলে জানা যায , আব গৌবলীলা গীতি প্রথমে লিখেছিলেন নবহবি। আগে বলেছি, নবহ 'গৌবনাগবী' ভাবেবও প্রবর্তক ছিলেন। এঁব বাডি ছিল শ্রীখণ্ডে, পিতাব নাম ছিল নাবাযণ। ১৪৭৮ থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবহবি জীবিত ছিলেন। তাঁব লেখা গৌবলীলাব পদটি —

নবহবি সবকাব

"গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে।
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি।।
এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু।।
* * *
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা।"

আগে দেখেছি, নরহরির যোগ্য শিষ্য লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করে গুরুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন।

চৈতন্য-সমকালীন যুগে গৌর-পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বাসুদেব ঘোষ। তাঁর লেখা অধিকাংশই পদই গৌরাঙ্গ বিষয়ক। এই সব পদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে 'চৈতন্যচবিতামৃত'কাব জানিয়ে ছিলেন :—

"বাসুদেব গীতে কবে প্রভুব বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহাব শ্রবণে।।"

বাসু ঘোষের আবো দুই সহোদর ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ। তিন জনেই চৈতন্য পরিকর এবং বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন। গৌর-বর্ণনা করে বাসুদেব ঘোষ একটি পদে লিখেছেন :—

বাসু ঘোষ ও সহোদবগণ

"গৌরাঙ্গ বিহরই পবম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গা পুলিনে রঙ্গে
হরি হরি বলে নিজ বৃন্দে।।
কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরা রূপ তাহা জিনি
ডগমগি প্রেম-তবঙ্গে।
ও নব-কুসুম-দাম গলে দোলে অনুপাম
হেলন নরহরি অঙ্গে।।
প্রিয়তম গদাধর ধরিয়া সে বাম কর
নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে।
ভাবে ভরল তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজন যৈছন সিংহে।।
ঈষত হাসিয়া ক্ষণে অরুণ-নয়ন-কোণে
রোয়ত কিবা অভিলাষে।
সোঙরি সেসব খেলা বৃন্দাবন-রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে।।"

পদটি পডলেই বোঝা যায়, নবহবিব মতো কবি বাসুদেব ঘোসও ছিলেন 'গৌবনাগবী' ভাবেব সাধক।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এব কবি মালাধব বসুব পৌত্র বামানন্দ বসু মহাপ্রভুব পাবিষদ ছিলেন। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই কিছু কিছু পদ বচনা কবেছিলেন।

বামানন্দ বসু

ব্রজবুলি ভাষায় পদ-বচয়িতা প্রথম বাঙালি কবি ছিলেন যশোবাজ খান। ভণিতায় তিনি হুসেন শাহেব উল্লেখ কবেছেন। তাই অনুমান কবা হয়, পদটি হুসেন এব বাজত্বকালেব (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি) কোনো সময়ে বচিত।

যশোবাজ খানেব লেখা সেই ব্রজবুলি পদটি হল —

ব্রজবুলি পদেব প্রথম বাঙালি কবি

"এক পয়োধব চন্দন লেপিত আবে সহজই গোব।
হিম ধবাধব কনক ভূধব কোবে মিলল জোব ॥
মাধব, তুয়া দবশন কাজে
আধ পদচাবি কবত সুন্দবী বাহিব দেহলী মাঝে।
ডাহিন লোচন কাজবে বঞ্জিত ধবল বহল বাম
নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ সোহ এ বস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বব ভোগ পুবন্দব ভনে যশোবাজ খান ॥"

চৈতন্য পাবিষদদেব মধ্যে বংশীবদন চট্ট একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। এব বহু পদ চৈতন্যোত্তব কালেব বংশীদাসেব বচনাব সঙ্গে মিশে গেছে। বংশীদাস শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষ্য, এবং সপ্তদশ শতকেব কবি ছিলেন।

বংশীবদন ও বংশীদাস

কিন্তু তাব আগে চৈতন্যোত্তব যুগেব প্রথম উল্লেখ্য কবি হিশেবে স্মবণীয় হচ্ছেন জ্ঞানদাস। চৈতন্য সমকালীনদেব মধ্যে পদকর্তা আবো অনেকে ছিলেন, ইতিহাসেব অগ্রগতিব ধাবা অনুসবণে তাঁদেব সকলেব উল্লেখ আবশ্যিক নয়।

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাসেব ব্যক্তি পবিচয় সম্বন্ধে সকল কথা জানা যায় নি। মোটামুটি বলা চলে, বর্ধমান জেলাব কাদডা গ্রামে তাঁব জন্ম হয়েছিল ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে। জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দেব দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবী কবিব গুরু ছিলেন। সে যুগেব আবো দুই শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিবাজ ও নবোত্তমদাসেব সঙ্গে কবি জ্ঞানদাসও খেতুবিব উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কবি পবিচয়

বাংলা, ব্রজবুলি এবং বাংলা-ব্রজবুলি মিশ্রিত ভাষাতে জ্ঞানদাস কবিতা বচনা কবেছিলেন। অবশ্য পদকর্তা হিশেবে তাঁব খ্যাতি প্রধানত বাংলা পদগুলিব জন্যেই। সহজ ভাবেব একান্ততা ও প্রকাশেব আড়ম্ববহীনতাই ঐ সব পদেব শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, যদিও এব গভীবে প্রতি পদে প্রচ্ছন্ন বয়েছে কুশল কলাকর্মেব সাবলীল প্রয়োগ। মনেব গভীব অনুভবকে জ্ঞানদাস সহজ সবল ভাষায় হৃদ্য কবে তুলতে পেবেছেন। তাই জ্ঞানদাসকে মধুস্বাদী হৃদয়ানুভবেব কবি চণ্ডীদাসেব সমধর্মী বলা হয়। বস্তুত এঁদেব দুজনেব কবি কর্মেব তফাৎ যতটা স্বভাবগত নয় যতটা কালগত। চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্বকালেব কবি, এক জয়দেব গোস্বামীব সংস্কৃত পদাবলি ছাড়া তাঁব বচনাব কোনো পূর্বাদর্শ ছিল না। অন্যপক্ষে জয়দেবেব অলংকাব বিক্রীড়িত কবি কর্ম চণ্ডীদাসেব মৌলিক কবি-ধর্মকে প্রভাবিত কবতে পাবে নি,—তাব শ্রেষ্ঠ প্রমাণ উভয়েব কবিতাব স্বভাবগত পার্থক্য। আসলে চণ্ডীদাস তাঁব ব্যক্তি-মনেব সহজ আকূতিকে একমাত্র অবলম্বন কবে পদ বচনা কবেছিলেন। ফলে তাঁব মনেব

কাব্যরূপ

অসংবৃত ভাব যেখানে বন্ধনহীন স্বেচ্ছা-মুক্তি পেয়েছে, সেখানে অনির্বচনীয় অনুভূতির অকুণ্ঠিত প্রকাশেই জন্ম হয়েছে শ্রেষ্ঠ কাব্যোৎকর্ষের। আগে দেখেছি, চণ্ডীদাসের কলাকর্মের কোথাও সচেতন কৌশলের প্রয়োগ নেই ; মুক্ত মনের স্বভাব-উক্তিতেই তাঁর শিল্পকৃতির উৎকর্ষ।

জ্ঞানদাসের কবিতার উৎকর্ষও মূলত মর্মানুভূতির একান্ততাতেই। তাহলেও চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবি তিনি। ফলে, সমসাময়িক বাংলা দেশে সুপ্রচলিত বৈষ্ণব দর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের গোষ্ঠিগত প্রেরণা তাঁর কবি-প্রাণের পক্ষে স্বভাব-সিদ্ধ হয়েছিল। তাই মনের সহজ ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়েও সহজেই এসে পড়েছে আলংকারিক সুমিত ভাষণ। জ্ঞানদাসের অনাড়ম্বর-হয়েও-মণ্ডনস্নিগ্ধ রচনার একটি সুন্দর নিদর্শন :—

"চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নবমেঘে করিয়াছে শোভা।।
মল্লিকা মালতী মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি শিখর ঘিরিয়া।।
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকি মিকি
কেবা দিল ফাগু রাঙিয়া।
রজতের পা'তে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া।।
হিঙুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে।।"

কবি-স্বভাব

বস্তুত, মনের সহজ অনুভবকে এইরূপ অনায়াসে মণ্ডিত কবে প্রকাশ করার দিকেই জ্ঞানদাসের ঝোঁক ছিল। তাহলেও মণ্ডন-কর্ম যেখানে হৃদয়ের আর্তির অভিন্ন সূত্রে গাঁথা পড়ে নি, জ্ঞানদাসের পদ সেখানে নিষ্প্রাণ। কেলি-কলা-কুতূহল শব্দের চপল ভঙ্গিযুক্ত হয়েও প্রাণের সহশ্র আকৃতি-বিহীন ; কেবল এই কারণেই জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি পদ আলংকারিক সুগঠন সত্ত্বেও হৃদয়স্পর্শী হতে পেরেছে কদাচিৎ।—

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ।।
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচকাই।।
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি।।"

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে অনাবিল অন্তরানুভূতিকে শিল্প-সুষম সহজ প্রকাশ দানের প্রবণতাবশে জ্ঞানদাসের ভূমিকা অনন্য।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে ষোড়শ শতকের আর একজন সমুল্লেখ্য কবি বলরাম দাস। বলরাম নামে বৈষ্ণব পদাবলির একাধিক কবি ছিলেন। আলোচ্য বলরাম হয়ত চৈতন্য-নিত্যানন্দের সমসাময়িক। জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ ; বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার দোগাছিয়া গ্রামে। এই বলরাম-কবি ব্রজবুলি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ লিখেছিলেন; তার মধ্যে বাংলা পদগুলিই ছিল উৎকৃষ্টতর। বাৎসল্য রসের কবি হিশেবেই এই কবি বিখ্যাত :—

বলরাম দাস

"গোষ্ঠে আমি যাব মা গো, গোষ্ঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।।
চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াএগ্র রাজপথে।।
পীত ধড়া দেগো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা।।
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি।।

* * *

বলরাম দাস কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল মুখ কাতর পরাণি।।"

চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্যে বিশিষ্ট পদ রচনার গৌরব গোবিন্দদাস কবিরাজের। ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক, বা তার কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল মাতুলগৃহ শ্রীখণ্ডে। কবির পিতার নাম ছিল চিরঞ্জীব, মা ছিলেন সুনন্দা। পিতামহ ছিলেন 'সংগীত দামোদর' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর। ইনি ঘোর শাক্তপন্থী সাধক ছিলেন। গোবিন্দ এবং তাঁর অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ মাতামহের প্রভাবে প্রথমে শাক্ত আচার গ্রহণ করেছিলেন। পরে দুজনেই বৈষ্ণব ধর্মে সবিশেষ আসক্ত হয়ে পড়েন ; রামচন্দ্র সংস্কৃত কবিতা লিখেছিলেন বৈষ্ণবী নিষ্ঠার প্রকাশ করে। গোবিন্দদাস কবিরাজের ধর্মাসক্তি সম্বন্ধে কৌতুকজনক লোক প্রবাদ রয়েছে। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সে কবি দুরারোগ্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করলে সুস্থ হতে পারবেন,—দেবীর কাছে এই স্বপ্নাদেশ পেয়েই নাকি তিনি বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। কবির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের কাল মোটামুটি ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ, তাঁর দেহান্ত হয় ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় সীমার মধ্যেই গোবিন্দদাসের বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হয়েছিল। এদিক থেকে কিছু সংখ্যক পদ সপ্তদশ শতকের রচনা হওয়াও সম্ভব।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস কবিরাজ মুখ্যত ব্রজবুলি ভাষাতেই পদ লিখেছিলেন বলে মনে করা হয়। গোবিন্দদাস ভণিতায় কিছু সংখ্যক বাংলা পদও পাওয়া গেছে। তার প্রায় সব কয়টিই গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামক অপর এক কবির রচনা বলে অনুমিত হয়েছে। অন্য পক্ষে, ভাষা এবং ভাব-কল্পনার দিক থেকে কবিরাজ গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির আদর্শের অনুসারী বলে মনে করা হয় :—

'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'

"ব্রজের মধুরী লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।।"

বিদ্যাপতির প্রতি গোবিন্দদাসের অনুরক্তির সুবিদিত পরিচয় রয়েছে :— বিদ্যাপতির লেখা 'ত্রিচরণ'-পদ প্রাপ্ত হয়ে তার চতুর্থ পাদ পূরণ করেছিলেন তিনি। তাছাড়া, এই দুই কবির যুক্ত ভণিতাতেও একাধিক ব্রজবুলি পদ পাওয়া গেছে। তাহলেও বিদ্যাপতির সঙ্গে আসলে গোবিন্দদাসের প্রকাশ শৈলীরই সাদৃশ্য বেশি; ভাবের বিচারে তাঁর অনুভব বিদ্যাপতির চেয়ে নিঃসন্দেহে গভীরতর। আর তার মূলে ছিল কবি-প্রাণের আত্যন্তিক চৈতন্যভক্তি।

আগে বলেছি, শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন কবিরাজ গোবিন্দদাস ; আব শ্রীনিবাস আপন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে চৈতন্যের অবতার বলে পূজিত হয়েছিলেন। তাছাডা, বৃন্দাবনের গোস্বামিকুলের দর্শনাদর্শে বাংলাদেশে চৈতন্য ধর্মের পুনরুজ্জীবনেরও তিনি ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর প্রাণধর্মের প্রদীপ্তি যোগ্যতম শিষ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ পাননি। সেই দুঃখের অনুভবে তাঁর কবি-প্রাণ সর্বদা আর্ত হয়েছিল। পদ লিখে, চৈতন্যলীলা-কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন,— সেই প্রেমজগৎ থেকে 'গোবিন্দদাস রহু দূর'। কিন্তু কালের ব্যবধানের ওপরে ভক্তমনের গভীর নিষ্ঠা সেতু-বন্ধন রচনা করেছিল। গোবিন্দদাসের কবি কল্পনা যেন দূর-গমনের তপস্যা করেছিল; ফলে কৃষ্ণ অথবা চৈতন্য-লীলার যে-কোনো অংশের রূপ-রচনা করতে গিয়ে কবি তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছেন। রাখীবন্ধন ঘটিয়েছিল বৃন্দাবনীয় দার্শনিক আদর্শ। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ মনের প্রেমাকৃতি, রাধার অদম্য কৃষ্ণ-পিপাসা, কৃষ্ণের লীলাকৌতুকের মাধুরী—কবি তাঁর তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তি-মনের নিবিড়তায় অনুভব করেছিলেন। পরিশীলিত মনের সেই ধর্মচিন্তা দুর্লভ কলাকৌশলের সূত্রে বাঁধা পড়ে অতুল্য শিল্প সম্পদ অর্জন করেছে গোবিন্দদাসের কবিতায়। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদে প্রেমের লাস্যময় রূপ তরঙ্গায়িত হয়েছে ; গোবিন্দদাসের রচনায়, ব্রজবুলির চলিষ্ণু ছন্দঃস্রোতে ভাব ও ভাবনার গভীরতা সঞ্চালিত হয়েছে। ফলে ধ্বনিমাত্রিক প্রকাশ-বিভঙ্গের সঙ্গে অনুভবমগ্নতা যুক্ত হয়ে তাঁর পদের ভাবরূপে অনেক সময়েই যেন মন্ত্রের মহিমা সঞ্চার করেছে। গোবিন্দদাসের রচিত কৃষ্ণের রূপারাধনার একটি পদ :—

গোবিন্দদাসের কবি-প্রাণ

"শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর
রঙ্গিণী মোহন নটবর।।
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুমধনু।।
থল-কমলদল অরুণ চরণ-তল
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জীর-কল।।
প্রেম ভরে অন্তর গতি অতি মন্থর
অধর মুরলি ধনি মন্মথ মন্তর।।
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর।।"

কল্লোলিত ছন্দোঝংকার, অলংকার শাস্ত্র-মন্থিত রূপরচনার দক্ষতা,—বিদ্যাপতি-প্রতিভার সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে পদটিতে। তাহলেও এ-ধরনের পদের শ্রেষ্ঠ রস-মূল্য কবির কৃষ্ণলীলা-মগ্ন শাস্ত্রনিষ্ঠ চৈতন্যধ্যান-মগ্নতায়।

প্রধানভাবে অভিসারের কবি হিশেবেই গোবিন্দদাস সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তাহলেও অভিসারের মিলন-উৎকণ্ঠা তাঁর পদে রূপ-বুভুক্ষায় পুলক-কণ্টকিত হয়ে ওঠেনি। মিলনের

জন্য সর্বস্বপণ সাধনার ত্যাগ ও বেদনাকেই তিনি তপস্যার মহিমায় মণ্ডিত করে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর অভিসার-উৎকণ্ঠিতা রাধা সখীর সাবধানবাণীর উত্তরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন :—

"কুলবতী কঠিন কবাট উদঘাট-
তাহে কি কণ্টক বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে ডারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা।।
সজনি, মঝু পরিখন করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হেরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।।
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজর কি আগি।।
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসব
সহচরী পাওল বোধ।।"

কবিকর্মেব অতুল্য সম্পদ

আবার নিজেব গো^ন ঘরে দুঃসাধ্য অভিসার সাধনের এই অভ্যাসে সিদ্ধ হয়ে গোবিন্দদাসেব রাধা যেদিন যথার্থ অভিসারের পথে বেরিয়েছেন, সেদিনও তিনি বলেন :—

"মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে,
যদি হয় মুখ লাখ লাখ।।
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমিব দুরন্ত পথ হেরই না পারিযে
পদ যুগে বেঢল ভুজঙ্গ।।
একে কুল-কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোব গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন্ পূর।।
একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজব ভেল।
তুয়া দরশন আশে ক- নাহি জানলু
চির দুখ অব দূরে গেল।।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহসুখ-আশ।

পন্থক দুখ তৃণ করি গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস।।"

ও কেবল গোবিন্দদাসের রাধারই কথা নয়, রাধার উপলব্ধির সঙ্গে আপন হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষাকেও কবি জড়িয়ে দিয়েছেন সেই সঙ্গে। কৃষ্ণ-মিলন-সুখের উৎকণ্ঠায় গোবিন্দদাসের কবি-প্রাণ অভিসারের পথে চির-পথিক হয়ে বেরিয়েছে। ব্রজবুলির দৈহিক সৌষ্ঠবের মধ্যে তাঁর পদে ধ্যানী-কল্পনার ভাবজ্যোতি এক অপরূপ কলারূপ রচনা করেছে। বস্তুত বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাসে কবিরাজ গোবিন্দদাস অনন্যতুল্য।

আগে বলেছি, গোবিন্দদাসের ভণিতায় প্রচলিত বাংলা পদাবলির কবি হিশেবে গোবিন্দ চক্রবর্তীকেই পরিচিত করা হয়েছে। ইনিও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন; তাঁর বাড়ি ছিল বোরাকুলি গ্রামে। গোবিন্দ চক্রবর্তী কিছু কিছু ব্রজবুলি পদও লিখেছিলেন; কিন্তু সে সবই কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচনার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য এঁর লেখা বাংলা পদেও কাব্যিক উৎকর্ষ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

গোবিন্দ চক্রবর্তী

'চৈতন্যমঙ্গল'-এর কবি, নরহরি-শিষ্য লোচনদাস পদকর্তা হিশেবেও সুখ্যাতি লাভ করেন। আগে বলেছি, গুরুর প্রভাবে লোচন গৌরনাগরীভাবের অনুরক্ত হয়েছিলেন। হাল্কা, লঘু ছন্দে পদ লিখে তিনি 'নাগরী' ভাবের কৌতুক-চপলতাকেও ব্যক্ত করেছেন।

লোচনদাস

পদকর্তা অনন্তদাস ছিলেন আচার্য অদ্বৈতর শিষ্য। এঁর লেখা অল্প কয়টি মাত্র ব্রজবুলি পদ পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ সীমিত কয়টি পদের গুণেই তিনি বৈষ্ণব পদকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

অনন্তদাস

সপ্তদশ শতকর বৈষ্ণব ধর্মগুরু নরোত্তমও কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদের লেখক। তাঁর পদে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব দর্শন-জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সার্থক যোগ ঘটেছে। একটি পদের শুরু হয়েছে,—

কবি নরোত্তম

"হরি হরি আর কবে এমন দশা হবে।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব,
দোঁহারে নুপূর পরাইব।।
টানিয়া বাঁধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জাবেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর।।"

শ্রীনিবাস আচার্যও কিছু কিছু পদ রচনা করেছিলেন। তবে শ্রেষ্ঠ পদকর্তাগণের গুরু হিশেবে তাঁর খ্যাতি যত, স্বয়ং কবির ভূমিকায় ততটা প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জন করতে পারেন নি।

চৈতন্যোত্তর পদসাহিত্যের ইতিহাসে কবি দীনচণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ অবশ্য স্মরণীয়। এঁদের বিস্তারিত পরিচয় উদ্ধার করেছি চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস-কবির আলোচনা প্রসঙ্গে।

চণ্ডীদাস-কবিগোষ্ঠী

চণ্ডীদাসের মতো বিদ্যাপতির কবিকীর্তিকেও আচ্ছন্ন করেছেন একই নামের আরো একাধিক পদকর্তা। এঁদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন' সমুল্লেখ্য ; এঁকে বাঙালি বিদ্যাপতিও বলা হয়। বিদ্যাপতির ভণিতায় কিছু কিছু বাংলা পদ পাওয়া গেছে ; সেগুলি এঁরই রচনা বলে মনে করা হয়েছে। ভণিতায় 'কবি রঞ্জন' এবং

বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী

'বিদ্যাপতি' উভয় অভিধারই ব্যবহার রয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে। এঁর লেখা ব্রজবুলি পদগুলি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনার মধ্যে মিশে গেছে। অথচ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ছিলেন ষোড়শ শতকের পদকর্তা; রঘুনন্দন ছিলেন তাঁর গুরু।

রায়শেখর নাম বা উপাধি-যুক্ত আরো একজন কবির রচনা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশে গেছে। এঁর পদে শেখব রায়, রায়শেখর এবং দুখিয়া শেখর, শেখর ইত্যাদি বিচিত্র রকমের ভণিতা পাওয়া যায়। ইনিও ষোড়শ শতকের কবি, রঘুনন্দনের শিষ্য। ব্রজবুলি রচনাতেই এঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম দুটি সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকে। প্রথমটির নাম 'রসকল্পবল্লী', সংকলক রামগোপাল দাস। দ্বিতীয়টির সংকলন করেছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,—সংকলনের নাম ছিল 'ক্ষণদা গীতচিন্তামণি'। এতে ৪৫ জন কবির লেখা ৩০৯টি পদ সংগৃহীত হয়ে আছে।

প্রথম বৈষ্ণব পদসংগ্রহ

দশম অধ্যায়
চৈতন্য-উত্তর অনুবাদ-সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ রচনা শুরু হয়েছিল তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী কালে; সেদিন তার উদ্দেশ্য ছিল লোক-চিত্তের প্রবোধন। বাংলা ভাষার সংগঠনেও এই সব অনুবাদ-সাহিত্য সেদিন যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। সংস্কৃতের ভাষা-সম্পদ ও প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা কৃত্তিবাস বা মালাধরের রচিত বাংলা কাব্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করেছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সঙ্গে তুলনা করলেই এই তথ্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হবে। অথচ, বড়ু চণ্ডীদাসও সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত যে ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাহলেও, বাংলা কাব্যে প্রথম ওজস্বিতার সৃষ্টি হয়েছিল অনুবাদ কাব্যের মাধ্যমেই। তার কারণ, এই সব অনুবাদে কৃত্তিবাস-মালাধর প্রধান ভাবে মূল কাহিনীর রূপরেখাই কেবল অনুসরণ করেন নি, একই ভাষার শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গিরও যথাসম্ভব অনুবর্তন করেছেন। এ ছাড়া, তখন উপায়ও আর কিছু ছিল না, বাংলা সাহিত্যের নিজের বলবার কথা তখনো অপ্রচুর ; ভাষা-শৈলী এবং শব্দ-সম্পদও ছিল একান্ত দুর্বল। ফলে, বাংলা সাহিত্যের গঠমানতার আদি-মধ্যপর্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যের মূলানুবাদ নবীন কলাকর্মে বলাধান করেছে।

বাংলা অনুবাদকাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্য

কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালের অনুবাদ-সাহিত্যকে এই অর্থে যথার্থ 'অনুবাদ' বলা উচিত কি না, তাতে সংশয় আছে। চৈতন্যোত্তর বাংলা ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃত, তথা, তৎসম শব্দ-বহুল হলেও তার স্বতন্ত্র গঠন ততদিনে স্বচ্ছ হয়েছিল। ফলে, ভাষা ও প্রকাশের জন্য পরমুখাপেক্ষিতার প্রয়োজন আর তত ছিল না। অন্য দিকে মহাপ্রভুর জীবন-সাধনা বাঙালিকে এক নূতন মূল্যবোধ দিয়েছিল। অ-হেতুক অনুরাগের প্রেমাবেগে দীপ্ত এই নূতন মূল্য-চেতনা চৈতন্যোত্তর বাংলার পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য-জীবনে প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য পেয়েছিল। তাই স্বাধীন প্রকাশ-ভঙ্গির মতো চৈতন্যোত্তর বাঙালির চেতনার স্বতন্ত্র এক জীবন-বাণীও দেখা দিয়েছিল। এ-কালের অনুবাদ-কবিরা সংস্কৃত কাব্য-কথাকে উপলক্ষ করে এই নূতন জীবন-বাণীকেই নবীন রূপ দিয়েছেন। এ-যেন পুরাতন কাব্যের কাঠামোয় নব-যুগ-ভাবনার প্রাণ-সঞ্চার। ফলে, কোনো কোনো কবি যে-কোনো একটি কাব্যের আগাগোড়া অনুবাদ করে তৃপ্ত হন নি ; একই বিষয়ের একাধিক সংস্কৃত কাব্য-কবিতা থেকে পছন্দমত কাহিনী আহরণ করে তাতে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে রচনা করেছেন নবরূপ। বস্তুত তাতে অকৃত্রিম অনুবাদ-কাব্যের সৃষ্টি না হয়ে অনেক সময়ে জন্ম নিয়েছে স্বতন্ত্র নূতন কাব্য। যেখানে কবি বিচিত্র কাব্যসূত্রের সন্ধান করেন নি, সেখানেও একটি মাত্র সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে নবীন যুগ-ভাবনার মূলগত স্বতন্ত্রতার প্রভাবে কাব্য নবরূপ ধরেছে। চৈতন্য-উত্তর কালের এই নবীন সাহিত্য-প্রবাহ প্রধানত তিনটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে ; রামায়ণ, মহাভারত, ও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ-কাব্য রূপেই তারা ইতিহাসে পরিচিত।

চৈতন্যোত্তর অনুবাদকাব্যের বিশিষ্টতা

১। চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণকাব্য

চৈতন্যোত্তর কালের রামায়ণ কাব্যের প্রথম উল্লেখ্য কবি অদ্ভুতাচার্য। এঁর রচনার মধ্যে আলোচ্য কালের অনুবাদ-কাব্যের স্বভাব-ধর্ম উজ্জ্বলতম প্রকাশ লাভ করেছে। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে বাল্মীকি-রামায়ণ ছাড়াও সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'রঘুবংশ' ইত্যাদি রাম-বিষয়ক বিচিত্র পুরাণ ও কাব্য-কথা থেকে কবির পছন্দমতো গল্পের টুকরো বিচ্ছিন্নভাবে আহৃত হয়েছে; সেই বিচ্ছিন্নতাকে একান্ত ঐক্যে বেঁধে তুলেছেন কবি তাঁর বাঙালি-স্বভাবিত কল্পনা-ধর্মের দ্বারা। অদ্ভুতাচার্যের এই স্বাধীন কবি-কর্ম বাংলার রস-লোকে কালজয়ী হয়েছে। একালে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে পরিচিত বাজার-চলতি বিভিন্ন কাব্যের প্রধান উৎস যে অদ্ভুতাচার্যের রচিত রামায়ণ, এ-পর্যন্ত পণ্ডিতেরা অনেকে এ-কথা মোটামুটি স্বীকার করেছেন। কবির নামকে হারিয়েও তাঁর সৃষ্টিকে রস-চিন্তার, এবং নিত্যদিনের জীবন-চর্চার সঙ্গী করে নিয়েছে বঙ্গ শতকের বাঙালি পাঠক। এখানেই অদ্ভুতাচার্যের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণকে অনুবাদ না বলে বিভিন্ন সংস্কৃত রাম-কথার আশ্রয়ে লেখা মৌলিক সৃষ্টি বলাও কিছু অসঙ্গত নয়।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ কাব্য

অদ্ভুতাচার্য মোটামুটি ষোড়শ শতকের কবি ছিলেন বলে মনে হয়। এঁর প্রচলিত অভিধা সম্পর্কে অদ্ভুত জনপ্রবাদ আছে। কবির পিতৃদত্ত নাম ছিল নিত্যানন্দ, জাতিতে এঁরা ব্রাহ্মণ। বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবির বাসভূমি ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য—মতান্তরে কাশী আচার্য ছিলেন তাঁর পিতা, মা ছিলেন মেনকা দেবী। কবির সাত বছর বয়সের সময়ে নাকি স্বয়ং রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে তাঁর জিহ্বায় তীর দিয়ে মহামন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। আর তারই প্রভাবে নিত্যানন্দ নিতান্ত অল্পবয়সে তাঁর মধুস্বাদী রামায়ণ রচনা শেষ করেন। এই অদ্ভুত কার্য সমাধা করতে পারার দরুনই তাঁর নাম নাকি হয়েছিল অদ্ভুতাচার্য। এই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে সংশয় আছে।

কবি-পরিচিতি

কৈলাস বসু রামায়ণ লিখেছিলেন সম্ভবত ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ ভাগে। ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের মূলানুগ অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছিলেন। একই কবির ভণিতায় চলিত মহাভাগবত পুরাণ-এর রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমিত হয়েছে।

কৈলাস বসু

চৈতন্যোত্তর রামায়ণের কবি হিশেবে চন্দ্রাবতী সুখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি যে কেবল কাব্য রচনা করেছিলেন, তা নয়। তাঁর নিজের জীবন-কাহিনী পূর্ববঙ্গের উৎকৃষ্ট লোক-গাথার প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে আছে আজও। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি বংশীদাস ছিলেন চন্দ্রাবতীর পিতা।

এঁদের বাড়ি ছিল ইদানীন্তন বাংলাদেশের মৈমনসিংহে। চন্দ্রাবতীর শৈশব-সঙ্গী ছিলেন ব্রাহ্মণকুমার জয়চন্দ্র। যৌবন-সীমায় পৌঁছে দুজনে দুজনের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। জয়চন্দ্র বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করলে উভয় পক্ষের অভিভাবক তা অনুমোদন করেন। কন্যাপক্ষে বিয়ের প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ হয়েছে, তখন বিয়ের দিনে খবর আসে জয়চন্দ্র একটি মুসলমান রমণীর রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেছেন, নিজে ইসলাম ধর্ম পরিগ্রহ করে। প্রণয়-উপেক্ষিতা চন্দ্রাবতী এর পরে যৌবনে যোগিনী হয়ে পড়েন ; চিরকুমারীর ব্রত নিয়ে রুদ্র-মন্দিরের উপাসিকা হয়ে যান তিনি। এদিকে জয়চন্দ্রের রূপ-মোহ দিনে দিনে স্তিমিত হয়ে আসে; পুরাতন প্রণয়ের বেদনা মনের গহনে নূতন

কবি চন্দ্রাবতীর পরিচয়

যাতনার সৃষ্টি করে। অপরাধী মন নিয়ে তিনি তখন চন্দ্রাবতীর কাছে ছুটে আসেন। কিন্তু রুদ্র-মন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ ; প্রণয়ীর আকুল আহ্বানের উত্তরে চন্দ্রাবতীকে কঠিন নিশ্চল হয়ে থাকতে হয় পিতার আদেশে। প্রত্যাখ্যাত জয়চন্দ্র নদীর জলে প্রাণ সমর্পণ করেন; রুদ্রের সাধনায় চন্দ্রাবতীও করেন দেহত্যাগ। জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতীর এই প্রেম-করুণ জীবন-কথা পূর্ববাংলার লোকমুখে দীর্ঘকাল গীত হয়ে চলেছিল। ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় এই গাথা-কাব্যকেও সংকলিত করেছেন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্যের কোনো লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নি; কিন্তু মৈমনসিংহের মহিলা-কণ্ঠে এই কাব্য নিয়ত গীত হয়ে ফিরত। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল চন্দ্রাবতীর রামায়ণগান। এই অতি-প্রচলনের জন্য মূল রচনার বিশুদ্ধি বিস্রস্ত হয়েছে। কালে কালে বহু লেখক ও গায়িকার ভাল-মন্দ রচনা চন্দ্রাবতীর কাব্যের সঙ্গে মিশে গছে। চন্দ্রনাথ দে এই অবস্থাতেই মহিলাদের মুখ থেকে গোটা কাব্যটি লিখে আনেন। তাতে অনেক অর্বাচীনতার ছাপ আছে ; এমন কি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-র রচনাংশও কিছু কিছু রূপান্তরিত হয়ে গৃহীত হয়েছে এতে। তবে কাব্য-কাহিনীর বর্ণনা এবং ভাষার প্রয়োগে নারী-হস্তের কোমল-করুণ বিন্যাসের পরিচয় আছে।

রামশংকর দত্ত

ভিষক রামশংকর দত্ত রামায়ণ লিখেছিলেন সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষ, অথবা অষ্টাদশ শতকের শুরুতে। কবির বাড়ি ছিল একালের বাংলাদেশে, মাণিকগঞ্জের বায়রা গ্রামে। ইনি কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের বিভিন্ন রচনাংশকে মিশিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবও কিছু কিছু আছে।

ভবানীদাস

ভবানীদাসের লেখা 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়', 'শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়', 'রামের স্বর্গারোহণ' ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিষয়ে লেখা বিভিন্ন পালাগানের পুঁথি পাওয়া গেছে। ভবানীদাস সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের কবি। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে এক নূতনতর রচনা-প্রকৃতির উদ্ভব হয়। চৈতন্য-প্রভাবিত সমাজ-ধর্ম, মানব-প্রেম, এবং জীবন-মহিমাবোধ ততদিনে ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছে : অথচ নূতন জীবনাদর্শ, নূতন ভাব-কল্পনার জন্ম হয় নি। বাঙালি সংস্কৃতির সে ছিল এক বিনষ্টির যুগ। এই বিনাশের ইতিহাস পরে আলোচনা করব। আপাতত জেনে রাখা ভাল যে, এই যুগে অনুভবের গভীরতা যত কমেছে, বৈচিত্র্য ও পরিহাস-প্রিয়তার প্রতি আকর্ষণ ততই গিয়েছিল বেড়ে। তাই, একখানি অখণ্ড-সম্পূর্ণ রমায়ণ বা মহাভারত কাব্য-রচনার চেয়ে তারই টুকরো কাহিনী নিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র কাব্য সৃষ্টির দিকে ঝোঁক পড়েছিল বেশি। আর ঐ সব গল্পে নানা রকমের উপকাহিনী জুড়ে দিয়ে তাতে বিচিত্র সরসতার সৃষ্টি করা হত। কখনো লঘু পরিহাস, কখনো বা যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনা, কৌতুক-রচনা, অথবা ডিটেক্‌টিভ গল্পের স্বাদ মিলত।

'দিগ্বিজয়'-কাব্য

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন-দিগ্বিজয়ের মূল আখ্যানভাগ রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিভিন্ন অংশ নিয়ে লেখা। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষা করবার ভার ছিল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের উপর। সেই প্রসঙ্গে তাঁরা কোথায় কত যুদ্ধ করেছিলেন, কত দেশ জয় করেছিলেন,—বিনাযুদ্ধে কত রাজ্য অধিকার করেছিলেন, দিগ্বিজয় কাব্য-প্রবাহের ঐটুকু ছিল মূল বক্তব্য বিষয়। সে ছাড়া ঐসব উত্তেজক গল্পের মধ্যে বিচিত্রতা সৃষ্টি করেছিল নায়কদের প্রণয়-মিলন-বিরহের নানা ছোট-বড় উপাখ্যান। ভবানীদাস এই শ্রেণীর কাব্য-রচনা করে ব্যাপক জনপ্রীতি লাভ করেছিলেন। মালদহ থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত নানা জায়গায় এঁর কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে। কবির নিজের বাড়ি ছিল পাণ্ডুয়া গ্রামে ; তাঁর বাবা ছিলেন

যাদবানন্দ, মা যশোদা।

দ্বিজ-লক্ষ্মণ

দ্বিজ-লক্ষ্মণও রামায়ণ ও মহাভারতের খণ্ড উপাখ্যান নিয়ে বিচিত্র পালাগান লিখেছিলেন। তার মধ্যে রামায়ণ প্রসঙ্গে সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের আদিকাণ্ড ও শিবরামের যুদ্ধ পালা উল্লেখ্য। কবি বন্দ্যঘটি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

অষ্টাদশ শতক ও নিকটবর্তী সময়ের রামায়ণ রচনার ধারায় যুগানুগ আরো এক বিচিত্রতার সৃষ্টি করেছিল 'রায়বার' কাব্যসমূহ। 'রাজদ্বার' শব্দ থেকে'রায়বার' কথার উৎপত্তি। রাবণের রাজদ্বারে বানর-রাজকুমার অঙ্গদকে পাঠিয়েছিলেন রামচন্দ্র। সেখানে পৌঁছে নানারকম কৌতুক ও ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষায় সে রাবণকে ভৎর্সনা করে।

রায়বার কাব্য

রামায়ণ কাব্যে ঐ অংশ 'অঙ্গদ রায়বার' নামে পরিচিত , এতে গ্রাম্যকবির সহজ pun রচনার মধ্যে মাঝেমাঝে wit-এর দীপ্তিও চোখে পড়ে। অঙ্গদ রায়বার এর বৈশিষ্ট্য,—ভাঁড়ামি, কৌতুক ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত উদ্দাম হাস্যরস। তাকেই আরো লঘু এবং তরলিত করে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন রায়বার কাব্যের সৃষ্টি হয়। ফকির রাম, কাশীনাথ এবং দ্বিজতুলসী রায়বার কবিদের মধ্যে সমুল্লেখ্য।

শংকর চক্রবর্তী

'কবিচন্দ্র' শংকর চক্রবর্তী রামায়ণ ছাড়াও শিবায়ন, ভাগবতামৃত, মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির বাড়ি ছিল মল্লভূমে,—মুনিরাম চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর পিতা। বাজারচলতি বাংলা রামায়ণের 'অঙ্গদ রায়বার', 'তরণীসেন বধ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই কবির রচনার দ্বারা প্রভাবিত।

দ্বিজ ভবানীনাথ

সেকালে রামায়ণ লিখে লাভজনক পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন কবি 'দ্বিজ ভবানীনাথ'। ইনি সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বন করে কাব্য লিখেছিলেন রাজা জয়চন্দ্রের আদেশে। এজন্য রাজা তাঁকে প্রতিদিন 'দশমুদ্রা' করে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন

রামানন্দ ঘোষ

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ কাব্যের উল্লেখ্য তেমন কোনো চমৎকৃতি নেই , কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কৌতুককর গল্প ফেঁদেছেন তিনি। নিজেকে কবি 'বুদ্ধাবতার' বলে ঘোষণা করেছেন। দেশে তখন স্বেচ্ছাচার প্রবল হয়েছিল বলে, তা দূর করার জন্য স্বয়ং বুদ্ধদেব নাকি রামানন্দ ঘোষ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। আরো কিছু কিছু উদ্ভট কল্পনা ছাড়া কাব্যের বৈশিষ্ট্য বা কবি-পরিচয় আর কিছু নেই।

জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ রায়

পিতা-পুত্র জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ রায়ের যৌথ চেষ্টায় লেখা রামায়ণের বিষয়-বর্ণনা এবং আখ্যান-বিন্যাসে অভিনবতা আছে। এটি অষ্টকাণ্ড রামায়ণ। প্রচলিত রামায়ণের সাতটি কাণ্ড ছাড়া অতিরিক্ত কাণ্ডটির নাম পুষ্করকাণ্ড। তাছাড়াও আর একটি খণ্ড আছে 'রামরাস'। অতএব সবশুদ্ধ নয়টি প্রধান বিভাগে এই রামায়ণের কাহিনী বিভক্ত হয়েছে। নূতন দুইটি খণ্ডে নানারকম পুরাণ-কথার উল্লেখ করে অভিনব বিচিত্রতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

রঘুনন্দনের রামায়ণ

এঁদের বাড়ি ছিল রানীগঞ্জের কাছে —দামোদরের উলটো পারে ভুলুই গ্রামে। জগদ্রাম গোটা কাব্যটি রচনা করে লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ড বিস্তারিত করবার ভার দিয়েছিলেন পুত্রের ওপরে। এই কাব্য-রচনা শেষ হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ ভাগে। রামায়ণ ছাড়াও জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ যুক্তভাবে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' লিখে শেষ করেছিলেন ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে। রামের দুর্গোৎসবের কাহিনী কাব্যটির বিষয়বস্তু। পিতা-পুত্র দুজনেরই রচনায় উল্লেখ্য সরসতা ছিল।

অর্বাচীন বাংলা রাম-কাব্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রঘুনন্দন গোস্বামী, তার কাব্যের নাম

ছিল 'রামরসায়ন'। রঘুনন্দন উনিশ শতকের কবি ছিলেন; কিন্তু 'রামরসায়ন' কেবল ঐ শতকেরই নয়, সমগ্র অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের একখানি বহুখ্যাত কাব্য।

রঘুনন্দন নিত্যানন্দের বংশধর ছিলেন—বাড়ি ছিল বর্ধমানের মাড় গ্রামে। গ্রন্থ-শেষের কবি-পরিচিতি থেকে জানা যায়, কবির পিতার নাম ছিল কিশোরীমোহন—মা ছিলেন উষা ; আর বংশীমোহন ছিলেন তাঁর গুরু।

'রামরসায়ন' কাব্য আকারে সুবৃহৎ। বস্তুত রঘুনন্দন তাঁর রচনায় পূর্ববর্তী কোনো রাম-কাব্যের কাহিনীই অবর্ণিত রাখেন নি। ফলে মূল কাব্য সাত কাণ্ডে বিন্যস্ত হলেও প্রতিটি কাণ্ড আবার অসংখ্য পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদে কবি যে কেবল নূতন গল্প শুনিয়েছেন তাই নয়, রচনার ছত্রে ছত্রে তাঁর আলংকারিক বিদগ্ধতা এবং প্রখর পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও সুস্পষ্ট। 'রামরসায়ন' বাং া ভাষার বৃহত্তম গ্রন্থগুলির একটি—অথচ এর প্রতিটি ছত্র সুলিখিত। তা ছাড়া, এর কথাংশে সংস্কৃত পুরাণ-কাব্যের পূর্বৈতিহ্য দক্ষতার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে। তবে ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারের প্রকরণগত দীপ্তি যত, 'রামরসায়নে' অনুভবের গভীরতা তত নেই।

এই সুবৃহৎ কাব্য ছাড়াও রঘুনন্দন 'রাধামাধবোদয়' এবং 'গীতমালা' নামে আরো দুখানি বাংলা কাব্য লিখেছিলেন।

কোচবিহাব রাজসভায় বামাযণ-কাব্য

কোচবিহারের প্রাচীন রাজকুল বামায়ণ-মহাভারত রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এঁদের প্রবর্তনায় অন্তত নয়খানি রামায়ণ কাব্য রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। শুধু তাই নয়, রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং একখানি বাংলা কাব্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন। তাছাড়া 'ক্রিয়াযোগসার', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যেরও মূলানুবাদ ইনি করেছেন।

২। বাংলা মহাভারত

প্রাককথন

বাংলা ভাষায় রামায়ণ এবং ভাগবত-কাব্যের প্রথম অনুবাদ হয়েছিল চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে ; অন্তত পঞ্চদশ শতকের পরে নয়। কিন্তু প্রথম বাংলা মহাভারত কাব্যের রচনা ষোড়শ শতকের আগে হয় নি। অন্যদিকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর মালাধর বসুর ভাগবত প্রথম অনূদিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক জন-প্রীতি লাভ করেছিল। কিন্তু মহাভারত কাব্য সর্বজনীন রস-রূপ লাভ করতে পেরেছিল কেবল সপ্তদশ শতকে এসে ; কাশীরামের যুগান্তকারী রচনার কল্যাণে।

প্রথম বাংলা মহাভরত

প্রথম মহাভারত কাব্য-রচনার প্রবর্তনা এসেছিল পূর্ববঙ্গের এক মুসলমান শাসকের কাছ থেকে। হুসেন শাহ ছিলেন গৌড়বঙ্গের বিদ্যোৎসাহী বদান্য পাঠান নবাব (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রি.)। চট্টগ্রাম জয় করে নবাব হুসেন তাঁর এক 'লস্কর' পরাগল খাঁকে সেখানকার শাসনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাভারতের টুকরো গল্প শুনে পরাগল মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে গোটা কাহিনী জানবার জন্যে তাঁর আগ্রহ জন্মে। তখন 'কবীন্দ্র' পরমেশ্বর দাসকে তিনি আদেশ করেছিলেন 'দিনেকে' শোনাবার উপযোগী করে একখানি গোটা মহাভারত রচনা করতে। কবীন্দ্রের কাব্য সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। তাহলেও নিছক সূত্রাকারে লেখা রচনাটির জায়গায় জায়গায় উৎকৃষ্ট কবি-কর্মের ছাপ আছে। কবীন্দ্রের কাব্যের নাম ছিল 'পাণ্ডব বিজয়' —পরাগলের উৎসাহে লিখিত হয়েছিল বলে সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যটি'পরাগলি মহাভারত' নামেও খ্যাত।

মহাভারত প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় কাব্যের প্রবর্তক ছিলেন পরাগল-পুত্র ছুটি খাঁ।

পিতার মৃত্যুর পরে তিনি চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত হন। পরমেশ্বরের মহাভারতের সংক্ষিপ্ততা তাঁকে অতৃপ্ত করেছিল। তাই, কেবল অশ্বমেধপর্বের কাহিনীকে বিস্তৃত করে একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য লিখতে তিনি আদেশ করেছিলেন শ্রীকর নন্দীকে। শ্রীকর কেবল অশ্বমেধপর্ব নিয়েই কাব্য লিখেছিলেন—তাঁর রচনার প্রধান অবলম্বন ছিল সংস্কৃত জৈমিনি মহাভারত। পরমেশ্বরের মহাভারত কাব্যের কোনো কোনো পুথিতে শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব জুড়ে দেওয়া আছে। এই কারণে প্রথমে মনে করা হয়েছিল, এঁরা দুজনে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু পরবর্তী কালে এ-ভ্রান্তির সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে।

শ্রীকব নন্দীব অশ্বমেধপর্ব

কেবল অশ্বমেধপর্ব নিয়ে আরো যাঁরা ষোড়শ শতকে কাব্য লিখেছিলেন, রামচন্দ্র খান এবং কবি রঘুনাথ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য।

অপবাপব কবি

ঐ একই শতাব্দীতে মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে কাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন পিতা-পুত্র ষষ্ঠীবর আর গঙ্গাদাস সেন। এঁদের বাড়ি ছিল ঢাকার মহেশ্বরদি পরগনায়—জিনারদি গ্রামে। জাতিতে এঁরা বৈদ্য ছিলেন। ষষ্ঠীবরের ভণিতায় স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে। গঙ্গাদাসের ভণিতায় আবিষ্কৃত হয়েছে আদি ও অশ্বমেধ পর্বের পুথি। পিতা ও পুত্র দুজনের লেখাই একদা পূর্ববঙ্গে জনসমাদর লাভ করেছিল।

ষষ্ঠীবব ও গঙ্গাদাস সেন

কিন্তু এঁদের কবি[illegible] উৎকর্ষ সত্ত্বেও, আগেই বলেছি, মহাভারতের কাব্য-রসকে আপামর বাঙালির মনের কাছে পৌঁছে দেবার সার্থক কীর্তি কাশীরাম দাসের। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি জানিয়েছেন :—

কাশীবাম দাস

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গী গ্রাম।
[illegible]ঙ্করদাস-পুত্র সুধাকব নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গঙ্গাধব-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণ-পদে মনে অভিলাষ।।

অর্থাৎ ইন্দ্রাণী পরগণাব সিঙ্গীগ্রামে কবির বাস ছিল। তিন সহোদরের মধ্যে [illegible]শীরাম ছিলেন মধ্যম। অগ্রজের নাম কৃষ্ণদাস, গঙ্গাধর ছিলেন কনিষ্ঠ। কমলাকান্ত দেব ছিলে[illegible] এঁদের পিতা। ইন্দ্রানী পরগনা এখন বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত।

কাশীরামেরা তিন ভাই-ই সুকবি ছিলেন। কৃষ্ণদাস লিখেছিলেন কৃষ্ণলীলা-মূলক 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্য ; ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে কৃষ্ণকিঙ্কর নামে পরিচিত হয়েছিলেন। গদাধরের 'জগন্নাথমঙ্গল' প্রধান ভাবে নীলাচলের মহিমা-কীর্তন। কিন্তু কাব্য হিশেবে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল কাশীরামের মহাভারত। এঁরা তিন সহোদরই চৈতন্য-লীলারসে অভিষিক্ত ছিলেন। কায়স্থ 'দেব' বংশে জন্ম নিয়েও কাশীরাম নিজেকে 'দাস'—কৃষ্ণভক্ত-দাসানুদাস রূপে পরিচিত করেছেন। তাঁর হৃদয়ের রাগানুগা রতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই সবিনয় আত্মনিবেদনে। সমগ্র কাব্যে কবি-প্রাণের এই প্রেমানুরক্তির স্পর্শ বিকীর্ণ হয়েছে, ফলে মহাভারতের মহাবীর্য-গাথা সকরুণ মূর্ছনায় নবীন মধুর রূপ লাভ করেছে। কাশীরামের রচনা চৈতন্যোত্তর বাংলার প্রেমভক্তি-রসে সমাকুল বলেই বাঙালির আনন্দের হাসি এবং বেদনার অশ্রুকে তা এক সূত্রে গেঁথে তুলেছে।

কবি-স্বভাব

কিন্তু এই অমূল্য কাব্য-রত্নের রচনা কবির হাতে সম্পূর্ণ হয় নি বলেই মনে হয়। এ-সম্বন্ধে

প্রবাদ আছে, —

"আদি সভা বন-বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।।"

তাছাড়া, কবির 'ভ্রাতৃপুত্র' নন্দরাম দাস জানিয়েছেন :—

"কাশীরামদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা।।
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহঁ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।।
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাই পোথা রহি গেল শোক।।
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে।।
আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেই জন।
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ।।
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।।"

কাব্য-পবিচয়

প্রথম প্রবাদ এবং দ্বিতীয় প্রমাণ একত্র করলে বোঝা যায়,—কাশীরামদাস মহাভারতের আদি, সভা ও বনপর্ব লিখে সম্পূর্ণ করেছিলেন; আর বিরাট পর্বেব অংশ মাত্র রচনা করে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। কোনো কোনো পুথির বিবরণ অনুসারে কাশীরাম আগে আদি সভা ও বিরাট পর্ব লিখে, এবং বনপর্ব রচনা অসম্পূর্ণ রেখে, প্রয়াত হয়েছিলেন। আব ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম স্বয়ং কবির আদেশে কাব্যের বাকি অংশ লিখে শেষ করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা সাধারণভাবে এই তথ্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও বাজার-চলতি মহাভারতের আগাগোড়াই কাশীরামের ভণিতায় প্রচলিত রয়েছে দেখতে পাই। তার কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতেও কবির রচনার প্রামাণিক পরিচয় রক্ষিত হয় নি। আর দুঃখের কথা, কাশীরাম সম্বন্ধে উল্লেখ্য গবেষণাও এ-পর্যন্ত বিশেষ হয় নি। তবু অ-নির্ভরযোগ্য রচনা-প্রবাহের মধ্যেও একটি ঐতিহাসিক তথ্য অ-তর্কিত রয়েছে। বাংলা মহাভারত রচনার সকল প্রয়াসের বিচিত্রতা একটি মাত্র ঐক্যের সূত্রে বাঁধা; আর কাশীরাম দাস ছিলেন সেই এক এবং অভিন্ন কাব্যাদর্শের প্রাণকেন্দ্র। মধুসূদনের কবিতা এই ঐতিহাসিক সত্যকেই ঘোষণা করেছে :—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।"

অনুমান করা হয়েছে,—১৬০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে কাশীদাসী মহাভারতের আদি পর্ব রচনা শেষ হয়; একটি পুথিতে বিরাটপর্ব রচনার সমাপ্তি-তারিখ পাওয়া গেছে—১৬০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দ।

আগে বলেছি, কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম খুল্লতাতের অপূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করার গৌরব দাবি করেছেন। তাছাড়া দ্বৈপায়ন দাস নামে কবির এক পুত্রও ক্ষুদ্র একখানি ভারত-কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনার উল্লেখ্য কোনো কাব্যগুণ ছিল না। কেবল পিতৃ-ঐতিহ্যের গৌরব সম্বন্ধে কবি অতি-সচেতন ছিলেন। তাই ভণিতায় বারে বরেই পিতার নাম স্মরণ করেছেন নানা রকমে! —

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনেযেন সকল সংসার।।"

নন্দরাম দাস ও দ্বৈপায়ন দাস

"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গে আরোহণ।।"

এর থেকে প্রমাণিত হয়,—কাশীরাম তাঁর জীবৎকালে এবং তার অব্যবহিত পরেই অতুল্য কবি-কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

নন্দরামের পিতার নাম ছিল নারায়ণ। তাঁর ভণিতায় দ্রোণ ও কর্ণপর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

আপরাপর কাব্য

রামায়ণ কাব্যের মতো একাধিক বাংলা মহাভারতের রচনা-কর্মেও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কোচবিহরের রাজন্যগণ। এই সব প্রয়াসের মধ্যে রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের পৃষ্ঠপোষণে লেখা গোবিন্দ কবিশেখরের কিরাতপর্ব, আর প্রাণনারায়ণের রাজ্যকালে লেখা দ্বিজ শ্রীনাথের মহাভারত উল্লেখ্য। দুখানি কাব্যই সপ্তদশ শতকের রচনা।

অষ্টাদশ শতকের বাংলা মহাভারতের মধ্যে রাজেন্দ্র সেনের কাব্যের রচনারম্ভে কিছু অভিনবতা লক্ষিত হয়। রাজেন্দ্রের মূল কাব্যে শকুন্তলা-উপাখ্যানই বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩। ভাগবতের অনুবাদ ও কৃষ্ণলীলা কাব্য

চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত কাব্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাগবত-অনুবাদের পরিমাণ কম ছিল। মহাপ্রভুর জীবনাচরণ এবং বৈষ্ণব ভাব-বিশ্বাসের কল্যাণে ভাগবতের মধুর-রস-বহ বৃন্দাবন-লীলাংশই কেবল বিশেষ ভক্তি ও জন-প্রীতির আকর হয়েছিল। এই সব লীলাকথাই আবার বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন পালাগানে গীতি-রসঘন রূপ পেয়েছে। বস্তুত, সে-যুগের প্রতিভাধর শ্রেষ্ঠ কবিরা প্রায় সকলেই পদ-সংগীত রচনায় প্রবর্তিত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায়, ঐ ভাগবত-কথারই বৃন্দাবনলীলা নিয়ে যাঁরা আখ্যায়িকা-কাব্য লিখলেন, কবি হিশেবে তাঁরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন বলেও বটে, আবার গীতের উচ্ছ্বাস বিবরণাত্মক রচনায় স্তিমিত হয়েছিল বলেও বটে, সংস্কৃত রচনার মূলানুবাদ করে তাঁরা দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। ফলে, সূক্ষ্ম বয়ন-কর্মের তুলনায় কাহিনীর বিচিত্রতা রচনার দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। এই চেষ্টায় অর্বাচীন পুরাণাদি থেকে যেমন রাধাকৃষ্ণের লীলা-মধুর গল্প সংগ্রহ করা হয়েছে, তেমনি নিছক লোককাব্যের দানলীলা নৌকালীলা প্রভৃতি উপাখ্যানেরও রয়েছে দীর্ঘ উপস্থাপনা। অথচ, মূল ভাগবতে ঐ সব প্রেম কাহিনী ছিল না; কেবল তাই নয়, রাধার নাম পর্যন্ত সেখানে উল্লিখিত হয় নি। অতএব, ভাগবত-অনুবাদের নামে চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে যে-সব কাব্য রচিত হয়ছে, তার প্রায় সব কয়খানিতেই মূল ভাগবত-কথার চেয়ে অর্বাচীন পুরাণ ও লোক-সংগীতের বিমিশ্রতায় গড়া মধুর-রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়েছ। এতে ভাগবত-পুরাণকথার চেয়ে চৈতন্যলীলা-মাধুর্যের প্রতি যুগ-মানসের অতি-প্রবণতাই প্রমাণিত হয়।

চৈতন্যোত্তর ভাগবত কাব্য

মহাপ্রভুর সমকালে যে একমাত্র কবি মূল ভাগবতের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন, তিনি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। 'ভাগবতাচার্য' উপাধিটি কবির জীবনে চৈতন্য-কৃপার দান। গৌড় থেকে নীলাচলে ফিরে যাবার পথে মহাপ্রভু কবির কলকাতা বরাহনগরের বাড়িতে অবস্থান করেন। রঘুনাথ তাঁকে তখন মূল সংস্কৃত ভাগবত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তাই শুনে, 'চৈতন্য ভাগবত' বলেছেন,—

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

"প্রভু বোলে ভাগবত এ মত পড়িতে,
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।।
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য।।"

আগাগোড়া কাব্যের ভণিতায় কবি এই উপাধি বহুমান্য শিরোভূষণের মতো ব্যবহার করেছেন। তাতে বোঝা যায়, গৌড় থেকে মহাপ্রভুর পুরীতে ফিরে যাবার পরে ভাগবতাচার্যের কাব্য রচনা আরম্ভ হয়।

গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গ বিবৃত করে কবি বলেছিলেন,—"মহভাগবতে না কহিব অন্য কথা।" এই প্রতিশ্রুতি তিনি আগাগোড়া দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। রঘুনাথ তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'। তাহলেও তাতে মূল ভাগবতের পুরো বারোটি স্কন্ধেরই মোটামুটি অনুবাদ রয়েছে। সংস্কৃত কাব্যের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদই কেবল করেন নি তিনি, আসলে প্রতিটি স্কন্ধের বিষয়-সার একত্র করে তাকে গল্পের পর গল্পে সাজিয়েছেন নিজের ইচ্ছামতো। বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গিতে স্বাধীনতার পরিচয় স্পষ্ট। তাহলেও রঘুনাথ ছিলেন পরম ভক্ত এবং পণ্ডিত ; আর এই কারণেই, তাঁর নিজস্ব প্রকাশ-শৈলীতেও মূল ভাগবতের ভাব-পরিবেশকে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

রঘুনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভাগবতের শ্লোক-এর মৌলিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহাপ্রভুকে কৃষ্ণাবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রথম প্রয়াস। এ-সম্পর্কে তাঁর বিচার ছিল আগাগোড়া যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। কলিতে গৌরাবতার-বাদ প্রতিষ্ঠার গৌরব জীব গোস্বামীর ওপরে অর্পিত হয়েছে। কিন্তু রঘুনাথ ছিলেন এই পথের প্রথম পথিকৃৎ।

প্রখ্যাত বৈষ্ণব-শিরোমণি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন তিনি।

রঘুনাথ দাসের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'র পরেই উল্লেখ্য দ্বিজমাধবের লেখা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। কাব্যটি সম্ভবত 'একাব্বর শাহে'র রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। মনে করা হয়, সপ্তগ্রামে কবির জন্ম হয়েছিল; তাঁর বংশধরদের পরিচয় পরে সংগৃহীত হয়েছিল তদানীন্তন ময়মনসিংহ জেলায়।

দ্বিজমাধব

এই কাব্যেই চৈতন্যোত্তর ভাগবত অনুবাদ-কাব্যের সকল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে; মূলানুবাদের প্রতি কবিমনের নিষ্ঠা এখানেই স্পষ্টত শিথিল হয়ে পড়েছে; সেই সঙ্গে বিচিত্র সূত্র থেকে অভিনব কাহিনী আহরণের আকাঙ্ক্ষাও হয়েছে প্রবল।

কবি দ্বিজমাধবের ব্যক্তি-পরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন,—ইনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর ছিলেন ; আবার কারো মতে ইনি ছিলেন তাঁর খুল্লতাতপুত্র। মৈমনসিংহের যশোদল গ্রামে রাঢ় বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামীরাও কবির উত্তরাধিকার দাবি করেন। মনে হয়, মাধব বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর অন্তত ছিলেন না।

কবি বলেছেন, 'কৃষ্ণ-চৈতন্য'র স্বপ্নাদেশ পেয়েই তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'ভাগবত সংস্কৃত'-কে 'লোক ভাষা'-রূপে বর্ণনা করে তাকে সর্বজনের বোধগম্য করে তোলা। কবি কিন্তু ইচ্ছা করেই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। ভাগবত ছাড়াও তাঁর রচনায় মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অজস্র কাহিনী যথা-ইচ্ছা গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে দানলীলা, নৌকালীলা ইত্যাদি লোক-কথার বর্ণনাতেও কবির উৎসাহ ছিল সমতুল। আগাগোড়া কাব্য-কাহিনীতে একচ্ছত্র নায়িকার ভূমিকা পেয়েছেন রাধা, যে রাধার নামও নেই ভাগবতে। এ-দিক থেকে ভাগবত ঐতিহ্যের চেয়ে চৈতন্য-প্রেমের জীবন-বাণীর

দ্বারাই কবি সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর 'রাগানুগ' কবি-প্রাণ, বস্তুত, রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রেম-লীলারসের আবেশে আকৃষ্ট হয়েছিল। স্থানে স্থানে ভাবের উচ্ছল আকৃতি সংগীতের আকার পেয়েছে। কবি সে-সব জায়গায় উপযুক্ত সুর-লয়েরও নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে ভগবতের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদের চেয়ে চৈতন্য ভক্তি-প্রনোদিত প্রেম-গীতিকা রূপেই দ্বিজমাধবের কাব্য যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। কাব্য-বর্ণনায় মহাপ্রভুকে ইনি স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণাবতার বলে ঘোষণা করেছেন।

এঁর কাব্য চৈতন্য-সমকালে, কিন্তু রঘুনাথদাসের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'র পরে, রচিত হয়েছিল বলে মনে করবার কারণ আছে।

কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল

কবি কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-ও দ্বিজমাধবের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ, অল্প পরিমাণ ভাগবত-কথার সঙ্গে হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণ এবং নৌকাখণ্ডাদি লৌকিক উপাখ্যান মিলিয়ে 'কৃষ্ণমঙ্গল'-এর বিচিত্রতাপূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া মধুর রসাবেশের প্রতিই এই কবির আগ্রহ ছিল সমধিক। তাঁর পিতার নাম ছিল যাদব, মা ছিলেন পদ্মাবতী। বাড়ি ছিল তাঁদের গঙ্গার পশ্চিম পারে। কাব্য-রচনাকাল ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ, অথবা সপ্তদশ শতকের একেবারে শুরুতে।

দৈবকীনন্দন সিংহ

ষোড়শ শতকের আর একজন সুখ্যাত কবি ছিলেন কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ। তাঁর পিতার নাম ছিল চতুর্ভুজ—মা ছিলেন হীরাবতী বা হারাবতী। কবি নিজে লিখেছেন,—

"আর একখানি দোষ না লবে আমার।
পুরাণের অতিরিক্ত লিখিব অপার।।"

দৈবকীনন্দনের আগা গোড়া কাব্যটি এই উক্তিরই যেন সার্থক রূপায়ণ। আর এই রচনা-কর্মে পাণ্ডিত্যের চেয়ে চৈতন্য-অনুরক্তিময় ভাবাতিশয্যই কবির মনকে চালিত করেছে বেশি। দৈবকীনন্দনের রচনায় সহজ-কুশলতা হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন, এই কবিশেখর দৈবকীনন্দনই ছিলেন বৈষ্ণব পদাবলি-খ্যাত 'বাঙালি বিদ্যাপতি'। রায়শেখর, কবিশেখর ইত্যাদি ভণিতায় এই বাঙালি বিদ্যাপতির অসংখ্য পদ রয়েছে। অবশ্য পদকর্তা কবিশেখর এবং কবিশেখর দৈবকীনন্দনের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। দৈবকীনন্দনের অনুবাদ গ্রন্থের নাম গোপাল পাঁচালি'। এর আগে তিনি সংস্কৃত ভাষায় দুখানি, এবং বাংলা ভাষায় আরো একখানি, গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত রচনা দুটি হচ্ছে— 'গোপীনাথ বিজয়' নাটক এবং 'গোপাল চরিত' মহাকাব্য। তাঁর প্রথম রচিত বাংলা কাব্যের নাম ছিল 'গোপালের কীর্তনামৃত'।

শ্যামাদাস

'দুঃখী' শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য রচনার কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেছেন, কবি অষ্টাদশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবার কারো কারো মতে তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতকের লোক। ড. সুকুমার সেন কবিকে ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে কবির পিতা এবং মহাভারত-বিখ্যাত কবি কাশীরাম দাসের খুল্লপিতামহ শ্রীমুখ ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। কবির মা'র নাম ছিল ভবানী , মেদিনীপুর জেলায় এঁদের বাসভূমি ছিল বলে মনে করা হয়েছে। শ্যামদাসের কাব্যে লৌকিক উপাখ্যানের প্রভাবই বেশি। মঙ্গলকাব্যের আদর্শে লেখা 'রাধার বারমাস্যা' যেমন অভিনব, তেমনি করুণ। রচনার বিষয় ও শৈলীতে অর্বাচীনতার লক্ষণ কবির প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়।

কাশীরাম দাসের অগ্রজ কৃষ্ণদাসের কাব্যের নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'; রচনাকাল সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথম বা দ্বিতীয় বছর। কাশীরামের প্রসঙ্গে এঁর ব্যক্তি-পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে। কাব্যের বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নেই। কবি বারে বারে তাঁর কাব্যকে 'ভাগবত সার' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু গল্পাংশে ভাগবতের বহির্ভূত কাহিনীর বর্ণনাই বরং বেশি।

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস

অভিরাম দাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' লিখেছিলেন সপ্তদশ শতকে। এতে গল্পের বিচিত্রতা রয়েছে ; কিন্তু লৌকিক রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর ব্যবহার সংক্ষিপ্ত। ইনি শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করে কাব্যারম্ভ করেছেন।

অভিরামদাস

'হরিবংশ' কাব্যের কবি ভবানন্দ সম্ভবত শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। সংস্কৃত হরিবংশ পুরাণের সঙ্গে এঁর রচনার কোনো যোগ নেই। প্রধানত রাধাকৃষ্ণের গ্রামীণ কাহিনীকেই কবি রূপ দিয়েছেন। দানলীলা, নৌকালীলাদি-ই ভবানন্দের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়। ইনি সপ্তদশ শতকের কবি ছিলেন।

ভবানন্দ

দ্বিজ পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল' ঐতিহাসিক খ্যাতি পেয়েছে আবিষ্কর্তার গৌরবে। এই কাব্যের একখানি আগাগোড়া সম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কাব্যের বিষয় ছিল দানলীলা, নৌকালীলাদি। কবি বীরভূমবাসী ছিলেন বলে মনে হয়।

দ্বিজ পরশুরাম

ষোড়শ শতকের পরে ভাগবত-অনুবাদ আখ্যাযুক্ত কাব্যে মূল ভাগবতের প্রভাব ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। আরো পরে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অর্বাচীন পুরাণ-কথা, এবং ততোধিক, লোক-কাব্যের গল্প-বিচিত্রতা এই সব রচনাপ্রবাহে অভিনব কৌতুক সৃষ্টি করেছে। আগে বলেছি, বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে এই কৌশল-শিথিল লঘুতার সূচনা দেখা দেয় চৈতন্য-প্রভাব বিনষ্টির সময়ে। অষ্টাদশ শতকের অনুবাদ কাব্যে এই বিনষ্টি-লক্ষণ স্ফুটতর হয়েছে।

অপরাপর রচনা

বলরাম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' কাব্যে ভাগবত-প্রসঙ্গ দুর্লভ। অতি অর্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্পাধারে লৌকিক দেহাসক্তিপূর্ণ সহজিয়া রসের পরিবেশন করেছেন কবি। কাব্যের রচনাকাল ১৭০২-০৩ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমিত হয়েছে।

বৈষ্ণব প্রসঙ্গের আধারে দেহ-রসাসক্ত নূতন সহজিয়া সাহিত্য প্রবাহের মধ্যে প্রধানভাবে উল্লেখ্য চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'দেহ কড়চা' এবং 'চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি' ইত্যাদি গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ঊষা-যুগে সহজিয়া দেহ-সাধনার শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ 'চর্যাপদ'। চৈতন্য-পূর্ব মধ্যযুগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অতুল্য সহজিয়া কাব্যকীর্তি। কিন্তু আগে বলেছি, চৈতন্য-মহিমার শ্রেষ্ঠ মূল্য, প্রেম-সাধনার জগতে দেহ-বিবিক্ততার আদর্শ সৃষ্টিতে। ফলে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যই নয় কেবল, প্রায় সকল সাহিত্যই 'কাম-গন্ধে'র প্রাচুর্যহীন পরিস্রুত প্রেম-রসে ভরপুর। কিন্তু চৈতন্য-ভাবশিথিলতার সঙ্গে বাংলাদেশে আবার দেহাসক্তি জমে উঠেছে প্রেম-ভাবনাকে ছাপিয়ে। ফলে, উচ্চ-নীচ উভয় সমাজেই শৃঙ্গারান্ধতা প্রবল হয়েছে; সমাজের অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরে, বিশেষ করে লোকসাহিত্যের আকারে, সেই অন্ধ দেহাসক্তি প্রকাশ পেয়েছে সহজিয়া কবিকর্মের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, চৈতন্য-ভাবৈতিহ্যের বিনষ্টি-যুগে জাত এই সাহিত্যের রচনা বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের দ্বারা হয়নি। ইনি নব-রসের রসিক 'নবীন' চণ্ডীদাস। বৈষ্ণব কাব্যে বৈষ্ণব ভাবানুভূতির ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে এঁদের নূতন রচনা-প্রবাহে।

ইতিহাসের পরিসমাপ্তি

একাদশ অধ্যায়
চৈতন্য-উত্তর মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো চৈতন্য-উত্তর মঙ্গলকাব্যও মহাপ্রভুর জীবন-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আগে দেখেছি, মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। সেখানে বিভিন্ন লোক-দেবতাদির মধ্যে রেষারেষির ভাবটাই ছিল প্রধান। কিন্তু মহাপ্রভুর অহেতুক প্রেমসাধনার সামাজিক প্রভাবসূত্রে মঙ্গলসাহিত্যে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, সহজ সহনশীলতা ক্রমশ আন্তরিক প্রীতি-ভক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যে, এমন কি মনসামঙ্গলেরও অনেক কাব্যে, দেবতার অমিতচারী শক্তির সামনে মানুষকে নিতান্ত অসহায়, কৃপাভিক্ষু রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু চৈতন্য-উত্তর যুগে মানুষ তার মানবিক শক্তি ও সাহসের বলে মনে মনে অজেয় হয়ে উঠেছে, দেবতার হাতে অকারণ লাঞ্ছনা তার প্রতিরোধে[illegible] শিথিল হ[illegible]য়েছে। ফল কথা, সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে কল্পিত মঙ্গলসাহিত্য চৈতন্য-চেতনার ভাবস্পর্শে নূতন মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই একই মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে অতঃপর এই যুগ-স্বভাবের সাধারণ শিল্প-প্রকাশই লক্ষ করব।

চৈতন্যোত্তর মঙ্গল-কাব্যের বিশিষ্টতা

১। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গল

চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম উল্লেখ্য কবি ষষ্ঠীবর দত্ত। এঁর বাড়ি ছিল শ্রীহট্টের গয়গড় গ্রামে ; কবি ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে ছিল; ছেলে ছিল না একটিও। মহাভারত রচয়িতা ষষ্ঠীবর সেনের সঙ্গে এক সময়ে এঁকে ভুল করে অভিন্ন কবি মনে করা হয়েছিল। আসলে এঁরা দুই পৃথক কবি।

ষষ্ঠীবর দত্ত

ষষ্ঠীবরের পরেই মনসামঙ্গলের উল্লেখ্য কবি ছিলেন বংশীদাস। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিও ইনি। আবার মৈমনসিংহের রামায়ণ-কবি, 'মহিলা কৃত্তিবাস', চন্দ্রাবতী ছিলেন এঁরই কন্যা। পিতৃ পরিচয় দিয়ে চন্দ্রাবতী বলেছেন,—

বংশীদাস

"ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বয়ে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।।
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালাব ঘরে ছনের ছাউনি।।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।।
দ্বিজ বংশী পুত্র হইলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।।"

বংশীদাস তাঁর পিতার চেয়েও দরিদ্র ছিলেন, অধিকতর মনসা-প্রীতির জন্যই কি না কে জানে। পিতার দারিদ্র্য চিত্রিত করে চন্দ্রাবতী লিখেছিলেন,—

"ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।।"

কেবল মনসামঙ্গল রচনা নয়, আসরে তা গান করাই ছিল বংশীদাসের প্রধান জীবিকা।

কবি-পরিচয়

চৈতন্যধর্মের প্রবর্তনায় দেবনাম কীর্তনের রীতি সারা বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়েছিল। কেবল 'হরিনাম' নয়. সেই সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি মঙ্গলকাব্যসমূহও আসরে গীত হত। মনসামঙ্গলের এইরূপ কীর্তনই ছিল দ্বিজবংশীর পেশা।

রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী পরিমিতিবোধের দ্বারা সহজে নিয়মিত হয়েছিল। তাই তাঁর রচনার সুষমা ছিল স্বতোভাস্বর। দ্বিজবংশীর কণ্ঠও ছিল মধুস্বাদী। এ-বিষয়ে বিস্ময়কর লোক-প্রবাদ রয়েছে। এব বার 'মনসার ভাসান' গাইতে যাওয়ার পথে বর্ষার জল-থইথই হাওরে ভয়ানক দস্যু কেনারামের হাতে ধরা পড়েছিলেন কবি। মৃত্যুর আগে ডাকাতের কাছে তিনি শেষবারের মতো ভাসান গাইবার সুযোগ প্রার্থনা করেন। সেই অন্তিম পরিবেশে কবিকণ্ঠে উৎসারিত বেহুলার বেদনা-সংগীত দস্যুর চিত্তকেও বিগলিত করে তুলেছিল; হাত থেকে তাব তরবারি খসে পড়ে, চোখে ঝরেছিল জল। বাকি জীবন কেনারাম নাকি কবির দলের সেবক হয়ে অতিবাহিত করে।

বংশীদাসের লেখা বেহুলার ব্যথার্তির একটি ছবি :—

"নিরখি নিরখি কান্দে চন্দ্রমুখী,
বসি ত্রিবেণীর ঘাটে।
ত্রিবেণীর চর দেখি লাগে ডর
ঠেকিল ঘোর সংকটে।
চান্দর কোঙর প্রভু লক্ষ্মীধর,
দেহ হে উত্তর মোরে।
আমি অভাগিনী কিছুই না জানি,
ভাসিলু একা সাগরে।।"

কবি-স্বভাব

দ্বিজবংশী সপ্তদশ শতকের কবি ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গল কাব্য রচনার গৌরব ছিল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের। পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম বাংলায় মনসামঙ্গল রচনার তৎপরতা কম ছিল। তাব

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

পেছনে কারণও ছিল বলে মনে করা হয়। পূর্ববঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গ অত জলাকীর্ণ নয় ; সর্প-ভীতিও পূর্ববঙ্গের মতো এ অঞ্চলে তত প্রবল ছিল না। সে যাই হোক, ক্ষেমানন্দের কবি-কর্ম এ অঞ্চলে উল্লেখ্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি কৌতুককর কাহিনী বলেছেন :— তাঁর মূল বাড়ি নাকি ছিল বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে। নানা অশান্তির দরুন তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়; তাতে বাল্যশিক্ষারও বিভ্রাট ঘটে। অবশেষে রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্লের কাছে তিনখানি গ্রাম তিনি দান হিশেবে লাভ করেন। সেখানেই এক সন্ধ্যায় খড়বনে মুচিনী-বেশে মনসা তাঁকে দেখা দেন, এবং কাব্য-রচনায় প্রবুদ্ধ করেন। কবির নির্দেশ অনুসারে এই ঘটনার সময় ১৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দ ; তাঁর গ্রন্থ রচনার সমাপ্তির কাল স্বভাবতই আরো কিছু পরে । মনসাকে কবি বারে বারে 'কেতকা' নামে অভিহিত করেছেন,—"কেয়াপাতে জন্ম লৈলা কেতুকা সুন্দরী।" তাই নিজেও আত্মপরিচয় দিয়েছেন কেতকাদাস বলে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর পরিবেশ-সচেতনতা ও ব্যাপক কৌতূহল। বেহুলার স্বর্গ-যাত্রার পথ বর্ণনা করে ২২টি ঘাটের নাম দিয়েছেন কবি ; তার মধ্যে চৌদ্দটি এখনও রয়েছে,—দামোদর, বাঁকা নদী ও বেহুলা নদীর দুই তীরে। মধ্য যুগের বাঙালির পক্ষে এই ভৌগোলিক জ্ঞান অনেকটাই বিস্ময়কর। দেব-সভায় বেহুলার নৃত্যের প্রসঙ্গে কবি প্রাচীন নটীনৃত্যের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর রচনায় চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনার প্রভাবও যথেষ্ট।

ক্ষেমানন্দ

ক্ষেমানন্দ নামে আর একজন কবির মনসামঙ্গলের পুথি পাওয়া গেছে মানভূম অঞ্চলে। তাতে ঐ অঞ্চলের ভাষার ছাপও রয়েছে। কাব্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, রচনাগুণও উল্লেখ্য নয়।

কবি সীতাদাস

সীতারাম নামে পশ্চিমবঙ্গের আর একজন কবি মনসামঙ্গল লিখে আসলে রাঢ়ের দেবতা ধর্মঠাকুরের জয়গান করেছেন। সীতারাম ধর্মমঙ্গলের কবি রূপেও পরিচিত। মনসামঙ্গলে তিনি মনসাকে দিয়ে ধর্মের পূজা করিয়েছেন।

জীবন মৈত্র

বগুড়া জেলার কবি জীবন মৈত্র তাঁর রচনায় প্রচলিত মনসা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের সর্প পূজার উপাখ্যান যুক্ত করে গল্পের বিচিত্রতা সম্পাদন করেছেন। কবির পিতার নাম ছিল অনন্ত মৈত্র ; মা ছিলেন স্বর্ণমালা। নাটোরের রানী ভবানীর ছেলে রামকৃষ্ণের প্রজা ছিলেন এই কবি ; জনসাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল 'পাগলা জীবন' নামে। চৈতন্য-চেতনার বিনষ্টি কালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে বিচিত্রতা ও অভিনবতার যে আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল, মনসামঙ্গলের ইতিহাসে জীবন মৈত্রের কাব্য তার উৎকৃষ্ট নির্দশন।

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চৈতন্যোত্তর চণ্ডীমঙ্গল

চৈতন্যের পূর্ব ও পরবর্তী বাংলায় মনসামঙ্গলের রচনা চলেছিল প্রায় অবাধিত ধারায়। চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য এবং কবি-সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম , যদিও শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কবির মর্যাদার অধিকারী চণ্ডীমঙ্গলেরই রচয়িতা একজন,— কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। একদিক থেকে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গলের ভূমিকা অনেকটা অতুল্য। অনুমান করা হয়, প্রাচীন পাঁচালি থেকেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি। অর্থাৎ তুর্কি আক্রমণের পূর্বকালেও লৌকিক মঙ্গল দেবতাদের পূজা বহুদিন থেকে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। সেদিনকার অর্ধ বা অল্পশিক্ষিত ভক্তগণ পাঁচালির অপূর্ণ-গঠিত কাব্যাধারে দেবতাদের বন্দনা করেছিলেন। সেই দুর্বল শিল্পকর্মকে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে নবরূপায়িত করে মঙ্গলকাব্যের জন্ম হয়। এই ঐতিহাসিক সম্ভাবনার কথা জানা থাকলেও প্রাচীন পাঁচালির আকৃতি ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অনেকটাই দুর্লভ। অনেক দিনই তার কোনো পুথি পাওয়া যায়নি। চণ্ডীমঙ্গলের সাহিত্যে কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট পাঁচালির পরিচয় আছে। এই সব কাব্য বহুলত অর্বাচীন কালের রচনা হলেও প্রাচীন পাঁচালির স্বতন্ত্র আঙ্গিকটি তাতে আভাসিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

চণ্ডীর পাঁচালি

দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডী-পাঁচালি এ বিষয়ের এক উল্লেখ্য রচনা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন জনার্দনের পাঁচালিকে প্রায় আড়াইশ' বছরের পুরানো,অর্থাৎ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রচনা বলে অনুমান করেছিলেন। একালের পণ্ডিতেরা কাব্যটির অত প্রাচীনতার দাবি অস্বীকার করেছেন। তাহলেও পাঁচালি-কাব্যের স্বতন্ত্র রূপটি

নিঃসন্দেহে এতে ধরা পড়েছে।

অন্য পক্ষে পূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সফল শিল্পী হিশেবে প্রথমে উল্লেখ্য কবি দ্বিজ মাধব। দ্বিজ মাধবের কাব্যের অনেক পুথিতে কবির যে আত্মপরিচয় আছে, তাতে জানা যায়, আকবরের শাসনকালে সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল; পিতার নাম ছিল পরাশর। কিন্তু এখন পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করেছেন, এ পরিচয় 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের কবি দ্বিজ মাধবের ওপরে চেপে গেছে। সে যাই হোক, এ কথা ঠিক যে, কবির কাব্যের নাম ছিল 'সারদাচরিত'; 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামও পাওয়া গেছে।

কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন,—

দ্বিজমাধব

"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় শারদা চরিত ॥"

অর্থাৎ ১৫০১ শক,—তথা ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাধবের 'সারদা চরিত' রচনা শেষ হয়েছিল। এই কাব্যের অধিকাংশ পুথি পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেছে। মনে হয়, কবি চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন; সেখানেই তাঁর কাব্য রচিত হয়ে থাকবে।

দ্বিজ মাধবের কবি-স্বভাবের পরিচয় দিয়ে ড দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন,—"ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ কবিত্ব বিকাশ পায়। কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটির বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়া কাঁথা, মাংসের পসরা ও ভেরাণ্ডার থামই বর্ণনীয় বিষয়। ......

কাব্য-স্বভাব

মাধু যে কার্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষমতা তাঁহার বেশ ছিল,—'দুলি পেলি খেলী এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে। মৃগচর্ম পরিধান, দুর্গন্ধ শরীরে ॥' প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়, মাধু ভেরাণ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের ঘরে উঁকি মারিয়া নিজে এই সকল দেখিয়াছেন ; সেখানে ব্যাধ-রূপসীগণের অর্ধাবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ্য করিয়াও ভদ্র কবি তাহাদের গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তাহা মার্জিত করিয়া সুন্দর করিতে যান নাই।"

মাধবাচার্যের কবি-প্রতিভার এর চেয়ে যথার্থ পরিচয় দান অসম্ভব। চণ্ডীমঙ্গলে, তথা মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে এঁর রচনার তুলনা করা হয়। বাস্তব জীবনকে তার ভাল-মন্দ, সম্পদ ও দীনতার সকল খুঁটিনাটি সহ এঁরা দুজনেই প্রত্যক্ষ করেছেন ; দুজনেই ছিলেন তাঁরা বাস্তবের কবি। কিন্তু মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের প্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীর। বস্তুর স্থূল রূপকে তিনি কল্পনার রং দিয়ে সূক্ষ্ম লাবণ্যময় করেছেন, অথচ তার বাস্তব মূল্যকে আচ্ছন্ন হতে দেন নি। অন্যদিকে মাধবাচার্যের শিল্প প্রথম শ্রেণীর প্রতিবিম্ব-রচয়িতার ; তাঁর কবি-মন ছিল যেন সঠিক ফটো-তোলার এক ক্যামেরা ; বস্তুর হুবহু প্রতিরূপটি সেখানে ধৃত হয়ে আছে যথোচিত ভাষার ফ্রেম-এ। দীনেশচন্দ্রের কথাই ঠিক—মাধু-কবি তাঁর কাব্যে "গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন।"

কিন্তু কবির এই অনন্যচিত্ত বাস্তব-অনুরাগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে চৈতন্য-চেতনা-প্রবুদ্ধ বৈষ্ণব ভাবুকতা। মূল গল্পের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মুখবন্ধ হিশেবে কবি একটি-দুটি ছত্রের 'ধুয়া' রচনা

কাব্যরূপ

করেছেন। প্রত্যেকটি উপাখ্যানের মূল ভাব ঐ ধুয়ার মধ্যে আভাসে ব্যঞ্জিত। আর গল্প-ভাবের সেই কাব্যিক ব্যঞ্জনা রচনা করতে কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কথাকে প্রায় একমাত্র অবলম্বন করেছিলেন। মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত না হয়েও রাধা-কৃষ্ণলীলা আস্বাদনের এই লুব্ধতা কবির চৈতন্য-নিষ্ঠার পরিচয়বহ—

"কাল ভ্রমরা, যথা মধু তথা চলি যাও
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও।।
সে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কেঁও লোকে শুনে পাছে।।
চরণ-কমলে শত জানাইও প্রণাম।
অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম।।"

মুকুন্দদাস

চণ্ডীমঙ্গল, তথা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। মোটামুটি ষোড়শ শতকের একেবারে শেষভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়া এমন কী, কবির সঠিক নামটি সম্পর্কেও এক সময়ে দ্বিতীয় ভাবনা দেখা দেয়। মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের পরিচিত প্রায় সকল পুথিতেই ভণিতাংশে যেখানেই কবির নাম আছে, সর্বত্রই সেখানে 'মুকুন্দ' দেখা যায় , মুকুন্দরাম নয়। তাই মনে করা হয়েছে, মুকুন্দই কবির নাম ছিল, 'মুকুন্দরাম' নয়। কিন্তু ওই নামই আবহমান প্রচলিত আছে; এমন কী অব্যবহিত পরবর্তী কালের একটি ধর্মমঙ্গল পুথিতেও কটাক্ষভঙ্গে ওই নামই ব্যবহৃত। এক্ষেত্রে 'মুকুন্দ' এবং 'মুকুন্দরাম' উভয় নামই গ্রাহ্য হতে বাধা নেই।

কবির নিজের জীবন-কথা তাঁর কাব্যের মানবিক আবেদনকে বহুল পরিমাণে বর্ধিত করেছে। বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামে ছিল তাঁর পৈতৃক বাসভূমি। আকবরের রাজত্বকালে মানসিংহ যখন 'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' তখন ঐ অঞ্চলে ডিহিদার ছিলেন মামুদ সরিপ। তাঁর অত্যাচারে "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব" সুজনেরা অতিষ্ঠ হয়েছিলেন ; অনেককে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। ভয়-ত্রস্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীও সপরিবারে হাঁটা-পথে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ পেরিয়ে অবশেষে কবি 'কুচট্যা নগরে' এসে উপস্থিত হন। সেখানে,—

কবি-জীবনী

"তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ।।"

স্বপ্নেই কবিকে দেবী মহামন্ত্র দান করেছিলেন, আর আদেশ করেছিলেন চণ্ডীকাব্য রচনা করতে। এর পরে তিনি মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামে গিয়ে সেখানকার ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে আশ্রয়লাভ করেন। সেখানেই 'রাজা' রঘুনাথ-এর সভাকবিরূপে মুকুন্দরাম তাঁর কাব্য রচনা করেন। ভণিতাংশে কবি নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছিলেন:—

"মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।"

অর্থাৎ, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র হৃদয় মিশ্র ছিলেন তাঁর পিতা ; আর কবিচন্দ্র ছিলেন 'অগ্রজ ভাই'। তাছাড়া আর এক ধরনের ভণিতা থেকে জানা যায়, —কবির এক ছেলে এবং এক মেয়ে ছিলেন---যথাক্রমে শিবরাম ও যশোদা। তাঁর পুত্রবধূর নাম ছিল চিত্রলেখা; জামাতা ছিলেন মহেশ।

মুকুন্দ-কবির ভাব-কল্পনা চৈতন্য-ভক্তিবশে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কাব্যারম্ভে তিনি চৈতন্য-বন্দনা করে বলেন :—

"অবনীতে অবতরি চৈতন্য রূপেতে হরি,
বন্দিব সন্ন্যাসী চূড়ামণি।
কবি স্বভাব
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ-কন্দ
মুকতির দেখাল্য সরণি।।"

চৈতন্য-কৃপায় উদ্বোধিত মানুষের জীবন্মুক্তির অনুভব কবি-মনকে প্রভাবিত করেছিল, এবং তার ফলে মুকুন্দরামের সমগ্র কাব্যে মানুষের জীবনের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের পরিমাপ মধ্যযুগীয় অপরাপর কাব্যের তুলনায় অসাধারণ। জীবনেব নিছক আলোকময় মুহূর্তগুলিকেই কবি একত্র করেন নি। সুখে অথবা দুঃখে, সম্পদে এবং দীনতায়, যে জীবন একান্ত পরিচিত, তাবই জীবন্ত ছবি এঁকেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। কেবল কাব্য-সাহিত্যের নয়, মধ্যযুগের বাঙালি জাতির ইতিহাসেও মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' এক অতুল্য গ্রন্থ। কালকেতুর ব্যাধ-জীবন থেকে আরম্ভ করে তার রাজৈশ্বর্য লাভের কাহিনীটি তিনি খুটিনাটি সহ উপস্থিত করেছেন ; কিন্তু তাঁর কবি-দৃষ্টি কখনোই কোনো একক জীবনেব সীমায় বাঁধা পড়ে ছিল না। কালকেতুর নগব নির্মাণের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি সেকালেব বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দুসমাজেব একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইতিহাসের দিক থেকে সে জীবন-চিত্র যেমন সামগ্রিক, সাহিত্যের বিচারে তেমনি জীবন্ত। গুজরাট নগরে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক থেকে নব-শাখ, তৎকালীন অস্পৃশ্য হিন্দু—এমনকি মুসলমানদেরও অবস্থান, স্বভাব-ধর্ম, ও জীবিকাচরণের একটি করে স্বয়ম্পূর্ণ চিত্র তিনি গড়ে তুলেছেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য সমাজধর্মের বিবৃতি দিয়ে মুকুন্দ লিখেছেন,—

"মৎস্য বেচে চষে চাষ বৈসে দুই জাতি দাস,
কলুরা নগবে পাতে ঘানী।
বাইতি নিবসে পুরে, নানা জাতি বাদ্য করে,
পুরে ভ্রমে মঞ্জুবী বিকিনী।।
বাগদি নিবসে পুরে, নানা অস্ত্র ধরি করে,
কাব্য-কীর্তি
দশ বিশ পাইক কবি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনে মাছ মারে,
কোচগণ বইসে নানা রঙ্গে।।
নগর করিয়া শোভা, বসিল অনেক ধোবা,
দড়ায় শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সীয়ে বেড়ন করিয়া জীয়ে,
গুজরাটে বৈসে একপাশে।।"..

মুসলমান সমাজের প্রতিদিনকার আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে কবি বলেন :—

"ফজর সময়ে উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটি,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলি মিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগাম্বরে,
* * *
বড়ই দানিস-বন্দ, কাহাকেও না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।।"

আসল কথা, মুকুন্দ চক্রবর্তী ছিলেন মধ্যযুগের বহুদর্শী কবি। রাজনৈতিক দুর্যোগের আঘাতে তাঁকে বাস্তুত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর দুঃখ-দুর্ভাগ্যকে নিয়ে পথ চলেছেন তিনি দীর্ঘদিন। পরে একদিন আবার সুখের মুখও দেখেছিলেন। সুখ-দুঃখের সঙ্গে সমান মিতালি ছিল তাঁর, তাই কোনোটিকেই অতিমূল্যে ফাঁপিয়ে তোলেন নি। সুখে-দুঃখে বন্ধুর জীবনপথে নিত্যকালের বাঙালির অভিযাত্রার ঐতিহাসিক ছকটিকে যেন চিরকালের মতো রসরূপ দিয়েছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এই কবি-কর্মের পরিচয় উদ্ধার করে বলেছেন,— "Its most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are super-human and miraculous, but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelty which has no parallel in the range of Bengali literature." মুকুন্দ-কবির কাব্যের এর চেয়ে সত্য পরিচয় উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। কেবল কালকেতু-ফুল্লরার গল্পেই নয়, ধনপতি-খুল্লনার উপাখ্যানেও তাঁর শিল্পি-সুলভ দূরদর্শনের সঙ্গে ঐতিহাসিকোচিত বিশ্বস্ততার মিলন ঘটেছে। একটি অখণ্ড জাতির জীবন-ঐতিহ্যকে নিত্যকালের রস-লোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যিনি,—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বাঙালি জীবনের সেই স্মরণীয় কবি।

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

'অভয়ামঙ্গল' নামে আর একখানি নূতন কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে; নবীন কবির নাম রামদেব। অনুমান করা হয়েছে ১৫৭১ শক — তথা ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। এই কাব্যের কাহিনী, বর্ণন-ভঙ্গী এবং ভাষাগত উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আলোচ্য কাব্যের বহুলাংশই দ্বিজ মাধবের 'সারদাচরিত'-এর অনুকরণ। কাব্যের পুথি মিলেছে চট্টগ্রামে, কবিও ঐ অঞ্চলের বলেই মনে হয়। সব কিছু মিলে দ্বিজ রামদেবের কবি-কর্মের মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা অসম্ভব নয়।

দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল (?)

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পরে রচিত অধিকাংশ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই তাঁর রচনার প্রভাব রয়েছে। এই সময়কার কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য একজন ছিলেন দ্বিজ হরিরাম। অনুমান করা হয়, দক্ষিণ রাঢ়ের সীমান্তে চিতু... বরদার সর্দার শোভাসিংহের আশ্রয়ে থেকে এই কবি কাব্য রচনা করেন।

দ্বিজ হরিরাম

চট্টগ্রামের চণ্ডীমঙ্গল-কবি মুক্তারাম সেন জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। তাঁর পিতার নাম ছিল মধুরাম—কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'; মোটামুটি রচনাকাল অষ্টাদশ শতক। ইনি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় কেবল কালকেতুর উপাখ্যানই রচনা করেছিলেন। ধনপতি-কাহিনী তাঁর কাব্যে পরিত্যক্ত।

মুক্তারাম সেন

রামানন্দ যতির কাব্যের উল্লেখ্য উৎকর্ষ কিছু নেই ; কেবল তাঁর আত্মাদরের ছবিটি কৌতুকপ্রদ। কাব্য মধ্যে নিজের রচনার সঙ্গে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনার তুলনা করে নিজেকে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

রামানন্দ যতি

লালা জয়নারায়ণ দেব তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রচলিত কাহিনী দুটি ছাড়াও তৃতীয় একটি গল্পের অবতারণা করেছেন ; সেটি 'ক্রিয়াযোগসার' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে গৃহীত। কবি বিক্রমপুরের বৈদ্য-বংশজ ছিলেন।

জয়নারায়ণ দেব

৩। দুর্গামঙ্গল কাব্য

দুর্গামঙ্গল কাব্য আসলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারারই নূতন পরিণতি। আগে বলেছি, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চৈতন্য-চেতনার বিনষ্টির সময়ে বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাতেই জীবন-বোধের ঘনিষ্ঠতা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সেই অভাব পূরণের জন্য তখন একদিকে পরিহাস-লঘুতা বা ডিটেকটিভ-কমিক রচনা, অন্যদিকে কৌতুকজনক গল্প-বিচিত্রতা সৃষ্টির চেষ্টা ব্যাপক হয়েছিল। নূতন গল্পের রসদ জোগাতে অনেক সময়ে সংস্কৃত পুরাণ-কথার আশ্রয় নেওয়া হয়েছ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে এইরূপ প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দুর্গামঙ্গল কাব্য। আগে দেখেছি, লালা জয়নারায়ণের মতো কবি লৌকিক চণ্ডী-ক'হিনীর সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য-কথার যোগ সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই চেষ্টার ক্রমিক পরিণতিতে লৌকিক চণ্ডীকাব্যের পরিবর্তে আগাগোড়া পুরাণ-কাহিনী নিয়ে পৌরাণিক দেবী দুর্গার মঙ্গলকাব্য রচিত হতে লাগল।

কাব্য-পরিচয়

আগে বলেছি, চৈতন্যোত্তর যুগে লৌকিক চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী, তথা দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন। দুর্গার এই চণ্ডীরূপের মহিমা কীর্তিত হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি উপাখ্যানে। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' নামে সে রচনা সুপ্রসিদ্ধ ; দুর্গাপূজার সময়ে বঙ্গদেশে এই সংস্কৃত চণ্ডীকাব্য নিত্য পঠিত হয়। বাংলা দুর্গামঙ্গলকাব্যসমূহ প্রধানভাবে এই কাব্যেরই বঙ্গানুবাদ।

সপ্তদশ শতকে রচিত অনুরূপ একটি বাংলা কাব্যের নাম 'চণ্ডিকা বিজয়' ; কবির নাম দ্বিজ কমললোচন। এই রচনার সঙ্গে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল ধারার কোনো যোগ নেই ; আগাগোড়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আখ্যায়িকা নিয়ে কাব্যটি গঠিত। কবি 'দিল্লীশ্বরসুত' অর্থাৎ শাহ সুজার শাসনাধিকারে বাস করতেন বলে জানিয়েছেন। কাব্যটি হয়ত ঐ সময়ে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.) রচিত হয়েছিল। কবির বাড়ি ছিল অধুনাতন বাংলাদেশের রংপুর জেলায়; পিতার নাম ছিল যদুনাথ। কাব্যের মধ্যে পিতা যদুনাথের ভণিতাও আছে স্থানে স্থানে। কাব্যটি যৌথ রচনা কি না বলা কঠিন। রচনায় ভক্তিমূলক আবেগ আছে ; কিন্তু কাব্যিক উৎকর্ষ নেই।

কমললোচন

আলোচ্য শতকে দুর্গামঙ্গল কাব্যের আর একজন উল্লেখ্য রচয়িতা ছিলেন ভবানীপ্রসাদ রায়। কবির পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়, কুলগত উপাধি 'কর'; জাতিতে এঁরা ছিলেন বৈদ্য। মৈমনসিংহের কাঁটালিয়া গ্রামে কবির বাড়ি ছিল। শৈশবেই তিনি মা-বাপকে হারিয়েছিলেন; তাঁর উপরে ছিলেন জন্মান্ধ। এই দুর্ভাগ্যের বেদনা কাব্যের আত্মকথা অংশে করুণাবহ রূপে বিবৃত হয়েছে। স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদও প্রশংসনীয়।

ভবানীপ্রসাদ রায়

রূপনারায়ণ ঘোষ দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে। এঁর বাড়িও ছিল মৈমনসিংহ জেলায় আদাবাড়ি গ্রামে। কবি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফলে তাঁর কাব্যের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে সংস্কৃত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে। তা ছাড়া কিছু কিছু অংশ তিনি ব্রজবুলি ভাষাতেও রচনা করেছিলেন।

রূপনারায়ণ ঘোষ

'অভয়ামঙ্গল'-এর রচয়িতা রামশংকর দেব অষ্টাদশ শতকের কবি ছিলেন, তাঁর বাড়ি ছিল হুগলি জেলায়। চণ্ডীকাব্য ও রামায়ণের কবি রামানন্দ যতি ছিলেন এঁর গুরু। "গৌতম-পুত্র শতানন্দের আগমশাস্ত্র এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন" করে রামশংকর তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

রামশংকর দেব

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ছিলেন মূলত ফুলিয়ার মুখুটি বংশজাত। তাঁর পিতা বীরভূমে বাস পরিবর্তন করেছিলেন। গঙ্গানারায়ণের 'ভবানীমঙ্গল'-এব কাহিনীতে অভিনবতা আছে। পুরাণ-কথার অনুসরণ করে উমার জন্ম থেকে আগাগোড়া দেবী-লীলা এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণলীলারও বর্ণনা করেছেন কবি। কাব্যিক উৎকর্ষ তাতে বাড়ে নি ; কিন্তু গল্পবর্ণনায় বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ

৪। ধর্মমঙ্গল কাব্য

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো ধর্মমঙ্গলকাব্যেরও প্রথম উদ্ভব তুর্কি আক্রমণোত্তর মধ্যযুগে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। আগে দেখেছি, এই কাব্যধারাব আদিকবি রূপে ময়ূর ভট্ট বন্দিত হয়ে আসছেন। তা হলেও ধর্মমঙ্গলকাব্যের যত পুথি এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার কোনোটিরই মূল রচনাকাল ষোড়শ শতকের আগে বলে অনুমানও করা চলে না। প্রায় সব ক'খানাই সপ্তদশ শতক বা তার পরের রচনা। পুথিগুলিও কিছু প্রাচীন নয়। তা ছাড়া এই কাব্যধারায় শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের রচনাকাল অষ্টাদশ শতকে। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এই সব দিক থেকে ধর্মমঙ্গলের তফাত মৌলিক। সবচেয়ে বড় তফাত হচ্ছে কাব্যকাহিনীর বসাবেদনে। আগে দেখেছি, চণ্ডী ও মনসামঙ্গল সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচিত হলেও ক্রমশ বাঙালিব সমাজ ও পরিবার-বন্ধনের মৃ. ভূমি থেকে রস আহরণ করে জীবন রসে নিবিড় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে অনুভূতির গভীরতা এবং জীবনবোধের স্পর্শকাতবতা আলোচ্য দুটি কাব্যধারাকেই মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলকাব্যে চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের এই সহজ স্পর্শাতুরতা দুর্লভ . ডিটেক্‌টিভ গল্পের উত্তেজনা, কৌতুক এবং কৌতূহলই ধর্মমঙ্গলেব সাধারণ রস-উৎস। এই স্বাতন্ত্র্যেব মূলে ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রভাবও অবশ্য খুব কম ছিল না। আগে দেখেছি, চৈতন্য-পূর্ব মধ্যযুগেই চণ্ডী এবং মনসা পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চকোটির হিন্দু সমাজে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। ফলে, শিক্ষিত পরিমার্জিত অভিজাত হিন্দু কবি-প্রতিভার স্পর্শে ঐসব লৌকিক কাহিনী বিদগ্ধতাপূর্ণ রসব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু রাঢ়ের যে-সব অঞ্চলে মুখ্যত শিক্ষাসংস্কৃতি-দুর্বল তথাকথিত অন্ত্যজ জীবনের সীমায় ধর্মপূজার প্রচলন ঘটেছিল, সেখানে হিন্দু-সংস্কৃতিব এধরনের বিমিশ্রতা সাধিত হতে প নি। সমাজের তথাকথিত উচ্চ কোটিতে ধর্মপূজা দীর্ঘদিন নিন্দনীয় ছিল। এমন কি সপ্তদশ শতকেও কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনার অপরাধে সমাজে পতিত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায়, আভিজাত্যদীপ্ত সূক্ষ্ম মানসিকতার সান্নিধ্যলাভ ধর্মমঙ্গলের ভাগ্য ঘটেনি; ফলে অনুভব গভীরতার স্পর্শ এই শ্রেণীর রচনায় সুলভ নয়। অন্য আর এক দিক থেকে এই ক্ষতির পরিপূরণ ঘটেছে। রাঢ়ের তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজের মধ্যে যে জীবনসংগ্রাম, যুযুৎসা এবং প্রবল শক্তির প্রখরতা রয়েছে, তাকেই পাথরেব মূর্তির মতো কঠিন ঋজুতায় বেঁধে তুলেছে ধর্মমঙ্গলের কাব্যকথা। এইসব রচনার ভাষায় অ লংকারিক উজ্জ্বলতা প্রায়ই অনুপস্থিত। অথচ, তার বদলে অমিশ্র সত্য-কথনের আদিম উদাত্ততার অভাব নেই কোথাও। চণ্ডী এবং মনসামঙ্গলের প্রেমস্নিগ্ধতার পরিবর্তে ধর্মমঙ্গল কাব্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে বলিষ্ঠ জীবন সংগ্রামের আদিমতাধর্মী কঠিন দৃঢ়তা।

ধর্মমঙ্গলেব
স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য

ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম যে কাব্যের সন্ধান জানা গেছে, তার লেখক ছিলেন কবি খেলারাম। এঁর কাব্য ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু কাব্যের কোনো অখণ্ড পুথি পাওয়া যায়নি।

খেলারাম

প্রাচীনতম যে কবির ধর্মমঙ্গলের পুথি পাওয়া গেছে, তিনি রূপরাম চক্রবর্তী। এঁর কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত কোনো সময়ে রূপরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন। বর্ধমানের কায়তি শ্রীরামপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়; তাঁর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর টোলে অনেক ছাত্র পড়ত। কিন্তু এমন পণ্ডিতের ছেলে হয়েও কবির ভাগ্যে যথেষ্ট বিদ্যালাভ ঘটেনি। লেখাপড়ায় তিনি খুব অমনোযোগী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে কবির অগ্রজ রত্নেশ্বর টোলের অধ্যাপক হন। অমনোযোগিতার জন্য তিনি কবিকে খুব তিরস্কার করেন ; ফলে রূপরাম গৃহত্যাগ করে যান। অন্যান্য আরও অনেক জায়গায় বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়েও তিনি বারে বারেই ফিরে আসেন। একবার গুরুগৃহ থেকে এইরূপ স্বেচ্ছা-বিদায় নিয়ে ফিরে আসবার পথে ধর্মঠাকুর কবিকে দেখা দেন। ঠাকুরের এই সময়কার আদেশ শিরোধার্য করেই রূপরাম পরে কাব্য রচনায় বৃত হয়েছিলেন। গোপভূমের রাজা গণেশ তাঁর কবি-কর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আগে বলেছি, ধর্মমঙ্গল রচনা ও ধর্মপূজা করার অপরাধে রূপরাম নিজের সমাজে পতিত হয়েছিলেন।

রূপরাম চক্রবর্তী

রূপরামের ধর্মমঙ্গল মোটামুটি সবল, সাবলীল ভাষায় লেখা। কিছু কিছু জায়গায় কবির সংস্কৃত-প্রীতির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে; তৎসম শব্দের প্রয়োগে ও বাচন-ভঙ্গিতে। রূপরামের কবিকর্মে প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ দুর্লভ, যদিও অনেকে তাঁকেই ধর্মমঙ্গলের সমৃদ্ধিমান কবি বলে মনে করেন।

শ্যামপণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে ; লিপিকাল ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যের বর্ণনাংশে বীরভূম অঞ্চলের পরিবেশ প্রভাব লক্ষিত হয় ; এই কাব্যের প্রচলনও বীরভূমেই দেখা যায়। কবি এই জেলার লোক ছিলেন মনে হয়। সাধারণত ধর্মঠাকুরের পুরোহিতেরাই পণ্ডিত উপাধি ব্যবহার করতেন; কবি হয়ত ধর্মপূজক ছিলেন।

শ্যামপণ্ডিত

রামদাস আদকের ধর্ম-কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'; রচনাকাল ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ। কবির পিতার নাম ছিল রঘু, জাতিতে এঁরা কৈবর্ত ছিলেন; নিবাস ছিল বর্ধমানের হায়াৎপুর গ্রামে।

রামদাস আদক

সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গলের একজন প্রতিষ্ঠাবান কবি ছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাস গ্রামে মামার বাড়িতে এঁর জন্ম হয়েছিল ; নিজের বাড়ি ছিল সুখসায়েরে। কবির পিতার নাম দেবীদাস, জাতিতে এঁরা কায়স্থ ছিলেন। গৃহদেবতা গজ-লক্ষ্মীমার স্বপ্নাদেশ পেয়ে সীতারাম কাব্য-রচনায় বৃত হয়েছিলেন। রচনাকাল ১৬৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দ। প্রাঞ্জল সরলতাই ছিল সীতারামের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ইনি একখানি মনসামঙ্গল কাব্যও লিখেছিলেন।

সীতারাম দাস

অষ্টাদশ শতকের প্রথম স্মরণীয় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ; ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিও তিনিই। বর্ধমান জেলার কৈয়ড় পরগণা, কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির বাড়ি ছিল। পিতার নাম গৌরীকান্ত ; মা সীতাদেবী ছিলেন রাজবংশের কন্যা। কবি একান্ত রামভক্ত ছিলেন। "কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্"কে কাব্য-মধ্যে বারে বারে তিনি বন্দনা করেছেন। তাছাড়া নিজের চারটি ছেলেরই নাম রেখেছিলেন প্রথমে রাম নাম যোগ করে।

কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে ঘনরাম লিখেছেন,—

"সংগীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপণ।।
শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াক্ষ তিথি।
যাম সংখ্য দিনে সাঙ্গ সংগীতের পুথি।।"

কবি-শ্রেষ্ঠ ঘনরাম

অর্থাৎ, ১৬৩৩ শতকের—[১৭১১ খ্রিস্টাব্দ] ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ঘনরামের কাব্যরচনা শেষ হয়। কিন্তু পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গণনা থেকে জানা গেছে, এই বছরে শুক্লা তৃতীয়া হয়েছিল ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে। অনেকে মনে করেন, ঘনরামের কাব্য-সমাপ্তিও ঘটেছিল ঐ দিন। কবি তাঁর রচনায় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের শুভ-কামনা করেছেন। সম্ভবত ইনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ঘনরামের কবি-কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজের স্থূলতাপূর্ণ কাহিনীকে তিনি অভিজাত কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। আগে বলেছি, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর অ্যাডভেঞ্চার-ধর্মিতা ছিল অতুল্য। আর সেই দুর্লভ সম্পদের উৎস সেকালের [illegible]কায় রা[illegible] জনতার জীবন। কেবল পুরুষ নয়, ধর্মমঙ্গলের নারীচরিত্রগুলির দুঃসাহসিক সমরাভিযান ও বিস্ময়কর বীরত্বও আসলে সেকালের লোকজীবনের অন্তর্লগ্ন অমসৃণ আদিমতার পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন মুক্ত হতে পারেনি। ঘনরাম তাঁর বিদগ্ধ রুচি, পাণ্ডিত্য, ও সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের পরিমণ্ডনে 'গ্রাম্য' লোক জীবনের গাথাকে সর্বজ[illegible] কাব্যরূপ দান করেন। অশিক্ষি[illegible]-পটু, সহজ জীবন-কাহিনীতে শিল্প-রসের এই নব-সংযোজন ধর্মমঙ্গল কাব্যকে নূতন রস-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। ধর্মমঙ্গলের ইতিহাসে ঘনরাম এদিক থেকে মৌলিকতার দাবি করতে পারেন।

কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য

স্মার্ত হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যে কবির সবিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর মানসিকতায় পৌরাণিক হিন্দু ঐতিহ্যের অনুভবও সহজে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া, আরবি ফারসি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল লক্ষণীয়। ফলে, কি বাগ্‌বিন্যাসে, কি গল্প-বর্ণ[illegible], কি রুচির শা[illegible]তায়; কি শব্দ সম্পদের সমীচীনতায়, ধর্মমঙ্গল কহিনীর অপেক্ষাকৃত রুচি-দুর্বল অংশস[illegible]ও ঘনরামের রচনায় নাগরিক বিদগ্ধতায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। বাচনভঙ্গির এই দুর্লভ কলাকৌশল তাঁর রচনার বহু অংশকে লোক-প্রিয় প্রবচন রূপে আজও অমর করে রেখেছে :—

"নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হইবে বুঝি সোনায় সোহাগা।।"

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কাহিনী-বিচিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ'-এ। অনুমান করা হয়েছে ১৭৩৪ থেকে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের কোনো সময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গলের মুখ্য কাহিনী লাউসেন উপাখ্যান এতে অনুপস্থিত। হরিশচন্দ্র ও তার ছেলে লুইচন্দ্রের প্রাচীনতর গল্পটি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া উপাখ্যানের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে শিবের প্রসঙ্গ। শিব বাংলাদেশে প্রাচীনতম লোক-দেবতা। বৈদিক ও পৌরাণিক প্রাচীন দেব-কল্পনার সঙ্গে এই অনভিজাত দেবতার অভিন্নতা সম্পাদিত হয়েছিল অনায়াসে। সহদেব চক্রবর্তী শিব সম্পর্কিত সেই পৌরাণিক-অপৌরাণিক বিচিত্র কাহিনীকে একত্র জড়ো করে তাঁর কাব্যের অভিনবতা সম্পাদন করেছেন। তাতে নাথসিদ্ধা মীননাথ গোরক্ষনাথের গল্পও প্রসঙ্গত এসে পড়েছে।

অনিল পুরাণ ও সহদেব চক্রবর্তী

চৈতন্য-প্রভাবের বিনষ্টি কালে বাংলা সাহিত্যে অগভীরতার অভাব পূরণের জন্য গল্প-বৈচিত্র্য সৃষ্টির যে নূতন প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, ধর্মমঙ্গলের ইতিহাসে 'অনিলপুরাণ' তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ ছাড়া কাব্যটির উল্লেখ্য শিল্প-সম্পদ আর কিছু নেই।

নরসিংহ বসু

সরল অনাড়ম্বর ভাষায় হৃদ্য ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচনার পরিচয় দিয়েছেন কবি নরসিংহ বসু। তাঁর পিতার নাম ছিল ঘনশ্যাম। কবি বীরভূমের নবাব আসাদুল্লা, মতান্তরে আসফউল্লা খাঁর উকিল ছিলেন। একবার প্রভুর দেয় খাজনা নিয়ে মুর্শিদাবাদ যাবার পথে ধর্মঠাকুরের স্থানে তিনি এক সন্ন্যাসীর দেখা পান। ইনি তাঁকে ধর্মকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি, ওড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় নরসিংহের ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহলেও গোটা কাব্যে কোথাও তিনি অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নি। তাঁর প্রাঞ্জল ভাষা একদিক থেকে গ্রাম্যতা-দোষমুক্ত, অন্যদিকে স্বভাব-সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী। কাব্যটির রচনাকাল ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ।

মাণিক গাঙ্গুলি

মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্য রচনার কাল নিয়ে প্রবল মতভেদ আছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে কাব্যটি রচিত হয়েছিল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে। কবির পিতার নাম গদাধর, মা ছিলেন কাত্যায়নী। এঁদের বাড়ি ছিল হুগলির বেল্‌ডিহা গ্রামে। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিশেবে কবি ধর্মঠাকুরেব স্বপ্নাদেশ লাভের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের মুখ্য উপাখ্যান লাউসেন সম্পর্কিত। স্থানে স্থানে বিচিত্রতর গল্প পরিবেশনের প্রয়াসও রয়েছে।

৫। শিবায়ন কাব্য

শিবায়নেব কাব্য-স্বভাব

শিবায়ন কাবাধারাকে ঠিক মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না ; রূপ প্রকরণের দিক থেকে তো নয়ই, ভাবাদর্শের দিক থেকেও না। আগে বলেছি, তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলাদেশে ধর্মচেতনার পুনর্গঠন যখন হচ্ছিল, তখনই চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি লোক-দেবতাকে পৌরাণিক হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার সাম্প্রদায়িক আকাঙ্ক্ষা থেকে মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক জন্ম। আর মূলত সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার এই মনোভাবই মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক রূপ-কল্পনাকেও প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু শিব-দেবতাকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির উদ্বেজনা বাংলাদেশে কখনোই ঘটে নি। শিব বেদ-পূর্ব বাঙালি সমাজের প্রাচীনতম দেবতা। তা হলেও তিনি যে কখন কী করে বেদের রুদ্র এবং পুরাণের শিব-এর সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হয়ে মিশে গেছেন, তার ঐতিহাসিক পরিচয় আজ স্পষ্ট করে জানবার উপায় নেই। ফলে, অভিজাত ব্রাহ্মণ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে চণ্ডী-মনসার মতো শিবকে কখনো সচেষ্ট হতে হয় নি। বরং চণ্ডী-মনসাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন রচনা করে উচ্চ সমাজে পাংক্তেয় হতে চেয়েছেন। এমন কি, ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টি-কাহিনীতে পর্যন্ত পৃথক ও প্রধান ভাবে শিব-মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। হয়ত এই কারণেও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতামূলক মঙ্গলকাব্যের জন্ম-কালে পৃথকভাবে শিব-কাব্য আর রচিত হয়নি; সে-বিষয়ে কোনো প্রয়োজনবোধই ছিল না বলে।

কিন্তু শিবকে নিয়ে স্বতন্ত্র-কাব্য রচনার অতি-আগ্রহ না থাকলেও সুপ্রচীন কাল থেকেই শিব-গীতির প্রচলন ছিল বাংলা দেশের সর্বত্র। শিব ছিলেন মূলত বাঙালির কৃষি-জীবনের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ফলে সেদিন 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' করা হত। তাছাড়া দলবদ্ধভাবে না হলেও,

শিবকে নিয়ে নানারকম গল্প-গাথা কাহিনী কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। মঙ্গলকাব্যের মতো শিবের ক্ষমতার প্রাচুর্য প্রদর্শনের উত্তেজনা এ-সব কব্য কথায় কম ছিল। তার বদলে তাঁর সর্বাতিক্রমী প্রতিষ্ঠার শান্ত মহিমাকেই কীর্তিত করা হয়েছে আগাগোড়া। সপ্তদশ শতক বা পরবর্তী কালে রচিত এই ধরনের কিছু সংখ্যক কাব্যের পুথি আবিষ্কৃত হয়েছ। কাহিনীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদর প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা চলে: —(১) মৃগলুব্ধ এবং (২) লৌকিক শিবায়ন কাব্য।

শিব-কাব্যেব দুটি রূপ

মৃগলুব্ধ কাব্যের মূল উৎস পুরাণের গল্প। কাব্যের মুখবন্ধে শিব কর্তৃক মুনিপত্নী-লঙ্ঘন, মুনির শাপে লিঙ্গ-চ্যুতি, ভ্রষ্টলিঙ্গের প্রভাব ইত্যাদি লোক-কথাশ্রিত অর্বাচীন পুরাণ-প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। তার পরে মূল উপাখ্যানের সূচনা হয়েছে। রাজা মুচুকুন্দ শিবরাত্রির উপবাস ব্রত পূজা শেষ করে বসলে রানী রুক্মিণী তাঁকে শিবরাত্রির কথা শুনিয়েছিলেন নিম্নরূপে :—

১। মৃগলুব্ধ।

বিদ্যাধর চিত্রসেন একবার ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করবার সময়ে হরিণ-শিকার দেখে তাল ভঙ্গ করেন। ইন্দ্র তাই ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পৃথিবীতে ব্যাধ-জন্ম যাপনের অভিশাপ দেন। পরে দেবরাজকে তুষ্ট করে চিত্রসেন বর লাভ করেন যে, ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ পেলে তিনি মুক্ত হবেন। অতঃপর যথারীতি চিত্রসেনের ব্যাধ-জীবন শুরু হয়। এক শিবারাত্রির দিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা করেও চিত্রসেন কোনো পশু পেলেন না, অনাহার ও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পথও খুঁজে পাচ্ছিলেন না বনের মধ্যে। অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য রাত্রিতে তিনি এক বেলগাছে চড়ে বসেন। গাছের তলায় ছিল এক শিবলিঙ্গ। চিত্রসেনের স্পর্শ লেগে একটি সজল বিল্বপত্র গাছ থেকে সেই শিবের মাথায় পড়ে। উপবাসী ব্যাধের হাতে সজল বিল্বপত্র পেয়ে আশুতোষ পরিতৃপ্ত হন। এদিকে রাত্রিতে ভদ্রসেন মৃগ চিত্রসেনের বিস্তারিত জালে ধরা পড়ে। মৃগী প্রাণ বিপন্ন করেও স্বামিসঙ্গ ত্যাগ করতে গররাজি হয়। সকালে গিয়ে ব্যাধ ভদ্রসেন মৃগকে দেখতে পান। মৃগ-দম্পতির কাছে তত্ত্বকথা শুনে তাঁর লুপ্তজ্ঞান ফিরে আসে। তখন চন্দ্রভাগা-তীরের মন্দিরে শিবপূজা করে তিনি মুক্তিলাভ করেন ; ভদ্রসেনও পত্নীসহ শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

রুক্মিণীর কাছে এই ব্রতকথা শুনতে শুনতে মুচুকুন্দেব শিবরাত্রি প্রভা· হয়। রাজদম্পতিও চন্দ্রভাগা-তীরের মন্দিরে পূজা করে শিবলোক লাভ করেন।

লৌকিক শিবায়নের গল্প আসলে কৃষক জীবনের কল্পনা-জাত। মৃগলুব্ধের মুখবন্ধে যেমন লোক-কাহিনী রয়েছে, তেমনি শিবায়নের শুরুতেও আছে নানা পৌরাণিক গল্প :—দক্ষ প্রজাপতির গল্প :—দক্ষ প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের দুর্গতি, হিমালয়-গৃহে সতীর পুনর্জন্ম-গ্রহণ, তাঁর শিবসাধনা, এবং শিবকে পতিরূপে লাভ ইত্যাদি। মৃগলুব্ধ কাহিনীর বিবৃতিও সংক্ষেপে আছে কোনো কোনো কাব্যে। এর পরেই মূল গল্প আরম্ভ হয়েছে কৃষি-দেবতা শিবকে নিয়ে :—

২। শিবায়ন।

সংসার-জীবনে পার্বতীর দুঃখের শেষ নেই ; ভিক্ষার অন্নে সংসার চলে না। অবশেষে শিবকে তিনি চাষে মনোযোগী হতে পরামর্শ দিলেন। বিশ্বকর্মা তৈরি করে দিলেন লাঙল জোয়াল আর চাষের মই। জোড়া বলদ আর বীজের ধান ধার করে আনা হল কুবেরের ভাণ্ডার থেকে। শিবের অনুচর ভীম বৃষ্টি-ভেজা মাটিতে হাল ধরল ; দিনে দিনে পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার উঠল পূর্ণ হয়ে। নারদের ঢেঁকি দিয়ে ভীম ধান ভানে, দেখে দেখে শিবের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সুদিনের মুখ দেখে শিব পার্বতীকে গেলেন ভুলে। একে তাঁর দারিদ্র্য, তায় বিরহ। শিবকে উত্যক্ত করবার জন্যে তাই তিনি উঙানি মশা আর ডাঁশ-মাছিকে পাঠালেন শিবের

ক্ষেতে। সারা গায়ে ঘি মেখে শিব তাদের আক্রমণ উপেক্ষা করলেন। অবশেষে পার্বতী বেগে গিয়ে শিবের পাকাধানে ধরিয়ে দিলেন পোকা ; সোনার ধান শূন্যগর্ভ হল। শিব তাতে আরো প্রমত্ত হয়ে উঠলেন; মহামায়া তখন বাগ্দিনীর বেশ ধরে এসে ভুলিয়ে নিলেন শিবকে। নিরুদ্দিষ্টা বাগ্দিনীর অনুসরণ করে শিব অবশেষে ফিরে এলেন কৈলাসে। আবাব যাতে স্বামী ভুলে না যান, তাই পার্বতী এবার শাঁখা পরতে চাইলেন ; — নারদ বলেছিলেন হাতে শাঁখা পরলেই স্বামী আর বিরূপ হতে পারবেন না। কিন্তু ত্রিদিবেশ্বর শিব চিরভিখারি, শাঁখা পাবেন কোথায়? শুরু হল হর-গৌরীর কোন্দল। অভিমানে পার্বতী চলে গেলেন পিতৃগৃহে। নিরুপায় শিব শঙ্খবণিকের বেশে শ্বশুরবাড়ি গেলেন পার্বতীর মান ভাঙাতে। দুজনের কৃত্রিম বাদানুবাদের পর বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরের হাতে নারীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পরলেন শাঁখা। তারপরে মহাশক্তি মহাকালীরূপে বিকশিতা হলেন। হর-গৌরীর মিলন হল; দুজনে আবার ফিরে এলেন কৈলাসে।

গল্প দুটির প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে,—প্রথমটির মুখ্য কাহিনী অভিজাত পুরাণ থেকে আহরণ করা, দ্বিতীয়টির প্রধান গল্পাংশ লোকজীবন-সম্ভব। তাহলেও দুটি কাব্যেই বিপরীত ধর্মী গৌণ উপাখ্যান অনায়াসে মিশ্রিত হয়েছে। মৃগলুব্ধ-তে লোক-কথা, আর শিবায়নে পুরাণ-প্রসঙ্গ। এখানেই শিবকাব্যের সহনশীলতার ছাপ স্পষ্ট। অন্যদিকে শিবায়নের গল্পাংশ স্থূল হলেও আদিম লোক-জীবনের অটুট প্রতিচ্ছবি রূপে কেবল অভিনবই নয়, ইতিহাস-রসেও সমৃদ্ধ।

মৃগলুব্ধ কাব্যপ্রবাহের মধ্যে যে পুথিখানি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা হয়েছে, তার কবির নাম বা পরিচয় কিছুই জানা যায় নি। অসম্ভব নয়, ইনি হযতো চট্টগ্রামের কবি ছিলেন।

মৃগলুব্ধঃ আদি কবি

এই ধারার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি ছিলেন রতিদেব। কাব্যরচনার কাল সম্বন্ধে জানা যায়,—

কবি বতিদেব

"রস অঙ্ক বায়ু শশী শকের সময়।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হয়।।"

অর্থাৎ ১৫৯৬ শক, — ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে কার্তিক বৃহস্পতিবার রতিদেবের কাব্য-রচনা আরম্ভ হয়েছিল। এঁব বাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রাম চক্রশালা পরগণাব সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। তাঁব পিতার নাম গোপীনাথ, মা ছিলেন মধুমতী। জাতিতে এঁরা ব্রাহ্মণ। কবির নাম ছিল মোক্ষদা ঠাকুর।

পাঁচালির আকারে লেখা রতিদেবের মৃগলুব্ধ একান্ত ক্ষুদ্রকায় কাব্য। তাহলেও কবিব ভক্তি-বিশ্বাসের গভীর স্পর্শ আগাগোড়া কাব্যকে হৃদ্য করেছে। মৃগ-দম্পতিব প্রসঙ্গে করুণ বসের অনুভূতিও নিবিড় হতে দেখা যায়।

রতিদেবের মৃগলুব্ধ কাব্য-পুথির পরিশিষ্টে 'মনসা ধূপাচার' নামক রচনাংশ পাওয়া গেছে। এটুকুও একই কবির রচনা বলে অনুমিত হয়।

বামবাজা

মৃগলুব্ধের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন রামরাজা। ইনি হয়ত জাতিতে ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ ; 'রাজা' উপাধি চট্টগ্রমবাসী মগরাই ব্যবহার করতেন। লিঙ্গপূজা প্রচারের কাহিনী ছাড়া অপর অংশে রতিদেব ও রামরাজার রচনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। কে যে কার কাছে ঋণী বলা কঠিন।

কবিচন্দ্র

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে মৃগলুব্ধের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কবিচন্দ্র। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৫৮—১৬৮২ খ্রি.) এই কাব্য রচিত হয়েছিল। ইনি, এবং শিবায়ন-খ্যাত কবি রামকৃষ্ণ দাস অভিন্ন ব্যক্তি বলে ড. সুকুমার সেন অনুমান করেছেন। কারণ উভয় কাব্যেই কবিচন্দ্র বা কবিচন্দ্র দাস ইত্যাদি ভণিতা পাওয়া গেছে।

রামকৃষ্ণের পিতার নাম ছিল কৃষ্ণরায়—মা ছিলেন রাধা দাসী। জাতিতে এঁরা কায়স্থ ছিলেন। কাব্য-রচনার কাল ১০৯১বঙ্গাব্দ (?)। রামকৃষ্ণের রচনায় পুরাণ-কথার প্রাধান্য বেশি।

শিবায়নের কবি রামেশ্বর

শিবায়ন কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী। এঁর মূল বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, যদুপুর গ্রামে। কবি নিজে বাস পরিবর্তন করেছিলেন একই জেলার অযোধ্যা নগরে। এঁরা কেশর-কোণীয় ব্রাহ্মণ। কবির পিতার নাম ছিল লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মা ছিলেন রূপবতী। তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন—সুমিত্রা আর পরমেশ্বরী।

যদুপুরে থাকবার সময়ে কবি একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখেছিলেন। শিবায়ন কাব্য রচিত হয় কর্ণগড়ের রাজা রাজসিংহ ও যশোবন্ত সিংহের আশ্রয়ে থেকে। কাব্যের রচনাকাল,—

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বামে হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥"
অর্থাৎ, ১৬৩২ শক—বা ১৭১০-১১ খ্রিস্টাব্দ।

রামেশ্বরের শিবায়নের মূল নাম 'শিব সংকীর্তন'। কাব্যটি গীত হবার জন্যে লিখিত হয়েছিল। তাই মঙ্গলকাব্যের মতোই অষ্টমঙ্গলার আকারে এই গল্পাংশ বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু, ঐ সাংগীতিক আকৃতি ছাড়া মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর ভাব বা প্রকরণগত আর কোনো মিল নেই।

রামেশ্বর অষ্টাদশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ; যুগ-স্বভাব তাঁর রচনায় পরিব্যক্ত হয়েছিল। ফলে, আলংকারিক চাকচিক্য ও রচনার বৈদগ্ধ্যে তিনি ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হলেও, তাঁর সার্থক পূর্ব সূরী। রামেশ্বরের গ্রন্থে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও স্পষ্ট।

দ্বিজশংকর

দ্বিজ হরিহরের পুত্র শংকরের লেখা একখানি লৌকিক শিবায়নের কাব্যও পাওয়া গেছে।

৬। কালিকামঙ্গল

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে কালিকামঙ্গল নামে আর একশ্রেণীর রা প্রবাহের উল্লেখ করা হয়। শিবায়নের মতোই আকৃতিতে এরা সর্বাংশে মঙ্গলকাব্যের সমধর্মী নয়। আসলে এই

কালিকামঙ্গল

কাব্যধারা সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরের পদচিহ্ন-বাহী। ভারতচন্দ্রের রচনাকে আশ্রয় করে এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যেই মধ্যযুগের বিনষ্টি ও নবযুগের সম্ভাবনার সংকেত স্ফুটতর হয়েছে। এই কারণেই চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে নয়, যুগান্তরের পরিবাহক হিশেবে এই কাব্যধারা পৃথক আলোচনার যোগ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের বিপর্যয় ও যুগান্তর

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগ অবসানেব লক্ষণ অঙ্কুবিত হতে আবম্ভ কবেছিল সপ্তদশ শতকে ' মাঝামাঝি সময় থেকে। লক্ষ করেছি, ঐ সময থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতে বিষযগত বিচিত্রতা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হযেছে। তাহলেও বিচিত্রতা মাত্রই সব সময়ে নবীনতার পরিবাহক হয না। আলোচ্য পর্যাযেও নূতন সৃষ্টিধাবাব বিকাশের চেযে পুরাতনের বিনাশই ঘটেছে বেশি। মধ্যযুগেব চৈতন্য-প্রভাবিত জীবন-চেতনা ক্রমশ যত শিথিল হয়েছে, ততই সাহিত্যেব আকৃতি ধীরে ধীরে হয়েছে পরিবর্তিত। অবশেষে সাহিত্যের প্রকৃতিতেও দেখা দিয়েছে প্রায আমূল পরিবর্তন। আবাকান-রোসাঙের ইসলামি সাহিত্য, বাউল-সুফি প্রভৃতি লোক-সংগীত, শক্তিগীতি এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্যপ্রবাহ বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগান্তরের এই নবীন স্বভাব-প্রকৃতিব শ্রেষ্ঠ বাহক।

চৈতন্যযুগেব বিপর্যয

আগে বলেছি, প্রেম-অনুরক্তিপ্রধান সামাজিক মূল্যবোধ, ও মানব-মহিমাব প্রতি সশ্রদ্ধতাই চৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালি জীবনেব প্রাণ-কেন্দ্র ছিল। এই সার্বিক মিলনাকাঙ্ক্ষাব ফলে স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজেব প্রাচীন জাতি-বিভেদ অনেকটা শিথিল হযেছিল। অন্যদিকে, হিন্দু ও মুসলমানেব উচ্চনীচ নির্বিশেষে, সংস্কৃতি ও রুচিগত অভিন্নতারও একটি আদর্শ গড়ে উঠেছিল। এই কাবণে, বিনষ্টিযুগেব আঘাতও, এই মিলন ও একতামূলক জীবনাদর্শের ওপবেই এসে পড়েছিল প্রথমে। একেবাবে শুরুতেই জাতি ও অর্থনীতিগত বিভিন্নতা দিনে দিনে মাথা তুলতে লাগল , তাবপরে বিচ্ছেদেব সেই ফাঁক দিযে নৈতিক অবনতি ও আত্মপরতা ক্রমশ সমাজ-জীবনেব সকল স্তরে দেখা দিল। আর বৃহত্তব বাঙালি জীবন, তথা, বাংলা সাহিত্যেবও এই প্রকৃতি পবিবর্তনেব মূলে ছিল পবিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিব প্রভাব।

বিনষ্টিব স্বভাব

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম দিল্লির মোগল বাজ-বংশের অধিকাবভুক্ত হয। সম্রাট আকবর ছিলেন তখন দিল্লীশ্বর। এর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ পাঠানজাতীয় নানা রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। প্রথম যখন তুর্কি-পাঠানেরা এদেশে আসেন, সারা বাংলাদেশে তখন বিপর্যয় ও বিনাশ প্রায় নিরবধি হয়েছিল। আগে দেখেছি, এই সময়ে প্রায় দু'শো বছরকাল বাঙালি জীবনের মতো বাংলা সাহিত্যের সৃজন-লোকও নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতায় উষর হয়েছিল। ইলিয়াসশাহি শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরে সেই ভীরু নিষ্ক্রিয়তা প্রথম মুক্তির পথ খুঁজে পায় ; চৈতন্য-জীবনাদর্শের প্রভাবে তা বহুমুখী হয়েছিল। ইংলন্ডের মতো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও একান্তরূপে রাষ্ট্রশক্তির লালিত ছিল, —এমন কথা বলা চলে না। তাহলেও সাহিত্য ও অন্যান্য সৃজনমূলক কর্মপদ্ধতির উপযোগী জীবন-পরিবেশ রচনায় এদেশের পাঠান শাসকেরা যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সুস্থ ভারসম একটি রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির অভাবে, এমন কি, চৈতন্য-চেতনার সামাজিক ফল-

উৎস

পরিণামও অঙ্কুরিত হতে পারা কঠিন ছিল, একথা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, বিখ্যাত পাঠান গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্ এবং তাঁর অনুবর্তী প্রশাসকেরা নানাভাবে বাংলা কাব্যরচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আসল কথা, পাঠানযুগের রাষ্ট্রাধিকারিগণ প্রথমে বিদেশ থেকে এলেও বাংলাদেশে বসবাস করে বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। ফ ল, তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত বিপত্তির কাল কেটে গেলে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য পুনর্গঠি‌‌ত ভারসমতা ফিরে পেয়েছিল।

মোগল শাসনের সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। বস্তুত মোগল আমলেই বংলাদেশে বিদেশী রাজশক্তির অধীন থাকার অনুভব সর্বপ্রথম তীব্র ও স্পষ্ট হতে পেরেছিল। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর 'The West and the World' গ্রন্থিকায় উল্লেখ করেছেন,—ভারতবর্ষ প্রথমে মুসলমানদের পদানত না হলে তাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীন হতে হত না। এই প্রসঙ্গে মুসলমান অধিকার অর্থে, আগাগোড়া বিজাতীয় মোগল অধিকারের কথাই ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করি। পরে দেখব, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র প্রথম থেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মোগল সাম্রাজ্যবাদের প্রবর্তিত রীতিপদ্ধতিই একান্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন। বস্তুত ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আকবরের শাসন-সীমাভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সমাজদেহে ক্রমশ ঔপনিবেশিক অনুশাসনের বিক্রিয়া প্রবল হতে থাকে।

শাসকেরা সকলেই আসতেন দিল্লি থেকে। এঁরা অনেকেই রক্তসূত্রে বা অন্য কোনোভাবে বাদশাহি বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তাছাড়া অর্থের লোলুপতা, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-ব্যসন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মপর মূল্যবোধ,—সবকিছু নিয়ে দিল্লির জীবনযাত্রা বাংলাদেশের সামাজিক আদর্শের একেবারে পরিপন্থী ছিল। শুধু তাই নয়, শাসন করতে যাঁরা এলেন, শোষণ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলেই প্রায় জানতেন, কিছুতেই এদেশে বাস করবেন না তাঁরা চাকরি করতে আসা, চাকরি শেষ করে আবার ফিরে যাবেন দিল্লির 'স্বদেশে'। অতএব, যতটুকু পারা যায়, সাম্রাজ্য এবং নিজের লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নেবার দিকে সকলেরই আগ্রহ ছিল প্রবল। তাছাড়া, ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভূমি তখন স্বর্ণপ্রসূ বলে বিখ্যাত ছিল। অতএব, যত পারা যায় ধন সঞ্চয়ের জন্য শোষণ করার দিকেই ছিল তাঁদের একমাত্র লোভাতুরতা। স্বয়ং দিল্লীশ্বর, এবং তাঁদের প্রতিনিধি ও কর্মিবৃন্দেব বহুমুখী লালসার অগ্নিতে বাঙালির অর্থনৈতিক সংগতি ও সামাজিক শান্তি একসঙ্গে দগ্ধ হয়ে চলেছিল; জীবনের ভারসমতা হচ্ছিল বিলুপ্ত।

বিপর্যয়-লক্ষণ

অন্যদিকে, সমাজ-দেহেও বিভেদের শূন্যতা ক্রমে দুরাতিশায়ী হয়ে চলেছিল। মোগল শাসক যাঁরা এসেছিলেন, দিল্লির নাগরিক পরিবেশের জন্য আক্ষেপ ছিল তাঁদের ঐকান্তিক। সেই অভাব পূরণের জন্যে দেশের লোকের অর্থেই বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠতে লাগল বিচিত্র শাসন-নগরী ও উপনগরী। এই সব নবগঠিত শহর কেবল শাসনেরই নয়, বাণিজ্যেরও কেন্দ্র হয়ে উঠল। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশ মোগল অধিকারে আসে। পর বছরেই পর্তুগীজ বণিকেরা হুগলিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের ফরমান পায়, দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসিদের বাণিজ্য কুঠিও গড়ে উঠতে থাকে পূর্ব-পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন নদীর তীরে তীরে। ফলে প্রচুর কাঁচা পয়সার আড়ৎ হয়ে ওঠে নবগঠিত এই সব শহর-নগর-বন্দর। নবাব সরকার বা বিদেশী বণিকদের কুঠিতে চাকরি পাওয়ার অর্থই ছিল প্রচুর টাকা উপার্জন। এই টাকার লোভে সমাজের শিক্ষিত, বুদ্ধিমান লোকেরা নিজেদের গ্রামের ভিটা ছেড়ে উঠে এলেন নূতন নগরীতে। ফলে একদিকে অর্থবান নাগরিক এবং অন্যদিকে অর্থহীন ভূমিজীবী গ্রাম্য জনতার মোটা দুই ভাগে প্রথমেই বিভক্ত হয়ে গেল গোটা বাঙালি সমাজ।

এই পার্থক্য বা দূরত্ব ক্রমে কেবল বাড়তেই লাগল। ফলে, গ্রামের জীবনে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, রোগ-জীর্ণতা ও নীতিহীনতা হতে লাগল দুর্বার। অন্য দিকে শহুরে জীবনেরও নিরবচ্ছিন্ন অভ্যুদয় ঘটল না। অর্থের লোভ উচ্চস্তরের লোকেদের অন্ধ করেছিল। ফলে, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের আদর্শ থেকে তাঁরা বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাছাড়া, মোগল রাজধানীর আদর্শে গড়া এই সব নূতন শহর-নগরে নৈতিক জীবনের চারিত্র্য-গুণ ও মানসিক স্বাস্থ্যও প্রবল উচ্ছৃঙ্খলতায় ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল। মানব চরিত্রের দীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক আদর্শেরও বিনাশ ঘটেছিল। অথচ দেখেছি, মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রাণ ছিল এই মহৎ মানবিক মূল্যবোধ। অতএব, এখানেই মধ্যযুগীয় সাহিত্যধর্মেরও বিনষ্টি সূচিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল ভাষাগত অনৈক্য পাঠান যুগে বাঙালি জাতির মতো বাংলার শাসক-গোষ্ঠির ভাষাও ছিল বাংলা। কিন্তু, মোগলেরা স্থানীয় ভাষার দাবিকে অস্বীকার করলেন ; আরবি এবং ফারসি রাজ-ভাষার মর্যাদা পেল। অতএব, ঐ সব ভাষা-শিক্ষা রাজকৃপা লাভের একমাত্র উপায় হল। অর্থের লোভে বাঙালি-শ্রেষ্ঠরা সেদিন আরবি, ফারসি ভাষার চর্চায় একান্ত বৃত হয়েছিলেন। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সেদিক থেকেও বাধাহত হয়েছিল। নূতন ভাষা জাতির জীবনে নূতন প্রাণের বার্তা বহন করে আনে। কিন্তু, আলোচ্য যুগের বাঙালি শিক্ষিতজন লাভের লোভে ভাষা-চর্চা করছিলেন, প্রাণের আনন্দে নয়। এই কারণে দীর্ঘ দু'শ বছরের আরবি-ফারসি চর্চা বাংলা ভাষায় অল্প সংখ্যক নূতন শব্দমাত্র ছাড়া স্থায়িভাবে আর প্রায় কিছুই দিতে পারেনি। বিনষ্টি যুগের এই সাহিত্য, সজীব প্রাণের এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছিল কথার আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যের কৃত্রিম ঘনঘটা রচনা করে।

আগে বলেছি, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আকবরের শাসন-ভুক্ত হয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল', কাশীরামের 'মহাভারত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের' চৈতন্য-চরিতামৃত' র মতো শ্রেষ্ঠ কাব্য ও দার্শনিক গ্রন্থ এর পরে রচিত হয়েছিল। কিন্তু আসলে মোগল-প্রভাবিত যুগের বাইরেই এঁদের সৃজনপীঠ রচিত হয়েছিল। বাইরে গিয়ে তবেই তাঁর কাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন। কাশীরাম ও কৃষ্ণদাসের কবি-মানসও গঠিত হয়েছিল মোগল অধিকার-পূর্ব যুগে। তাছাড়া, তাঁদের কাব্য-রচনার কালে মোগলপ্রভাবের ফল সমাজে প্রকট হতে পারেনি। আকবরের আমলে মোগল শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের আগে বাংলাদেশে মোগল শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। রাজকার্য সুশৃঙ্খল হতে শাহজাহানের আমল চলে এসেছিল। জাহাঙ্গীরের দেহান্ত ঘটে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে। অতএব, মোগল শাসনের সামাজিক প্রতিফল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝিতেই সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ পায়। আগেও বলেছি, বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরস্বভাব সূচিত হয়েছে ঐ সময় থেকেই।

এই সময়কার শিল্প-কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-বিষয়ের দ্বিধা-বিভক্তি। একদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থসম্পদে দীন গ্রামীণ লোকসাধারণের জীবনবাণী উদ্গীত হয়েছে লোকসাহিত্যের আকারে। বাউল, মুর্শিদিগান, পূর্ববঙ্গের গীতিকা-সাহিত্য ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার নাগরিক সমাজের সাহিত্য আকার পেয়েছিল বিভিন্ন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে। আলংকারিক বিদগ্ধতা ও পাণ্ডিত্যের চমক দিয়ে আদিম দেহ-লোলুপতাকে আবৃত করার দিকেই এই শ্রেণীর সাহিত্যের ঝোঁক ছিল বেশি। এ ছাড়া, রামপ্রসাদ-প্রবর্তিত শাক্ত সংগীতে গ্রাম-নগরে ব্যাপ্ত নিখিল বাংলার ক্ষুধার্ত শূন্যতাবোধের বিরুদ্ধে ব্যথিত প্রতিবাদ-গীতি ধ্বনিত হয়েছে। অন্যদিকে আরাকান-প্রত্যন্তের মুসলমানি সাহিত্যে লোক-সংগীতের আধারে নবীন মানব-প্রেমের বাণী বিঘোষিত হয়েছিল।

সাহিত্যে যুগান্তর লক্ষণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

লোকসাহিত্য

সাধারণত লোকসাহিত্য কথাটির ব্যবহাব ইংরেজি Folk Lore শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। Folk অর্থে, উন্নততর সমাজের প্রান্তবর্তী অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পৃথক জনসমষ্টিকে বোঝায়। অতএব Folk Lore, ['লোকযান' বলে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যার পরিচয় দিয়েছেন] বলতে বুঝি, উন্নতর জীবনধাবার পাশাপাশি প্রচলিত এই বিশেষ স্তরের জীবনধারাকে। লোকসাহিত্য লোকযানেরই প্রত্যঙ্গ। স্বভাবত, লোকসাহিত্য অর্থে বুঝব,—এই অনুন্নত সমাজের সৃষ্টিকে—পার্শ্ববর্তী উচ্চস্তরের শিল্প কর্মের তুলনায়, রুচি, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে যা অপেক্ষাকৃত অমসৃণ এবং দীনতাপূর্ণ। এদিক থেকে লোকসাহিত্যের ধারণার সঙ্গে একটি আপেক্ষিক নিকৃষ্টতাবোধ জড়িয়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি উচ্চ-নীচ দুটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ সে সমাজে লোকসাহিত্যের উদ্ভব কল্পনা করা চলেনা। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্যায়ে 'চর্যাপদ' ছিল শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যের নিদর্শন ; তার পাশে বাঙালির রচিত অভিজাত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-তে আদিমধ্যপর্যাযে বিদ্যাপতির বিদগ্ধ কলা-কুশলতার পাশে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' স্থূলাবয়ব লোকসাহিত্যের নিদর্শন। চৈতন্য-সমকালীন বাংলায় লোকসাহিত্য নেই। কারণ নিখিল বাঙালির একীভবনের ফলে লোকসমাজের দুর্বলতর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সেদিন একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

লোক জীবন ও লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য অর্থে সব সময়েই মূর্খতা বা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ রচনার কথা ভাববার কারণ নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে লোকজীবনের জ্ঞান ও আদর্শ মাত্রই স্পন্দন ভাবে প্রকৃতিজ, অপেক্ষাকৃত অমার্জিত। চৈতন্য-চেতনা বিনষ্টিব গ লোকসমাজের পুনরুদ্ভব ঘটে, লোকসাহিত্যেরও ঘটে নব প্রাদুর্ভাব। এই সব সাহিত্যে চৈতন্য-যুগের ক্ষীণ পূর্ব-চেতনার সঙ্গে লোকজীবনের স্থূল প্রেম ও দেহাকৃতিকে এক সঙ্গে যুক্ত করে মানব মনের মন্ময় অনুভূতির সহজ রস-রূপ দিয়েছেন এ-যুগের মরমি কবিরা। তাঁদের মধ্যে আছেন বাউল, মুর্শিদি, মারিফতি, প্রভৃত গুহ্য সাধক-কবির দল।

বাউল, মুর্শিদি, মারিফতি গান

তা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির বিমিশ্রতায় গঠিত অখণ্ড বাঙালি চেতনার মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের নবরূপ দিয়েছেন চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমান কবিকুল। এ-কেবল নূতন নূতন আকৃতি নয়, নব জীবনের সঞ্চার! চৈতন্য-যুগের বাংলা দেশ মানুষের মধ্যে দেব-মহিমা আবিষ্কার করে ভাবে অভিভূত হয়েছিল। সে-যুগের সাহিত্যের সকল শাখায় দেবায়িত মানুষের মহিমা-গীতিই নব নব রূপে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আরবি, ফারসি ভাষায় লেখা মুসলমানি সাহিত্যে মানুষের প্রেম,—তথা, মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে তার অসংগতি-অপূর্ণতাও সমান মানবিক মূল্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। ভক্তির বদলে সহানুভূতির স্পর্শ পেযে মানুষের দুর্বলতাও প্রীতি-

চট্টগ্রাম-রোসাঙেব ইসলামি সাহিত্য

মাধুর্যে হৃদ্য হয়েছে। চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলমান কবিকুল সেই বিশুদ্ধ মানবতাকে আরবি-ফারসি সাহিত্যের মণিকোঠা থেকে আহরণ করে এনেছেন বাংলা ভাষায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পূর্বৈতিহ্যকে তাঁরা বিস্মৃত হন নি। চৈতন্য-যুগের ক্ষীয়মাণ ধর্ম-প্রেরণার বৃন্তে এঁরা বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের কাব্য-কুসুম রচনা করেছেন।

তা হলেও, রোসাঙের মুসলমান কবিকুলের অধিকাংশ রচনাই লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, আলোচ্য কবি-সমাজ একেবারে নির্জ্ঞান না হলেও, পাণ্ডিত্যের চেয়ে চিত্ত-জ সহজ অনুভবের ওপরেই নির্ভর করেছেন একান্তভাবে। তাঁদের গল্প তাঁদের অনুভব ও রচনাভঙ্গী, সব কিছুই ছিল লোক-চেতনাশ্রিত লোকসাহিত্য।

পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকা

লোকসাহিত্যের আর একটি অর্বাচীন এবং পুথি-প্রামাণ্যহীন রূপ পাওয়া গেছে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকার উপাখ্যানকাব্যধারায়। বিপর্যয় যুগের সামাজিক জীবনের স্পর্শ এই সব রচনায় স্পষ্ট ও অকৃত্রিম।

১। বাউল, মুর্শিদি ও মারিফতি গান

বাউল-এব তাৎপর্য

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করা হয়েছে 'বাতুল' শব্দ থেকে। এই নামের তাৎপর্য বিষয়ে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, "বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতি-পংক্তির বহির্ভূত নিবক্ষর একদল সাধক শাস্ত্র-ভারমুক্ত মানবধর্মই সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তপুরুষ, তাই সমাজের কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল।"

বাউলেরা 'শাস্ত্রভারমুক্ত' যে মানবধর্মের সাধনা করেছেন, তাকে তাঁরা মানবদেহ-ভাণ্ডের মধ্যেই খুঁজে ফিরেছেন ; দেহের আদিম ও চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে মনের সহজ অনুরাগে রাঙিয়ে ডালি দিয়েছেন অনুভবময় 'মনের মানুষ'-এর দেউলে ; নিভৃতে, মনে মনে। বাউলের গান সেও বাউল সাধনারই অঙ্গ। তাই এই গানের বিষয়বস্তুতে দুটি উপাদান ঃ—(১) ইন্দ্রিয়জ দৈহিক আকাঙ্ক্ষা ও আকৃতিকে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত করার সাধন-প্রয়াস অধিকাংশ বাউল গানে প্রাধান্য পেয়েছে। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সংগীতের উৎস দেহাতীত অনুভব-গাঢ়তার কেন্দ্রমূলে। রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে দেহী যেখানে রূপের অতীত অনুভব-বেদ্যতার মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেখানকার আনন্দ-সৌরভই দুর্লভ দু-একটি বাউলগীতে ব্যঞ্জনা পেয়েছে ঃ—

সাহিত্যে বাউল ধর্ম

"ধন্য আমি বাঁশিতে তোর
আপন মুখের ফুক্।
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাইরে কোন দুঃখ।।
ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশি
আমি তোমার ফুঁক্।
ভালমন্দ রন্ধ্রে বাজি,
বাজি নিশুইত্ত রাত।
ফাগুন বাজি, শাঙন বাজি
তোমার মনের সাথ।।

একেবারেই ফুরাই যদি
কোনো দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলেম বাজি,
আর কি আমি চাই।।”

আধুনিক বাঙালির বিদগ্ধ রস-লোকে বাউল গানকে আবিষ্কার করার প্রধান গৌরব রবীন্দ্রনাথের। শিলাইদহের জীবনে তিনি বিখ্যাত বাউল-কবি গগন হরকবার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ডাক হরকরা গগন কবিগুরুর জমিদারিতেই বাস করতেন। এঁর মুখ থেকে, এবং অন্যান্য সূত্র থেকে, বাউল গান সংগ্রহ করে কবি তাঁর বিখ্যাত হিবার্ট বক্তৃতা 'Religion of Man'-এ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আরো একজন প্রিয় মরমিয়া কবি ছিলেন শ্রীহট্টের হাসনবজা চৌধুরী। ভারতীয় দর্শনসভার সভাপতির ভাষণে কবি এঁর গানের উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেছেন। 'Religion of Man'-এও এঁর কবিতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রয়েছে।

বাউল-ইতিহাস

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন স্বতন্ত্রভাবে বাউল সাধক ও তাঁদের সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ ও উপদেশের প্রভাবে তিনি বাউলগীতির আবিষ্কার, ব্যাখ্যা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথও নূতন ভাবে প্রভাবিত হন অধ্যাপক সেনের এই প্রচেষ্টায়।

বাউলদের সাধনা গুরুপরম্পরা-সিদ্ধ। ফলে, গুরুর প্রবর্তনা অনুসারে এঁরা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পূর্বোক্ত গগন হরকরা ছিলেন কুষ্টিয়র লালন ফকিরের শিষ্যধরার অন্তর্গত। স্পষ্টই দেখছি, বাউলদের মধ্যে জতিভেদ ছিল না ; 'মনের মানুষ'-এর সাধনায় সকল মানুষের প্রীতি-উপদেশ এঁরা অন্তরে গ্রহণ করেছেন।

বাউল সম্প্রদায়ের প্রথম অঙ্কুরোদগম মোটামুটি ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের শুরুতে হয়েছিল ; বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে অষ্টাদশ শতকে, এবং তারও পরে। বাউলেরা অনেকে মহাপ্রভুকে তাঁদের আদি গুরুরূপে বন্দনা করে থাকেন। এর থেকেই বুঝি, একান্ত শিথিলভাবে হলেও চৈতন্যের প্রেমানুরক্তির ঐতিহ্য বাউলের 'মনের মানুষ'এর সন্ধিৎসাকে মূল হতে আলোড়িত করেছিল।

বিভিন্ন বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে জগমোহন ছিলেন একটি প্রাচীন ধারার প্রবর্তক, তাঁর অনুগতরা জগমোহনী সম্প্রদায় নামে খ্যাত। একতারা বাজিয়ে বাউল গান করার প্রচলন করেন গুরু আউলচাঁদ। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শুরু কিংবা পূর্ব শতকের সমাপ্তি সীমায় ইনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আউলচাঁদের সময় থেকে গুরুপরম্পরাবদ্ধ বাউল সাধনার ইতিহাস ক্রমশ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়ে এসেছে।

মুসলমান লোকসমাজে বাউল-এর অনুরূপ সহজ সাধনার পন্থাকেই মুর্শিদি বা মারিফতি ধারা নামে অভিহিত করা হয়। বাউল-সাধনা আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র-ধর্ম নিরপেক্ষ। মুর্শিদি-মারিফতি

মুর্শিদি মারিফতি

সাধনাতেও শাস্ত্রাচার বর্জিত হয়েছে। অনুভব-প্রধান স্বাধীন সহজ ইসলামি সুফি ভজন-পদ্ধতি দ্বারা মুর্শিদি-মারিফতি প্রভাবিত। বাউলদের মতো এঁদেরও সকল সাধনার কাণ্ডারী হচ্ছেন গুরু বা মুর্শিদ। মারিফত শব্দের অর্থ 'পন্থা'। গুরুগম্য সাধনপন্থাকেই ব্যঞ্জিত করা হয়েছে মুর্শিদি-মারিফতি গানে।

২। রোসাঙের ইস্‌লামি সাহিত্য

ব্রিটিশ ভারতে চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানকালেও তা পূর্ববঙ্গ তথা

বাংলাদেশের অন্তর্গত। কিন্তু দৈনন্দিন আচার ব্যবহার, ভাষা ও উচ্চারণ পদ্ধতির বিচারে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল বাংলা সমাজে অনন্য। প্রতিবেশী ব্রহ্মরাজ্যের আরাকানিদের দ্বারা চট্টগ্রামের জীবনযাত্রা ও ভাষা-সংস্কৃতি বহুল প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাব কেবল ভৌগোলিক নৈকট্যের ফল নয়। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়েছিল অন্তত দেড়শ বছর। সপ্তদশ শতকের শুরুতে জাহাঙ্গীর-এর রাজত্বে চট্টগ্রামের বৃহত্তম অংশ মোগল বাংলায় আবাব ফিরে এসেছিল। বাকি অংশ নানা প্রভাবের তাড়নায় ছিল অশান্তি-পীড়িত হয়ে। এদিক থেকে চট্রগ্রাম যেমন আরাকানি আচার-আচরণের দ্বারা প্রভাবিত, আরাকানও তেমনি বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রভাব এড়াতে পারে নি। বস্তুত, সপ্তদশ শতকের ইস্‌লামি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ রচিত হয়েছিল আরাকান-ভূমিতে ; সেখানকার রাজা বা রাজ-পারিষদগণের পৃষ্ঠপোষকতায়।

ইসলামি সাহিত্যের সৃজন-পীঠ

আরাক.ᐧ তখন ছিল সংস্কৃতি সমন্বয়ের কেন্দ্র। রাজা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, অথচ অধিকাংশ প্রজা ছিলেন মুসলমান ; এঁদের মধ্যে অনেকে শ্রেষ্ঠ রাজকার্যেও নিযুক্ত ছিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধ রাজারা সিংহাসনে আরোহণ করবার সময়ে একটি ইস্‌লামি নামও গ্রহণ করতেন। অতএব, সহৃদয় বৌদ্ধ এবং ইস্‌লামি সংস্কৃতির একটি সাযুজ্য রচিত হতে পেরেছিল সেদিনকার আরাকানে। হিন্দুরাও যে ছিলেন, এবং তাঁদের ধর্ম ও পুরাণকথার ঐতিহ্য মুসলমান কবিদের পক্ষে দুরধিগম্য ছিল না, আলাওলের 'পদ্মাবতী', — এমন কি দৌলৎ কাজির 'সতী ময়নামতী'তেও তার ছাপ স্পষ্ট। তাছাড়া, ভাষাগত বিচিত্রতাও ছিল সেকালের পক্ষে কল্পনাতীত। রোসাঙের প্রথম উল্লেখ্য বাঙালি মুসলমান কবি দৌলৎ কাজি আশরফ্ খান্-এর রাজসভা বর্ণনা করে বলেছেন, সেখানে নানাজাতির লোক-সমাগম হয়েছিল :—

আবাকান রাজসভা

"সৈয়দ শেখ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন যেন মহেশ্বর।।"

সেই রাজসভায় প্রচলিত ভাষা-বিচিত্রতা সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন,

"আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ।।
গুজ্রাতি গোহারি ঠেট্ ভাষা বহুতর।
সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সাগর।।"

তাহলেও সেখানকার বহুসংখ্যক সাধারণ লোকের মাতৃভাযা ছিল বাংলা। দৌলত কাজি তাদেরই চিত্তবিনোদনের জন্য কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির পৃষ্ঠপোষক আশরফ খাঁ তাঁকে কাব্য রচনার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,—

দৌলৎ কাজির সতী ময়নামতী

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন কোন জনে।।
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে।।"

হিন্দি ভাষার কবি সাধন 'মৈনা সত' নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। দৌলৎ কাজি এই হিন্দি কাব্য-কথাকেই বাংলা ভাষায় নবরূপ দিয়েছিলেন আশরফ খাঁর আদেশে।

কবি জানিয়েছেন, আশরফ ছিলেন আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্মের অমাত্য। শ্রীসুধর্ম তাঁর রাজত্বকালের ষোল বছরের মধ্যে বারো বছরই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজকার্য করেন নি। কারণ, দৈবজ্ঞেরা বলেছিলেন, রাজ-অভিষেক গ্রহণের এক বছরের মধ্যে তাঁর প্রাণান্ত হবে। এই কারণে তাঁর শাসন কালের প্রথম বারো বছর রাজ-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আশরফ খাঁ। দৌলত এই সময়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। ইতিহাস অনুসারে এই সময় ছিল ১৬২২ — ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

দৌলৎ কাজির কাব্য হিন্দি 'মৈনা সত'-এর হুবহু অনুবাদ নয় ; পুরাতন গল্পের ওপরে কবি নিজের আকাঙক্ষা ও কল্পনার রং বুলিয়েছেন। 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রানী' নামে পরিচিত কাব্যের কাহিনী নিম্নরূপ :— রাজপুত্র লোরক সতী ময়নামতীকে বিয়ে করেছিলেন। রাজপুত্র যেমন বীরত্বে ছিলেন 'দুর্জয়', ময়নামতী তেমনি ছিলেন রূপেগুণে 'সর্বকলাযুতা'। নবদম্পতির জীবন সুখে কাটছিল। এমন সময়ে, একদিন লোরকের কানন-বিহারের ইচ্ছা হল। রানী ময়না আর বৃদ্ধ অমাত্যদের ওপরে রাজ্যভার দিয়ে তিনি সকল যুবাপাত্রের সঙ্গে বন-যাত্রা করেন এবং সেখানে এক যোগীর কাছে গোহারি দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানীর প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামন ছিল চন্দ্রানীর বর। তার অমিত শক্তি গোহারি রাজাকে শত্রুভয় থেকে মুক্ত করেছিল। কিন্তু, পিতা নিরাতঙ্ক হলেও বামনের হাতে কন্যা চন্দ্রানীর যৌবন-কামনা একান্ত অতৃপ্ত হয়েছিল। যোগীর কাছে এই কাহিনী, এবং চন্দ্রানীর রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে লোর ছদ্মবেশে গোহারি দেশে উপস্থিত হন। প্রথম দর্শনেই দুজনের প্রতি দুজনের আসক্তি জন্মে। গভীর রাত্রে দুঃসাহসিক কৌশলে লোর চন্দ্রানীর শয্যাগৃহে গিয়ে পৌছেন। এমন সময়ে বামনের আগমন-বার্তা শুনে দুজনেই বনপথে পালিয়ে যান। গভীর বনে বামন এদের পথরোধ করে দাঁড়ায় ; কিন্তু লোরের সহিত দুঃসাহসি যুদ্ধ করে অবশেষে তার মৃত্যু হয়। যুদ্ধ চলবার সময়ে অতর্কিত সর্পাঘাতে চন্দ্রানীরও প্রাণান্ত হয়েছিল। লোর যখন শোকে অভিভূত, তখন এক ঋষি এসে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পরে, গোহারি-রাজের আহ্বানে, তাঁরা রাজধানীতে ফিরে যান। আরো পরে, বিবাহিত জীবনে এঁরা গোহারির রাজা-রানীর আসন অধিকার করেন।

কাহিনী

এদিকে স্বামি-বিরহে ময়না সতী দিনরাত অঝোরে ঝরতে থাকে। এমন দুর্দিনে 'ছাতন কুমার' এসে দাঁড়ালো তার অদম্য লালসা নিয়ে ; প্রবল বিতৃষ্ণা-ভরে সতী ময়না তাকে প্রত্যাখ্যান করল। রতনা মালিনীকে টাকা দিয়ে চর নিযুক্ত করে ছাতন ময়নার মন জয় করে দেবার জন্যে। শুভার্থিনী দাসীর ভূমিকায় আবির্ভূত হল বিশ্বাস-ঘাতকা কুট্টিনী। আষাঢ়ের ঘনবর্ষা থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রখর উত্তাপের মধ্যে বারোটি মাস ঘুরে আসে ময়নার বিরহার্ত চিত্তের বিচিত্র বেদনার 'বারমাস্যা'। আর প্রতিটি দুর্বল আকুলতার ক্ষণে রতনা মালিনী ছাতনের সঙ্গ লাভের লোলুপ প্রস্তাব তুলে ধরে চোখের ওপরে। প্রতিবারেই ময়না তার অজেয় সতীত্বের শক্তিতে সকল প্রলোভন জয় করে ; মালিনীর দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পেরে অবশেষে তাকে চরম শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারপরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লোরকের সন্ধানে পাঠায় বিমলা সারিকে সঙ্গে দিয়ে। চন্দ্রানীর ছেলের হাতে গোহারি রাজ্যের ভার দিয়ে লোর তখন সপত্নীক ফিরে এলেন ময়নার কাছে। এবার তিনজনেরই দিন কাটতে লাগল সুখে। শান্তিতে। পরিণত বয়সে লোরের মৃত্যু হলে দুই নারীই অনুমৃতা হয়েছিলেন।

গল্পটির মধ্যে আদর্শ-বিমিশ্রতার পরিচয় স্পষ্ট লক্ষণীয় হয়ে আছে। ময়নামতীর চরিত্রে মধ্যযুগের স্মার্ত হিন্দু সমাজের সতীত্বের আদর্শ লিপ্ত। স্বামী যথেচ্ছাচার করলেও স্ত্রী নীরবে

সমস্ত কিছু সহ্য করবে, উপেক্ষিত অপমানিত হয়েও একান্তমনে করবে স্বামি-ধ্যান ; ময়নামতী এই মূল্যবোধেরই প্রতীক। অন্য দিকে, আদিম লোক-সমাজের নারী-স্বতন্ত্র্য, বিবাহিতা পত্নীরও বীর-উপভোগের স্বাধীন আকাঙক্ষা, স্বীকৃতি পেয়েছে লোর-চন্দ্রানীর গল্পে। আর নিজে পণ্ডিত হলেও দৌলৎ কাজি এই দুটি আদর্শকেই লোকজীবনের ভাবে-ভাষায় মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতা, এমন কি জয়দেব-কালিদাসের সংস্কৃত রচনার প্রতিচ্ছায়াও দুর্লভ নয় 'সতী ময়নামতী' কাব্যে। কিন্তু, বর্ণনা-ভঙ্গী এবং চরিত্রায়ণের গুণে সব কিছুই আকারিত হয়েছে আদিম প্রকৃতিজ স্বভাবে। রচনা-শৈলী ও জীবনবোধের এই বৈশিষ্ট্যেই দৌলৎ কাজির রস-ঋদ্ধ কবি-কর্মও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

দৌলৎ তাঁর কাব্যরচনা শেষ করে যেতে পারেন নি। ময়নার বারমাস্যা অংশে সর্বশেষ জ্যৈষ্ঠমাসের বর্ণনা আরম্ভ করার পরেই তাঁর দেহান্ত হয়। কিন্তু ঐ অসম্পূর্ণ রচনারই গুণ-বৈশিষ্ট্যে তিনি রোসাঙের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। এর মূলে ছিল কবিপ্রাণের সহজ বিশ্বাস ও প্রেমানুরক্তির নিবিড়তা। রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ওপরে দৌলৎ কাজির আদর্শবাদী ভাবকল্পনা প্রেম-তপস্যার মহিমা রচনা করেছে। কবি নিজে ছিলেন সুফি সাধক। সেই সাধনার আনুষ্ঠানিকতার অংশ থেকে বিশুদ্ধ অনুরক্তির রক্তিমাটুকু ছেঁকে নিয়ে তাঁর কাব্যকে লাবণ্যময় করে তুলেছেন। বেদ-উপনিষদের প্রসঙ্গ থেকে বিদ্যাপতির রূপ-প্রকাশ পর্যন্ত সর্বত্র সেই সহজ অনুভবের লাবণ্য বিভাম্বিত হয়ে আছে। 'বারমাস্যার' শুরুতে কবি লিখেছেন,—

"দেখ ময়নাবতী প্রবেশ আষাঢ়
চৌদিকে সাজয় গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিয়া পন্থিক
আইসয় নিজ মন্দির ।।
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পূরে মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী
নির্জন সংকেত ঠাম।
দারুনী ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণ বিদরে
না সহয় মনে মদন।।
যাবৎ বয়স কেলি কলারস
পূরয় মনোরথ জানি
হঠ পরিপাটি মান উপরোধ
চাতুরি তেজ কামিনী ।।
শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই।।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেম
যেন কালার কোলে রাই।।"

দৌলতের কবি-কীর্তি

বৈষ্ণব কবিতার সুর লোকজীবনরসে তন্ময় দৌলৎ কাজির কবি-প্রাণের স্পর্শে এমনি করেই লোকসাহিত্য-লক্ষণে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

দৌলৎ-এর অপূর্ণ কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন রোসাঙের প্রখ্যাত কবি করে ড. এঁর অনেক কবি-কর্মের মধ্যে 'পদ্মাবতী' কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাব্যের চেয়েও কবির জীবন ছিল বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা ও রসের আকর।

কবি আলাওল

'মুল্লুক ফতেহাবাদ'-এর জামালপরে কবির আদি নিবাস ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন নবাব কুতুবের অমাত্য।

পিতা-পুত্র একবার জলপথে যাবার সময়ে পর্তুগীজ দস্যুদের হাতে পড়েন। তাতে কবি-পিতা প্রবল যুদ্ধ করে 'শহিদ' হন। আলাওল নিজে রক্ষা পেলেও বহু দুর্ভোগ সহ্য করে আরাকান রোসাঙে এসে পৌঁছান। এখানে প্রথমে তিনি সৈন্য-বাহিনীতে অশ্বারোহীর পদে যোগ দেন। কিন্তু অল্প দিনেই তাঁর কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন, রোসাঙের 'মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন' মাগন ঠাকুর তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন ; এঁর আশ্রয়েই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী' রচিত হয়। 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' নামে দ্বিতীয় কাব্যটির রচনাও আরম্ভ হয় মাগনঠাকুরেরই পৃষ্ঠপোষণে। কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তির আগে মাগনের মৃত্যু হয়, কবি তখন রাজা চন্দ্রসুধর্মের অমাত্য সোলেমানের আশ্রয়ে চলে আসেন। এঁর নির্দেশেই তিনি দৌলৎ কাজির কাব্যের অসম্পূর্ণ অংশ রচনা করে শেষ করেন। এর পরে প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে রচনা করেন 'হপ্তপয়কর' নামে নূতন কাব্য।

এই সময়ে আলাওলের জীবনে আবার দুর্যোগ দেখা দেয়। শাহসুজা তখন ঔরঙ্গজেবের ভয়ে পালিয়ে রোসাঙ্ রাজসভায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ সময়ে কবির সঙ্গে সুজার হৃদ্যতা ঘটে। কিছু দিন পরে রোসাঙ্ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে শাহসুজার প্রাণান্ত হয়। সেই সময়ে মৃজা নামে এক দুষ্ট শত্রু সুজা ও আলাওলের নাম একত্র জড়িয়ে রাজদরবারে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগ আনে। বিনা অপরাধে কবি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ দিন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করেন। পঞ্চাশ দিন পরে মৃজার মিথ্যাচার ধরা পড়লে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, আর কবি মুক্তিলাভ করেন। তার পরেও আরো কিছুদিন নানা দুর্ভাগ্য তাঁকে তাড়া করে ফিরেছিল। সবশেষে কাজি সৈয়দ মামুদশাহের কৃপা লাভ করে আবার তাঁর সৌভাগ্যের উদয় হয়। এঁর আশ্রয়ে কবি 'সয়ফুলমুলুক্ বদিউজ্জমাল' রচনা করে সম্পূর্ণ করেন। পরে রাজা চন্দ্রসুধর্মার আদেশে তিনি কবি নিজামির 'দারা সেকেন্দর নামা' অবলম্বন করে নূতন কাব্য রচনা করেন।

কবি-জীবনী

দৌলৎ কাজির অনুভব-তন্ময়তার পরিবর্তে আলাওলের কাব্যে জ্ঞান-চিকীর্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী' হিন্দি কবি মহম্মদ জায়সির 'পদুমাবৎ'-এর অনুসরণে লেখা। ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পরিমাণ কবি-কল্পনা মিশিয়ে 'পদ্মাবতী' কাব্যের কাহিনী গঠিত :—চিতোরের রাণা রত্নসেনের প্রথমা পত্নী ছিলেন নাগদেবী। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপগুণের কথা শুনে রত্নসেন মুগ্ধ হন, এবং একটি পোষা শুকপাখি নিয়ে যোগীর বেশে উপনীত হন সিংহলে। সেখানে প্রধানত সেই শুক পাখিরই সাহায্যে রত্নসেন-পদ্মাবতীর মিলন হয়। দেশে ফিরে দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে দিন কাটছিল রানার। কিন্তু পদ্মাবতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন, এবং পরাজিত রাজাকে বন্দী করে নিয়ে যান। গৌরীসেন ও বাদিনা নামে দুই রাজ-সুহৃদ্ তাঁকে কৌশলে উদ্ধার করে আনেন। এদিকে রানা রত্নসেনের অনুপস্থিতির সময়ে দেওপাল নামে রাজা পদ্মিনীকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে। দেশে ফিরে রত্নসেন তার প্রতিবিধানের জন্য প্রস্তুত হন। যুদ্ধে দেওপালের মৃত্যু হয় ; কিন্তু স্বয়ং রাজাও মারাত্মক আঘাত পান। স্বামীর মৃত্যু হলে

পদ্মাবতী-কাব্য

নাগদেবী ও পদ্মাবতী দুজনেই অনুমৃতা হন। এই সময়ে সম্রাট আলাউদ্দিন আবার ছুটে আসেন চিতোরে ; পদ্মাবতীর দগ্ধ চিতার পাশে প্রণাম করে তিনি স্বদেশে ফিরে যান।

জায়সি সুফি কবি ছিলেন ; ঐতিহাসিক গল্পাশ্রিত কাব্যে তাই নিজ ধর্ম-কল্পনার রং ফলিয়েছেন। চিতোর অর্থে তিনি মানবদেহ বুঝেছিলেন, রত্নসেন হচ্ছেন জীবাত্মা ; পদ্মিনী বিবেক, আর শুকপাখি ছিল তাঁর কাব্যে ধর্মগুরুর প্রতীক। আলাওল নিজেও সুফিভাবের সাধক ছিলেন ; জায়সির কাব্যাদর্শের তিনি পোষকতা করেছিলেন। কিন্তু জায়সির মতো তাঁর অনুভূতি অমন অতল-স্পর্শ ছিল না। সে অভাব তিনি পূরণ করেছেন পাণ্ডিত্যের বিদগ্ধতা দিয়ে। আরবি-ফার্সি সাহিত্যের মতো হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত কাব্যালংকার শাস্ত্রে আলাওলের সাধারণ জ্ঞান ছিল। তাকেই লোকসাহিত্যোচিত আধারে উপস্থিত করে কাব্য-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি। অনুভব- 'ভীরতার চেয়ে বিদগ্ধ উজ্জ্বলতার প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি।

অপবাপর বচনা

'সৈফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' নামে আলাওলের দ্বিতীয় রচনা একই নামের ফারসি কাব্যের আদর্শে লেখা। 'হপ্তপয়কর' এবং 'দারা সেকেন্দরনামা' নিজামির লেখা ফারসি কাব্যের বঙ্গানুবাদ শেষোক্ত কাব্যে গ্রিক্ বীর আলেকজাণ্ডারের বিজয়-কাহিনীর কিছু কিছু অংশ বর্ণিত আছে।

আলাওল, এবং তাঁর আগে দৌলৎ কাজি, কিছু কিছু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও লিখেছিলেন। দৌলতের পদরচনা তাঁর একমাত্র কাব্য 'সতী ময়নামতীর' অন্তর্গত। কিন্তু, এই সব কাব্য বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বহির্ভূত,—একান্তভাবেই লোকসাহিত্যের অন্তর্গত।

কবি সৈয়দ সুলতান

কবি সৈয়দ সুলতান ঐ ধরনের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমমূলক লোকসংগীতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। এঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামের পরাগলপুরে, কবি সুফিপন্থী সাধক ছিলেন। তাঁব রাধাকৃষ্ণ-কবিতায় ঐ সাধনারই গোপন সংকেত-কথা আভাসিত হয়েছে। তাছাড়া, 'জ্ঞানপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে তান্ত্রিক যোগাদি সাধনার উল্লেখ আছে। 'নবীবংশ'-তে আছে নবীদের আবির্ভাব ও জীবনকাহিনী। এই শেষোক্ত গ্রন্থেব রচনা সমাপ্ত হয় ১৬৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

মহম্মদ খান

কবি মহম্মদ খান 'মুক্তালহোসেন' কাব্যে কারবালা যুদ্ধের আরবি কাহিনীব বঙ্গানুবাদ কবেছেন। নবীবংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনাও রয়েছে এতে। কবির পিতার নাম ছিল মুবারিজ খান। শাহ সুলতান ছিলেন এঁর গুরু।

শাহ মোহাম্মদ সগীব ও জৈনদ্দিন

এক সময়ে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, কোনো কোনো ইস্‌লামি বাংলা কাব্যের রচনা-সময ষোড়শ এমন কী, পঞ্চদশ শতকেও নির্দেশিত হয়। শাহ মোহাম্মদ সগীর এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম বলে বিবেচিত হয়ে ছিলেন। তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা' বিখ্যাত ফার্সি প্রেমকাব্যের রূপান্তর। আর একজন কবি, জৈনদ্দিন, লিখেছিলেন 'রসুল বিজয় ; হজরত মহম্মদের বিজয়-কথা। এসব কাব্য সপ্তদশ শতকের পূর্বকালের নয় বলেই প্রতিপাদিত হয়েছে।

৩। পূর্ববঙ্গের গীতিকা-সাহিত্য

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহ ও প্রবর্তনায় প্রধানত চন্দ্রনাথ দে পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক গাথাকাব্য আহরণ করেছিলেন ; —লোক-জীবনাশ্রিত নরনারী-নির্ভর বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের সার্থক রসরূপ তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই কাব্যপ্রবাহের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্পর্কে অনেকে সংশয় পোষণ করে থাকেন। অধিকাংশ কাব্যেরই পুথি

পাওয়া যায় নি। চন্দ্রনাথ দে লোকমুখ থেকে ঐ সব প্রাচীন প্রেমগাথা সংগ্রহ করে ড. দীনেশচন্দ্রকে লিখে পাঠিয়েছিলেন তার থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র একাধিক খণ্ড সম্পাদিত হয়। সন্দেহ নেই, এমন অবস্থায় মূল রচনার আগা-গোড়া বিশুদ্ধি রক্ষিত হওয়া অসম্ভব ছিল। তাহলেও, এই গাথাবলি যে মোটামুটি গ্রামীণ লোকজীবনের স্বভাব-আকৃতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। ড. দীনেশচন্দ্রের ভাষাতেই এই রচনাপ্রবাহের শিল্প-পরিচয় প্রকাশিত হতে পারে :—"পল্লীগীতিকায় বৈষ্ণব প্রভাব আদৌ নাই। তাহাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে—কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই ; দুশ্চর তপস্যা আছে--কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই...পল্লীগীতিকার প্রেম বিরাট আকাশের নীচে নীল বনান্ত প্রদেশে, রক্তপুষ্প রঞ্জিত বন্যবীথিতে কংস, ধনু প্রভৃতি প্রবল নদ-সৈকতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়াছে--কিন্তু তাহা মন্দির জড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নর-নারীর প্রেম,—ইহা উপাস্য-উপাসকের সাধনা নহে।"

কাব্য-স্বভাব

স্পষ্টই দেখছি, এই গীতিকা-সাহিত্য চৈতন্য-প্রভাব থেকে বিমুক্ত। ড. দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছেন, চৈতন্য-পূর্ব মধ্যযুগেই এই সব গাথার অন্তত কয়েকটি রচিত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী পণ্ডিতেরা অবশ্য এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নি। মোটামুটি সপ্তদশ শতক বা তার পরে এই সব কাব্য রচিত হয়েছে। এই রচনাপ্রবাহে চৈতন্য-প্রভাবিত দেবায়িত মনুষ্যত্ব-বোধের ছাপ যেমন নেই, তেমনি আবার একটু লক্ষ করলেই তার পরিবর্তে পাওয়া যাবে, ইসলামি সাহিত্যের সমতুল মানব দেহ-মনের প্রতি বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার রস-রূপ। এই সব রচনায় মুসলমানি সাহিত্যের পৃথক প্রভাব কিছু আছে কিনা, সে-কথা নির্ণয় করা কঠিন। তাহলেও পূর্বকথিত যুগান্তর কালের সামাজিক বিনষ্টির অনুভবকে এই কাব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেদনাঘন রূপ দিয়েছে।

মহুয়া, মলুয়া, জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী, লীলা-কঙ্ক প্রভৃতির উপাখ্যান এই সব গাথাকাব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর প্রতিটি কাব্যেই প্রেমের জন্য সতী নারীর লাঞ্ছনা বরণ, এমন কি অকথ্য সামাজিক নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদানের কাহিনী অশ্রু-তপ্ত গীতিরূপ ধারণ করেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই সতীত্ব অর্থে নারীর মূক সহনশীলতা ও নির্বিচার আত্ম-নির্যাতনের মহিমাকেই আলৌকিক মূল্যে উদ্ভাসিত করে দেখানো হয়েছে। স্বভাবত-ই এই সব কাহিনীতে সামাজিক ভার-সমতার অভাব সূচিত হয়ে থাকে। পুরুষ নিরবধি উৎপীড়ন করেছে, আর অন্ধ আবেগে নারী তা কেবল সয়েই গেছে , কোনো সমাজের পক্ষেই এমন অবস্থা আদর্শ বলে মনে করা চলে না। তা হলেও, যে-কোনো পরিবেশের মধ্যেই হোক, প্রেমের জন্যে একান্ত আত্মসমর্পণের বেদনা ও গরিমা এই সব কাব্য-কথাকে সহজেই কালজয়ী হৃদ্যতা দান করেছে।

কাব্য পরিচয়

চতুর্দশ অধ্যায়
শক্তি বিষয়ক সঙ্গীত

শক্তি বিষয়ক সংগীত বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের নূতন যোজনা। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় রামপ্রসাদ সেন ছিলেন এই নবীন গীতিপ্রবাহের 'আদি গঙ্গা হরিদ্বার'। বাংলা দেশে শক্তি পূজা · ইতিহাস সুপ্রাচীন , আর্যপূর্ব কাল থেকেই এই সাধনার ধারা একান্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। আর্য-প্রভাবিত যুগে বাংলাদেশের লৌকিক স্ত্রী-দেবতারা অনেকাংশে হিন্দু-পুরাণেব স্বীকৃতি পেয়ে পৌরাণিক শক্তির রূপ ধারণ করেন। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতা এই পর্যায়ে পড়েন। কিন্তু শক্তিসাধনাব আরো একটি ধারা রয়েছে, পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। বিভিন্ন তন্ত্র-শাস্ত্রের গুহ্য সাংকেতিক নির্দেশের দ্বারা পরিচালিত বলে একে তান্ত্রিক ধর্ম নামে পরিচায়িত করা হয়। শক্তি-তন্ত্রের নির্দেশিত সাধনা দেহাশ্রয়ী, গুরুগম্য, এবং সাংকেতিক। কালী-তারাদি দশমহাবিদ্যা এই সাধন-ধারাব শ্রেষ্ঠ দশজন মহাশক্তি। তান্ত্রিক শক্তি-সাধনা প্রধানত গোপনীয় আচার-আচরণ-প্রধান ছিল। অনেকটা এই কারণেও, এই শাখার দেব-মহিমা নিয়ে সর্বজনীন আবেগাশ্রয়ী সার্থক সাহিত্য রচিত হতে পারে নি। রামপ্রসাদই তান্ত্রিক শক্তির মহিমা গান করে প্রথম বাংলা কবিতা রচনা করলেন।

শক্তি-গীতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য

তাঁর শক্তি-গীতিকে বিষয় অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। এক শ্রেণীর কবিতায় তান্ত্রিক সাধনার নানা পদ্ধতি ও পর্যায় সাংকেতিক ভাষায় বিবৃত হয়েছে। ঐসব গান কেবল দুর্বোধ্য নয়, যাঁদের পক্ষে বোধগম্য, তাঁদের কাছেও সাহিত্য-স্বাদুতার দাবি তা করতে পারে না। আর এক ধরনের কবিতায় দেবতার নামটুকুকে মাত্র উপলক্ষ করে অমিশ্র মানব হৃদয়ার্তির একটি সর্বকাল-হৃদ্য রসরূপ বচিত হয়েছে। তন্ত্র-সাধনায় আরাধ্যা দেবীকে জননীরূপে বন্দনা করা হয়। এই প্রসঙ্গসূত্রেই কবি রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে মানবিক বাৎসল্যের একটি ব্যথা-করুণ মূর্তি রচনা করেছেন। বিশেষ করে ঐ সব ক্ষেত্রে দেবতার তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মূল রূপটি স্তিমিত হয়ে বিশুদ্ধ মানব-হৃদয়ার্তিই প্রায় সর্বত্র করুণা-সুন্দর হয়ে উঠেছে। আগমনী এবং বিজয়া সংগীত এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পুরাণে হিমালয়ের গৃহে সতীর পুনর্জন্ম গ্রহণের উপাখ্যান রয়েছে। হিমালয়-বধূ মেনকা হয়েছিলেন এবারে পার্বতীজননী। রামপ্রসাদ মাতা-কন্যার এই পৌরাণিক সম্পর্ককে আশ্রয় করে তাঁর সমকালীন বাংলাদেশের ব্যথাহত বাৎসল্যের একটি ঐতিহাসিক রূপ রচনা করেছেন। ড. দীনেশচন্দ্র আগমনী ও বিজয়া সংগীতের সেই বিশেষ দেশকালগত মানবিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—"বাংলার কুটিরের বালিকা-দুহিতাদের স্বামিগৃহে যাওয়ার পর মাতৃ-হৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদিগঙ্গা হরিদ্বার এই প্রসাদ-সংগীত। আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলি-ফুলের মত এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল রাত্রিদিন ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রুরচিত হার,—উহা তাৎকালিক বঙ্গজীবনের

শক্তি-গীতিব দুটি রূপ : আগমনী-বিজয়া

জীবন্ত বিচ্ছেদ-রসে পুষ্ট।" মনে রাখতে হবে, —অষ্টাদশ শতকের বাংলার সমাজে মেয়েদের মধ্যে শিশুবিবাহ প্রায় এক অপরিহার্য ঘটনা ছিল ; আর স্বামিগৃহ ছিল বালিকা-বধূদের দুঃসহ কারাগার। বৎসরে দুয়েকটি দিনের জন্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যেমন কন্যার, তেমনি মায়েরও, চোখের জল নীরবে ঝরত — নিরবধি। রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়া গীতি-তে উমা-মেনকা উপলক্ষ, একান্ত লক্ষ্য সেদিনকার বঙ্গীয় জীবনের মানবিক বেদনার্তি!—

"আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ-শশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রানী, বসন না সম্বরে।
এমনি কাঁদে গলা ধরে।।
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চাঁদমুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।"

কেবল আগমনী-বিজয়ার গানেই নয়, শক্তি-বিষয়ক অন্যান্য কবিতাতেও সমকালীন জীবন-চেতনার প্রতি রামপ্রসাদের এই অবহিত-চিত্ততার পরিচয় স্পষ্ট। গুহ্য তান্ত্রিক সাধনায় তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিসিদ্ধির মূলে রয়েছে দুর্লভ মানবিক মূল্যবোধ ও একান্ত সমাজ-সচেতনতা। রামপ্রসাদের সমকালীন সমাজ কেবল বাল্য-বিবাহেই নয়, আরো নানারূপ অনাচার অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছিল। আত্মসচেতন সুস্থ সামাজিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি তা অনুভব করেছেন ব্যথিত চিত্তের কানায় কানায়। প্রতিকারের উপায় তাঁর হাতে ছিল না, তাই নিরুপায় মনের অভিযোগ উজাড় করে দিয়েছেন মহাশক্তি জগজ্জননীর পায়ে। নালিশটাই সেখানে লক্ষ—একান্ত তীব্র ; জননী কেবল নালিশ জানাবার উপলক্ষ মাত্র। একটি গীতে কবি লিখেছেন :—

শক্তি-গীতি ও রামপ্রসাদ-প্রতিভার ঐতিহাসিক স্বরূপ

"বল মা আমি দাঁড়াই কোথা
আমার কেউ নাই শংকরী হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথাতথা।
যে-বাপ বিমাতাকে ধরে শিরে।
এমন বাপের ভরসা বৃথা।।"

জানা যায়, কবি নিজে বিমাতার ঘরের সন্তান ছিলেন। স্বামি প্রেম-রিক্তা জননীর পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত পুত্রের এই ক্ষোভ কবির ব্যক্তি-জীবনের মূলোৎসারিত না-ও যদি হয়ে থাকে, তাহলেও এ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। দেব-কথার উপলক্ষে অমিশ্র মানব-জীবনানুভূতির বেদনা-বিধুর এই চিত্রায়ণ, ও সামাজিক সহৃদযতাকে আশ্রয় করে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। এখানেই শাক্ত সংগীত — তথা রামপ্রসাদের কবি-কীর্তির ঐতিহাসিক মহিমা।

হালিসহর কুমারহট্টের বৈদ্যবংশে কবির জন্ম হয়েছিল ; তাঁর পিতা ছিলেন রামরাম সেন। কবি-পিতা দুটি বিবাহ করেছিলেন ; রামপ্রসাদ ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। তাঁর সহোদর আর একজন ভাই ও দুটি বোন ছিলেন। নিধিরাম ছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই। রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুটি ছেলে ছাড়া কবির কন্যাও ছিলেন দুজন,—পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। কথিত আছে, এই জগদীশ্বরীর ছদ্মবেশ ধরে দেবী কালিকা কবির ঘরের বেড়া বেঁধে

গিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদের কবিত্ব-প্রকাশের বিষয়েও বিচিত্র লোক-প্রবাদ রয়েছে। দারিদ্র্যের জন্য কবি কোনো জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি নিয়েছিলেন ; কিন্তু হিশেবের খাতায় তিনি লিখতেন গান। ঐ খাতাতেই নাকি অন্যান্যের মধ্যে নীচের বিখ্যাত সংগীতটিও প্রথম লিখিত হয়েছিল :—

রামপ্রসাদ-জীবনী

"আমায় দে মা তবিলদারি,—
আমি নিমক হারাম নই শংকরী।।" ইত্যাদি।

কবি-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে জমিদার নাকি মাসিক ৩০ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সহৃদয় ভূম্যধিকারীর নাম জানা যায় না। তা ছাড়া নিজ কবিকর্মের পৃষ্ঠপোষক হিশেবে জমিদার রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধিও দিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ একখানি কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্যও রচনা করেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর শক্তি-সাধনার কোনো যোগ নেই। তৎকালীন সমাজের রুচিহীন দেহ-রসবিলাসের একটি স্থূলরূপ এতে আভাসিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হবে।

কবির আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে মতভেদ রয়েছে। ড. দীনেশচন্দ্রের অনুমান ১৭১৮-১৭২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে রামপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল।

শ্যামাসংগীতের আদি এবং মহত্তম কবি রামপ্রসাদ সেন ছাড়া 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' নামে আর একজন কবিরও সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি পূর্ববঙ্গের কবি; ঢাকা জেলার চিনিশপুরের অধিবাসী। কবি সেখানকার কালীবাড়িতে সাধনা করেছিলেন।পূর্ববঙ্গে তাঁর বহু সংগীত দীর্ঘদিন জনপ্রিয় ছিল।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

ভক্তি এবং সামাজিক জীবনবেদনা মিশ্রিত মানবিক অনুভবে স্নিগ্ধ এই শক্তিগীতি সাধক-অসাধক নির্বিশেষে বহু কবিকে আকৃষ্ট করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এঁদের মধ্যে সাধক-কবিরূপে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রথমে উল্লেখ্য। কবির নিবাস ছিল কালনার অম্বিকানগরে। পরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোটালহাটে বাস পরিবর্তন করেন। তাছাড়া, ইনি বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কবিতায় শ্যামার চরণ লাভের আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক সহৃদয়তা একসূত্রে গাঁথা পড়েছে ঃ—

"জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশি, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।'

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শ্যামাসংগীতের ভক্ত ছিলেন, নিজেও পদ লিখে গেছেন কিছু কিছু। তাঁর পুত্র ও বংশধরদের মধ্যেও কেউ কেউ শক্তি-গীতি রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদ-ও গান রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া কমলাকান্তের মধুস্বাদী গীতি সংকলনের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি ইতিহাসে খ্যাত হয়েছেন। বৃটিশ-ভারতের বিখ্যাত শহীদ রাজা নন্দকুমারও কিছু কিছু কালিকাগীতি রচনা করেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ও বংশধরগণ

শক্তি-গীতি—বিশেষ করে আগমনী-বিজয়া সংগীতের মানবিক আবেদন আরো যাঁদের কবি-কর্মকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাঁদের মধ্যে আছেন রামবসু এবং দাশরথি রায়। এঁদের প্রথমজন

ছিলেন বিখ্যাত কবিয়াল,—দ্বিতীয়জন মুখ্য পাঁচালিকার। কবি-সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে এঁদের পরিচয় উদ্ধার করব। এখানে কেবল লক্ষ করি,—ধর্মকে উপলক্ষ করে আলোচ্য গীতি-সাহিত্যে রামপ্রসাদ আসলে বিশুদ্ধ মানব-রসের স্বাদুতা সঞ্চার করেছিলেন। তারই ঐতিহাসিক পরিণতিতে ধর্ম-প্রভাবমুক্ত কবি-মন নিছক শিল্প-রসের সন্ধানেই এই ধারার পরিপূর্তি সাধন করেছে। বস্তুত, আলোচ্য কাব্য-সাহিত্যের কবি হিশেবে কেবল মৃজা হুসেন ও এন্টুনী ফিরিঙ্গি-ই নন—মধুসূদন এবং নজরুল ইসলামও অবশ্য উল্লেখ্য।

রামবসু ও দাশুরায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য

কালিকামঙ্গল বনাম বিদ্যাসুন্দব

কালিকামঙ্গল নামে এক নূতন কাহিনীযুক্ত কাব্য-প্রবাহ বাংলা ভাষায় রচিত হতে থাকে মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। তান্ত্রিক দেবী কালিকার ভাবাদর্শ, অথবা বাংলা মঙ্গলকাব্যের রূপ ও রস-প্রকৃতি, কোনো কিছুর সঙ্গেই এই রচনা-প্রবাহের কোনো যোগ নেই। সপ্তদশ শতক থেকে বাংলা কাব্য-কবিতার আখ্যানভাগে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল। আর এই প্রয়োজনে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি ও লোককাব্য থেকে অসংখ্য গল্প সংগৃহীত হয়েছিল। এই সংগ্রহের পথ বেয়েই বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশলাভ করে।

প্রচলিত বাংলা কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প মোটামুটি নিম্নরূপে পাওয়া যায় : —

বিদ্যাসুন্দবেব গল্প

এক গভীর রাত্রে কালী পূজো করে তুষ্টা দেবীর কাছে রাজকুমার সুন্দর বর পেয়েছিলেন যে, রাজকন্যা বিদ্যার পণিগ্রহণের অধিকারী তিনি হতে পারবেন। বিদ্যা যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমনি ছিলেন সর্বগুণ-যুতা বিদুষী। দেবীর দেওয়া শুকপাখি সঙ্গে নিযে সুন্দর এসে উপনীত হন বিদ্যার পিতৃরাজ্যে। সেখানকাব মালিনী বুড়ি স্নেহাসক্ত হয়ে তাকে নিজর বাড়িতে নিয়ে যায়। সুন্দর তাকে মাসি বলে ডাকতে আরম্ভ করেন। এই মালিনীই রাজবাড়িতে ফুল যোগাত। পরদিন সকালে ফুলের পসরা নিয়ে যাবার সময় সুন্দর একটি অপরূপ মালা তার হাতে দিলেন—রাজকন্যাকে দেবার জন্যে। মালিনী জানত না, সেই মালায় রতি-কামদেবের পুষ্পচিত্র কৌশলে আঁকা ছিল ; আর ছিল একটি সাংকেতিক প্রণয়-লিপি। সেই মালা পেয়ে রাজপুত্রের রসবোধ, পাণ্ডিত্য ও কলাকৌশলে বিদ্যা মুগ্ধ হন। পরদিন স্নানের ঘাটে সাক্ষাতের জন্যে সাংকেতিক প্রতিবচন পাঠান তিনি সুন্দরকে। যথাকালে এদের সাক্ষাৎ ও সাংকেতিক ভাষায় প্রেমবিনিময় হল। গভীর রাত্রে বিদ্যার শয্যাগৃহে উপস্থিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দর ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু সারাদিনের পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে আবার ভিক্ষা করলেন দেবীর কৃপা। স্তবে তুষ্টা কালিকা সুন্দরের ঘর থেকে বিদ্যার শয্যাগৃহ পর্যন্ত একটি গোপন সুড়ঙ-পথ সৃষ্টি করে দিলেন। শুধু ঐ একবারই নয়, সে পথে প্রতি রাত্রে বিদ্যা-সুন্দরের মিলন হতে লাগলো। ক্রমে মিলন থেকে গোপন পরিণয়, এবং পরিণয় ফলে বিদ্যার সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সংবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়লে রাজপুরীতে আক্রোশ ও ক্রোধ প্রখর হয়ে উঠলো। অথচ অপরাধীকে কিছুতেই ধরা গেল না। অবশেষে রাজকন্যার শয্যাগৃহে সিঁদুর বিছিয়ে রেখে কৌশলে নগরপাল সুন্দরের সন্ধান আবিষ্কার করল। প্রতি রাত্রির মতো সেদিনও সুন্দর বিদ্যার কাছে গিয়েছিলেন, আর তার কাপড়ে লেগেছিল ছড়ানো সিঁদুর। সেই কাপড় ধোপার ঘরে কাচতে দিলে সেখান থেকে খোঁজ করে সুন্দরের পরিচয় আবিষ্কৃত হয়। তার ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় বিরাট সুড়ঙ্। ক্রুদ্ধ রাজা তার মৃত্যুদণ্ড বিধান করেন। মশানে গিয়ে সুন্দর চাতুর্যময় বাগ্‌ বিন্যাস করে দেবী কালিকার বন্দনা করেন আবার। তিনি স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে ভক্তকে রক্ষা করেন। ফলে, বিদ্যাসুন্দরের প্রকাশ্য মিলন সংঘটিত হয়।

আসলে এই গল্প উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাহিত্য থেকে বাংলা ভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করেছিল। অবশ্য সুন্দরের রক্ষাকর্ত্রী হিশেবে দেবী কালিকার পরিকল্পনা বাংলাদেশের নিজস্ব। অনুমান করা হয়, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই কাহিনীর প্রাথমিক রূপ পৃথক দুটি গল্পের আকারে প্রচলিত ছিল। একটির বিষয়-বস্তুতে রয়েছে শিক্ষাগুরু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি ছাত্রী রাজকন্যার প্রণয়ের উপাখ্যান, অপরটিতে আছে 'চৌর' [চতুর] কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়িণী রাজকন্যার গোপন মিলন-কথা। তার সঙ্গে বররুচির লেখা সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরম্' এবং কাশ্মীরী কবি বিলহনের 'চৌর পঞ্চাশৎ' কাব্যের প্রভাব যুক্ত হয়েছে।

গল্পের উৎস

'বিদ্যাসুন্দরম্'-এর আদিকবি বররুচির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নি. তবে কৃষ্ণরাম, বলরাম কবিশেখর, রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের বাংলা কাব্যে বররুচির রচনার প্রভাব রয়েছে নিঃসন্দেহে। বররুচির কাব্যে কালিকার কোনো উল্লেখ নেই ; আগেই বলেছি—কালীকথা বাংলাদেশের পরিকল্পনা। অষ্টাদশ, এমন কি, উনিশ শতকেও বাংলা দেশে সামন্ত শক্তির সাধারণ পূজ্য দেবতা ছিলেন দেবী কালিকা। সেকালের জমিদারেরা লেঠেল দল পোষণ করতেন কেবল নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই নয়, অধিকাংশ লেঠেলেরাই সেকালে অবসর সময়ের বৃত্তি হিশেবে ডাকাতি করত ; আর ভূম্যধিকারীরা ছিলেন প্রায় সর্বত্র এদের পৃষ্ঠপোষক। বিভিন্ন ডাকাতি অথবা সামন্ততান্ত্রিক রাহাজানির সময়ে প্রতিবারেই কালী পূজা করা ছিল প্রথাসিদ্ধ ; সাধারণ বিশ্বাস ছিল, ঐ সকল বিপজ্জনক কর্মের প্রতিফল থেকে দেবী তাঁর ভক্তদের রক্ষা করতে পারেন। মনে হয়, আলোচ্যকালের এই সামাজিক প্রথাই বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পৃষ্ঠপোষিকা রূপে দেবী কালিকার অবতারণা সম্ভব করেছে।

বররুচি

এই অনুমানের সমর্থন বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ইতিহাস থেকেও পাওয়া যেতে পারে। এই ধারার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি কঙ্ক চৈতন্য-সমসাময়িক বলে কথিত। ষোড়শ শতকের আর একজন কবি দ্বিজ শ্রীধর এবং সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবি সাবিরিদ খাঁও 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রচনা করেছিলেন। এঁদের কারো বর্ণিত কাহিনীতেই দেবী কালিকার উল্লেখ নেই।

কবি কঙ্ক মৈমনসিংহের বিখ্যাত লোক-গাথা লীলা-কঙ্ক-কাহিনীর নায়ক ছিলেন বলে মনে হয়। ইনি নিজেই জানিয়েছেন, রাজেশ্বর নদীর তীরে বিপ্রগ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পিতার নাম গুণরাজ ; মা ছিলেন গুণবতী ; জাতিতে এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে চণ্ডাল-দম্পতি মুরারি ও কৌশল্যার কাছে কবি প্রতিপালিত হন। পরে তিনি ব্রাহ্মণ গর্গের গৃহে গো-পালকের কাজ গ্রহণ করেন। গর্গ ও তাঁর স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে কবিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু সমাজপতিরা তাতে প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। কবি কঙ্ক তাঁর আত্মকথা এখানেই শেষ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত লোক-গাথা থেকে জানা যায়—সমাজের এই প্রতিবন্ধক গর্গকন্যা লীলা ও কঙ্কের জীবনে ট্র্যাজেডি রচনা করেছিল।

কবি কঙ্ক

কঙ্ক তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'পীরের পাঁচালি'। সত্যনারায়ণের (পীরের) 'পাঁচালি'র আবরণে তিনি আসলে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কথা বিবৃত করেছেন। আগে বলেছি, কঙ্ককে চৈতন্য-সম সাময়িক অর্থাৎ ষোড়শ শতকের কবি বলে মনে করা হয়। ড. সুকুমার সেন এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে, কঙ্ককে বাংলা বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবি মনে করাও চরম 'বিচার-মূঢ়তা'।

দ্বিজ শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'-র দু-খানি মাত্র খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে। হোসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের আদেশে কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

দ্বিজ শ্রীধর

সাবিরিদ্ খাঁর 'বিদ্যাসুন্দর'-এ সংস্কৃত শ্লোকের অশুদ্ধ উদ্ধৃতি এবং তার ভুল অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায়। এর থেকে অনুমিত হয়, কোনো সংস্কৃত কাব্য হয়ত এঁর রচনার আদর্শ ছিল।

সাবিরিদ্ খাঁ

বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালিকা-উপাখ্যান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে। কবি কৃষ্ণরাম দাস কলকাতার কাছে নিমতে গ্রামে বাস করতেন ; তাঁর পিতা ছিলেন ভগবতীদাস। কালিকামঙ্গল ছাড়াও ইনি আরো তিনখানি কাব্য লিখেছিলেন ঃ—(১) ধর্ম-বিষয়ক রাঢ়মঙ্গল। (২) ষষ্ঠীর পাঁচালি, ও (৩) শীতলার পাঁচালি। কালিকামঙ্গলই তাঁর সর্বপ্রথম রচনা—কবিকর্মের দিক থেকেও এটি সর্বোৎকৃষ্ট। রচনাকাল অনুমিত হয়েছে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। কালিকা-প্রসঙ্গ এই কাব্যে উপলক্ষ, মূল লক্ষ বিদ্যাসুন্দরের প্রেমোপাখ্যান।

কৃষ্ণরাম দাস

এই ধারার পরবর্তী উল্লেখ্য কবি বলরাম কবিশেখর। এঁর কাব্যের শেষাংশ খণ্ডিত ; অন্য কোথাও রচনাকালের নির্দেশ নেই, আর এ-নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ রয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে মনে করা হয়, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'এর আগে আলোচ্য কাব্যখানি রচিত হয়েছিল। কবির জন্মভূমি সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা একমত নন। কেউ কেউ এঁকে পশ্চিমবঙ্গের, কেউ-বা আবার পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। কবির পিতার নাম ছিল দেবীদাস আচার্য ; মা ছিলেন কাঞ্চন দেবী। এঁদের বংশীয় উপাধি ছিল চক্রবর্তী। 'কবিশেখর' ছিল বলরামের উপাধি! ইনি বিষ্ণুদাস-বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণের সভাসদ ছিলেন।

বলরাম কবিশেখর

বলরামের কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কথার চেয়ে কালিকার প্রতি ভক্তিভাব নিবিড়তর। ফলে মূল উপাখ্যানের বর্ণনাতে আদিরসাত্মক বিবৃতি অতি-অসংযত হয় নি। বস্তুত একমাত্র এই কাব্যকেই যথার্থভাবে 'কালিকামঙ্গল' নামে অভিহিত করা চলে।

আগে বলেছি, শক্তি-সংগীতের আদিগুরু রামপ্রসাদ সেনও 'কালিকামঙ্গল' নাম দিয়ে একখানি 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' লিখেছিলেন। বিষয় বর্ণনার দিক থেকে এই রচনা যেমন রুচি রহিত, বাগ্ বিন্যাসের বিচারেও তেমনি স্থূলতাধর্মী এবং অশালীন। মহাকালীর এমন সিদ্ধ সাধকও যে কি করে দেবী কালিকার নাম দিয়ে এমন একখানি গর্হিত কাব্য, লিখেছিলেন, ড. দীনেশচন্দ্র সেন সে-কথা ভেবে বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়েছেন। আসলে রামপ্রসাদ ছিলেন যুগ-সন্ধির কবি। সেকালের সমাজ-জীবনের সর্বব্যাপী অনিয়ম এবং অনাচার-উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর ব্যক্তিচেতনার মূলে প্রবল আক্ষেপের সৃষ্টি করেছিল। রামপ্রসাদের গীতি-সাহিত্য সেই অনুভূতির সংবেদনশীল শিল্পরূপ। তাহলেও, যে সমাজে নিজে বাস করেছিলেন, তার পরিবেশ, রুচি ও গল্প-কৌতূহলের বিশিষ্ট স্বভাবকে কবি অস্বীকার করতে পারেন নি। ফলে, তাঁর কাহিনীকাব্য 'কালিকামঙ্গল'-এ তৎকালীন জীবনের একটি স্থূল হলেও বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাই, তেমনি সেই জীবন-প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরল অভিযোগ লক্ষ করি তাঁর শক্তি-সংগীতে। এই দ্বিবিধ কবিকর্ম রামপ্রসাদের সমাজনিষ্ঠ কবি-চেতনার পূর্ণ পরিচয় উদঘাটন করেছে।

রামপ্রসাদের 'কালিকামঙ্গল'

অন্য দিক থেকে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে তুলনায় রামপ্রসাদের এই 'কালিকামঙ্গল'

সমকালীন জীবনচরিত্রের আর একটি দিক প্রকাশিত করে থাকে। ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকবি ছিলেন,—তাঁর কাব্যে সেকালের নাগরিক বিদগ্ধ মানসিকতার প্রকাশ। আর রামপ্রসাদ ছিলেন স্বভাবত গ্রামীণ কবি। কৃষ্ণচন্দ্রের পুনঃপুন অনুরোধ এড়িয়েও গ্রামের ভিটাতেই তিনি থেকে গিয়েছিলেন। একই বিষয়ে লিখিত সমসাময়িক এই দুই শ্রেষ্ঠ কবির রচনা থেকে সেকালের জীবনধর্মের একটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কাব্য-বিষয়ের দিক থেকে দুটি রচনাই সমান শৃঙ্গার-প্রমত্ত এবং রুচি-নিকৃষ্ট। কিন্তু ভারতচন্দ্রের নাগরিক মন ভাষা ও বাক্-চাতুর্যের সরসতায় যেখানে অশালীনতার ওপরে শিল্প-মণ্ডন রচনা করেছে,—রামপ্রসাদের কাব্য সেখানে নিরাবরণ, নিরাভরণ—নগ্নদেহ।

ভারতচন্দ্র কিন্তু আসলে বিদ্যাসুন্দরের কবি নন ;—তাঁর কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। বিদ্যাসুন্দব-কাহিনী বা কালিকার প্রসঙ্গও সেই কাব্যের একটি অংশমাত্র। 'অন্নদামঙ্গল'-এ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয়তার উত্তরণ এবং আধুনিকতার পথে পদক্ষেপের আকাঙ্ক্ষা আভাসিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান উৎস ছিল কবির একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি-চেতনা। এই কারণেই কাব্যবিচারেব আগে কবির জীবনের পরিচয় সন্ধান বর্তমান প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

'অন্নদামঙ্গল'-এব কবি ভাবতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রেব পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান ভুরসুট-পরগনার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। এখন এই গ্রামটি হাওড়া জেলার অধীনে। ঐখানেই কবির জন্ম হয় ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে। জাতিতে এঁরা ছিলেন ফুলিয়ামেল মুখুটি ব্রাহ্মণ। কবির পিতা রাজা নরেন্দ্রনারয়ণ ছিলেন প্রতিপত্তিশালী জমিদার। বর্ধমানের রাজাব সঙ্গে বিবাদের ফলে ইনি সর্বস্বান্ত হন। ভারতচন্দ্র তখন বালক ; মাতুলালয়ে থেকে তিনি সংস্কৃত পাঠে বৃত হন। কিছুদিন পরে মত্র ১৪ বছর বয়সে সারদাগ্রামের কেশরকুনী আচার্যদেব একটি বালিকাকে বিয়ে করে তিনি বাড়ি ফেরেন। ভারতচন্দ্রের অগ্রজেরা তখন পরিবারের কর্তা ছিলেন ; এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুজকে তাঁরা প্রচুর ভর্ৎসনা করেন। ফলে, নব-বিবাহিতা পত্নীকে ফেলে কবি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান হুগলিব দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সির আশ্রয়ে। সেখানে ফারসি ভাষায় তিনি প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ঐখানে থাকতেই যথাক্রমে ত্রিপদী ও চৌপদী ভাষায় দুখানি সত্যনারাযণেব পাঁচালি তিনি লিখেছিলেন। সেই প্রাথমিক রচনাতেই ভারতচন্দ্রেব রস-বিদগ্ধ বাকচতুর্যেব সুনিশ্চত প্রকাশ ঘটেছিল ঃ—

কবি-জীবনী

"সেলাম হামারা পাঁড়ে ধুপমে তোম্ কাহে খাঁড়ে,
পেরেসান দেখে বড়ে মেরে বাৎ ধর তো।।"

[চৌপদী—সত্যনারায়ণ পাঁচালি।]

এবারে দেশে ফিবে গেলে ভারতচন্দ্র তাঁর ফার্সিবিদ্যার জন্য অগ্রজদেব কাছে পবম আপ্যায়িত হন। আগে বলেছি, ফার্সি ছিল সে সময়কার রাজ-ভাষা। কিছু দিন পরে বৈষয়িক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্যে কবিকে বর্ধমান যেতে হয় ; কিন্তু সেখানে তিনি কারারুদ্ধ হন। কৌশলে মুক্তি লাভ করে এবারে পালিয়ে যান কটকে। সেখান থেকে কর-মুক্ত তীর্থবাসী হিশেবে পুরুষোত্তম হয়ে যান শ্রীক্ষেত্রে। শ্রীক্ষেত্র থেকে সন্ন্যাসিবেশে বৃন্দাবনে যাবার সময়ে হুগলি খানাকুল পরগনার কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর ভায়রা-ভাই-এর কাছে ধরা পড়েন। পরে কবি-পত্নী এসে মিলিত হন সেখানে। কিছুদিন খানাকুলে বাস করে কবি এবার ফরাসি চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধরীর কাছে উপনীত হন

কবির আদি-রচনা

জীবিকার অন্বেষণে। প্রধানত তাঁরই সহায়তায় ভারতচন্দ্র ৪০ টাকা মাসোহারায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। এখানেই তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয় ঃ—

"বেদ লয়ে ঋষি রস ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।"

অর্থাৎ ১৬৭৪ শক, তথা ১৭৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল'-এর রচনা শেষ হয়।

অন্নদামঙ্গল পবিচয়

কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়েই ভারতচন্দ্র মৈথিল কবি ভানু দত্তের 'রসমঞ্জরী'র অনুবাদ করেছিলেন। এটি নায়ক-নায়িকার লক্ষণ বিশেষক কাব্য। দুঃখের কথা, মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিভাবান কবির জীবনাবসান ঘটে।

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার প্রায় একমাত্র ভিত্তি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল'। এই কাব্যেই মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ যুগপৎ আভাসিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। আগে দেখেছি, মধ্যযুগের বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রধান সামাজিক জীবনাদর্শ। আধুনিকতার উৎস, বলা হয়, উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে। সপ্তদশ শতকেব মাঝামাঝি সময় থেকেই মধ্যযুগের সমাজ-গঠন ও প্রেম-ভক্তিমূলক জীবনাদর্শ ক্রমশ শিথিল ও বিপর্যস্ত হতে আরম্ভ করেছিল। আর জর্জরিত সেই সমাজের খোলসে আটকে পড়ে সেকালের বাঙালির জীর্ণ মন কেবলই ক্ষুব্ধ—আক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। রামপ্রসাদের 'কালিকামঙ্গল' ও শক্তি-গীতিতে যথাক্রমে সেই বিক্ষোভ ও মুক্তির আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। এদিক থেকে ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিমন অনেকটা পরিমাণে ছিল সহজে-মুক্ত। একেবারে বাল্যকাল থেকেই কোনো সমাজ বা পরিবারগোষ্ঠির প্রতি কোনো ঐকান্তিক আকর্ষণ তাঁর ছিল না। খুব স্পষ্ট করে বললে, ভারতচন্দ্রের কবি-ব্যক্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর সকল অবধান এবং আনুগত্য ছিল কেবল নিজের সম্পর্কে। এমন কি, বাল্যবিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের কথাও যথাসময়ে তিনি ভাবেন নি।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তির্যক রস-বোধ, এবং সর্ব-নিরপেক্ষ আত্মরতি ভারতচন্দ্রের কবি-কর্মকে অপূর্ব মানবিক রস-স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছিল। এই নূতন মানবরস-সম্ভোগের কাহিনীকে তিনি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের আধারে বিন্যস্ত করেছেন ; তাহলেও 'অন্নদামঙ্গল' যথার্থ মঙ্গলকাব্য নয়।

এই কাব্যের কাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে পৌরাণিক অন্নপূর্ণামঙ্গল—অর্থাৎ দক্ষ-যজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ প্রসঙ্গ থেকে তাঁর পুনর্জন্ম, বিবাহ ও গার্হস্থ্যের কাহিনীর গতানুগতিক বর্ণনা ; তারপরে আছে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তি গ্রহণ, বিশ্বকর্মার অন্নপূর্ণা-পুরী নির্মাণ, কাশীর মাহাত্ম্য, ব্যাসকাশী প্রতিষ্ঠা ও তার বিড়ম্বনা, ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান। 'অন্নদামঙ্গল'-এর এই প্রথম খণ্ডটি বহুলাংশে আঙ্গিকসিদ্ধ স্বয়ম্পূর্ণ এক মঙ্গলকাব্য। 'অন্নদামঙ্গল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরের গল্প বা তথাকথিত 'কালিকামঙ্গল'। তৃতীয় খণ্ড ভবানন্দর-মঙ্গল,—দেবীর কৃপায় কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ্রের সার্থকতা ও দিল্লির নবাব দরবারে তাঁর 'রাজা' উপাধি লাভের কাহিনী। আসলে এই তিনটি পৃথক কাব্যকে ভারতচন্দ্র ভবানন্দ-প্রসঙ্গের ক্ষীণ সূত্রে বেঁধে একত্র করছেন। এতে অখণ্ড সংহতির চেয়ে বিচিত্রতার স্বাদই বেশি। ভারতচন্দ্র তাঁর রস-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন কাব্যের দ্বিতীয় অংশে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনায়।

গ্রন্থরচনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, নবাব আলিবর্দির কারাগারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী হয়েছিলেন বকেয়া টাকার দায়ে। তখন দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন,—

'সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
'মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়।।
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।।"

কবির কথা, সত্য হলে, রাজা এবং দেবী —দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল পূজা প্রচার ; অথচ তাঁর নিজের একমাত্র কাম্য ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা। মহাভক্তের ভাবানুভূতি নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেন নি মোটেই। ববং একদিকে রাজা ও রাজবংশের প্রতি একান্ত আনুগত্যের ছাপ আছে, কারণ তাতে কবির আধিভৌতিক উন্নতির সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। অন্যদিকে 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রচনায় তিনি তাঁর যুগ ও রাজসভা-পরিবেশের রতি-রভস আকাঙক্ষাকে চরম অভিব্যক্তি দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, মধ্যযুগবিনষ্টির গ্রাম্য রুচি ও স্থূল প্রকাশ-দুষ্ট কাব্যকথাকে তিনি নাগরিক অভিজাত রুচির সীমানায় টেনে তুলেছেন। এখানে তাঁর প্রতিভা ছিল কবি জয়দেবের শিল্পকীর্তির প্রায় সমতুল। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের দেহ-লোভাতুর স্থূল প্রেম-কথাকে রস-সমুজ্জ্বল সর্বজনীন রূপ দিয়েছিলেন। ভাবতচন্দ্র তাঁর যুগে অশ্লীল, এমন কি ইতর-হয়ে-পড়া, বিদ্যাসুন্দরের শৃঙ্গাব-প্রমত্ততাকে সুখপাঠ্য সরসতা দান করেছেন। তাঁর প্রকাশের শালীনতা ও সৌষ্ঠব রুচিব নাগরিকতা ও বিদগ্ধতা, বাংলা কাব্য-ভাষাকে নূতন মুক্তির পথ দেখিয়েছে। মুন্সিয়ানা ও দূবদর্শিতায় পূর্ণ তাঁর রচনার বহু অংশ আজও জন-প্রবাদরূপে সুপ্রচলিত ঃ—

ভাবতচন্দ্রেব কবি-প্রতিভা ও ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

"যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।"
"নীচ যদি উচ্চভাষে
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" ইত্যাদি।

বিদগ্ধ কলাকর্মের সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র যথার্থ অধিকারীর মতোই তাঁর পূর্বৈতিহ্যের সদ্‌ব্যবহার করেছেন। কেবল তৎসম শব্দ ও বাগ্‌ বিন্যাসই নয়, বহু জায়গায় তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত ইত্যাদি সংস্কৃত ছন্দের সার্থক প্রয়োগ করে, মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের গতানুগতিকতায় নূতন রূপসুষমারও সংযোগ কবেছেন। অন্যদিকে ধামালি ও লোক-গীতির ছন্দ, ও 'বনী-মিশাল' বাক্‌শৈলীর ব্যবহারে রচনাব বিচিত্রতা ও বিদগ্ধ উজ্জ্বলতা গেছে বেড়ে। কাব্য-বিষয়ের বহু অংশে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর নবীন ভাষা ও ব্যক্তিত্ব-দীপ্ত প্রকাশ-ভঙ্গী পুরাতনকে নূতন রূপে রচনা করেছে, রবীন্দ্রনাথ কবি-ভারতচন্দ্রের শিল্প-কীর্তির ফলশ্রুতি ঘোষণা করে বলেছেন,—"রাজসভা-কবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত। যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।"

ষোড়শ অধ্যায়
বিপর্যয় যুগের সাহিত্য

আগে বলেছি, ভারতচন্দ্রকে মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধি-লগ্নের কবি বলে অভিহিত করা হয়। আর ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কাল থেকে গণনা করা হয় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের উদ্ভব। অপর পক্ষে এই আধুনিকতর উৎস হিশেবে বাঙালির ইংরেজ- সংসর্গের কথাও বলা হয়ে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পরেই এ-দেশে ইংরেজ অভ্যুদয়ের পথ ক্রমশ অবারিত হয়ে উঠেছিল। আর আগে দেখেছি, ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'-এর রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৭৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে। যদিও এর পরেও ১৭৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবি জীবিত ছিলেন, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রভাব 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সুচিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। অতএব ১৭৫২-৫৩তে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার পরে এবং ১৭৫৭-য় ইংরেজ অভ্যুদয়ের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয়তার সমাপ্তি এবং আধুনিকতার অঙ্কুর-উদগম হয়েছে,—এটুকু সাধারণ মোটা হিশেব।

বিনষ্টি বনাম নবজাগরণ

কিন্তু ইতিহাসের হাতে জীবনের বিকাশ কখনোই এমন অকস্মাৎ ঘটে না। অনেক দিনের অনেক চেষ্টা, অনেক ত্যাগ ও দুঃখ বরণের পরিণামে তবেই নূতন যুগের ঊষার আভাস অঙ্কুরিত হতে পারে। অতএব, পলাশির যুদ্ধ, অথবা তার পরবর্তী কোনো এক বিশেষ দিনে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের ভাব-রূপের আগাগোড়া কাঠামো পালটে গিয়ছিল, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। তাছাড়া বাঙালির বৃটিশ সংসর্গের প্রাথমিক ইতিহাস মোগলযুগের চেয়েও ব্যাপক বিনষ্টিতে পূর্ণ! বস্তুত সেই বিনাশের গভীরেই নব-যুগের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হচ্ছিল ; শুক্‌নো ঝরা ফুলের বৃন্তে যেমন দেখা দেয় নবীন ফলের অঙ্কুর। পলাশির পর থেকে রামমোহন রায়ের কলকাতায় স্থায়ি বাসস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত (১৮১৩ খ্রিঃ) এই জাতীয় বিধবংসের পথ রোধ করার সার্থক চেষ্টা হয় নি বড় একটা। এই সময়-সীমার মধ্যেই আধুনিকতার অঙ্কুর উদগমের ইতিহাস সন্ধান করবো এবারে।

প্রথমেই বলতে হয়, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব উজ্জ্বল বিকাশের একমাত্র বা প্রধান কারণ ইংরেজের সান্নিধ্য জনিত—এই ধারণা ইতিহাসের বিচারে সঠিক নয়। বাঙালির আগে, এবং প্রায় সমসময়ে ভারতবর্ষের আরো একাধিক প্রদেশবাসী এই সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের জীবন বা সাহিত্যে এমন আমূল পরিবর্তনের আলোড়ন দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। অতএব, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সকল গৌরব ইংরেজি সাহিত্য-দর্শ-বিজ্ঞানের নয়, সেকালের ভারতীয় ইংরেজদের তা একেবারেই নয়। দীর্ঘদিন ব্যাপী ধ্বংসের গ্লানি জীবনের মূলে দুর্জয় ক্ষোভ পুঞ্জিত করে তুলছিল, সেই সঙ্গে ছিল মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। বাঙালি মানসের সেই ক্ষোভ ও বাসনা শান্তি ও মুক্তির আশ্রয় পেয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের অগ্নিতপ্ত সেদিনকার ইংরেজি সাহিত্য-দর্শনের মধ্যে।

নবজাগরণের স্বভাব

সেই বৈপ্লবিক অগ্নিযজ্ঞে ইংরেজের জ্ঞানভাণ্ডার ঘৃতভাণ্ড হয়েছিল ; আর সমিধ হয়ে জ্বলেছিল দীর্ঘ দিনের বিনষ্টিশুষ্ক বাঙালির প্রাণ। ইংরেজি সাহিত্য-দর্শনের ঘৃত-সংযুক্তি ঘটেছিল আরো পরে। কিন্তু বাঙালির শুষ্ক প্রাণস্রোতকে সম্পূর্ণ নীরস রুক্ষ সমিধে পরিণত-করবার ভূমিকা আলোচ্য সময়-সীমার মধ্যেই প্রধানভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেদিনকার ভারতীয় ইংরেজরা।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রসঙ্গে বলেছি, মোগল অধিকারের শোষণের ঐতিহ্যকে বহন করেই এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মোগল বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলপরিণামকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পরে ঃ—

(১) ভূমি-নির্ভর গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বদলে এই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত মুদ্রানির্ভর নূতন অর্থনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। ফলে শহর ও গ্রামে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় অখণ্ড বাঙালি জীবন ; আব এই ফাটল কেবল বাড়তে থাকে অর্থলোলুপ মানুষের অন্ধ আত্মপরতার প্রভাবে।

বিনষ্টিব লক্ষণ

(২) গ্রাম-নগরের এই বিভেদের ফলে, গ্রামীণ জীবনই কেবল নিঃস্ব হয়ে পড়ে নি, নাগরিক সমাজও রুচি, শিক্ষা এবং সুস্থ চিন্তার অভাবে দেউলে হয়ে পড়েছিল। একদিকে অর্থ সঞ্চয়ের অন্ধ ব্যাকুলতা, আর একদিকে মোগল-নগরীর নারীলোলুপতা এদের শরীর ও মনকে এক সঙ্গে জীর্ণ করে তুলছিল।

(৩) অতি লাভের লোভ কেবল নাগবিক ব্যক্তি-জীবনেই প্রধান হয়ে ওঠেনি, রাষ্ট্র-শাসকেরা স্বনামে এবং বেনামে ব্যাবসায়িক একাধিপত্য বিস্তারেও উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে শাসনের পথ রুদ্ধ হয়েছিল, অথচ শোষণের আকাঙক্ষা গিয়েছিল বেড়ে।

মোগল যুগের সবচেয়ে চরম দুর্ভাগ্য, প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভারসাম্য বিচূর্ণ হল, অথচ নতুন বাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বিধিও গড়ে উঠলো না। মাঝে থেকে নৈতিক ব্যভিচার, অমানুষিক স্বার্থপরতা, এবং আত্মসর্বস্ব পরপীডনেব অপরাধে অতলে ডুবে যেতে লাগল আপামর জাতীয় জীবন।

ইংরেজ অধিকারের প্রথম ধাপে এই সর্বাভিমুখী বিনষ্টির ধারা আরো ব্যাপক আর দ্রুত হয়ে উঠলো। সাধারণ ধারণা, ইংবেজেরা যতই বিবেকহীন হোক্ দেশপ্রেম এবং জাতীয়তা-বুদ্ধি তাদের মজ্জাগত। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা যুগের ইংরেজ কর্তারদের সম্বন্ধে এ-কথা একেবারেই প্রযোজ্য নয়। স্বয়ং ক্লাইভ, পলাশির বিজয়ের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির উন্নতির চেয়েও নিজের স্বার্থের কথা বেশি ভেবেছিলেন। মীরজাফরকে মসনদ দানের মূল্য স্বরূপ ক্লাইভ তাঁর ব্যক্তিগত খাতে উপার্জন করছিলেন ২০,৮০,০০০ টাকা। বলা বাহুল্য, এই অর্থার্জন কোনো অংশেই আইন-সংগত ছিল না ; নীতিগত ঔচিত্যের তো প্রশ্নই ওঠে না।

কোম্পানির স্বার্থ এবং জাতীয়. মর্যাদাকে পদদলিত করে সেকালের ভারতীয় ইংরেজদের আত্মগত দলাদলির চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছিল ওআরেন্ হেসটিংস ও তাঁর সহকর্মী ফিলিপ ফ্রান্সিসের কদর্য বিবাদের মধ্যে। মহাবাজ নন্দকুমার এই গ্লানিকর বিসংবাদের যূপকাষ্ঠে ভয়াবহ বলি।

বলা বাহুল্য, ইংরেজ চরিত্রের এই দীনতা, অর্থ-লিপ্সা ও শোষণ-বৃত্তি দেশীয় পদাধিকারী ধনবানদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, মধ্যযুগের সমাজ-পালক, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী বাঙালি জমিদার গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার এঁদের মধ্যে ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই মোগল বাংলায় দেওয়ান হয়ে আসেন মুর্শিদকুলি খাঁ। রাজস্ব আদায়ের জন্য ইনি আর প্রাচীন জমিদারদের ওপর নির্ভর করলেন না, ইজারাদার নমে এক মধ্য-মুনাফাভোগী

কন্ট্রাকটর দল সৃষ্টি করলেন। নির্মম শোষণ, লোলুপ অর্থ-পিপাসা, এবং অদম্য স্বার্থচিন্তা এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজ-দরবারের প্রাপ্য মিটিয়ে দিলে এদের পৈশাচিকতাকে নির্বাধ হতে দিতে মুর্শিদকুলির কোনো আপত্তি ছিল না। ক্রমে এরাই হয়ে উঠলো জমির মালিক। বংলাদেশে এখান থেকেই একমুখী সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সূচনা। ইংরেজেরা দেশের মালিক হয়ে রাজস্ব ইত্যাদির জন্যে এদের ওপরে আরো বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে থাকেন। অন্যদিকে দেশি-বিদেশী বাণিজ্যের সহায়ত করেও ভাণ্ডাব অজস্র অর্থ সঞ্চিত হতে থাকে। সেকালের ইংরেজদের দেখে নাগরিক বাঙালির এই ধারণা মজ্জাগত হয়েছিল যে, অর্থার্জন ও ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্যে কোনো আচরণই পাপ নয়, এ-সব কিছুব পরিবর্তে কিছু সামাজিক দান-খয়রাত, কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান করলেই সকল পাপের ভাব লঘু হ'য়ে যায়। ফলে, কি বিদেশী শাসক, কি দেশী সহযোগী, সকলের মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ লুপ্ত প্রায় হয়েছিল। বিশেষ করে দ্বৈত শাসনকালে ইংরেজদের হাতে অর্থার্জনের অবাধ অধিকার ছিল, কিন্তু সুশাসনের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ছিল না। এর ফলে যে অবাধ নির্যাতন ও অকথ্য পীড়ন অবারিত হতে পেবেছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বাংলাদেশের প্রথম মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ '৭৬-এর মন্বন্তরের ঐতিহাসিক বিভীষিকা।

এমন অবস্থায়,—সুস্থ মানবিক মূল্যবোধ যখন একেবারে লুপ্ত হয়েছে, প্রাচীন সমাজ-জীবন আমূল বিধ্বস্ত, অথচ নবীন জাগৃতির বিন্দুমাত্র পরিচয় কোথাও অঙ্কুবিত হয় নি, সুস্থ পূর্ণাঙ্গ শিল্প-রচনা তখন অসম্ভব। এই সময়ের মধ্যে দু'রকমের সাহিত্যকর্মের পরিচয়ই কেবল পাওয়া যায়—এক কবিগান, আর এক গদ্য-রচনার অপূর্ণ খণ্ডিত প্রয়াস। কবিগান কবিতা হিশেবে খুব উৎকৃষ্ট নয়, আব সেকালের গদ্যরচনায় সাহিত্যিক মূল্যের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ঐ সব বিশীর্ণ-ক্ষীণ প্রয়াসের অন্তরালেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোপন স্বভাব।

বিনষ্টি-যুগেব নবীন সাহিত্য

লক্ষ করলে দেখব,—স্বাধীনতা-পূর্ব আধুনিক বাংলা সাহিত্য ছিল একান্তভাবে নগরসীমা-সংকীর্ণ। বৃহত্তর জনজীবন থেকে সহজ বিমুখতা এই আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যকে প্রথম অবস্থায় তীব্র স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় করেছিল। মধ্যযুগের আস্তিক্যবাদী সমাজ-প্রেমিক গ্রামীণ সহিত্য-ধারার ওপরে রূপ এবং ভাবগত প্রথম ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়েছে কবিগানে, বিশ্বাস-ভ্রষ্ট মানুষের ক্ষণিক লোভের উল্লাস-উত্তেজনাকে বক্ষে ধরে সমাজ-বিমুখ ব্যক্তি-সুখপিয়াসি এই অপূর্ণ গঠিত কবি কর্মের জন্মের সূত্রে।

অন্য দিকে, মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল প্রায় আগাগোড়া পদ্য-প্রধান। গদ্যের সৃজন-প্রয়াসে বাস্তব প্রয়োজনের প্রতি উৎকণ্ঠা ও বিচার-যুক্তিসিদ্ধ রচনার প্রতি নবীন জীবনের আগ্রহের অঙ্কুর,—অদৃশ্য রূপে হলেও উদগত হতে পেরেছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়
কবিগান

কবিগানের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা রচনা সহজ নয়। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিনষ্টি কালে এই শ্রেণীর রচনা-প্রবাহ একাধিক শতাব্দীতে ব্যাপ্ত হয়েছিল , আর তাদের রূপও ছিল বিভিন্ন রকমের। কত বিচিত্র ধরনের রচনাকে কবিগানের আওতায় ফেলা যেতে পরে, তার মোটামুটি হিশেবে দিয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস ঃ—"বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ্ আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীতি প্রভৃতি নানা বিচিত্রনামা বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্ম লাভ করে।" 'কবি' বলতে অশিক্ষিত-পটু স্বভাব-কবিদের বোঝাত। সেদিনকার বিস্রস্ত-ভঙ্গুর সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার অবকাশ প্রায় কারোই ছিল না। তা ছাড়া, আগে সাহিত্য রচনার একটি আলংকারিক অথবা সংস্কারগত মান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নতুন বিনষ্টির যুগে পুরাতন জীবনবাণীর মতোই প্রাচীন রূপাঙ্গিকও শিথিল বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই শ্রেণীর রচনার কাব্যিক উৎকর্ষ অলঙ্কার-রস-সিদ্ধ নয়। তাই এর রচয়িতারাও 'কবি' নন,—'কবিওয়ালা' নামে পরিচিত ; আর তাদের রচনা 'কবিতা' নয়, –'কবিগান'।

কবিগান-পরিচয়

কবিগানের গঠন ও বিকাশ একাধিক শতকে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও, এই শ্রেণীর রচনার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাবের সময়-সীমার মধ্যে। আর সেকালের কলকাতাই ছিল এই গীতি-ধারার প্রধান পীঠভূমি, যদিও আগে-পরে দুর্বলতর আকারে কবিগানের প্রসার গ্রাম-বাংলাতেও যথেষ্ট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কবিগানের উদ্ভব-ইতিহাসকে প্রাঞ্জল ভাষায় পরিচায়িত করেছেনঃ—"ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল। তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত—তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

ইতিহাস

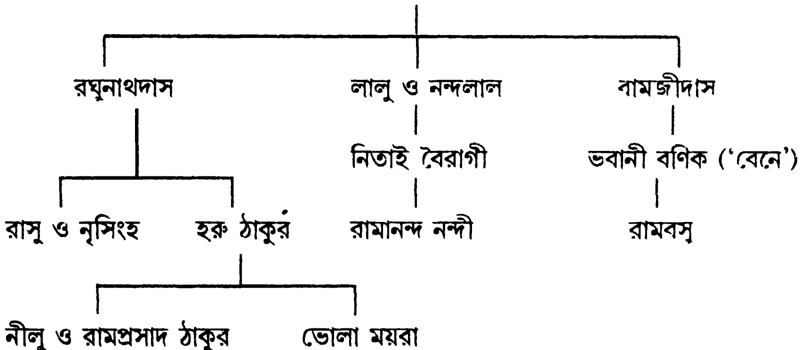
এই 'আমোদের উত্তেজনা'র উদ্দেশ্যেই হয়ত কবিগানের বহিরঙ্গ কাঠামো গাঁথা হয়েছিল পদ্য বিতণ্ডার আকারে। 'কবির গান' পাঠের উদ্দেশ্যে রচিত হত না। দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক বা 'কবিওযালা' আসরে অবতীর্ণ হয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পদ্য বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন। একজন প্রথমে 'চাপান' গাইতেন,—অর্থাৎ বিতর্কিতব্য বিষয়ের অবতারণা করতেন। অপরজন সেই 'চাপান'-এর 'উতোর' বা উত্তর রচনা করতেন। তার প্রত্যুত্তর দিতেন প্রথম পক্ষ ; দ্বিতীয় পক্ষ রচনা করতে। আবার তার উত্তর। এই সব উত্তর-প্রত্যুত্তর সবই পদ্যে রচিত হত ; এবং ঢাক-করতাল সংযোগে গীত হত। প্রথম প্রথম 'কবির গান' করবার আগে দুই প্রতিপক্ষ মিলিত হয়ে বিতর্কের বিষয় এবং 'চাপান' ও 'উতোর' পর পর রচনা করে নিতেন ; এবং আসরে সেই পূর্ব-প্রস্তুত গানই গেয়ে যেতেন একের পর এক।

কাব্য-স্বভাব

কোনো সময়ে অভিজ্ঞ গীতি-রচয়িতাদের দ্বারাও কিছু কিছু গান লিখিয়ে নেওয়া হত। পরে এই পদ্ধতি উঠে যায়, এবং আসরেই 'চাপান' ও 'উতোর' তৎক্ষণাৎ রচনা করে গাইবার রীতি প্রবর্তিত হয়। এতে রচনার ধীরকল্পিত সৌন্দর্য কমে গিয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের চাক্‌চিক্য প্রধান হয়ে ওঠে।

আগে বলছি, কবিগান রচনার ভাব ও রূপ-প্রকৃতি দুই-ই ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারার থেকে পৃথক ও অভিনব। কিন্তু পরে, এই অশিক্ষিত-পটু স্বভাব-সৃষ্টিব ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল নূতন এক আঙ্গিকগত সংস্কার। ফলে, কবিগানও ক্রমশ গুরুগম্য বিদ্যায় পরিণত হয়ে পড়ে। কবিয়াল-এর জীবিকা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা তখন শ্রেষ্ঠ পূর্বসূরীদের কাছে কবিগান রচনার পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। এইরূপে গুরু-পরম্পরায় কবিওয়ালাদের পূর্বসূত্র সন্ধান করে প্রায় আড়াইশ বছর আগে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব। 'সংবাদ প্রভাকর'এর সুখ্যাত সম্পাদক গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রই কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আজও এ-বিষয়ের গবেষণা তাঁর পরিবেশিত তথ্যের চেয়ে আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পাবেনি। ১২৬১ বাংলা সালে গুপ্তকবি লিখেছিলেন,"...১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল, গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনীদের গৃহে গাহনা করিতেন।" গোঁজলা গুঁই থেকে শিষ্য-পরম্পরায় কবিওয়ালাদেব ইতিহাস নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পরে ঃ—

কবিওয়ালা পরিচিতি



গুপ্তকবি গোঁজলা গুঁই-এর একটি মাত্র পদ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। পদটিব আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ—

গোঁজলা গুঁই

"এসো এসো চাঁদ বদনি।
এ রসে নীরস করো না ধনি।।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ।
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ।
তুমি আমার তায় রতন মণি।"

গোঁজলা গুঁই-য়ের শিষ্য চারজন সম্বন্ধে প্রায় কোনো খবরই জানা যায় না। এঁদের প্রত্যেকেরই শিষ্যরা প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ক্ষমতাবান শিষ্যদের রচনার প্রাধান্যে হয়ত গুরুদের কবি-কর্ম প্রায়ই হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে শিষ্যদের

উদ্ধৃতিতে। রঘুনাথ, লালু-নন্দলাল এবং রামজীদাস-এর মধ্যে কেবল দ্বিতীয়োক্তদেরই রচিত একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে. কবিগানের ইতিহাসে পদটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য ঃ—

লালু ও নন্দলাল

"হলো এই সুখ লাভো পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে।।
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার গিয়েছে না যাবে কুল
ডুবেছি না ডুব দেখি পাতাল কতদূর।"

ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন, লালুর পুরো নাম ছিল লালচন্দ্র। ইনি আর নন্দলাল দুই সহোদর ছিলেন।

গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্যদের মধ্যে রঘুনাথ দাসের শিষ্য-ভাগ্যই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। এঁদের মধ্যে রাসু ও নৃসিংহ ছিলেন দুই সহোদর ; দু-ভাই মিলে একটি কবির দল চালাতেন। রাসুর জন্ম হয় ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ; নৃসিংহ জন্মেছিলেন ১৭৩৮-এ। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পরে দুইজনেই রঘুনাথ দাসের কাছে কবিব গান শেখেন। ফরাসি চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এঁদের কবির দল প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। সখী সংবাদ ও বিরহেব গান বচনাতে এঁদের দক্ষতা ছিল বেশি। কবির গানের ভাবে এবং বর্ণনায় লঘুতা আর বিশ্বাসের অভাব থাকলেও মধ্যযুগীয় কাব্যের বিষয়বস্তু নিয়েই এঁরা প্রধা[illegible] 'গান' বচনা করতেন। বলা হয়েছে,—"কবির আসরে প্রথমতঃ ভবানী বিষয়, পরে সখীসংবাদ, তাবপর বিরহ এবং সর্বশেষে লহর বা খেউড গাইবার নিয়ম।" রুচির অপকর্ষ এবং সংখ্যাব আধিক্যে খেউড় কবিগানের ইতিহাসকে আবিল করে রেখেছে। সখীসংবাদ এবং বিরহের কবিগানই বিষয় ও রচনার উৎকর্ষে সবচেয়ে হৃদ্য। রাসু ও নৃসিংহের বাঁধা গান বিষয়-সৌন্দর্য ও অনুভূতির আন্তরিকতায় সত্যই মধুব। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে রাসুর মৃত্যু হয় , নৃসিংহ তার পরেও আরো কিছুদিন বেঁচে ছিলেন।

বাসু ও নৃসিংহ

বাসু-নৃসিংহের চেয়েও কবিওয়ালা হিশেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন হরু ঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি। কলকাতার সিমলায় কবির জন্ম হয় ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে। পুথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর আবাল্য বিবাগ ছিল। এগাব বছব বযসে পিতৃহীন হয়ে হরেকৃষ্ণ প্রথমে সখের একটি কবিদল গড়ে তোলেন। পরে ক্লাইভ-এর দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এটি এক পেশাদারি দলে পরিণত হয়। প্রথমে গান বাঁধতে শিখবার সময়ে রঘুনাথ দাসকে দিয়ে কবি সংশোধন করিয়ে নিতেন। এই কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিশেবে হরেকৃষ্ণ নিজের রচিত কোনো কোনো গানে গুরুর ভণিতা যোগ করেছেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হরু ঠাকুর

হরু ঠাকুরের কিছু কিছু 'কবিগান' রচনাগুণে উৎকৃষ্ট। অবশ্য, 'কবির লড়াই' অর্থাৎ বিতণ্ডার ব্যাপারেই তাঁর দক্ষতা ছিল বেশি। বলাবাহুল্য, রুচির বাধা অনেক সময়েই কবি স্বীকার করেন নি। হরু ঠাকুরের রচনার চরমোৎকর্ষের একটি নিদর্শন ঃ—

"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে।।
শুনেছো কখনো জ্বলন্ত আগুনে।
বসনে বন্ধন রাখে।।
প্রতিপদের চাঁদো হরিষে বিষাদো
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।

দ্বিতীয়ার চাঁদো কিঞ্চিতো প্রকাশো
তৃতীয়ার চাঁদো জগতে দেখে।"

নিতাই বৈরাগী

নিত্যানন্দ দাস বা নিতাই বৈরাগী ছিলেন লালু ও নন্দলালের শিষ্য. এঁর পিতা ছিলেন কুঞ্জদাস বৈরাগী। চন্দননগরে কবির জন্ম হয়েছিল ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে। গুরুযুগলের মতো নিতাই বৈরাগীর শ্রেষ্ঠ খ্যাতি ছিল সখীসংবাদ ও বিরহের পদের জন্য। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে এঁর দেহান্ত হয়।

ভবানী বেনেকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য রাম বসু। কবিওয়ালাদের ইতিহাসে রাম বসুর প্রতিভাই দীপ্ততম। কলকাতার কাছে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে শালকিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে কবির জন্ম হয়েছিল ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এঁর পুরো নাম ছিল রামমোহন বসু—পিতা ছিলেন র:মলোচন। কিছু ইংরেজি লেখাপড়া শিখে কবি প্রথমে কেরানির বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবিগানের নেশা তাঁকে চাকরি-ছাড়া করে। প্রথমে অন্যান্য কবিওয়ালাদের

রাম বসু

ফয়মায়েস মতো তিনি গান বেঁধে দিতেন। পরে নিজেই বিখ্যাত দল গড়ে তোলেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রামবসুর মৃত্যু হয়। এই স্বল্পায়ত জীবনের সীমাতেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালার মর্যাদা অর্জন করে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত লিখে গেছেন,—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু।"

রাম বসুর এই শ্রেষ্ঠতা ছিল বহুমুখী। রচনার হৃদ্যতা, বিষয়ের বিচিত্রতা ও প্রাচুর্য, এবং বুদ্ধি-দীপ্ত বিতর্কের উজ্জ্বলতা,—সব দিক থেকেই রাম বসু ছিলেন কবিওয়ালা হিশেবে অতুল্য। তাঁর রচনায় বিদগ্ধ আন্তরিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে নীচের অতি ক্ষুদ্র কবিগানটিতেঃ—

"জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখ গো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারি নে স্থির নির্ণয় করিতে।
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি,
নির্মল যমুনা জলেতে।।"

এঁর রচনার বিষয়-বিচিত্রতার বিবরণ দিয়েছেন ঈশ্বরগুপ্ত,—"রাম বসু ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর, সপ্তমী ['আগমনী'], শ্যামা বিষয়ের রণবর্ণনা ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদয় গান উত্তম করিতেন।" রাম বসুর লেখা আগমনী গানের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ঃ—

"গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন—
এল হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে, 'মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার.
দেও দেখা দুখিনীরে।'
অমনি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।"

এই শিল্প-দক্ষতা ছাড়াও রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি,—কবিগানের আসরে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ব প্রস্তুতিহীন তাৎক্ষণিক রচনার রীতি প্রবর্তন করেন। এর আগে প্রতিদ্বন্দ্বী কবিওয়ালারা আসরে আসবার আগে পরস্পর পরামর্শ করে গান বেঁধে আনতেন। আসরে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ 'চাপান' ও 'উতোর' রচনা করে গাইবার পদ্ধতি রাম বসুর প্রবর্তিত। এর ফলে কবির নিজের রচনায়,

অন্তত, হৃদ্যতার সঙ্গে উপস্থিত-বুদ্ধির যোগও ঘটেছিল।

রাম বসুর পরে কবিগানের ইতিহাসে উৎকর্ষের অভাব ঘটতে থাকে, ক্রমে ক্রমে এই ধারার বিলোপ ও বিনাশ ঘটে। তাহলেও গুরুপরম্পরায় পরিচায়িত ওপরের কবিওয়ালাদের তালিকার বাইরেও রাম বসুর পূর্ববর্তী আরো একাধিক কবির উল্লেখ প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে

কেষ্টা মুচি

কেষ্টা মুচি বা কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। হরু ঠাকুরের চেয়ে বয়োজেষ্ঠ হলেও এই বৃদ্ধের কাছে তরুণ কবিওয়ালা হরেকৃষ্ণকে একাধিকবার পরাজয় মানতে হয়েছিল। এঁর রচিত একটিমাত্র পদ্যাংশ এযাবৎ পাওয়া গেছে ; পদটি সত্যিই মনোরম।

এন্টুনি ফিরিঙ্গি অবাঙালি হয়েও বাংলা কবিগান রচনায় দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুরসিংহের সঙ্গে আক্রমণ-প্রবল লড়াই-এ প্রসঙ্গত তাঁর স্বচ্ছ কবি-প্রাণের প্রকাশ মনোহর হয়ে দেখা দিয়েছিল ঃ—

ঠাকুরসিংহ। "বলহে এন্টুনি আমি একটি কথা জানতে চাই,
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।।"

এন্টুনি। "এই বাঙলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।।"

কবিগানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আখড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই

আখড়াই

দলের মধ্যে যাদের গান, বাজনা ও সুর ভাল হত, তারাই জয়ী বলে ঘোষিত হতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কুলুইচন্দ্র সেন এই ধারায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার আগে "বাংলা এগার শতাব্দীতে আখড়াই সুরের উদ্ভাবন করেছিলেন শান্তিপুরের কতিপয় ভদ্রলোক।"

আখড়াই ভেঙে হয় হাফ আখড়াই। কবির লড়াই-এর মতোই এতে উত্তর-প্রত্যুত্তর রীতি

হাফ আখড়াই

আছে। কবিগানের সঙ্গে হাফ আখড়াই-এর পার্থক্য কেবল আঙ্গিকগত খুঁটিনাটিতে।

'টপ্পা'র সঙ্গে কবিগানের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। তাহলেও একই সময়ের নাগরিক রস-রুচিকে চরিতার্থ করবার আকাঙক্ষা থেকেই মূলত টপ্পার জন্ম। তাছাড়া শব্দযোজনা ও বাচনভঙ্গির দিক থেকেও কবিগানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। আখড়াই প্রবর্তয়িতা কুলুইচন্দ্র

নিধুবাবুর টপ্পা

সেনের আত্মীয় রামনিধি গুপ্ত বাংলা টপ্পার বিশিষ্ট উৎকর্ষ ও পরিণাম বিধান করেন। ইনি নিধুবাবু বা নিধুগুপ্ত নামে পরিচিত। ১১৪৮ বাংলা সালে রামনিধির জন্ম হয়, তাঁর পিতা ছিলেন হরিনারায়ণ গুপ্ত। কর্ম উপলক্ষে রামনিধি কিছুকাল বিহারের ছাপরা অঞ্চলে বাস করেছিলেন। তখন তিনি হিন্দি গানে পারদর্শিতা লাভ করেন। এখানেই তাঁর বাংলা টপ্পা গান রচনার আরম্ভ।

"টপ্পা হিন্দি শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতেই রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা"। টপ্পার হালকা সুরে একদা দেহলিপ্সু হালকা ভাবের অতিশয় চটক লেগেছিল। ফলে, টপ্পা বলতে সাধারণত আদিরসে সিক্ত একপ্রকার আবিল রচনার কথাই মনে করা হয়। কিন্তু টপ্পা আসলে এক পৃথক রীতির গান। স্বয়ং নিধুবাবুও টপ্পা সুরের গায়ে আবিল রুচির রং চড়িয়েছিলেন প্রচুর! কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি হচ্ছে, আলোচ্যযুগের দীনস্বভাব ভাবের আড়ষ্টতার মধ্যেও টপ্পার মাধ্যমে নূতন সূক্ষ্ম অনুভবের স্পর্শও সঞ্চারিত করেছিলেন তিনি ঃ—

'নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা,
পুরে কী আশা?"

মাতৃভাষার প্রতি চিরন্তন আবেদনে পূর্ণ এই আবেগ-আকৃতিও নিধুবাবুরই রচনা। ৯৭ বছর বয়সে কবির দেহান্ত হয় ১২৪৫ বাংলা সালে।

শ্রীধর কথক

নিধুর প্রভাবে টপ্পা-সাহিত্যের সুর ও শৈলী বৈচিত্র্য এবং বিস্তার লাভ করেছিল। বিখ্যাত শ্রীধর কথকও টপ্পার সুরে কথকতাকে ঢেলে সেজেছিলেন। শ্রীধর (১৮১৬) হুগলি-বাঁশবেড়ের প্রখ্যাত কথক লালচাঁদ বিদ্যাভূষণের পৌত্র ছিলেন। আর নিজে তিনি ছিলেন নিধুর শিষ্য। তাতেই তাঁর প্রতিষ্ঠা নবীন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। শ্রীধরের পিতার নাম ছিল রতনকৃষ্ণ শিরোমণি।

কালী মির্জা

কালী মজা কিংবা মীর্জা নামে বিখ্যাত কবিটিও আসলে ছিলেন টপ্পা সুরেরই গায়ক। শ্যামা-বিষয়ক গানে ছিল এঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। পলাশির যুদ্ধের বছর-কয় আগে হুগলির গুপ্তিপাড়ায় এঁর জন্ম হয়েছিল, পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায় এবং কবির পুরোনাম ছিল কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। স্বয়ং রামমোহন রায় এঁর কাছে গান শিখেছিলেন বলে জানা যায়।

রূপচাঁদ পক্ষী

'পক্ষি'র দলও নিধুবাবুকে 'কর্তা' বলে মান্য করত। পক্ষির দলের পক্ষিরা সকলেই ভদ্রসন্তান ও 'বাবু' ছিলেন। গঞ্জিকা সেবন এদের নেশা এবং সখ দুইই ছিল। অনায়াসে যে যত বেশি গাঁজা হজম করতে পারতেন, তিনিই তত বড় পক্ষি বলে বিবেচিত হতেন। পক্ষির দলে রূপচাঁদ পক্ষী সংগীত-চটক রচনায় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর ইংরেজি বাংলা মেশানো গান বিদ্রূপে, কৌতুকে সরসতায় বহুল উপভোগ্য হয়েছিল। রূপচাঁদের পিতার নাম ছিল গৌরহরি দাস, মূল বাড়ি ছিল উড়িষ্যায়।

দাশুরায়ের পাঁচালি

পাঁচালিকার হিশেবে দাশরথি রায় বিখ্যাত। কবিগানের মতো পাঁচালিও আসরে গান করা হত, কিন্তু এতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। একজন গায়ক পায়ে নূপুর ও হাতে চামর মন্দিরা নিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে গান করতেন। ; তাঁর সঙ্গীরা বসে বসে বাদ্যাদিসহ সুর-যোজনা করতেন।

বর্ধমান জেলার বাঁধমুড়ি গ্রামে দাশরথির জন্ম হয়েছিল ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে। জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ; পিতার নাম ছিল দেবীপ্রসাদ রায়। দাশরথির গানে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার ও সুরের লালিত্য শ্রোতার হৃদয় জয় করে নিত। ইনি আগমনী-বিজয়ার বিষয়েও গান লিখেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

মধুকান-এর ঢপ

ঢপ কীর্তনের প্রবর্তয়িতা হিশেবে মধুকান বিখ্যাত। নূপুর ও চামরমন্দিরা সহ পাঁচালি গানের যে পুরানো ধারা ছিল, তারই বিবর্তনে কীর্তনের ঢং-এ নূতন গানের রীতি প্রচলিত হয়। তার থেকে জন্ম হয় ঢপ কীর্তনের। মধুকান-এর পুরো নাম ছিল মধুসূদন কিন্নর ; বাড়ি ছিল যশোহর জেলায়। ১২২০ থেকে ১২৭৫ বাংলা সালের মধ্যে ইনি জীবিত ছিলেন। অনুপ্রাসের উচ্ছ্বাস ও ধ্বনির চমৎকারিত্ব মধু-র রচনার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল।

যাত্রাগানও আসলে পাঁচালিরই পরিণতি কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। পাঁচালি একক গায়েনের গান ; বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপ গায়েন সেখানে একাই গান করতেন। যাত্রাগানে ভূমিকালিপি বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মধ্যে বণ্টিত হল। অভিনয়ের ব্যবস্থাও সুষ্ঠু করা হল ; কিন্তু

সংলাপের মাধ্যম থাকল গান। 'যাত্রা' শব্দের অর্থ রূপান্তরিত হতে হতে 'দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীর নাটগীতি' রূপে বিবেচিত হতে থাকে। এই অর্থেই যাত্রা বাংলার প্রাচীনতম নাট্যরূপ। এই নাট্যকলার মূলে বৈদিক কালের নাট্যাঙ্গিকের অবশেষও পণ্ডিতেরা কেউ কেউ লক্ষ করেছেন ; এবং অনুমান করেছেন, সম্ভবত প্রথম পর্যায়ে সূর্য ছিলেন যাত্রা কাহিনীর অধিদেবতা। পরে কৃষ্ণযাত্রা এবং আরো পরে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়। এই বিদ্যাসুন্দর নিয়েই কলকাতায় প্রথম সখের যাত্রাদল বাঁধা হয়। পরিচালক ছিলেন বহুবাজারের রাধামোহন সরকার, এবং প্রথম অভিনয় হয়েছিল রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে। গোপাল উড়ে এই যাত্রাদলে গান করে সুবিখ্যাত হন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর ইনি পেশাদারি দল গড়ে তোলেন।

সখের যাত্রা ও গোপাল উড়ে

কবিগানের আর একটি রূপান্তর তর্জা। তর্জা গানেও কবির মতো 'উতোর কাটাকাটি' রয়েছে। আসলে তর্জা ঝুমুর গানের মতো, গানের সঙ্গে নাচও আছে। রুচির দিক থেকে তর্জাগান খেউড়ের মতোই অপাংক্তেয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়
বাংলা গদ্যের অঙ্কুর-উদ্গম

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই আগে সাহিত্য রচিত হয়েছে পদ্যে, গদ্য এসেছে অনেক পরে। সাধারণত মনে করা হয়, পদ্য হচ্ছে আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের বাহন। গদ্যের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় মানুষের যুক্তি-চিন্তা সমন্বিত বিচারবোধ। একথাও মনে করা হয়ে থাকে যে, মানব-শিশুর মতো মানব সভ্যতাও প্রাথমিক অবস্থায় ছিল আবেগে উদ্বেল। হয়ত এই কারণেই মানুষের প্রথম ভাবানুভূতির আবেগ-কম্পিত প্রকাশও সকল কালে সর্বত্র পদ্যের মাধ্যমে। বহুদিনের জীবন-সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার শেষে কোনো জাতির মনে যখন যুক্তি-চিন্তার পারম্পর্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তখনই তার ভাষা-সাহিত্যে জন্ম নেয় সুগঠিত গদ্য। বাংলা ভাষাতেও পদ্যের প্রথম জন্ম লক্ষ করেছি, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সুগঠিত গদ্য রচিত হয়েছিল আরো প্রায় হাজার বছরের বেশিকাল পরে; মাত্র উনিশ শতকের মধ্যসময়ে এসে। অনেকটা এই কারণে মনে করা হয়, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এসেই বাঙালি মনে যুক্তি-চিন্তার বিস্তার ঘটেছিল। ফলে, বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনাও আসলে ইংরেজ-সংসর্গের দ্বারা প্রভাবিত। সন্দেহ নেই, বাংলা গদ্যের গঠনে কেবল ইংরেজি শিক্ষাই নয়, একাধিক ভারতীয় ইংরেজের দানও তুলনা-রহিত। কিন্তু একথাও সত্য যে, ইংরেজ আমলের আগেই বাঙালির মনে গদ্য রচনার আকাঙ্ক্ষা একটু একটু করে অঙ্কুরিত হচ্ছিল। সে গদ্যের দৈহিক গঠন ছিল এলোমেলো, ভাবের মধ্যেও ছিল আচ্ছন্ন মনের অস্পষ্টতা। তবু, অপূর্ণগঠিত ঐ গদ্য-শিশুর মধ্যেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম জন্ম।

গদ্যরূপের অঙ্কুর

বাংলা গদ্যের এই অঙ্কুর গঠনের ইতিহাসকে অনুসরণ করে পেছন দিকে পঞ্চদশ-চতুর্দশ শতকে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রসময় চম্পূ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। চম্পূ অর্থে গদ্য-পদ্যময় রচনা। অতএব চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির রচনাংশে গদ্য-ও ছিল, একথা মনে করা যেতে পারে। বিদ্যাপতি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের সব লেখাই ছিল বাংলা ভাষায়। 'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি' নামে একখানি 'সহজিয়া' গদ্য গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত আছে। তবে এর লেখক বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস নন, অপর কোনো সহজিয়া চণ্ডীদাস। আলোচ্য গ্রন্থের কোনো পুথিই সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে লেখা নয়। 'চৈত্যরূপ' এর ভাষা নিম্নরূপ :—

চৈত্যরূপ প্রাপ্তি

"চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল রা এতে বসিল।"

'দেহকড়চা' নামে আর একখানি সহজিয়া গদ্য গ্রন্থ রয়েছে নরোত্তমের নামে। ইনিই সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। গ্রন্থটির ভাষা নিম্নরূপ :—

দেহকড়চা

"তুমি কে ! আমি কে। আমি জীব। তুমি কোন্ জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা।

ভাগে। ভাগু কিরূপে হইল। তত্ত্ববস্তু হইতে।"

এই সব রচনার গ্রন্থকর্তার পরিচয় ও লিখনকাল বিষয়ে সংশয় আছে। এ ছাড়া সপ্তদশ শতকে শ্রীরূপ গোস্বামীর লেখা বাংলা গদ্য 'কারিকা'র সন্ধান পাওয়া গেছে। ভাষার পরিচয় :—"প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ ও স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী বাধিকাতেও বসে।"

শ্রীরূপের 'কারিকা'

অষ্টাদশ শতকে লেখা আরো একাধিক বৈষ্ণব সহজিয়া গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে। স্মৃতি, ন্যায়, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইত্যাদি বিষয়েও আলোচ্য সময়ে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ

কিন্তু বাংলা গদ্য রচনার নিশ্চিত সন-তারিখযুক্ত যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা একখানি চিঠি। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই চিঠি লিখেছিলেন আহোম-রাজা চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে। ভাষার পরিচয় নিম্নরূপ :—

বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিবন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

এই ভাষার বোধগম্যতা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, অন্তত চিঠি পত্রের ব্যবহারেও, বাংলা গদ্যের গঠন ষোড়শ শতকে প্রশংসনীয় আকার পেয়েছিল বলে এর থেকে মনে হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে লেখা বাংলা গদ্যের প্রামাণিক নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দুটি নিদর্শনই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত। সপ্তদশ শতকের লেখাটি একটি চুক্তিপত্রের দলিল .— রচিত হয়েছিল ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে। গদ্য রচনাভঙ্গি নিতান্ত বিস্রস্ত ; তাছাড়া সেকালে প্রচলিত দুর্বোধ্য বৈষয়িক ইসলামি শব্দের ব্যবহার অতিরিক্ত।

অষ্টাদশ শতকের লেখাটির নাম 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র'। যেমন বিষয়বস্তু, তেমনি তার ভাষা,- দুই ই কৌতূহলজনক :—

"মোং ভোজপুর শ্রীযুক্ত ভোজ রাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতী ষোড়ষ বরিস্যা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্র তুল্য, কেশ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ণ পর্য্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূ ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন,. . . ।"

বিক্রমাদিত্য চরিত্র

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের লেখা আরো বহু চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে। তাতে সেকালের বাংলা গদ্যের দুটি সমান্তরাল রূপ দেখতে পাওয়া যায়। নিজেদের মধ্যে পারিবারিক বা বৈষয়িক কারণে যখন ব্যক্তিগত পত্রাদি লিখিত হত, তাতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দাদির ব্যবহারই থাকত বেশি। সে ভাষা যেমন বোধগম্য, তেমনি তার গঠনও ছিল অপেক্ষাকৃত সাবলীল। কিন্তু যেসব চিঠি বা দলিল-দস্তাবেজ রাজদরবারে পেশ করবার জন্যে রচিত হত, তাতে মাত্রাতিরিক্ত, এমন কি অসংগত পরিমাণ, আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হত। ফলে ভাষার দুর্বোধ্যতা যেমন বাড়ত, গদ্য-দেহের গঠনেও তেমনি বিশৃঙ্খলা দেখা যেত বেশি। যে কোনো ভাষাতেই নূতন শব্দ এবং প্রকাশভঙ্গীকে আয়ত্ত করতে পারলে ভাষার বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, আরবি-ফার্সি ভাষার ব্যবহারকারী বাঙালিরা যে-কোনো রকমে বিদেশী রাজশক্তির মনস্তুষ্টি করতে চেয়েছিলেন,—ভাষাকে সুগঠিত করবার দিকে ঝোঁক ছিল না তাঁদের। রবীন্দ্রনাথের কথায়, সেদিন মুসলমানি রাজশক্তির "বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু

গদ্যরচনায় দেশীয় চেষ্টার ফলশ্রুতি

কোনো নতুন চিন্তা-রাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তাব মনকে চেতিয়ে তোলে নি।"

অতএব দেখছি, ইংরেজ সমাগমের আগে, বা ইংরেজ সংসর্গের বাইরে, দেশীয় উদ্যোগে বাংলা গদ্য রচনার প্রয়াস শুরু হয়েছিল অন্তত ষোড়শ শতাব্দী থেকে। কিন্তু অব্যবহিত প্রয়োজনন নির্বাহ করাই ঐ সব লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভাষা সুগঠিত করবার শৈল্পিক আয়োজনের কথা সেকালের গদ্য-লেখকেরা ভাবতেও পারেন নি।

বিদেশীদের মধ্যে প্রথমে গদ্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা। য়ুরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথমে এসেছিল ভারতবর্ষে,—১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে। ষোড়শ শতকের প্রথমভাগেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় এদের অনেক বাণিজ্য-কুঠি গড়ে উঠেছিল।

পর্তুগীজ প্রযাসে বচিত গদ্য

পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ছিল জলদস্যু ; যারা তা ছিল না, তাদের মধ্যেও সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রীতির ছিল একান্ত অভাব। এর মধ্যে বাংলা ভাষার কিছু কিছু চর্চা করেছিলেন পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা। ভাষার উন্নতি বা সুগঠন বিষয়ে তাঁদের কোনো চেষ্টাই ছিল না। বাঙালির কাছে যে-কোনো রকমে খ্রিস্টীয় ধর্ম-কথা বোধগম্য করে তোলাই ছিল এঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বাংলা গদ্যের বিশেষ গঠনরীতি বা প্রকাশভঙ্গিকে জানবার কোনো চেষ্টা তাঁরা করেন নি। ফলে, পর্তুগীজ ভাষারীতির কাঠামোর ওপরে সংগত বা অর্ধ-সংগত বাংলা শব্দ যোজনা করে এঁরা অদ্ভুত রকমের বাংলা গদ্য লিখে গিয়েছিলেন। তাহলেও স্বীকার করতে হয়, বিদেশীদের জন্য বাংলা ব্যাকরণ লিখবার প্রথম চেষ্টাও হয়েছিল পর্তুগজদের আওতায়। তাতে বাংলা ব্যাকরণের রীতি-পদ্ধতিকে সুগঠিত করবার কোনো আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না। পর্তুগীজ ব্যাকরণের কাঠামোয় বাংলা শব্দ-রূপ ও ধাতুরূপের একটি সাধারণ ধারণা পর্তুগীজ পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই ছিল ঐ প্রচেষ্টার একমাত্র প্রয়াস।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ যাজকদের বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার খবর পাওয়া যায় ষোড়শ শতকেই। ঐ সময়ে ঢাকা সোনার গাঁ-র জেসুইট ধর্মযাজক ফ্রান্‌সিস্‌কো ফেরনানদেস্‌-এর খ্রিস্টধর্ম-বিষয়ক দুখানি পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন দোমিনিক্ দে সুজা। সপ্তদশ শতকে ঐ অঞ্চলের ধর্মযাজকদের চেষ্টায় বাংলা ব্যাকবণ, শব্দকোষ, প্রার্থনা ও অপরাপব ধর্মপুস্তিকা রচিত হয়েছিল বলেও জানা যায়। কিন্তু এই সব, এবং আরো অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও, তাদের প্রত্যক্ষ কোনো নির্দশন মেলেনি। এপর্যন্ত পর্তুগীজ-চেষ্টায় লিখিত তিনখানি বই-এর পরিচয় পাওয়া গেছে। তার একখানি পাদ্রি মানো-এল্ দ্য-আস্‌সুমপ্‌-সাম্ এর লেখা। বাকি দুখানির লেখক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত বাঙালি জমিদার-পুত্র দোম্‌-এন্তোনিও।

মানো-এল-এর একমাত্র গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায়

মানোএল-এব কৃপারশাস্ত্রে অর্থভেদ

লেখা হয়েছিল ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন উপলক্ষে খ্রিস্টধর্মের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এতে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বই-এর ভাষা আলোচনা করে জানিয়েছেন,—এতে প্রায় আড়াইশ বছর আগেকার পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষাকে সাধুভাষার কাঠামোয় উপস্থিত করবার চেষ্টা রয়েছে।

পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের আওতায় লেখা, এপর্যন্ত প্রাপ্ত, সবচেয়ে মূল্যবান রচনা বাংলা গদ্যের একখানি ব্যাকরণ ও শব্দকোষ গ্রন্থ : Vocabulario em Idioma Bengalla c Portuguez। এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগ ব্যাকরণ; দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পর্তুগীজ-

বাংলা ও বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ। রচনার সময় ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ। ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান, বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণ, তথা শব্দকোষ, এই গ্রন্থটিও দীর্ঘকাল মানোএল দ্য আসসুমপ্ সাম-এর নামে প্রচলিত হয়ে আসছিল। বছর কয় আগে, লন্ডনের প্রাচ্য ও আফ্রিকা বিদ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াত অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে গেছেন, এই বইটি মানোএল-এর নয়, বাঙালি যাজক দোম্-এন্তোনিও-রই রচনা। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণের পরিকল্পনা ও রচনা যে একজন বাঙালিরই, এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় নেই।

দোম্ এন্তোনিও-র রচনা

পর্তুগীজ প্রবর্তনায় এপর্যন্ত পাওয়া তৃতীয় গ্রন্থটিও দোম্ এন্তোনিওরই লেখা :— 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ'। দোম এন্তোনিও, এখনকার বাংলাদেশে, ভাওযাল অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন।

আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থই ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালে লিস্‌বন নগরীতে মুদ্রিত হয়। তখনো বাংলা হরফ-এর আবিষ্কার হয়নি; তাই রোমান্ অক্ষরে এই বাংলা বই তিনখানির মুদ্রণ হয়েছিল। দোম এন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই, যদিও মুদ্রণ হয়েছিল রোমান্ হরফে। তিনখানি বই-এরই এক পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল, বিপরীত পৃষ্ঠায় বাংলা।

পর্তুগীজ রচয়িতাদের এইসব প্রচেষ্টা বাংলা গদ্যের গঠনে, বা ঐতিহাসিক বিকাশে উল্লেখ্য কোনো সহায়তা করতে পারে নি। তাহলেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গদ্য রচনার সুপরিকল্পিত চেষ্টার সূত্রপাত এখানেই। পর্তুগীজদের প্রবর্তিত এই চেষ্টার উল্লেখযোগ্য উন্নতি বিধান করেন ইংরেজ প্রয়াসীরা।

পর্তুগীজদের বেলা যেমন কেবল ধর্মযাজকদের মধ্যেই গদ্য রচনার প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল, ইংরেজদের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। একেবারে প্রথম দিকে ব্রিটিশ ভারতে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের উপস্থিতি আইন করে বারিত হয়েছিল। উইলিয়ম কেরির মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তিকেও প্রথমে ওলন্দাজ-অধিকৃত শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে ধর্ম প্রচার করতে হয়েছিল। তাই দেখি, পরবর্তী কালে ইংরেজ ধর্মযাজক ও শিক্ষাব্রতীদের চেষ্টাই প্রধান ভাবে বাংলা গদ্যকে গতিশীল করে থাকলেও, প্রথমে ঐ গদ্য রচনার কৃতিত্ব ইংরেজ সরকারের কর্মচারিগণেরই।

বাংলা গদ্য রচনায় ইংরেজ প্রয়াস

পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই এদেশের ভাষা শিখবার জন্যে ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধিদের প্রয়োজনবোধ প্রবল হয়েছিল। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে কটকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দেশী ভাষা না জানার দরুন পদচ্যুত হয়েছিলেন। ওআরেন হেস্‌টিংস্ ভারত শাসক হয়ে এসে বিদেশী শাসন-প্রতিনিধিদের জন্যে দেশী ভাষা শেখার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তারই ফলে, এন্. বি. হালহেড্-এর লেখা 'A Grammar of the Bengal Language' বই-এর প্রকাশ ঘটে। বাংলা গদ্য, এবং তার চেয়েও বেশি, বাংলা মুদ্রণ-পদ্ধতির ইতিহাসে এই বইখানি বিশেষ মূল্যবান ; এতেই সর্বপ্রথম বাংলা শব্দ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। বাংলা ছাপাখানার জন্ম হয় এই সূত্রেই।

হালহেডের ব্যাকরণ

হাল্‌হেডের মূল গ্রন্থ 'ফিরিঙ্গিদের উপকারার্থ' ইংরেজি ভাষায় লেখা। উদাহরণ হিশেবে কিছু বাংলা শব্দও তাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ শব্দগুলি মুদ্রিত করবার জন্যে চার্লস উইল্‌কিনসন্ ছেনি কেটে মুদ্রণযোগ্য বাংলা হরফের পত্তন করেন। হালহেড্ আর উইল্‌কিন্‌সন্, দুজনেই কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। দেশে

বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র

ফিরে যাবার আগে দ্বিতীয়োক্ত জন, পঞ্চানন নামে এক কর্মকারকে এই অক্ষর তৈরি করার পদ্ধতি শিখিয়ে গিয়েছিলেন। স-পুত্র পঞ্চানন পরে বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেন।

আগে বলেছি, হাল্‌হেড-এর ব্যাকরণ ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্যে রচিত হয়। এ ছাড়া দেশীয় ভাষায় আইন বিষয়ক নানা গ্রন্থও অনুবাদিত হয়েছিল। বাংলা শেখবার শব্দকোষ এবং সহজ-প্রবেশ (tutor) জাতীয় গ্রন্থিকাও প্রচুর লিখিত হযেছিল। কিন্তু বাংলা গদ্যের সুগঠনে এদের প্রত্যক্ষ দান কিছু নেই।

এবিষয়ে ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগই প্রথমে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য নাম উইলিয়ম কেরি ও জশুয়া মার্শম্যান-এর । ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা

কেরির বাইবেল

ওলন্দাজ-অধিকৃত শ্রীরামপুরে ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেরি এবং মার্শম্যান দুজনেই পূর্বাবধি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফলে. বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে সহজ-সাধ্য হয়েছিল। ক্রমে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কেরি ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর থেকে নিউ টেস্টামেন্ট-এর আগাগোড়া বাংলা অনুবাদ বাংলা হরফেই মুদ্রিত হয়। এই উপলক্ষেই বিখ্যাত শ্রীরামপুর প্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠা।

এই গ্রন্থের ভাষা অতিশয় দুর্বল এবং নানা রকমে ত্রুটিবহুল; একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষা আরো অনেক সুগঠিত হতে পেরেছিল। বাংলা ভাষার বক্তব্যকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে, প্রথম থেকেই এই আকাঙক্ষা শ্রীরামপুরের লেখকদের প্রভাবিত করেছিল । ফলে, ভাষার বাক্যরীতি ইংরেজি-ঘেঁষা হলেও তাতে প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতার অভাব কম। এখানেই পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের তুলনায় ইংরেজ যাজকদের স্বকীয়তা এবং উৎকর্ষ।

উনবিংশ অধ্যায়
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংলা গদ্য

শ্রীরামপুরে কেরির নিজের লেখা বাইবেল বাংলা গদ্যরচনার ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে পারে নি ; অথচ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁরই পরিচালনা ও পরিকল্পনায় রচিত বহু গ্রন্থ বাংলা গদ্যে নবযুগের সূচনা ঘটিয়েছিল।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ৪ ঠা মে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের বিঘোষিত নীতি ছিল বিদেশী সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা। কলেজটির জীবৎকালে এই উদ্দেশ্য বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারে নি। ফলে অনেক উৎসাহের মধ্যে জাত প্রতিষ্ঠানটির অকালমৃত্যু হয় একান্ত দুরবস্থার মধ্যে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছিল বাংলা গদ্য রচনার। আর তার কৃতিত্ব ছিল উইলিয়ম কেরির। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমে সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষক হিশেবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন। ১৮০[illegible] সালে ঐ দুই বিষয়ের অধ্যাপক ও সর্বাধ্যক্ষ পদে উন্নতি লাভ করেন। প্রথম থেকেই সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ দুটির দায়িত্ব কেরির ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্দেশ্য

পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি প্রথমে বাংলা গদ্য পুস্তকের একান্ত অভাব অনুভব করেন। তখন কেরির প্রথম কাজ হল বাংলা ভাষায় পাঠযোগ্য গদ্যপুস্তক রচনা করিয়ে নেওয়া। প্রথমত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য-তালিকায় ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, [illegible], অলংকার-শাস্ত্র, ইত্যাদি নানা বিষয়ের স্থান হওয়া উচিত। এদিক থেকে রচিতব্য গ্রন্থে[illegible] বিষয়াবলির পরিকল্পনাও তাঁকেই করতে হয়েছিল সুচিন্তিতভাবে। আর এই জন্য প্রথম থেকেই নির্ভরযোগ্য একদল শিক্ষক-রচয়িতাকে খুঁজে বার করতে হয়েছিল তাঁর। তাছাড়া, নূতন রচনার ভাষা যাতে কেবল বোধগম্য নয়, বাংলা ভাষার গঠন-রীতি-সম্মতও হয়, সে-বিষয়ে কেরির অবধান ছিল প্রখর। তিনি বুঝেছিলেন,—কোনো ভাষা শিখতে হলে, ভাষা-ভাষীদের বাচনভঙ্গির অনুসরণ অবশ্যই করতে হবে। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরির ব্যক্তিগত প্রয়াস প্রথমেই 'কথোপকথন' গ্রন্থের সম্পাদনাতে নিযুক্ত হয়েছিল। এককালে মনে করা হত,—এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ স্বয়ং কেরির রচনা। এখন সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে,—কোনো অংশই হয়ত তাঁর নিজের লেখা নয়। তা হলেও, গোটা গ্রন্থটিরই পরিকল্পনা যে তাঁর, তাতে কিছু সংশয় নেই। এই বৃহৎ গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চ-নীচ সমাজে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার পরিচয় উদ্ধার করা হয়েছে। সর্বত্রই যে মূল ভাষার যথার্থ প্রতিরূপ উদ্ধৃত আছে, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার মূল বাঁধুনিটি এই বিচিত্র রূপাবলির প্রায় সর্বত্রই আভাসিত হয়েছে :—

'কথোপকথন' ও কেরি

" 'তোমরা কয় যা।'
'আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা।'
'কেমন যা-য় যা-য় ভাব আছে, কি কালের মত।'
'আহা ঠাকুরাণী, আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড়,
আমাকে তাহারা অমুক-বুদ্ধিও করে না।' "

কিন্তু 'কথোপকথন'ই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ নয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বছরেই এর পূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) লেখা 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। তা হলেও, মুন্সি রামরাম যে কেরির আর্দশবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা গদ্যের গঠনের পথে সংস্কৃত ভাষার প্রতি কেবির আস্থা ছিল সমধিক। রামরাম বসু নিজে সংস্কৃত না জানলেও সংস্কৃতানুসারিতার হাস্যকর চেষ্টাও করেছেন অনেক। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-র ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন,—"আমি তাহাদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি"—অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের স্বজাতি ছিলেন তিনি। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য ছিলেন বারভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা; আকবরের বঙ্গ-বিজয়ের বিরোধিতা করে এক কালে তিনি শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের মর্যাদা পেয়েছিলেন। স্বাজাত্য-বোধের ফলে প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক কীর্তি-কলাপের প্রতি রামরামের গভীর মমতা ছিল। তিনি নিজে জানিয়েছেন,—ফারসি ভাষার নানা আখ্যাযিকার সঙ্গে বংশগত কিংবদন্তী যোগ করে এই জীবনী-ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকের তথ্য-দৃষ্টি ও জীবনবোধের যথার্থতায় রামরাম যে সিদ্ধকাম ছিলেন, তার বহু প্রমাণ মূল গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। কিন্তু ঠিক একই পরিমাণে ভাষা-রচয়িতার দায়িত্ব পালনে তিনি একান্ত অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

বামবাম বসুব 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'

রামরাম প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-র ভাষা রচনায় ত্রুটি তাঁব অক্ষমতা প্রসূত নয়, অনেকটাই অনবধান জনিত। প্রায় এক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত তাঁর 'লিপিমালা'র সঙ্গে তুলনা করলে এবক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। 'প্রতাপাদিত্য চবিত্র'ব একটি বাক্য—"কানুনগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্ঠে কাজকর্ম্ম করিতেছিল। ইতিমধ্যে সে দপ্তরে শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল। তাহাব সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে উৎখাত হইয়া গৌড়ে রাজধানী স্থানে গতি করিলেন।"

বচনা-পবিচয

মূলের একটি মাত্র বাক্যকে আমরা ছেদ-চিহ্নিত করেছি। তাতে মূল রচনার দুর্বোধ্যতা যদি কমেও থাকে, তবু বাক্যের অন্বয়হীনতা কেবল দোষবহুল নয়, বিসদৃশ। অথচ ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত 'লিপিমালা'র ভাষায় আছে,—"মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা। মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে। তাঁহার নাম সতী।"

'লিপিমালা'

এখানেও ছেদচিহ্নগুলি আমাদের দেওয়া। কিন্তু তাতে বাচ্যার্থই কেবল স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ; বাক্যের গঠন-রীতিও অনেকটা সহনীয় হয়েছে। এখানে বলা উচিত, 'লিপিমালা' রচনার আগে, ঐ একই সালে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকের ধারণা, বামরাম মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাভঙ্গিকে অনুসরণ করেই 'লিপিমালা'র রচনাগত উৎকর্ষের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এ অনুমান পুরো সমর্থনযোগ্য নয়। 'লিপিমালা'তে বাংলা পত্র রচনার আদর্শ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি নানা বিষযে লিখিত পত্রের সমষ্টি ।

বামরাম-প্রতিভা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লেখা এই দুটি গদ্য-পুস্তক ছাড়া রামরাম পৃথকভাবে

একাধিক পদ্য ও কবিতা-পুস্তিকাও লিখেছিলেন। আনুমানিক ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ফার্সি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। টমাস, কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের বাংলা শেখাবার দায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রথমে ইংরেজ সান্নিধ্যে আসেন। ক্রমে ইংরেজি ভাষার কথনেও সুদক্ষ হয়ে ওঠেন, যদিও তা লিখতে পারতেন না কখনো। একাধিক ইংরেজ তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের সঙ্গে বাস করে রামরাম বসু কিছুদিন ঐ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিনে। প্রথমে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি খ্রিস্ট-স্তোত্র রচনা করেন। পরে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে দুটি ইংরেজি খ্রিস্ট-সংগীতেরও বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। আরো পরে 'খ্রিস্টবিবরণামৃতম্' নামে পদ্যে যিশুখ্রিস্টের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত লিখেছিলেন।

রচনাকালের বিচারে রামরাম বসুর পরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক-লেখক হিশেবে প্রথমে উল্লেখ্য পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইনি ছিলেন নিঃসন্দেহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পী ও প্রধান গ্রন্থকার। আনুমানিক ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে ভদ্রক-এ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল। ভদ্রক এখন উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত; তখন ছিল মেদিনীপুর জেলায়। নাটোরের রাজপণ্ডিতের কাছে তিনি শিক্ষিত হয়েছিলেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় মাসিক ২০০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়মের প্রধান বাংলা-পণ্ডিত হিশেবে নিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে, শিক্ষক হিশেবে একই বিদ্যায়তনে রামরাম বসুর মাইনে ছিল মাসে ৪০ টাকা। মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ পদাধিকার এবং অধিকতর পারিশ্রমিক তাঁর যোগ্যতর পাণ্ডিত্যের দ্বারাই কেবল সমর্থিত হয় না, শিক্ষক ও ভাষা-রচয়িতা হিশেবেও তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণ। মৃত্যুঞ্জয় কখনো ভোলেন নি যে, বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে নিজের মাতৃভাষার গদ্যরূপ, সাহিত্য, ও জ্ঞানভাণ্ডারকে বরণীয় করে তোলার দায়িত্বেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাই, একদিকে একাধারে পাণ্ডিত্য ও রসপূর্ণ নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা যেমন করে গেছেন, তেমনি প্রতি রচনার ভাষাকে যথাসম্ভব রীতি-বিশুদ্ধ এবং সুগঠিত করে তোলাতেও তিনি সচেতনভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্যে মৃত্যুঞ্জয় সর্বমোট চারখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আগে বলেছি, তাঁর প্রথম লেখা 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। গল্পের বিবৃতিমূলক ভাষার শরীরে স্বচ্ছতা সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এই গ্রন্থে :—"দক্ষিণ দেশে ধাবা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত।"

'বত্রিশ সিংহাসন'

ক্রিয়ারূপের বিন্যাসে প্রথম প্রয়াসীর দ্বিধার চিহ্ন এখানে স্পষ্ট। তাহলেও, এ ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকবার কথা নয়। তবু, একালে পাঠকের কাছে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম দুর্বোধ্যতম বাংলা গদ্যের লেখক হিশেবে কুখ্যাত হয়ে আছে। এর প্রধান কারণ, তাঁর শেষতম গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র অংশবিশেষের ভাষা। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভাষাকে বিষয়ের অনুগত করে রচনা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে আন্তরিক। আসলে সেই চেষ্টাতেই মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। যথার্থ শিল্পী জানেন, ভাষা হচ্ছে ভাবের বাহন। অতএব, যে ভাষা বর্ণিতব্য বিষয়কে যথোচিত পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত করতে পারে না, নিতান্ত সুবোধ্য হলেও রচনাকর্মের ইতিহাসে তা নিকৃষ্ট। প্রাঞ্জলতার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিষয়-পরিবেশের মৌলিকতাকে বিসর্জন দেন নি। ভাষা-শিল্পী হিশেবে এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠতা। আর এই প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয়

'হিতোপদেশ'

'হিতোপদেশ' (১৮০৮ খ্রি.) গ্রন্থে।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ আসলে একই নামের সংস্কৃত মূলের অনুবাদ। 'হিতোপদেশ' কেবল গল্পের ভাণ্ডার নয়, সরস-বিচিত্র কাহিনীর আধারে জীবনের গভীর আদর্শকে প্রতিফলিত করে তোলার দিকে সংস্কৃত 'হিতোপদেশ'-রচয়িতার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। মূল রচনার সেই পরিবেশ-গম্ভীরতাকে মৃত্যুঞ্জয় হুবহু অনুবাদ করতে চেয়েছেন তাঁর বাংলাভাষার মধ্যে ঃ—

"প্রাজ্ঞলোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থচিন্তা করিবেক। আব যম কর্তৃক কেশে গৃহীতের মত হইয়া ধর্মাচরণ করিবে।"

এই শ্লোকের স স্কৃত মূল,—

"অজরামবরৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।।

স্পষ্টই দেখছি, ভাষাকে মূল সংস্কৃতের অনুগামী করার চেষ্টায় বাংলা গদ্যের অন্বয়রীতিকে এখানে ভেঙে গড়া হয়েছে। তাহলেও, এ-বাংলা বুঝতে অসুবিধা নেই।

'রাজাবলি' (১৮০৮) নামে মৃত্যুঞ্জয়ের তৃতীয় বইখানি ভারতীয় রাজবংশের ইতিহাস ; লেখকের স্বীকৃতি অনুসারে—"কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।"—'কলির প্রারম্ভ' বলতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী দিয়ে শুরু হযেছে বই-এর বর্ণনা। বিষয়বস্তুব আহরণে কিংবদন্তী ও লোকপ্রসিদ্ধির ওপরেই নির্ভর করা হয়েছে বেশি। 'রাজাবলি'র বিবরণাত্মক ভাষার রচনা উপলক্ষে মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যের আরো গাঢতা সম্পাদন করেছিলেন :—"পূর্বে সূর্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যে যখন যজ্ঞ আরম্ভ করেন তাহার পূর্ব কিছুদিন কোনই কারণেতে আপন পত্নী সীতাকে বনবাসে দিয়াছিলেন।"

'রাজাবলি'

মৃত্যুঞ্জয়ের চতুর্থ গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচিত হয়েছিল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর বহু পরে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। আগে বলেছি, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষাব জন্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের যত অখ্যাতি। এক অর্থে এই গ্রন্থটি কেবল সাধারণ জ্ঞানের বই নয়, বিচিত্র বিদ্যার বিশ্বকোষও। চারটি 'স্তবক' ও বহু 'কুসুম'-এ বিভক্ত এই গ্রন্থে অলংকার, ব্যাকরণ, ধ্বনি ও লিপিতত্ত্ব, আইন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্জ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্রবিধ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আর ভেবে বিস্মিত হতে হয়, রচনার প্রায় সকল বিভাগেই মৃত্যুঞ্জয় গদ্যভাষাকে বিষয়ানুগ করে তুলতে চেয়েছেন। 'ভাষা প্রশংসা' নামক 'প্রথম কুসুম'-এ ভাষার পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন, —"অভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা পরানাম্নী ভাষা প্রথমা, যেমন অভিনব কুমারেরদের ভাষা।" মূল সংস্কৃতের অনুগ, এবং সেই কারণে অতিরিক্ত তৎসম-শব্দে কণ্টকিত এই দুর্বোধ্য ভাষার জন্যেই মৃত্যুঞ্জয় নিন্দাভাজন হয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের গদ্য 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'তেও প্রচুর নেই। অথচ আমরা স্মরণ করি না, ঐ একই গ্রন্থের বিষয়ান্তরে লেখক লিখেছেন,—"দণ্ডকারণ্যে প্রাচীন নদীতীরে বহু কালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন, বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না।" তাছাড়া ঐ একই বইতে সাধারণ মানুষের মুখের লৌকিক ভাষার ছাঁচটিও লেখক হুবহু বসিয়ে দিয়েছিলেন।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'

ফল কথা, মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে বাংলা গদ্য বিশুদ্ধ অন্বয়রীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেনি।

কিন্তু গদ্যভাষাকে বর্ণিতব্য বিষয়ের বাহন হতে হবে, এই মৌলিক অনুভূতি তাঁর রচনাতেই প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা ছাড়া আর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে। গ্রন্থটি কেরির নামে প্রচলিত 'ইতিহাসমালা'। এতে সাধুভাষায় রচিত ১৫ টি দেশি বিদেশি গল্প বিবৃত হয়েছে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। ড. সুশীলকুমার দে বলেছেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্য নিয়ে সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অব্যর্থ ফল 'ইতিহাসমালা'য় দেখা দিয়েছে। এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ অন্বয়রীতি বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের পূর্বসূরী ; —"একজন ঘটক ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সেখানে এক ব্যাঘ্র ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।"

কেরির 'ইতিহাসমালা

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার তুলনায় এই গদ্যের রূপগত বিশুদ্ধি আরো স্পষ্ট।

রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া কেরির অধীনে আরো যে কয়জন মুন্সি পণ্ডিত গদ্য রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোলোকনাথ শর্মার (?-১৮০৩) 'হিতোপদেশ' ১৮০২ খিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের পুরো নাম ছিল গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইনি মিশনারিদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোলোকনাথের রচনায় বাংলা গদ্যরীতি জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

গোলকনাথ শর্মা

তারিণীচরণ মিত্রের (১৭৭২ ১৮৩৭?) 'ঈশপের গল্প' রোমান হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তারিণীচরণের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। ইনি বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু ভাষায় ব্যুৎপন্ন ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ছিলেন হিন্দি বিভাগের মুনসি। প্রতীচ্য গল্পের এই সংকলন জন গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে ছ'টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে রোমান হরফে প্রকাশ করা হয়েছিল। বাংলা, ফার্সি ও হিন্দি, এই তিন ভাষার অনুবাদ করেছিলেন তারিণীচরণ। এঁর বাংলা রচনায় ইংরেজি গদ্যের বাক্যরীতি (syntax) হুবহু অনুসৃত হয়েছে।

তারিণীচরণ মিত্র

চণ্ডীচরণ মুন্সির (?- ১৮০৮) 'তোতা ইতিহাস' ফার্সি 'তুতিনামা'র বাংলা অনুবাদ। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। লণ্ডন থেকেও এই গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লেখকের বাংলা গদ্যরীতির জ্ঞান যে বিশুদ্ধ ছিল না, আগাগোড়া বই-এ তার প্রমাণ আছে।

চণ্ডীচরণ মুন্সি

চণ্ডীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগে পণ্ডিত ছিলেন। ইনি 'ভগবদগীতা'রও একটি পদ্যানুবাদ করেন।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং'ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দেই। এই লেখকও ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত। ইনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাছাড়া, স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের এক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। এদিক থেকে রাজীবলোচনের হাতে সমকালীন বাংলার একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনার প্রচুর সুযোগ ছিল। কিন্তু যথার্থ নিষ্ঠার অভাব ও অতিরিক্ত কল্পনা-বিলাসের ফলে সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল বলে গদ্য গঠনরীতিও অনেকটা বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থও লন্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ রায়

সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতির লেখা 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন হরপ্রসাদ রায়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পরে এই গ্রন্থও লন্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। নির্ভুল সাবলীল বাংলা গদ্যের এক সার্থক নিদর্শন রয়েছে এই বইয়ের ভাষায়।

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আওতায় রচিত আরো বহু গ্রন্থ-গ্রন্থিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু, প্রায়ই তাদের কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন মেলে নি। তাছাড়া, আরো যে কিছুসংখ্যক বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, বাংলা গদ্যের গঠনে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্যতা নেই। অতএব, এখানেই বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তার আগে বাংলা গদ্যের জন্ম-ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়মের সামগ্রিক ভূমিকাটি স্মরণীয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ ১৮৫৪ খিস্টাব্দে যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন "It had no revenues and system of instruction. no teacher, and as a college, in reality no pupils." তাহলেও, এই একান্ত বৈনাশিক পরিণাম সত্ত্বেও, এই কলেজের অতন্দ্র সাধনা বাংলা গদ্যের গঠনে ইতিহাসের যাত্রাপথ রচনা করেছে। রীতিশুদ্ধ সাবলীল গদ্য রচনার সুনির্দিষ্ট আদর্শটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু বিচিত্র বিষয়চারী সুগঠিত গদ্য রচনার আয়োজন শুরু হয়েছিল এই শিক্ষাবেদীতেই। একই সঙ্গে গদ্যের গঠন বিচিত্র পরীক্ষালব্ধ বিন্যাসের প্রকরণবশে অনেকটাই প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয়েছিল ধীরে ধীরে।

বিংশ অধ্যায়
নগর-বাংলায় নবজীবন

আগে বলেছি, মোগল যুগের সমাপ্তি ও ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে প্রবহমাণ বিনাশ ধারার গভীরে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের লক্ষণ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। সে ছিল অনেকটা প্রকৃতির হাতের দান ; জৈব ব্যাপার। স্থাবর অথবা জঙ্গম, যা-ই হোক, জীবনের স্বভাবই হচ্ছে মৃত্যু রোধের চেষ্টা। অতএব, ব্যক্তি, জাতি, বা সমাজের সকল স্তরেই প্রাণের লক্ষণ যে-পর্যন্ত রয়েছে, বিনষ্টি-লক্ষণকে প্রতিরোধ করবার প্রয়াস সে-পর্যন্ত চলতেই থাকে চেতনার অতলে ; জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। কিন্তু নবীন শক্তি, তথা নবচেতনার প্রেরণা সংযোজিত না হলে প্রাণের সেই ক্ষয়ে-আসা স্পন্দন, মৃত্যু রোধ করবার প্রাণান্ত চেষ্টায় মরণের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। পূর্ববর্তী স্তরের সাহিত্যসাধনায় মুমূর্ষুর ঐকান্তিক মৃত্যু রোধের চেষ্টা লক্ষ করেছি ; গদ্য-পদ্যের ক্ষয়িষ্ণু ধারায়। এবার এল নবজীবন। আত্মরক্ষার পুরাতন প্রয়াসে কেবল বলাধানই হল না, জীবনে এবং সাহিত্যে নতুন প্রাণের বন্যায় নবীন বাণী—নূতর প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গায়িত হল। বাঙালি চেতনার এই নবজীবনায়নের কেন্দ্র-শক্তি ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)।

নবজীবন-শিল্পী রামমোহন

মনে রাখতে হবে, নূতন প্রাণের এই ঢেউ নিখিল বাংলার জীবনে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। আগে বলেছি, ইংরেজের সান্নিধ্যে না হলেও, উনিশ শতকের বাঙালি মনের গুহায়িত বিক্ষোভ বিদ্রোহের অগ্নিতাপ আহরণ করেছিল ইংরেজি সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের শিক্ষা থেকে। বাঙালি জীবন তখন ইতিহাসের হাতে দ্বিধাবিভক্ত , গ্রাম থেকে শহরবাংলা পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইংরেজি শিক্ষার প্রাণদীপ্তি দূরে থাক, এমন কি নিছক আক্ষরিক জ্ঞানও তখন গ্রামদেশে ছড়িয়ে পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল না। ফলে, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির নবজীবন-চেতনা শহরের সীমাকে ছাড়িয়ে কখনো বৃহত্তর বাংলার জীবন-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। এই কারণে, উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের রেনেসাঁস যত উত্তুঙ্গ, তত দূরব্যাপ্ত নয়। বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের শীর্ষ-সীমাকে পেরিয়ে সাধারণ বাঙালির জীবন-ভূমিতে তা বিস্তারিত হতে পারে নি। হয়ত অনেকটা এই কারণেই, উনিশ শতকের বিপ্লবী মনের আগুন শিল্প-সাহিত্যের সৃজন-ভূমি ছেড়ে সার্বভৌম জীবনের কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে নি। স্বয়ং রামমোহন রায় দেওয়ানি উপলক্ষে গ্রাম ও মফস্বল বাংলায় জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। তবু, কেবল পূর্বোক্ত কারণেই, বাঙালি-জীবন, —তথা নগর-বাংলায় বৈপ্লবিক চেষ্টার আরম্ভ হয় তাঁর কলকাতাবাসী হবার সময় থেকে।

উনিশ শতকীয় জাগরণের সীমায়তি

বাঙালির জীবন ও সাহিত্যের নবজাগরণ সাধনায় রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা। নিজে তিনি ছিলেন সংস্কার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। কিন্তু সেকালের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর আচার-অন্ধতার প্রতি তাঁর বিরোধিতা ছিল মর্মগত। নিতান্ত বাল্যকালে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা ও একেশ্বরবাদের শ্রেয়তা ঘোষণা করে সমাজে ও পরিবারে তিনি নিগৃহীত হয়েছিলেন। একথা রামমোহন নিজে জানিয়ে গেছেন। সন্দেহ নেই, রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মূলে নিহিত ছিল

স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যের তীব্রতা। তা হলেও তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস, তাঁর দুর্লভ জ্ঞান-সাধনার দ্বারাই ক্রমশ প্রবুদ্ধ ও সংহত হয়েছিল। এ-কথা সত্য যে, প্রথমে আরবি-ফার্সি ভাষার বই পড়ে তাঁর মনে একেশ্বরবাদের আদর্শ দানা বেঁধে ওঠে। তাহলেও ইংরেজি দর্শন-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সুতীব্র স্বাধীনতা-প্রীতির বিকাশ ঘটেছিল। রামমোহনের মুক্ত-চেতনায় এ-সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল যে, বাঙালি মনের অশিক্ষা, অন্ধ-সংস্কার ও দুর্নৈতিকতার অনপনেয় বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল স্বাধীন চিন্তা, স্বতন্ত্র আত্ম-বিশ্বাস, এবং অকুণ্ঠ বিচারবুদ্ধি। তাঁর সদ্য ইংরেজি-শিক্ষিত মন একথাও বুঝেছিল যে, আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বীজ প্রাণতপ্ত হয়েছিল সেদিনকার ফরাসি বিপ্লব-প্রবুদ্ধ ইংরেজি দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাসে। তাই, বাঙালি প্রাণের বন্ধন-মোচনের আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

রামমোহন-প্রতিভার দান

রামমোহনের স্বপ্ন ও আদর্শবাদ কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল না. একথা প্রমাণিত হল ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের পরবর্তী ফল থেকে। উনিশ শতকের সাহিত্য ও সমাজের শ্রেষ্ঠ কর্ণধারগণ—রাজনারায়ণ-ভূদেব-মধুসূদন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের মানস সন্ততি। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের পড়ুয়াদলের বিশ্বাস, উদ্দীপনা ও দৃঢ়তা ছিল নিরতিশয় প্রখর। ক্রমে সারা দেশের নাগরিক সমাজে অতীত-বিরোধী এক নূতন ব্যক্তি-স্বতন্ত্র জীবনাদর্শকে তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন। ফলে, যাঁরা সেই শিক্ষার আওতার বাইরে রইলেন, তাঁদেরও মধ্যে অনেকে নূতন চিন্তা ও নব-জীবন রচনার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে হিন্দু কলেজ কেবল একটি শিক্ষায়তন ছিল না। এর শিক্ষার্থীরা হয়েছিলেন নবীন আদর্শের পরিবাহক, অধিনায়ক। রামমোহনের আন্দোলন ও চেষ্টায় সতীদাহ নিবারিত হয়েছিল; স্বয়ং বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেছিলেন অন্ধ-বিশ্বাসের অচলায়তনকে বিদীর্ণ করে। কিন্তু, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কল্পনাতীত ঐসব বিপ্লবের পেছনে হিন্দু স্কুলের ছাত্ররাই শ্রেষ্ঠ সামাজিক সমর্থন রচনা করেছিলেন। সেদিনের শিক্ষিত তারুণ্যের অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের জীবন-ব্রত সফল হত-ই, এমন কথা আজ জোর করে বলবার উপায় নেই।

হিন্দুকলেজ ও বাংলার নবজীবন

হিন্দু কলেজের শিক্ষা সেকালের ছাত্রদের কেবল আত্মসচেতন নয়, সমাজ-সচেতনও করেছিল। সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল স্বদেশ প্রীতি ও স্বাধীনতাবোধ। এর সবটুকুই ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়, বরং অনেকাংশেই তা এক বাঙালি শিক্ষকের দান। ইনি ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন,—"তাঁহার পিতা একজন ইটালিয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন।...তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গি যেমন বলে, 'মোদের বিলাত', তিনি সেইরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ পূর্বক বাঙালিদিগের সংসর্গে এরূপ বাঙালি হইয়া যান যে, তিনি সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।"

নবীন-জীবনধর্মের মহাগুরু ডিরোজিও

বাঙালি একটি ভাষাভাষী গোষ্ঠিমাত্র নয়—একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি, এই বিশ্বাসের জীবন্ত প্রমাণ ছিলেন ডিরোজিও। তাঁর ভারতপ্রেমের অমর কাব্যরূপ ইংরেজি ভাষায় লেখা 'Faquir of Jangira'। সতেরো বছর বয়সে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিন্দু স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণ করেন। হিন্দু রক্ষণশীল অভিভাবকদের প্রতিবাদে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ডিরোজিওর প্রধান অপরাধ ছিল তাঁর তীব্রতম স্বাতন্ত্র্য প্রীতি ও অবিচল আত্মপ্রত্যয়। তিনি ছাত্রদের

উপদেশ দিয়েছিলেন,—নিজের মনে বিচার ও যাচাই না করে কেউ যেন ঈশ্বরকেও বিশ্বাস না করেন। মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা অত বেশি ছিল বলেই বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাস তাঁর চোখে ছিল দুঃসহ মূঢ়তা। ফলে, স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধির অত্যুৎসাহে সেদিনকার রক্ষণশীল হিন্দুত্বের প্রতি ডিরোজিও শিষ্যরা উৎপীড়নও করেছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু, একথাও মানতে হবে যে, সে অবিচার প্রথম উৎসাহের উচ্ছ্বাস সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বিদ্যায়তনের ভিতরে এবং বাইরে নিজের ·াড়িতেও তাঁরা ছিলেন তাঁর পরম আত্মীয়। এই স্কুলের কর্মভার ত্যাগ করলেও বাড়িতে নব্যবঙ্গদে‌ের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ অবারিত হয়ে ছিল। এমন কি, এই তরুণ শিক্ষকের অকাল-মৃত্যুর পরেও তাঁব স্বাধীন-স্বতন্ত্র প্রাণধারাই নবীন বাঙালিব নব-জাগরণের রসদ জুগিয়েছে দীর্ঘদিন।

এব পরে এলেন বাংলাব প্রাণকর্মের ধারক, মহত্তম শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। রামমোহন, ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগর,—এই ত্রয়ীর জীবন-সাধনায় বাঙালির জীবন্মুক্তির ত্রিবেণীতীর্থ রচিত হল। বাংলা সাহিত্যেও বিচিত্র ধারায় ঘটল সেই নবজাগরণের রূপ প্রকাশ ঃ—

প্রাণধর্মের মহাসাধক বিদ্যাসাগর

১। প্রথমত আত্মবিচার ও সমাজ চেতনার ফলশ্রুতি হিশেবে দেখা দিল নানা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা। তাতে একদিকে নানা মতবাদ ও বিতর্কের অবতারণা, এবং সমসাময়িক সাংবাদিক আলোড়নের ফলে আগ্রহ ও কৌতূহল ক্রমশ মুখর হতে লাগল। সেই সঙ্গে বহুমুখী ভাবনার বাহন রূপে গদ্য ভাষারও ঘটতে লাগল বিষয় ও প্রকরণগত বিচিত্র প্রসার।

সাহিত্য ইতিহাসের রূপ-পরিণাম

২। এই জীবন-কৌতূহল ও আত্ম-চেতনার প্রকাশ প্রসঙ্গেই বাংলা গদ্যের রূপ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে দেখা দিল তুঙ্গাসীন ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত সাহিত্যস্বাদী গদ্য।

৩। জাতীয় জীবন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত হবার ফলে দেখা দিল নূতন এক সাহিত্য রূপ,—নাটক। সেই সঙ্গে কবিতারও নবজন্মের বিবোধন ঘটল।

একবিংশ অধ্যায়
বাংলা গদ্যে সাময়িকপত্রের প্রভাব

আধুনিক সভ্যতার ওপরে সাময়িকপত্রের প্রভাব বিচিত্র এবং দূরপ্রসারী। একালের মানুষের মন বিশ্বমুখী। সংবাদপত্র বিশ্বমানুষের জীবন যাপনের সংবাদ ঘরের কোনায় টেনে আনে। তেমনি অপরাপর সাময়িকপত্রে পাই সমকালীন পৃথিবীর জ্ঞানসাধনা ও জীবনবাসনার স্পর্শ। অতএব, জাতির জীবন-ইতিহ.সে সাময়িকপত্রের প্রভাব অবিস্মরণীয়। তাহলেও, সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সাময়িকপত্রের পূর্বাপর আলোচনা অপরিহার্য নয়। অথচ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যুগের পরে বাংলা গদ্যের অগ্রগতির ক্রম অনুসরণ করবার জন্যে সাময়িকপত্রের আংশিক ইতিহাস অবশ্যই খুঁজে দেখতে হয়। বস্তুত, এই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই বিচিত্র আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বহন ও প্রকাশ-ক্ষমতা প্রথম বিস্তারিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া, চলমান জীবনের প্রতি বাঙালির কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাকে সংহত করেছিল সংবাদপত্রের আলোচনা। আর জীবন-চেতনাই তো সকল রকমের সৃজনকর্মের উৎস। এদিক থেকে আলোচ্যকালের সাময়িকপত্র নবযুগের সাহিত্য-চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল পরোক্ষভাবে।

বাংলা গদ্যে সাময়িক পত্র

বাংলাগদ্যের গঠনে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সার্থক চেষ্টার পরিচয় আগে লক্ষ করেছি। প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনের গৌরবও তাঁদেরই। 'দিগ্‌দর্শন' নামে এই পত্রিকা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ক্লার্ক মার্শম্যান্-এর সম্পদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। স্কুলপাঠ্য নানা বিষয়ের অবতারণা এই পত্রিকায় বেশি করে করা হত। তাই সম্পাদকেরা একে পত্রিকা না বলে বলেছেন 'মাসিক পুস্তিকা'। স্কুলপাঠ্য উপাদানেব প্রচুবতার জন্য স্কুল বুক্ সোসাইটি এই পুস্তিকার প্রতি সংখ্যার বহু খণ্ড ক্রয় করে নিতেন।

'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকা

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত, স্কুল বুক্ সোসাইটি এদেশে দেশীয় শিইক্ষার প্রবর্তন ও বাংলা গদ্যের প্রাথমিক গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এই সোসাইটির পত্তন হয় ষোলজন অভারতীয় আর আটজন ভারতীয় সদস্য নিয়ে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মতোই এঁরা বিশেষজ্ঞদের টাকা দিয়ে নানা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়ে নিতেন। এঁদের প্রখ্যাত লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে রামমোহনও ছিলেন একজন।

স্কুল বুক্ সোসাইটি

যাই হোক, একাধারে বাংলা, ইংরেজি, এবং বাংলা-ইংরেজি-মিশ্র ভাষাতে একই সঙ্গে 'দিগ্‌দর্শন' এর তিন প্রকারের সংস্করণ প্রকাশিত হত। বাংলা সংস্করণ ২৬ সংখ্যা, এবং ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়।

বাংলা ভাষায় এযাবৎ প্রাপ্য প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-ও প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন থেকে; সম্পাদক ছিলেন একই ক্লার্ক মার্শম্যান সাহেব। তবে, মার্শম্যান যে উভয় পত্রিকারই কেবল সাধারণ পরিচালকই ছিলেন, যথার্থ লেখক ও সংবাদ-সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত-মুন্সিরা, তার প্রমাণ আছে। পণ্ডিতেরা সকলে একসঙ্গে ছুটি নিয়েছিলেন বলে একবার 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রকাশ বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

'সমাচার দর্পণ'

'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের প্রায় একমাস কালের মধ্যেই 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিশেবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদনা কর্মে প্রথমে প্রধান সহযোগী ছিলেন জয়গোপাল তর্কলঙ্কার ও তারিণীচরণ শিরোমণি। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি জনপ্রিয়তার সঙ্গে চালু ছিল। এর মধ্যে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে একে [ইংরেজি ও বাংলা] দ্বিভাষিক করা হয়। কারণ ততদিনে হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি পত্রিকা পাঠের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের বাংলার জাতীয় ইতিহাসে 'সমাচার দর্পণ'এর স্থান অতুলনীয়। ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সমকালীন বাঙালি জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য-চিত্র এই প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ধৃত রয়েছে। এই পত্রিকার তথ্যাবলিকে বিষয়ানুসারে সজ্জিত ও সম্পাদিত করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কীর্তি—'সংবাদপত্র সেকালের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু 'সমাচার দর্পণ'-এরও আগে, যদিও প্রায় সমসময়েই, আর একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। পত্রিকাটির 'ফাইল' পাওয়া যায়নি, এবং হয়ত এ পত্রিকা খুব দীর্ঘজীবীও হতে পারে নি। তবুও এইটিই বাংলা ভাষায় এতাবৎজ্ঞাত প্রথম সংবাদপত্র। পরিচালকগোষ্ঠি ছিলেন বাঙালি ; হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। পত্রিকাটির নাম 'বাঙাল গেজেটি' ; প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই মে। 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রথম প্রকাশকাল ঐ একই বছরের ২৩শে মে।

বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার ইতিহাসে বাঙালির এই প্রথম স্বাধীন প্রচেষ্টা অবশ্যই শ্লাঘনীয়। এই ধারারই সফল পুষ্টি ও পরিণতি লক্ষ করি রামমোহনের বিচিত্রচারী প্রচেষ্টায়। প্রথম জীবনে তিনি একখানি ফার্সি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলা পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁর প্রথম প্রয়াস ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ; 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা নিয়ে। সম্পাদক হিশেবে রামমোহন সেখানে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন শিবপ্রসাদ রায়। পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যেই অবলুপ্ত হয়ে রামমোহনের নতুন প্রচেষ্টার পথ করে দিয়েছিল।

সাংবাদিক রামমোহন

ঐ ১৮২১ খ্রিস্টাব্দেই 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক পূর্ণাঙ্গ সংবাদ পত্রিকা নিয়ে দৃপ্ত আত্মপ্রকাশ করলেন রামমোহন। 'সমাচার দর্পণ'-এর দক্ষ সম্পাদনা কর্ম সত্ত্বেও মিশনারি প্রযোজকদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-বিরোধী প্রচার। প্রধানত এর প্রতিবাদ করবার জন্যেই 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশ। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নববাবুবিলাস', 'নববিবি-বিলাস', 'কলিকাতা কামলালয়' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা সম্পাদনা করে পরে ইনি বিখ্যাত হন। প্রথম থেকেই রামমোহন এই পত্রিকায় নানা বিষয়ে লিখতেন। কিন্তু সতীদাহ-নিবারণ বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর সঙ্গে ভবানীচরণের মতপার্থক্য হয়। ভবানীচরণ ছিলেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ, আর রামমোহন দৃপ্ত সমাজ-বিপ্লবী। এই মতভেদ উপলক্ষে ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংসর্গ ত্যাগ করেন, এবং রামমোহনের প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুমত প্রচারের জন্য রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণে নূতন সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রবর্তন করেন। যাই হোক নানা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে 'সম্বাদ কৌমুদী' ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত টিকে ছিল। একেবারে শেষ পর্যায়ে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ কিছু দিন এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। রামমোহনের পরিচালনাকালে পত্রিকাটি বহু বৈপ্লবিক প্রেরণার উদ্বোধনে সচেষ্ট হয়েছিল।

'সম্বাদ কৌমুদী'

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানত 'সম্বাদ কৌমুদী'র সতীদাহ নিবারণ চেষ্টার বিরোধিতা করবার জন্যে। এই দুই পত্রিকার দ্বন্দ্ব চলেছিল দীর্ঘ দিন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল , আর আগেই বলেছি, ভবানীচরণ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ইনি

রক্ষণশীল হিন্দুদলের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভারও সম্পাদক ছিলেন। এদিক থেকে তিনি রামমোহন-বিরোধী আন্দোলনের ছিলেন পুরোধা। তা হলেও, ভবানীচরণের প্রতিভা অনস্বীকার্য ছিল ; আর সকল বিষয়েই তাঁর রক্ষণশীলতা কিছু অন্ধ ছিল না। সেকালের ভারসমতাহীন নাগরিক জীবনকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রসিকতা যেমন ছিল তীক্ষ্ণ প্রখর, তেমনি সমাজ গঠনের চেষ্টাতেও তাঁর প্রভাব ছিল সেকালে প্রায় অতুল্য। ভবানীচরণের সমাজ সন্দর্শনের এই ক্ষমতা রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও 'সমাচার চন্দ্রিকা'কে বহুজন-শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণের মৃত্যুর পরে পত্রিকাটির দীপ্তি অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

'সমাচার চন্দ্রিকা'

বাংলা ভাষায় আর একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদ-সাপ্তাহিক ছিল 'বঙ্গদূত'। সার্জন আর মণ্ট্‌গোমারি মার্টি ' 'বেঙ্গল হেরাল্‌ড' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এক সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা, ফারসি ও নাগরি [হিন্দি] ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। বাংলা সংস্করণের নাম ছিল 'বঙ্গদূত'। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদূত' বাংলাভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার। তারপরে আরো একাধিক সুযোগ্য সম্পাদক এই পত্রিকার পরিচালনা করেছিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর,—এঁরা ছিলেন 'বঙ্গদূত' এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সেকালের রাজনীতি ও অর্থনীতিগত ভাবনার ছাপ এই পত্রিকায় সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

'বঙ্গদূত'

'বঙ্গদূত'-এর পরেই শ্রেষ্ঠ উল্লেখ্য পত্রিকা গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকব'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেকালের সবচেয়ে শক্তিশালী সাংবাদিক ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রায় একমাত্র বাহন। সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় মতবাদ গঠনে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ভূমিকা কেবল একচ্ছত্র ছিল না, সেকালের প্রবীণ কাব্যসাহিত্যেরও ধাত্রীরূপা ছিল এই পত্রিকা।

গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকব'

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। পাথুরেঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক ; ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন সম্পাদক। প্রথম বারে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ২৫মে পর্যন্ত পত্রিকাটি 'অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত' হয়েছিল। এই সময়ে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর দরুন 'সংবাদ প্রভাকর'-এর প্রকাশ বন্ধ হযে যায়। চার বছর পরে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশিত হয় ; এবারে বারত্রয়িক রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সপ্তাহে পত্রিকার তিনটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হত। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন 'প্রভাকর' সর্বপ্রথম দৈনিক আকারে প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। দৈনিক পত্রিকার সংবাদ সরবরাহ করে সাহিত্য রচনার সুযোগ কম থাকে ; তাই পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হল মাসিক 'সংবাদ প্রভাকর'।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর মাধ্যমে গুপ্তকবি নাগরিক বাঙালির জীবনে প্রখর স্বাদেশিকতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ অবারিত করে দিয়েছিলেন। কবিতা লিখে নিজের স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ তিনি প্রকাশ করেছিলেন—

"কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

এই উগ্র আদর্শবাদকেই 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় শিক্ষিত বাঙালির জন্য লালন করা হয়েছিল। যেমন গদ্যরচনাতে, তেমনি নবীন সমাজ-চেতনার সৃজনেও 'সংবাদ প্রভাকর' সেদিন বাংলাদেশে নবজীবনের সঞ্চার করেছিল।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। উদারপন্থী তরুণদের পরিচালনাধীনে এই পত্রিকা বাংলাদেশে প্রগতিশীল সমাজ ও সংস্কার আন্দোলনের অগ্রণী হয়েছিল। রামমোহন-সহচর প্রখ্যাত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুকাল এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তা ছাড়া নানা সময়ে এই পত্রিকার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত তরুণগণ ঃ—দাক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। সেকালের বাংলার উদারনৈতিক মতবাদের প্রচলনে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল দূরপ্রসারী।

'জ্ঞানান্বেষণ'

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর। ঐ বছরেই 'প্রভাকর' এবং 'জ্ঞানন্বেষণ'-এর সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা 'জ্ঞানোদয়' প্রকাশিত হয়, সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক। ঐ পত্রিকায় পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ক রচনার পাশে প্রাণিবৃত্তান্ত ও বিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর প্রস্তাব আলোচিত হত। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্র গঙ্গাচরণ সেন 'বিজ্ঞান-সেবধি' পত্রিকার প্রকাশ করেন—প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সম্পাদনায় বিজ্ঞানের চর্চাই ঐ পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ঐ ভাবে নূতন বিষয়ের অবতারণা ঘটে।

'জ্ঞানোদয় ও
'বিজ্ঞানসেবধি'

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রচুর জনপ্রীতি অর্জন করেছিলে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে উদয়চন্দ্র আঢ্য সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন। পরে আঢ্য পরিবারেই বংশ পরম্পরায় এর সম্পাদনা করেছেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথমে 'মাসিক' হিশেবে প্রকাশিত হলেও এক বছরের মধ্যেই 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক আকার পায়। পরে, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে, দৈনিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। দেশীয় পাঠকদের "বিদ্যা-বুদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ" দান ও "রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল শ্রীল শ্রীযুক্ত দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট" করাই ছিল এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'

গদ্যের সুসংগঠন ও পূর্ণ রূপায়ণ, আর সেই সঙ্গে শিক্ষিত মনের রুচির সংস্কার,—এই দু'ধরনের প্রয়োজন সাধনের সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক-পত্র-পত্রিকার অনুপ্রবেশ। আর এই দুটি উদ্দেশ্য পূর্ণ সফল হয়েছিল ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রকাশে। মধ্যবর্তী কালে প্রকাশিত আরো বহু পত্র-পত্রিকার উল্লেখও করা হয়নি এ আলোচনায়। তাতে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস অসম্পূর্ণ যদি থাকেও, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তাদের কোনো মূল্য নেই। কারণ, কী গদ্য রূপের সংগঠনে—কি সৃজনশীল রুচির পরিবর্ধনে, এইসব পত্রিকার কোনো উল্লেখ্য দান অনুপস্থিত। 'তত্ত্ববোধিনী' পরম্পরাগত সকল প্রয়াসের সুসম্পূর্ণতা বিধান করেছে।

'তত্ত্ববোধিনী'

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষণে ও পরিকল্পনায়, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল : মূলত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনেরই অন্যতম মাধ্যম হিশেবে কল্পিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ। বিশেষ করে মফস্বল বাংলার 'ব্রহ্ম-নিষ্ঠ'দের সঙ্গে মানসিক সংযোগ রচনার জন্য এইরূপ একটি পত্রিকার প্রয়োজন প্রথমে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু, মহর্ষির ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে একটি সহজ মুক্তি ছিল, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা চর্চার চেষ্টাকে যা নির্মূল করতে পেরেছিল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই দেখি,—উনিশ শতকের দীপ্ততম

'ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্রথমে তত্ত্ববোধিনী সভার পৃষ্ঠপোষক, এবং পরে সম্পাদক পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রই অক্ষয়কুমার দত্তের মতো সুযোগ্য সম্পাদককে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে প্রথমাবধি যুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই মুক্তপ্রাণ বাংলা গদ্য-রূপের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম রচিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলা-সুন্দর বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যের জনক। তাঁর রচনার মধ্যেই বাংলা গদ্য শিল্পগুণে বিভান্বিত হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে গদ্য-দেহে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দার্শনিক ঐতিহাসিক বিচারের ওজোগুণ সঞ্চারিত করেছিলেন সম্পাদন অক্ষয়কুমার।

স্বয়ং মহর্ষি যোজনা করেছিলেন তাঁর ঈশ্বরমগ্ন মনের অন্তর্দৃষ্টি, এবং সহজ সৌন্দর্য-পিপাসা-প্রভাবিত সাবলীল গদ্যরূপ। সবকিছু মিলিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী'র বাংলা গদ্য-চিন্তন ধীরে ধীরে নবজাগরণ কালের জা ীয় চিন্তারও সার্থক পবিবাহক হয়ে উঠেছিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
পূর্ণাবয়ব গদ্য-রূপ

মুখের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই গদ্যের প্রথম উদ্ভব। লেখাব মাধ্যমে যখন গদ্য-রূপের ব্যবহার হতে থাকে, তখনো প্রথমে তার প্রধান উদ্দেশ্য হয় প্রয়োজন নির্বাহ। সাহিত্য-রসের পরিবাহক হতে হলে আটপৌরে গদ্যকে প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করতে হয়। শিল্পীর ব্যক্তিমনের নিভৃত উত্তাপেই সার্থক শিল্পের অঙ্কুর উদ্গত হতে পারে। তাই সাহিত্যিক গদ্যকেও প্রথমে লেখকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সিক্ত হতে হয়। আর তাবও আগে প্রয়োজন গদ্যের সাবলীল বহমানতা। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো ভাবকে যদি ভাষার মাধ্যমে অনায়াসে প্রকাশ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে ভাষার রুদ্ধ প্রবাহে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে শিল্পি-মনের বাসনা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

সাহিত্যিক গদ্য

বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক বহমানতার সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সাময়িক পত্রেব বিচিত্রচারী আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে। তারপরে বিভিন্ন প্রাণতপ্ত ব্যক্তিত্বের লেখনী-স্পর্শে লিখ্য গদ্যের দেহে নবীন শিল্প-সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখা দিতে লাগল, ক্রম-বিকশিত হতে লাগল বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রূপসম্ভাব।

বাংলা গদ্য লিখে, সে গদ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের দীপ্তি সঞ্চারিত করে দেবার প্রথম কীর্তি রাজা রামমোহন রায়েব। প্রথমেই বলে রাখা উচিত, পুরোপুরি রীতি বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য রচনায় তাঁর সাফল্য সীমিত। কিন্তু গদ্য ভাষাকে তিনিই প্রথম গৃহকর্ম নির্বাহেব বদ্ধতা থেকে বৃহত্তর জ্ঞান-চিন্তাব জগতে টেনে আনেন। তাঁর প্রথম রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ'-ব (১৮১৫ খ্রি) অনুবাদে মূল সংস্কৃতের দার্শনিক বিচার ও আলোচনাকে তিনি সহৃদয় আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলা ভাষায় রূপায়িত করেছেন। কেবল এই ভাষার র[illegible]তেই নয়, পঠনেও যে মনের সংযোগ প্রয়োজন, গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান' অংশে লেখক সেকথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন,— "প্রথমত বাংলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এ-ভাষা সংস্কৃতেব যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ-ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যেক কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগ্য ন্যূন্যতা করিতে পাবেন। এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।"

গদ্য লেখক রামমোহন

উদ্ধৃত অংশটুকু রামমোহনের গদ্য রচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রামাণিক নিদর্শন। প্রথমত, এখানে তাঁর গদ্য-রীতি বাংলা বাগ্‌ভঙ্গি পুরো অনুবর্তন করতে পারে নি ; অনেকাংশে বরং ইংরেজি বাক্য-রীতির অনুসারে গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যে ব্যক্তি-মনের চিন্তা বা উপলব্ধির স্পর্শ যে ঘটে নি, একথাও তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। সর্বোপরি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্য

রচনার ধারা যেমন তিনি প্রবর্তিত করেছিলেন, তেমনি প্রথম গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান'-এই পাঠকদের রুচি ও চিন্তাকেও তাঁর অনুগামী করে নিতে চেয়েছেন। এখানেই বাংলা গদ্যে সাহিত্য-সম্ভাবনার বীজ নিহিত হয়েছে। কোনো শিল্পীই স্বয়ম্ভু নন। পাঠক-সমাজ, তথা, পারিপার্শ্বিক জীবনধারার সঙ্গে শিল্পি-মনের আদান-প্রদানের সূত্রই সার্থক শিল্পের উৎস। রামমোহন তাঁরা পাঠকদের গদ্য-রসবোদ্ধা করে তুলে সেই উৎস-মূল দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া কেবল পাঠকের অনুভবকে নয়, লেখকের আকাঙ্ক্ষাকেও উদ্দীপ্ত-সুগঠিত করে তোলায় রামমোহনের দান ছিল যথেষ্ট। তাঁর বেদান্ত সম্বন্ধীয় আলোচনা, এবং বিশেষ করে, সতীদাহ নিবারণ মূলক প্রবন্ধাবলি রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজকে বিরোধিতায় উদ্বেজিত করে তুলেছিল। রামমোহনের প্রবন্ধাদির উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা প্রতি-প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন। রামমোহন তার উত্তর দিলে, তাঁরা দিলেন আবার প্রত্যুত্তর। এইভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধারা চলতেই লাগল। এর ফলে, উভয় পক্ষেই গদ্যলেখকের সংখ্যা ও লেখার পরিধি বিস্তারিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, স্বপক্ষেব বক্তব্যকে যুক্তি-সিদ্ধ অথচ সর্বজন-গ্রাহ্য প্রাঞ্জল করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি লেখকই লেখাব মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের যথাসাধ্য নিয়োজনে সচেষ্ট হলেন।

এখানেই গদ্যলেখক রামমোহনের অতুল্য কীর্তি। বাংলা ভাষাকে পুরো রীতিশুদ্ধ রূপ তিনি নিজ হাতে দিতে পারেন নি, ভাষাকে শিল্প-সুন্দর করতে পারার উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল না। সাহিত্য রচনার দূরতম আকাঙ্ক্ষাও কখনো তাঁর ভাবনায় আসে নি। তাহলেও, সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত বাংলা গদ্য-রচনার ধারাকে তিনি অবারিত করেছিলেন প্রথম।

সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের সকল রচনা উল্লেখনীয় নয়—কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মোটামুটি জানা যেতে পারে যে, তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে, 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকেব প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদ' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮১৮ ও ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন 'সহমরণ বিষয়' ; 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ইংরেজি মূল অবলম্বনে বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ভাষা-সচেতন, বিজ্ঞানসম্মত বাংলা ব্যাকরণ। এ-ছাড়াও বহু সংখ্যক উপনিষদ-এর অনুবাদ-ব্যাখ্যা ও ধর্ম-বিষযে নানা বিতর্কমূলক প্রবন্ধেরও তিনি রচয়িতা ছিলেন। আধুনিক বাংলা, এমন কি ইংরেজি শিক্ষিত ভারতে, ঔপনিষদিক বিদ্যার প্রসার রামমোহনের আর এক অতুল্য কীর্তি। কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত-ও তিনি লিখেছিলেন।

রামমোহন রচনাপঞ্জী

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে বা নিকটবর্তী কোনো সময়ে হুগলি জেলার রাধানগরে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। পিতা ছিলেন রামকান্ত রায়, —মা তারিণী দেবী। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁর দেহান্ত হয়।

বাংলা গদ্যের লেখক হিশেবে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫ খ্রি.) সমুচিত মর্যাদা পান নি। হয়ত খ্রিস্টান হয়েছিলেন বলেই সেকালে তাঁর দান উদারতার সঙ্গে স্বীকৃত হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন,—ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন 'সর্বাগ্রগণ্য'। প্রথমে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, পরে শিবপুর বিশপ কলেজের অধ্যাপক, এবং আরো পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়েছিলেন। বাংলা গদ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পুস্তক 'উপদেশ কথা' (১৮৪০ খ্রি.) খ্রিস্টধর্মের যাজক হিশেবে প্রদত্ত ভাষণের সমষ্টি। কিন্তু বাংলা গদ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা রূপে। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে তেরো খণ্ডে বিভক্ত একখানি বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ তিনি রচনা

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন

করেছিলেন। এই গ্রন্থের বাংলা, এবং ইংরেজি-বাংলা-মিশ্র দুরকম সংস্করণই প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে এই গ্রন্থ-ভাষার অতিকাঠিন্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। তাহলেও কৃষ্ণমোহনেব ভাষা সর্বত্রই দুষ্পাঠ্য ছিল না,—"একপ্রকার হংসরাজের বিষয়ে কথিত আছে যে, সে ম্রিয়মাণ অবস্থায় ব্যতীত জীবদ্দশায় কদাপি গান করে না। কিন্তু আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মধুব স্বরে গান করে।"

'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৭৬ খ্রি.) নামে কৃষ্ণমোহন আর একখানি পাঠ্য পুস্তক লিখেছিলেন। তাতে কথোপকথনের মাধ্যমে দর্শনের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। 'Inquirer'-নামে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা কবে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন , তা ছাড়া 'সংবাদ সুধাংশু' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিকেবও সম্পাদনা করেছিলেন অল্পকাল।

বাংলা লৈখিক গদ্য ভাষায় লেখকের ব্যক্তিত্বের সাবলীল দীপ্তি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ব পৃষ্ঠায় (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩), সে কথা পূর্বে বলেছি। বাংলা গদ্যের এযাবৎ আলোচিত বিকাশ-ধারায় তিনটি প্রধান গ্রন্থি লক্ষিত হয়েছে। প্রথমে ছিল মুখেব ভাষাকে গুছিয়ে অন্বিত করে, পরিমার্জিত লিখ্যরূপদানের সমস্যা। উইলিয়ম কেরির সম্পাদনা এবং মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির রচনাবলির মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব কালেই বাংলা গদ্যের সেই গ্রন্থিমোচন ঘটেছিল। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল [illegible] শব্দ চয়ন ও প্রয়োগেব ক্ষমতার। ভাষার প্রকাশ-শক্তির বিস্তার এবং প্রাঞ্জলতা বিধানেই তার বলিষ্ঠতাব ভিত্তি। সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সেই সর্বমুখী প্রয়োগ-প্রবণতার সফল বিকাশ। বসরচনা, দর্শন, রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ক গুরুগম্ভীর আলোচনা ও তথ্য-প্রকাশ থেকে শুরু করে নানা রকমের ইস্তাহার-বিজ্ঞাপন রচনার লঘু ভাষা-প্রয়োগেও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সাবলীল প্রাঞ্জলতা প্রায় সর্বজন-আয়ত্ত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

বাংলা গদ্যে style-এব সুপরিণতিব পূর্বসূত্র

এবারে এল সাহিত্যিক বস-ব্যঞ্জনাময় ভাষাসৃষ্টির প্রেরণা। মানুষের ভাবনায় এমন কথাও আছে, কেবল অন্বয়-পরিবদ্ধ বাক্য, কিংবা আভিধানিক স্পষ্টার্থযুক্ত শব্দেব প্রয়োজনেই যার তাৎপর্য পূর্ণ অধিগম্য হয না। বক্তব্যের গূঢ়ার্থ যেখানে বক্তাব অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত থাকে, সেখানে সার্থক প্রকাশ কেবল তখনই সম্ভব, যখন বক্তার অন্তরঙ্গ ঝোঁকটি বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে সমুচিত বিন্যস্ত হতে পারে। এখানেই ভাষাব দেহে বক্তার ব্যক্তিত্বের সংযোজনবশে স্বাতন্ত্র্যদীপিত 'স্টাইল'-এর উদ্ভব ঘটে।

রামমোহন বাংলা গদ্যের প্রথম ব্যক্তিত্ব-ভাস্বর লেখক। কিন্তু তাঁর কালে গদ্যের শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ বিন্যস্ত হতে পারে নি। ভাষার আভ্যন্তরীণ সামর্থ্যও তাই শিল্প-সুষমাযুক্ত লাবণ্য আয়ত্ত করে উঠতে পারে নি। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশেরও পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাব পৃষ্ঠায় বাংলা গদ্যের গঠন-প্রকৃতি যে কত স্বাভাবিক ও সর্বজনসাধ্য হয়ে পড়েছিল, তার এক নতুন গ্রন্থভিত্তিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রন্থটির আবিষ্কর্তা অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ; লেখক বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি। গ্রন্থের নাম 'পুরাণবোধোদ্দীপনী—চতুর্থ খণ্ড', —রচনা সমাপ্তির কাল ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগ। এখানে স্মরণ করতে হয়, কৃষ্ণচন্দ্রের গ্রন্থরচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগান্তকারী সৃষ্টি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশের (১৮৪৭) প্রায় কুড়ি বছর আগেকার। লেখক কোনো বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তাহলেও, অনায়াসে তিনি লিখতে পেরেছিলেন,—"শচীকে বৃহস্পতি অভয় প্রদান করিয়া

'পুরাণবোধোদ্দীপনী' ও লিখ্য বাংলা গদ্যেব সাধারণ রূপ

আপনার অন্তঃপুরে রাখিলেন। পরে ক্ষণমাত্র ব্যাজে নহুষ রাজার দূত বৃহস্পতির গৃহে আগমন করিয়া বলিলেন যে, শচীকে নহুষ রাজা আহ্বান করিয়াছেন।"—এই ভাষা 'তত্ত্ববোধিনী'-পূর্ব লিখ্য বাংলা গদ্যের সমুচিত নিদর্শন হিশেবে গৃহীত হতে পারে।

এই সাবলীল ভাষা-রূপের গভীরে শিল্পের সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত করেছিল দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বদীপ্ত স্টাইল; 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠাতেই তার প্রথম স্মরণীয় প্রকাশ।

বাংলা গদ্য style গঠনে ত্রয়ী

'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতিষ্ঠাতা পরিকল্পক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সে কথা আগে বলেছি। এই পত্রিকা-গোষ্ঠীর বরণীয় লেখক হিশেবেও তিনি প্রথম স্মরণীয়। প্রিন্স দ্বারাকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন দেবেন্দনাথ ; জন্ম হয় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মে। কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, মহর্ষির অন্যান্য পুত্রেরাও অনেকেই যুগ-দুর্লভ শিল্প-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ; আর সেই লোকোত্তর শক্তির উৎস ছিল তাঁদের পিতৃ-প্রতিভার মধ্যে। দার্শনিকের অতলস্পর্শ অনুভবের সূত্রে কবির আবেগকেও গ্রথিত করেছিল মহর্ষির গদ্য। 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান'-এ তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে ভক্তিসুন্দর সাবলীল ভাষায় —"ভূলোকে, দ্যুলোকে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, ঊষাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ বীরেরা সেই স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন।...ঊষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

প্রধানভাবে ব্রাহ্মসমাজ, অথবা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্যেই তাঁর প্রায় সকল রচনাই লিখিত হয়েছিল। তাহলেও ঐসব লেখার সাহিত্য-মূল্যও কম নয়। বাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, বাংলা গদ্যে বক্তৃতার ভাষা এক সফল সাহিত্যিক পরিণতি লাভ করেছিল দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতামালায়। বস্তুত, বক্তৃতার এই বাক্‌রীতি বাংলা সাধু গদ্যের দেহে এক অভিনব সাবলীলতা দান করেছিল। মহর্ষির রচনাপঞ্জীর মধ্যে রয়েছে 'ব্রাহ্মর্ধম' (১৮৫১-৫২), 'ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২) 'ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬৯-৭২) ইত্যাদি। রচনাগুলি উল্লিখিত সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়,—পরে এগুলি গ্রন্থাকারেও পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সাহিত্যিক সৃষ্টি হিশেবে মহর্ষির শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮)। "১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত" নিজ জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে তিনি পাণ্ডুলিপি দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে নির্দেশ ছিল, লেখকের জীবৎকালে গ্রন্থটি যেন প্রকাশিত না হয়। পরে অনুরাগীদের বিশেষ আগ্রহে মহর্ষির জীবদ্দশাতেই গ্রন্থটিপ্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনায় আত্মদর্শনের গভীরতা, নিসর্গপ্রীতির ঐকান্তিকতা এবং ঈশ্বর-ভক্তির অবিচলতা সমগ্র রচনাকে আশ্চর্য শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত করেছে। মহর্ষির পত্রাবলিতেও ক্ষণে ক্ষণে কবি-পিতার প্রতিভাকে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করা চলে।

বাংলা গদ্যে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায়। প্রায় একই সময়ে তার আরো একটি রূপ প্রত্যক্ষ করি অক্ষয়কুমারের গদ্যপ্রবাহে। অপরিণত-যৌবন রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন—"যে দেশে শেক্সপীয়র জন্মিয়াছে, সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে ; যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব ; ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবলমাত্র সৃজন করা নয়। যেদেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে, সেদেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়। সকলি হয়।" কবি নিজে বিজ্ঞানের আলোচনা করে, এবং বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আযৌবন মানস সঙ্গচারণ করে এই সত্য প্রমাণ

বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমার

করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগ আত্যন্তিক বিজ্ঞান-দর্শনসাধনারও যুগ,—আচার্য জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের যুগ। বস্তুত সাহিত্যের সম্পূর্ণতা কেবল সৃজনমূলক রচনার প্রাচুর্যে নয়। দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদির জ্ঞান-মার্গী সাধনা সাহিত্য ও ভাষাকে বলিষ্ঠতা দান করে থাকে ; জাতির হৃদ্‌বৃত্তি ও চিদ্‌বৃত্তিকে বিকশিত করে সমগ্র জাতীয় জীবনকে করে তোলে সম্পূর্ণ—ভারসম। এই পূর্ণতার মধ্যেই সাহিত্যকর্মেরও যথার্থ সফলতা। ঈশ্বরচন্দ্র-অক্ষয়কুমারের যুগ কেবল বাংলা গদ্য ভাষার নয়, রেনেসাঁস যুগের বাঙালি জাতীয়তারও নব-প্রবোধনের যুগ। শিল্পের পথে, জীবন-সাধনার ভাবানুভব-গাঢ় উপলব্ধির পথে, জাতির মনকে সেদিন চালনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক অক্ষয়কুমার এলেন ভাবুক জাতির জীবনে সর্বপ্রথম বস্তুনির্ভর এবং নির্বস্তুক জ্ঞানের আলো নিয়ে। বিদ্যাসাগরের ভাব ও ভাষায় ঋজুতার সঙ্গে রয়েছে হৃদয়াবেগের জঙ্গমতা। অক্ষয়কুমারের বিচার-পরীক্ষণপূর্ণ রচনার ভাষা যেমন ধীর, তেমনি সংযত। এই দুই অবিস্মরণীয় লেখকের একজন দিয়েছেন ভাবের আবেগ—প্রাণের উৎসাহ ; আর একজন বর্ধিত করেছেন প্রাণের শক্তি।

অক্ষয়কুমারের জীবন-কথা

১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন পীতাম্বর দত্ত, জননী দয়াময়ী। অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর জ্ঞান ও উৎসাহ ছিল আবাল্য প্রখর। উনিশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের ফলে তাঁকে শিক্ষায়তন ত্যাগ করে কর্মসন্ধান করতে হয়। একান্ত শুভানুধ্যায়ী কোনো এক আত্মীয় এই সময়ে তাঁকে আইন পড়তে উপদেশ দেন। অক্ষয়কুমার জবাব দিয়েছিলেন,—"যে বিষয় পরিবর্তনীয় ; তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি?"—এর থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি, বিশ্বনিয়ামক চিরন্তন জ্ঞানের প্রতি, অক্ষয়-প্রতিভার সহজাত পিপাসার পরিচয় স্বয়ংস্ফুট হয়ে থাকে। এই সহজ প্রতিভাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে একদা সর্বজ্ঞানের আকর করে তুলেছিল। বস্তুত 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক হিশেবেই গদ্য-লেখক ও জ্ঞানি-মনীষী অক্ষয়কুমারের যুগপৎ আত্মপ্রকাশ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করে বলেছিলেন,—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল ; তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদনা না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনোই হইতে পারিত না।"

তাহলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল একখানি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে, 'অনঙ্গমোহন' কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। ঈশ্বর গুপ্তের নির্দেশে 'সংবাদপ্রভাকর'-এর জন্য তিনি প্রথম গদ্য রচনা করেছিলেন। তারপরে 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় এই গদ্যের পূর্ণ বিকাশ। পুস্তিকার আকারে অক্ষয়কুমারের প্রথম যে দুখানি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়, তার একখানি 'ভূগোল' (১৮৪১) একখানি 'শ্রীযুক্ত ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা'। তাঁর ইতিহাস-বিখ্যাত প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৫১ ও ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের সূত্র এই গ্রন্থে সহজ গদ্যে গ্রথিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের আর একখানি উল্লেখ্য গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', ইংরেজ গবেষক H. H. Wilson-এর 'The Religious Sects of the Hindus' অবলম্বনে কল্পিত ও রচিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্মচেতনার একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্বগত প্রামাণিক পরিচয় এই গ্রন্থে রয়েছে। অক্ষয়কুমারের স্বতন্ত্র গদ্য-রূপের স্বভাবও এতে সুপ্রকট,—"ল্যাটিন ও গ্রীক, কেলটিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লাবোনিক, হিন্দু ও পারসিক

রচনাপঞ্জী

ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি য়ুরোপীয়দিগের শব্দবিদ্যানুশীলনের, বিশেষত সংস্কৃত চর্চার সুধাময় ফল।"

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনাই একদা পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পেয়েছিল। এইসব পুস্তকের মধ্যে রয়েছে, 'চারুপাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ', 'ধর্মোন্নতি সংসাধক প্রস্তাব', 'ধর্মনীতি', ও 'পদার্থবিদ্যা'।

বাংলা গদ্যরীতির গঠনে যে শিল্পি-ব্যক্তিত্বের দান ঐতিহাসিক পথরচনার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' বলে অভিহিত করেছেন।

যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগর

১৮২০ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে সেপ্টেম্বর যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল মেদিনীপুর বীরসিংহের এক অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর পিতা ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। কঠোর দারিদ্র্য ও দুরবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সর্ববিদ্যা মন্থন করেছিলেন ; তাই তাঁর উপাধি হয়েছিল 'বিদ্যাসাগর'। কিন্তু বাঙালি মানসিকতার ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন 'দয়ার সাগর' রূপে। কেবল বাংলা গদ্যেরই নয়, শিক্ষা, ও নবীন সমাজ সংস্কারেরও, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ হোতা।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'

বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দি 'বেতাল-পচ্চিশী'র অনুসারে এই সরস গল্পগ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বিশেষ ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে। কলেজ-কর্তৃপক্ষই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন। এর আগে 'বাসুদেবচরিত' নামে আর একখানি গ্রন্থ বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধ অবলম্বনে। সম্ভবত হিন্দু পুরাণের কাহিনী বলে ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ এতে পৌত্তলিকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই গ্রন্থটি তাঁরা ছাপেন নি।

গদ্যে শিল্পরূপের বিকাশ

যাই হোক, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তেই ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগরের 'অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমা' শক্তির প্রাঞ্জল প্রকাশ ঘটেছিল। এই গ্রন্থেই বাংলা গদ্যের রীতিশুদ্ধ রূপ প্রথম আনুপূর্বিক শৈল্পিক শৃঙ্খলায় প্রকাশ পেল ; প্রতিটি বাক্য হল আদি-অন্তে অন্বিত, সুগঠিত, পূর্ণাঙ্গ। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলাগদ্যের প্রতি বাক্যকে ছেদ চিহ্ন দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক করে দেখালেন। কেবল তাই নয়, শব্দের পারস্পরিক অন্বয়ের ফলে গদ্যেও যে ছন্দের ঝঙ্কার জেগে ওঠে,—সে কথাও সচেতন ভাবে প্রথম প্রতিপন্ন করলেন তিনিই। তাছাড়া তাঁর রচিত গদ্য কেবল বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করল না, শিল্পীর ঋজু স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শব্দাবলি হয়ে উঠল ব্যঞ্জনাধর্মী। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে বলেছিলেন বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের এই অভূতপূর্ব সৃজনদক্ষতার "ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব" হয়েছিল। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র একটি ছত্র উদ্ধার করলেই এই সকল মন্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদিত হতে পারবে —

"বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল।"

নাতিদীর্ঘ এই দুটি বাক্যের একটি সরল, একটি যৌগিক। যথাযোগ্য বিরতিচিহ্নের প্রভাবে সাবলীল অবয়ব-পরিবদ্ধ পদাবলি ছন্দোঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। অনুপ্রাস-তরঙ্গিত সুচয়িত শব্দগুচ্ছ তাতে পদ্যের ধ্বনিসুষমা যোজনা করে।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র বাক্যসজ্জায় বিদ্যাসাগর প্রথম ছেদ চিহ্নের নিয়মিত প্রয়োগ করেছিলেন। 'কমা' চিহ্নের প্রথম পদ্ধতিবদ্ধ ব্যবহার হল দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শকুন্তলা'তে (১৮৫৪ খ্রি.)। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র পরবর্তী সংস্করণগুলি একই রীতিতে 'কমা'-চিহ্নিত হয়। রামমোহনের প্রথম রচনার 'অনুষ্ঠান' অংশে দেখেছি, বাংলা বাক্য সেকালে যেমন সুগঠিত সুচিহ্নিত ছিল না, তেমনি গদ্য পাঠের রীতিতেও তখনকার পাঠকেরা ছিলেন অনভ্যস্ত। প্রতিটি বাক্যকে ছেদ চিহ্নের দ্বারা পৃথক করে নিলে তার অর্থগ্রহণে সুবিধা হয়,—'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র রচনাকালেই বিদ্যাসাগর এ কথা অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া, উচ্চারণ করবার সময়ে একটি বাক্যের সমাপ্তিস্থলের আগেও আমাদের থামতে হয়। আর সে বিরতি সুকল্পিত হলে অর্থগ্রহণ সহজ হয়, তেমনি শব্দের ঝঙ্কারও হয় সুললিত। 'শকুন্তলা' গদ্য-কাব্যে অনভিজ্ঞ পাঠকের সামনে এই সুখপাঠ্য, তান-সমন্বিত গদ্যরূপকে সর্বপ্রথম তুলে ধরেছিলেন বিদ্যাসাগর —

'শকুন্তলা'

"কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিপূর্ণ জলকমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! শুনিলাম আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল ; এখন কেমন আছে, কিছু উপশম হয়েছে?"

সরল, অথচ গম্ভীর ছন্দোময় এ ভাষা কেবল রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য'-র গদ্যের সঙ্গেই তুলনীয়।

'শকুন্তলা' কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। কিন্তু বিষয় ও ভাবের ব্যত্যয় না ঘটিয়েও বিদ্যাসাগর তাঁর বাংলা রচনায় বাঙালি জীবনের পরিবেশটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' এর অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯খ্রি.) নামে। তাতে যেমন বই-এর নাম, তেমনি পাত্রপাত্রীদের নামও পালটে দিয়েছিলেন তিনি , বিদেশী নামের জায়গা জুড়ে ছিল দেশী নাম। বই-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ এ-বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন যে,—বিদেশী নাম দেশী পরিবেশে বেমানান হয়ে পড়ে। কেবল নামের বেলাতেই নয়, আগাগোড়া রসরচনার ক্ষেত্রেও, এই দেশীয় আবহাওয়া তিনি সর্বত্র রক্ষা করে গেছেন। ফলে, অনুবাদ কাহিনী মৌলিক রচনার রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রধানত অনুবাদক হলেও এখানেই বিদ্যাসাগরের শিল্প-স্বভাবের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য। তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'সীতার বনবাস'-এ (১৮৬০খ্রিঃ) এই সত্য আরো স্পষ্ট-প্রাঞ্জল হতে পেরেছে। এই গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায় ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' থেকে নেওয়া। গ্রন্থের বাকি অংশ বিদ্যাসাগর চয়ন করেছেন তাঁর শিল্পিমনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে,—বিভিন্ন সংস্কৃত রচনার বিচিত্র অংশ থেকে।

অপরাপর রচনা

বিদ্যাসাগরের একমাত্র মৌলিক শিল্প-রচনা হচ্ছে গদ্যকাব্য 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৩?), বাংলা ভাষার প্রথম শোক-কাব্য-ও বোধ হয় এটি ; রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের এক পৌত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এই অপূর্ব রচনার জন্ম হয়েছিল। মেয়েটির নাম ছিল প্রভাবতী , বিদ্যাসাগর তাকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন।

'প্রভাবতী সম্ভাষণ'

তাছাড়া 'বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব'-এও (১৮৫৫) বিদ্যাসাগরের আবেগকম্পিত বেদনা শিল্প-সুন্দর রূপ পেয়েছে ঃ—"হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক ধর্ম রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।"

বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ঃ—মার্শম্যান-এর 'বাংলা ইতিহাস'-এর শেষ নয় অধ্যায়ের অনুবাদ (১৮৪৮), 'চেম্বার্স বায়োগ্রাফি'র অনুবাদ 'জীবন চরিত' (১৮৪৯), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬), "মহাভারত"-এর (উপক্রমণিকা ভাগ) অনুবাদ (১৮৬০), 'আখ্যান মঞ্জরী' (১৮৬৩খ্রি.) ইত্যাদি।

'বিদ্যাসাগর রচনাপঞ্জী'

তাছাড়া 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', ইত্যাদি সরস ব্যঙ্গরচনাও তিনি করেছিলেন বেনামে ; উপলক্ষ ছিল বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বিতর্ক।

বিদ্যাসাগরের আর একখানি উল্লেখ্য গ্রন্থ তাঁর 'স্বরচিত জীবনচরিত'। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। নিজের জীবৎকালে এই মূল্যবান রচনাটি লেখক প্রকাশ করেন নি। পিতার তিরোভাবের পর বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৯১খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

'তত্ত্ববোধিনী' যুগের সমকালেই পত্রিকা সম্পাদনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর অধিকাংশ গদ্য রচনাই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার পাতায় বদ্ধ রয়েছে। দুটি পত্রিকাই ছিল সচিত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর জীবনে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-র প্রভাবের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বীকার করেছেন 'জীবনস্মৃতি'-তে। বাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—"বাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এমন আর কাহারও নহে।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অথচ, যথার্থ সৃজনী-সাহিত্য যাকে বলে, রাজেন্দ্রলাল তা মোটেও রচনা করেন নি। পত্রিকা দুটিতে তিনি বিশ্ববিদ্যার সমাহার করেছিলেন। তার বহুলাংশই সম্পাদকের রচিত হলেও, লেখকের নাম অনেক জায়গাতেই অনুপস্থিত। বাজেন্দ্রলালেব নিজ নামে প্রকাশিত কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আছে 'প্রকৃত ভূগোল' (১৮৫৪), 'শিল্পিক দর্শন' (১৮৬০), 'শিবাজীর চরিত্র' (১৮৬০), 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' (১৮৬১), ও 'পত্রকৌমুদী' (১৮৬৩)।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয়েছিল, তাঁর পিতার নাম ছিল জন্মেজয় মিত্র।

বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমারের রচনাধারার অনুসৃতি সেকালে খুব একটা লক্ষিত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যস্বাদী গদ্য রচনার রীতি বহুল অনুশীলিত হয়েছিল। শেষোক্ত অনুশীলনকারীদের মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্ন ছিলেন একজন প্রধান। সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী'র অনুবাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগবের 'শকুন্তলা'র ভাষার সঙ্গে এই রচনার অপরূপ সাদৃশ্য ছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগবের 'শকুন্তলা' রচনার মাত্র এক বছর পরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লেখক বলেছেন, তাঁর রচনা "মূল সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে।"

তাবাশঙ্কব তর্কবত্ন

'কাদম্বরী'র আগে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০), আর তার পরে লেখেন জন্‌সনের 'রাসেলাস্' গ্রন্থের অনুবাদ (১৮৫৭)।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনা ও সমাজ-বিপ্লবের একান্ত অনুবর্তী ছিলেন। তাঁরই শিশু পৌত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' লিখিত হয়। রাজকৃষ্ণের রচনায় আগাগোড়া বিদ্যাসাগবের গদ্যভঙ্গির প্রভাব রয়েছে। ফরাসি কবি ফেনেলনের ইংরেজি কাব্যানুবাদ অবলম্বন করে ইনি গদ্য 'টেলিমেকস্' লিখেছিলেন ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। লেখক নিজেই স্বীকাব করেছেন.—বিদ্যাসাগর মশায় এই গ্রন্থের আগাগোড়া ভাষা সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'রাজবালা' নামে একখানি রোমান্টিক আখ্যায়িকাও লিখেছিলেন রাজকৃষ্ণ (১৮৭০খ্রি.)।

যেমন 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনায় অক্ষয়কুমার, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভে' রাজেন্দ্রলাল, তেমনি এযুগের গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদক হিশেবে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অবিস্মরণীয়। কোনো সমালোচক বলেছেন,—"তাহার সোমপ্রকাশ বাংলাভাষাকে ও বাংলা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাংলা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স্ আলোচিত হইতে লাগিল। বাংলা ভাষার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্বে লোকে ভাল করিয়া ধারণা কবিতে পারে নাই।" এর থেকেই বাংলা গদ্যের সংগঠনে দ্বারকানাথের যথার্থ ভূমিকার পরিচয় স্পষ্ট হবে। এ ছাড়া, তাঁর নিজের নামে প্রচলিত স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে প্রধান হচ্ছে,—'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীসরাজ্যের ইতিহাস' (১৮৫৭)।

দ্বারকানাথ
বিদ্যাভূষণ

দ্বারকানাথ শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল ছিলেন। ১৮২০খ্রিস্টাব্দে তাঁব জন্ম হয়েছিল ; পিতা ছিলেন হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

নবীন বাংলা সাহিত্যের গঠমানতার যুগে গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন সব্যসাচী। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক হিশেবে তাঁর গদ্যরচনা ও জাতি-চেতনার দুর্লভ পরিচয় ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে' বাংলা সৃজনীসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেকালে একাধারে অতীতসন্ধিৎসু ও অনাগত-বিধাতা। আগে বলেছি, কবিওয়ালাদের বিস্মৃতপ্রায় পরিচয়ের প্রায় সবটুকুই ঈশ্বর গুপ্ত আহরণ করে গেছেন 'সংবাদ প্রভাকর'-এ। এই 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠাতেই শিক্ষার্থী তরুণ হিশেবে অন্যান্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুরও সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি হয়েছিল। কিন্তু, কেবল কবিগানের ঐতিহাসিক ও ভাবী কবিদের স্রষ্টারূপেই নয়,কবি হিশেবে ঈশ্বর গুপ্ত নিজেও সেকালে ছিলেন মুখ্য, —প্রায় একচ্ছত্র শিল্পী।

ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রতিযোগিতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেকালের বাংলা গদ্যচর্চা তথা সাংবাদিকতার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ছিল অনন্য। অন্যপক্ষে কবি হিশেবে তাঁর বিকাশ ছিল প্রায় একক। তাহলেও, বলতেই হয়, কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের সাফল্যের কাছে ম্লান হয়ে আছে। বস্তুত, তাঁর কবি-কর্ম একদিকে কবিওয়ালাদের রচনাধারারই উত্তর-সাধনা করেছে, অন্যদিকে তা ছিল তাঁর সাংবাদিক ব্যক্তিত্বেরই যেন পদ্যায়িত প্রকাশ। এতে বিস্ময়ের কারণ কিছু নেই। সিদ্ধকাম সাংবাদিক উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হতে পারেন নি, তার জন্য অনুযোগেব কারণ অন্তত থাকা উচিত নয়। আসলে কৌতূহলের বিষয় আলোচ্য যুগ-সীমায় কাব্য-প্রচেষ্টার এই একান্ত স্বল্পতা।

গুপ্তের কবিত্ব

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতাবাসী হন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, আর ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। এই সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যের উন্নতি, বিকাশ ও সম্পূর্ণতার ইতিহাস একটি অখণ্ড যুগ-প্রগতির পথকে চিহ্নিত করেছে। সে তুলনায় কাব্য-সাহিত্যের পরিণতি ঐ সময়ে একান্ত নিরুদ্ধ হয়েছিল। সুশিক্ষিত নগর-বাংলাতেও অশিক্ষিতপটু কবিগানের পুনরাবর্তন চলছিল বিচিত্ররূপে। গদ্যের তুলনায় পদ্য সাহিত্যের এই জড়তা বিস্ময়কর হলেও অসম্ভব নয়। আগে বলেছি, গদ্য হচ্ছে প্রয়োজন ও মননের বাহন ; পদ্য বহন করে ভাবের ধ্যান-তন্ময়তাকে। যে যুগের কথা বলছি, নগর-বাংলায় সকল দিকে তখন নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। নবীন জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন, উত্তেজনা, বিতর্কের ঝড় উঠেছিল যেন। এমন পরিবেশে গভীর অনুভবসাধ্য সফল কাব্যরচনার সাধনা অসম্ভব। কবি-মনের অবিচল দৃঢ় প্রত্যয়ের মূল-ভূমিতেই সার্থক কাব্য-প্রেরণার জন্ম। আরো পরবর্তী কালে, রঙ্গলালের রচনায় সেই প্রত্যয়ের উষালোক ক্ষীণ আভায় ধরা পড়েছে। মধুসূদনের কবিকর্মে ঘটেছে এই অকম্পিত যুগ-বিশ্বাসের প্রদীপ্ত প্রকাশ।

বিবর্তন যুগের কবিতা

ঈশ্বর গুপ্তের যুগে জাতীয় জীবনে কাব্য-রচনার সেই রাজপথ রচিত হয়নি। ফলে, একদিকে নিতান্ত লঘু, হাস্য-সরস চালে কবিওয়ালাদের বাঙ্‌মুখরিত অগভীর রচনাশৈলীর অনুসরণ করেছেন তিনি। অপর দিকে সমকালীন জীবনের বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে হয় ব্যঙ্গ, না-হয় তো, সাংবাদিকের মতো পদ্যে তর্কজাল রচনা করেছেন। 'আনারস' কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ—

ঈশ্বর গুপ্তের কবি-স্বভাব

"বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর।।
এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই।।
ঈষৎ শ্যামলরূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায়।।
সকল নয়ন-মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে।।"

এই রচনাংশে ঈশ্বর গুপ্তের রসিক মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট, সেই সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির বাঙ্‌নিপুণ অগভীরতাও দুর্লক্ষ্য নয়। কবিওয়ালা-সুলভ শব্দালঙ্কার-প্রীতির চরম নিদর্শনও এই কবিতাতেই পাওয়া যেতে পারে ঃ—

"লোকে বলে, আনারস, আনারস নয়।
আনারস হলে কেন জানারস হয়।।
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা।।
ফেলিয়া পনর আনা এক আনা রাখে।
এই হেতু 'আনারস' বলে লোক তাকে।।
অরসিক নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ।।

একটি মাত্র 'আনা' কথা দিয়ে কেবল অনুপ্রাস নয়, অর্থে ফাঁকি রচনার কবি-[illegible]ন-সুলভ প্রয়াস এখানে লক্ষ করবার মতো।

ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য,—যে কোনো অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে তিনি সরস—এমন কি, স্থূল, ব্যঙ্গ-চটুল কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর লেখা 'পৌষ পার্বণ', 'পাঁটা 'ইত্যাদি কবিতা এককালে রসিক জনের মন পুলকিত করেছিল; জিহ্বাকেও হয়ত করেছিল লুব্ধ। কিন্তু এ-সব কবিতায় ভাবের দিক থেকে উল্লেখ্য গভীরতা কোথাও ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এ'কে ঈশ্বর গুপ্তের কবিস্বভাবের 'ইয়ারকি' বলেছেন। ঈশ্বরকে নিয়েও কবি এই ধরনের 'ইয়ারকি' করেছেন ঃ—

"কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম?
তুমি হে আমার বাবা—হাবা আত্মারাম।"

'পৌষ পার্বণ' কবিতায় তাঁর রচনাংশ আজও লোকে মুখে মুখে ফিরে থাকে ঃ—

"সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা।"

কবির সহজ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সার্থক পরিচয় এখানেই। শুধু তাই নয় ঃ—

"রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

অভিজ্ঞতা-তিক্ত সরস অথচ তির্যক এই ব্যঙ্গকবিতাও ঈশ্বর গুপ্তেরই রচনা।

এ-সবই কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার একদিক। অন্যপক্ষে সেকালের জাগৃয়মাণ জীবন-বাণীর প্রতি তাঁর সচেতনতার প্রকাশ আছে 'কৌলীন্য প্রথা', 'স্বদেশ', 'মাতৃভাষা', ইত্যাদি কবিতায়। ভাবে অগভীর, এবং প্রকাশে গতানুগতিক হলেও অনুভূতির তির্যক ঐকান্তিকতা তীব্ররূপে প্রতিফলিত হয়েছে এই সব কবিতাতেও। তাঁর স্বদেশ-ভক্তির নিরাবরণ, নিরাভরণ স্বীকৃতি আগেও উদ্ধার করেছি ঃ—

"কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"।

আগে বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংকলন সম্পাদনা ও তাঁর জীবনী আলোচনা করে সেই ঋণ স্বীকার করেছেন ঃ—১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম হয়েছিল কাঁচড়াপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ গুপ্ত, —মা ছিলেন শ্রীমতী দেবী। অল্প বয়সে কবির মাতৃবিয়োগ হয়, এবং তাঁর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এর প্রতিবাদে কবি জোড়াসাঁকোয় চলে আসেন মাতুল বাড়িতে। এখানেই সামান্য লেখাপড়ার পর তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। অনেক সময়েই রক্ষণশীল হলেও সমকালীন সমাজ-জীবনের বহু প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। বিধবা-বিবাহের তীব্র বিরোধিতা তিনি যেমন করেছিলেন, তেমনি কৌলীন্য-প্রথারও নিন্দা ও বিদ্রূপ করেছেন। এর থেকেই বুঝি, তাঁর প্রত্যয় সব সময়ে পূর্বাপর সংযুক্ত ছিল না। কিন্তু একবার যা বিশ্বাস করতেন, তার জন্য সর্বস্ব পণ করতেও তাঁর বাধত না। কবিতাতেও কবি-চরিত্রের এই ঋজুতা ও কাঠিন্য নিরাভরণ-প্রায় গদ্যায়ত ভাষায় তীব্র প্রকাশ লাভ করেছে।

কবি-জীবনী

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বাংলা নাটকের জন্ম-কথা

নাটক যৌথ শিল্প। বস্তুত নাট্যশিল্পের স্বাদ নাট্যকার ও দর্শকের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একান্তবদ্ধ নয়। কবি আপন মনে কবিতা রচনা করেন, পাঠক তা পাঠ করে রসের স্বাদ গ্রহণ করেন। নাটকের বেলা তা হবার উপায় নেই। বই পড়ে নয়,—মঞ্চে অভিনয় দেখে তবেই নাট্য-রসের যথার্থ আস্বাদন সম্ভব। এই কারণে নাটককে বলা হয়েছে 'দৃশ্যকাব্য'। এদিক থেকে, নাটকের রস-উপাদানকে আস্বাদ্য করে তোলার দাযিত্ব যে-পরিমাণে লেখকেব, ঠিক ততখানি, বা তারও চেয়ে বেশি দায়িত্ব, মঞ্চাভিনেতাদের। আবাব মঞ্চের গঠন, সজ্জা, পরিবেশ-রচনা ইত্যাদির ওপরে অভিনয়ের সাফল্য অনেক অংশে নির্ভর করে থাকে। অতএব, নাট্যকার যা বচনা করেন, তার রসাস্বাদকে স্বরূপত দর্শকের মনে পৌঁছে দিতে হলে নাট্যকাবের কল্পনার সঙ্গে অভিনেতা ও মঞ্চ-নির্দেশককে একাত্ম হতে হবে। আবার অভিনয়-কলার সঙ্গে একাত্মক হতে না পারলে দর্শকের পক্ষেও নাট্যরসের আস্বাদন অসম্ভব হয়। অতএব, অন্যান্য শিল্প রচনার ক্ষেত্রে শিল্পী যেমন রসসৃষ্টি করেন, আর পাঠক করেন আস্বাদন, নাটকের ক্ষেত্রে তা হয় না। এখানে নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ-চালক ও দর্শক নাটকেব নির্মাণ-শৈলীর যেন চারটি স্তম্ভ; চারজনেই একাধারে পূর্ণাঙ্গ নাট্যরসের স্রষ্টা ও উপভোক্তা। অতএব, কোনো এক সমষ্টিগত আদর্শের আবেগ যখন একটি গোটা জাতির মনকে একাত্মতাব বন্ধনে বেঁধে তোলে, তখনই সেই জাতির ইতিহাসে সফল নাট্য রচনার জীবন-পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। এই ধরনেরই এক উপযোগী পরিবেশে শেক্‌সপীয়রের নাট্যকলারও জন্ম হয়েছিল।

নাট্য-কলাব অতুল্য স্বাতন্ত্র্য

অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে রচনার প্রকরণ শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু নাটকেব রচনা-শৈলীকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে একটি গোটা জাতি বা সমাজের সমষ্টিগত প্রভাব। এই কারণে, জাতিতে জাতিতে নাট্য রচনার প্রকৃতিই কেবল পরিবর্তিত হয় না, আকৃতিরও বিভেদ ঘটে থাকে। তাই দেখি, ইংরেজি ও সংস্কৃত নাট্যকলার প্রকাশভঙ্গিতে রয়েছে আমূল তফাৎ ; তাই সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় নাট্যশৈলীব দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বাংলা নাটক কোনো রীতিরই একান্ত অনুগত হয়নি।

বাঙালিব নাট্য-স্বভাব

অতি প্রাচীনকাল থেকেই গৌড়-বঙ্গবাসীদের স্বভাব ও শিল্প-সাহিত্যে আবেগাতিশায্যিতার কথা বিশেষ উল্লিখিত হয়েছে' এই কারণেই বাংলা গদ্যের বহমানতা পদ্য-সমুচিত আবেগধারায় ; এই কারণেই বাংলা কবিতা গানের সুরে বিগলিত। বাংলা নাটকেও জাতির এই মৌল স্বভাব বিশেষ প্রকট হয়েছে। ফলে আমাদের নাট্যসাহিত্যে ঘটনা ও সংঘাতের চেয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাসই প্রবল হতে দেখি সুপ্রাচীনকাল থেকে।

নাট্যাকারে লেখা প্রাচীনতম যে রচনার পরিচয় বাংলা ভাষায় পাওয়া গেছে, তা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। যথাস্থানে কাব্যটির পরিচয় দিয়েছি। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় একে "গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য" বলে পরিচিত করেছেন। আগাগোড়া কাব্য বিভিন্ন 'খণ্ড'

বা পালায় বিভক্ত। প্রতি খণ্ডই আবার কতকগুলো 'পদ' বা গীত-কবিতার সমষ্টি। কিন্তু এই পদগুলো প্রায় সর্বত্র কথোপকথনের আকারে সজ্জিত করা হয়েছে ; এবং কৃষ্ণ, রাধা অথবা বড়াই,—এই তিনটি চরিত্রের সংলাপাংশ হিশেবে রচিত হয়েছে। মাঝে মাঝে বিবরণাত্মক সংস্কৃত কবিতা গল্পের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একত্র গেঁথেছে। এর ফলে গীতি-কাব্যাকারে লিখিত গ্রন্থটিতে একটি সাধারণ নাট্য-পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যরূপ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর গল্পাংশ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-বিরোধ, মান-অভিমান ও মিলনের কাহিনী নিয়ে রচিত। এতে নাটকীয় ঘটনা-সংঘাতের অবকাশ কম ; ববং প্রেম-দ্বন্দ্বের ফলে নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগ প্রকাশের সুযোগই বেশি। পদগুলোও সেই আবেগকে উন্মোচিত করেছে সুরের মাধ্যমে ; 'শ্রী.কৃষ্ণকীর্তন'-এর সকল পদই আসলে গান, প্রত্যেক পদের আরম্ভে সুরের নির্দেশও রয়েছে। তবু, আবেগ-ঋদ্ধ এই সংগীতকে সংলাপের আকারে সাজিয়ে জনমনোহব নাট্যরসও সৃষ্টি হতে পেরেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কাহিনীর কোনো কোনো উপাখ্যান অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়।

চৈতন্য-তিরোভাবের পরে দীর্ঘদিন নাট্য বচনা বা নাট্যাভিনয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে পদকীর্তনের 'আখর' ও উত্তর-প্রত্যুত্তর-কলায়, কবির লড়াইয়ে, এবং অনুরূপ অন্যান্য রচনায় নাট্যরসকে ক্ষীণভাবে জিইয়ে রাখবার পরোক্ষ চেষ্টা করা হয়েছিল। এ-সব ছাড়া বাংলার স্বকীয় স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ নাট্যকলার বিকাশ ঘটে 'যাত্রা' সাহিত্যে।

নাটকেব ক্ষীণ পূর্বরূপ

যাত্রার ক্ষীণ অ-গঠিত পূর্বসূত্র সন্ধান করে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায় নিঃসংশয়ে। ড. সুশীলকুমার দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর রচনাঙ্গিক ও মহাপ্রভুর অভিনয়-কলাতেও যাত্রার পূর্বরূপ লক্ষ করেছেন। কিন্তু যাত্রার জন্ম যখনই হোক্, প্রথম যুগের সেই রচনাশৈলীর সঠিক পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নি।

যাত্রা-সাহিত্য

তারপরে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে, 'যাত্রা'-সাহিত্যে যথার্থ নাট্যরূপের সুসংগঠন ঘটে যাঁদের চেষ্টায়, তাঁদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ্য শিশুরাম অধিকারী। রাজেন্দ্রলাল মিত্র জানিয়েছেন, এঁর বাড়ি ছিল কেঁদেলি গ্রামে। যাত্রা সাহিত্য ও তার রচয়িতাদের পরিচয় এখন দুর্লভ হয়েছে। তবু, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যাত্রার উৎকর্ষ সেদিন একটি বাঙালি-ধর্মী স্বতন্ত্র নাট্যাঙ্গিক গঠনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। আর এই সংগঠকদের মধ্যে শিশুরামের সঙ্গে শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ প্রভৃতির কীর্তিও ছিল উল্লেখ্য। ড. সুশীলকুমার দে বলেছেন, যাত্রার পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ লাভের সম্ভাবনা মধ্যপথে নষ্ট হয়ে যায় ; তার কারণ ইংরেজি শিক্ষিত নবীন বাঙালিদের রস-দৃষ্টি ইংরেজি নাট্যাঙ্গিকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। কাহিনীর বিষয় অনুসারে যাত্রাসাহিত্যে কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সর্বাপেক্ষা জনপ্রীতি লাভ করেছিল।

প্রতীচ্য আদর্শে বাংলাদেশে নাট্যরস পরিবেশনের পথিকৃৎ রুশদেশবাসী গেরাসীম স্টেফানোভিচ্ লেবেডেফ্। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে M. Joddrel-এর The Disguise নামক একখানি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ বাঙালি নটনটী দিয়ে তিনি অভিনয় করিয়েছিলেন। মূল নাটকের অনুবাদ করে দিয়েছিলেন গোলোকনাথ দাস। অনুবাদের নামকরণ করা হয়েছিল 'কাল্পনিক সংবদল বা সাজবদল'। এই নাটকের অভিনয় আশাতিরিক্ত সফলতা লাভ করেছিল,—জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে লেবেডেফ আর একবার এই নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রতীচ্য আদর্শে প্রথম নাট্যাভিনয়

তারপরে, দীর্ঘদিন বাংলাদেশে আর মঞ্চাভিনয় হয়নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মঞ্চ তৈরি করে অভিনয় করার রীতি এদেশে প্রতীচ্য দেশাগত। শ্রোতাদের মাঝখানে একটুখানি শূন্য জায়গায় 'আসর' চিহ্নিত করে যাত্রার অভিনয় করা হত। বাঙালির চেষ্টায় প্রথম মঞ্চাভিনয় হয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটার-এ। এখানে ইংরেজি নাটক ইংরেজি ভাষাতেই অভিনীত হয়েছিল। দেশীয় নাটকের মঞ্চাভিনয়ের প্রথম গৌরব বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে এই নাটকের অভিনয় হয়। জনসমাগম ও উৎসাহ-উদ্দীপনার অবধি ছিল না তাতে।

বাঙালির প্রথম মঞ্চাভিনয় চেষ্টা

আগে বলেছি, দেশীয় যাত্রার প্রথম অবনতি শুরু হয় ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষার ফলে। আর দেশীয় নাট্যরীতির প্রতি এই অনবধানের প্রধান কারণ ছিল ইংরেজি নাট্যকলার কল্পনাতীত উৎকর্ষের প্রতি মোহাতিশয্য। হিন্দু কলেজের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে শেক্‌স্‌পীয়রের কালজয়ী নাট্যসাহিত্যের বহুলাংশ পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। আর অধ্যাপক ছিলেন স্বয়ং মহামনা ডি. এল. রিচার্ডসন। কেবল বিশ্লেষণ নয়, একক অভিনয় মাধ্যমে পঠনপাঠনকে তিনি জীবন্ত করে তুলতেন। ফলে, ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের মতো ইংরেজি অভিনয়কলার প্রতিও শিক্ষিত বাঙালির মন আবেগবশে ঝুঁকে পড়েছিল। তখন দেশীয় যাত্রাশিল্প অশিক্ষিত জনসমাজে নেমে গিয়ে অমার্জিতরুচি স্থূলতায় আকীর্ণ হয়ে পড়ে। তার ফলে, শিক্ষিত সমাজে যাত্রার প্রতি বিরূপতা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তখন নব্যজগতের প্রবল আগ্রহ হয়েছিল যে-কোনো প্রকারে যাত্রা-রীতিকে অস্বীকার ও পরিহার করার দিকে।

যাত্রার বিনষ্টি

সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ নিয়েই উনিশ শতকের বাংলাদেশে মঞ্চাভিমুখী নাট্য রচনার সূত্রপাত হয়। ১২৪৬ বাংলা সালে কাদিহাটি গ্রামের বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। রচনাটির সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই ; অনুবাদও নিতান্ত দুর্বল। এই নাটকটি কখনো অভিনীত হয় নি। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হিশেবে নন্দকুমার রায়ের লেখা 'শকুন্তলা' (১৮৫৫) প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি সাতুবাবুর [আশুতোষ দেব] বাড়িতে তাঁর দৌহিত্রগণের চেষ্টায় অভিনীত হয়।

প্রথম বাংলা নাট্যানুবাদ

কিন্তু সংস্কৃত নাটকের তুলনায় বাংলা ভাষায় ইংরেজি আদর্শে নাটক রচনার চেষ্টা সেদিন প্রবলতর হয়েছিল। এই ধারার লেখকদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ সিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বিশেষ উল্লেখ্য।

যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২ খ্রি.) বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত ট্রাজেডি। বাংলা রূপকথার শীত-বসন্তের মিলনান্ত গল্পকে অশুভশেষ আকারে সাজিয়ে ইংরেজি আঙ্গিকের অনুসারে ট্রাজেডি লিখবার চেষ্টা করেছিলেন যোগেন্দ্র গুপ্ত। শেক্‌স্‌পীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের দুর্বল অনুকরণের চেষ্টা রয়েছে এতে। গ্রন্থারম্ভে লেখক ট্রাজেডি রচনার মূলগত মূল্যবোধ ও আঙ্গিক-চেতনার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আদর্শে অশুভশেষ নাটক রচনা ছিল নিষিদ্ধ। সংস্কৃত নাট্যাদর্শের আপত্তি, এবং য়ুরোপীয় আদর্শের ট্রাজেডি-প্রবণতার কারণও লেখক ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু গোটা নাটকটি পড়লে বোঝা যায়, ট্রাজেডি শিল্পকলার একটি পুস্তকাশ্রয়ী জ্ঞানই যোগেন্দ্র গুপ্তের ছিল ; সার্থক ট্রাজেডি রচনার উপযোগী সৃজনী প্রতিভা ছিল না মোটেই।

প্রথম বাংলা ট্রাজেডি

তাই নাট্যসৃষ্টি হিশেবে 'কীর্তিবিলাস' দুর্বল, এবং সম্পূর্ণ অসার্থক। প্রথমাংশে রয়েছে সংস্কৃত আদর্শ অনুসারে নান্দী ও সূত্রধর প্রসঙ্গ ; ভাষায় আছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাভঙ্গির ছাপ।

'কীর্তিবিলাস' ইংরেজি আদর্শে লেখা প্রথম ট্রাজেডি। তেমনি তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২ খ্রি.) প্রতীচ্য আঙ্গিকে লেখা প্রথম বাংলা কমেডি। কাশীরাম দাসের মহাভারতের সুভদ্রা-হরণ কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটকের গল্পাংশ রচিত হয়েছিল। তারাচণের আঙ্গিক-চেতনা যোগেন্দ্র গুপ্তের চেয়ে স্পষ্ট ছিল ; ভূমিকাংশে নাট্যকলার আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়। তাছাড়া মূল গল্পাংশকেও ইংরেজি নাট্যকলার অনুসারে বিশেষ অবধানের সঙ্গে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রতীচ্য আঙ্গিকে লেখা প্রথম 'কমেডি'

সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক-রীতির পার্থক্য নির্দেশ করে তারাচরণ লিখেছিলেন,—"সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরজি ভাষায় এক্ট, (Act) কহে ; কিন্তু প্রত্যেক এক্ট্ (Act) যেমন (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে। তন্নিমিত্ত (Scene) সিন শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয় তাহাকে (Scene) সিন্ কহে।" ভূমিকার অন্য অংশে লেখক স্পষ্ট জানিয়েছেন,—"এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

নাট্যাঙ্গিক রচনায় তারাচরণের শৃঙ্খলাবোধ সুপরিণত এবং ভাষাভঙ্গী পরিচ্ছন্ন ছিল। ফলে, যোগেন্দ্র গুপ্তের তুলনায় তাঁর সফলতাও ছিল বেশি। কিন্তু 'ভদ্রার্জুন'কেও সার্থক নাটক বলা চলে না। সংলাপের ভাষা গদ্য-পদ্য মিশ্রিত, পদ্যের পরিমাণ বেশি। আর সে পদ্যে নাট্যগুণের অভাব সর্বৈব। গদ্যভাষা লেখা হয়েছে সাধুরীতিতে।

হরচন্দ্র ঘোষ চারখানি নাটক লিখেছিলেন। দু'খানি শেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ, একখানি মহাভারতের গল্পাংশ নিয়ে ; এবং আরো একখানি 'ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য'-কথাকে আশ্রয় করে লেখা। প্রবল উৎসাহ ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এঁর কোনো প্রয়াসই উল্লেখ্য সফলতা লাভ করে নি।

হরচন্দ্রের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩ খ্রি.) শেক্‌স্‌পীয়রের 'Merchant of Venice' অবলম্বনে লেখা। হুবহু অনুবাদ করা সম্ভব হয় নি, একথা নাটকের ভূমিকায় লেখক নিজেই জানিয়েছেন ; আর জানিয়েছেন,—"তথাপি বর্ণিত মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম" গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া "এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থ" গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তক হিশেবে গ্রন্থটির অনুমোদনের জন্য হরচন্দ্র আবেদন করেন ; কিন্তু তা মঞ্জুর হয় নি। সাধারণ জনসমাদরও নাটকটির ভাগ্যে জোটে নি।

হরচন্দ্রের নাট্যাবলি

প্রথম রচনার ব্যর্থতার পরে হরচন্দ্র দ্বিতীয় 'কৌরব বিয়োগ' নাটক (১৮৫৮ খি.) লিখলেন মহাভারতের গল্প নিয়ে। গ্রন্থারম্ভে তিনি নিজেই রচনাশৈলীর সমর্থন ও প্রশংসা করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পৃথক পৃথক ভূমিকা লিখেছিলেন। হরচন্দ্রের ধারণা ছিল, বিদেশী গল্পের অবলম্বনে লেখা হয়েছিল বলেই, তাঁর প্রথম নাটক জনসমাদৃত হতে পারে নি। দেশীয় গল্প নিয়ে নাটক লিখে তাঁর প্রবল ভরসা ছিল,—এবারে জনপ্রিয়তা লাভে তিনি সফল হবেন। কিন্তু হরচন্দ্রের ত্রুটি ছিল রচনাভঙ্গীতে। নীরস গল্পের বিবরণাত্মক পদ্ধতিতে তিনি নাটকের কাহিনী বিবৃত করেছেন, রসোত্তীর্ণ নাট্যরচনার প্রকৃতিই তাঁর জানা ছিল না। তাই এবারেও ব্যর্থতা অনিবার্য হল।

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪ খ্রি.) আবার শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে লেখা হয়। সংস্কৃত নাটকের মতো এই নাট্যারম্ভে 'নান্দী' আর 'প্রস্তাবনা'

বযেছে। হবচন্দ্রেব ব্যর্থতা এবাবেও যথাপূর্ব হযেছিল। আবো দশবছব পবে তিনি 'বজতগিবি নন্দিনী' লিখেছিলেন (১৮৭৪ খ্রি) ব্রহ্মদেশেব কাহিনী অবলম্বনে। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সাধাবণ বঙ্গমঞ্চেব প্রতিষ্ঠা হযে গিযেছিল। এবাবে হবচন্দ্র ভবসা কবেছিলেন, তাঁব নাটক মঞ্চাভিনীত হবে , কিন্তু সে আশাও সার্থক হয নি।

মধুসূদন-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয নাট্যবচনাব সফলতম ভূমিকা বামনাবাযণ তর্কবত্নেব। ইতিহাসে তিনি 'নাটুকে বামনাবাযণ' নামে খ্যাত। সে কেবল অধিক সংখ্যক নাটক বচনাব জন্যে নয, সমকালীন নাট্যকাবসমাজে তিনি অতুল্য-কীর্তি ছিলেন বলেও। তাঁব প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজে অপূর্ব উদ্দীপনাব সৃষ্টি কবে।

নাটুকে বামনাবাযণ

অথচ এই নাটক তিনি লিখেছিলেন প্রতিযোগিতায পুবস্কাব লাভেব উদ্দেশ্যে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বংপুব কুণ্ডী পবগণাব জমিদাব কালীচন্দ্র বাযচৌধুবী কৌলীন্যপ্রথাব বিবোধিতা কবে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নামে সফলতম নাটক লেখাব জন্যে ৫০ টাকা পুবস্কাব ঘোষণা কবেছিলেন। ঐ বছবই 'পতিব্রতোপাখ্যান' বিষযে প্রবন্ধ লিখে বামনাবাযণ ঐ একই জমিদাবেব ঘোষিত ৫০ টাকা পুবস্কাব পেযেছিলেন। নাটকখানিও পব বছবে প্রথম পুবস্কাব পায।

কলাসিকেব বিচাবে বামনাবাযণেব নাটক আধুনিকতাব দাবি কবতে পাবে না। নিজে তিনি সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যশাস্ত্রে পবম পণ্ডিত হলেও ইংবেজি সাহিত্য বা নাট্যাঙ্গিকেব সঙ্গে তাঁব পবোক্ষ যোগও কিছু ছিল না। নাটকটি সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসবণ কবে লেখা হযেছিল। সেদিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ নাটক না বলে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে একটি সফল সামাজিক ব্যঙ্গনক্সাই বলা উচিত। কিন্তু পঠিত সাহিত্য, তথা অভিনীত নাট্যবস হিসেবে এই নাটকেব অসামান্য জনপ্রিযতাব মূলে ছিল তাব বিষযগত বৈশিষ্ট্য। হিন্দু কলেজ এব শিক্ষাব প্রভাব ততদিনে সাবা সমাজে প্রবল

কুলীনকুলসর্বস্ব

প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি কবেছে। সতীদাহ নিবাবিত হযেছে বিধবাব বিবাহ বিধিব শাস্ত্রীয সংগতি নিযে তুমুল ঝড উঠতে চাইছে। মধ্যযুগীয বাংলাদেশে নাবী নির্যাতনেব প্রত্যক্ষ পবোক্ষ সকল পদ্ধতিব বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ জেগে উঠছে ইংবেজি শিক্ষিত তরুণদেব মধ্যে। তাব প্রভাব কিছু কিছু কবে ছডিযে পডেছিল বৃহত্তব সমাজেবও নানা দিকে। কৌলীন্য ছিল নাবী নির্যাতনেব এইরূপ এক পৈশাচিক প্রথাব উৎস। বামনাবাযণেব নাটক এই প্রথাব বীভৎসতা প্রত্যক্ষ কবে তুলেছিল নাট্য কাহিনীব মাধ্যমে। তাব প্রসিদ্ধ জনপ্রিযতাব উৎস এইখানেই।

৩৬ থেকে ৮ বছব পযন্ত বিভিন্ন বযসেব চাবটি সহোদবা বোনকে এক দডিতে বেঁধে এক অতিবৃদ্ধ কুলীনপুঙ্গবেব সঙ্গে বিবাহেব নামে আজীবন দগ্ধ কবাব বিভীষণ চিত্রকে ফুটিযে তুলেছে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গত কৌলীন্যজনিত সামাজিক ব্যভিচাবেব কদর্য রূপও প্রত্যক্ষ হযে উঠেছে। গোটা গল্পটিতে নাটকীয সংঘাত বা ঘটনা ঘনতা নেই। কিন্তু নিছক বিবৃতি এবং বর্ণনাও সজীবতাব জোবে তীব্র উদ্দীপনাব সৃষ্টি কবতে পেবেছিল।

'কুলীনকুলসর্বস্ব'ব সফলতায উৎসাহিত হযে বামনাবাযণ এবাবে সংস্কৃত নাটকেব অনুবাদ

বামনাবাযণেব অনুবাদ-নাট্য

এবং পৌবাণিক গল্পেব বিষয অবলম্বন কবে নাটক বচনায প্রবৃত্ত হন। অবশ্য, তাঁব একাধিক বচনাব প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা কবেছিলেন সেকালেব বিদ্যোৎসাহী ধনপতিগণ। বামনাবাযণেব সংস্কৃত নাট্যানুবাদেব মধ্যে বযেছে 'বেণীসংহাব' (১৮৫৬) 'বত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) ও 'মালতীমাধব' (১৮৬৭)। এই প্রসঙ্গে স্মবণ কবা যেতে পাবে বেলগাছিযাব

নাট্যমঞ্চে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় উপলক্ষ করেই বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

পুরাণাশ্রিত বিষয় নিয়ে মৌলিক তিনখানি নাটক লিখেছিলেন রামনারায়ণ—'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫) ও 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫)। রামনারায়ণের রচনাবলির মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' সর্বাপেক্ষা খ্যাত হলেও নাটক হিশেবে সর্বোৎকৃষ্ট 'নবনাটক' (১৮৬৬)। গ্রন্থটির পুরো নাম 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক'। এই নামের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পরিচয় রয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালার পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের ঘোষিত পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হয়, এবং উদ্দিষ্ট পুরস্কার লাভও করে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে পূর্ণাঙ্গ নাটক না বলে ব্যঙ্গনক্সা বলাই সমীচীন। কিন্তু, 'নবনাটক'-এ নাট্যগুণ স্পষ্ট বিকশিত হয়েছিল। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে মধুসূদনের সব কয়খানি নাটক ও দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' রচিত হয়ে গিয়েছিল। 'নবনাটক'-এব উৎকর্ষের মূলে এই সব পূর্বাদর্শের প্রভাব অনুমান করা অন্যায় নয়।

অন্যান্য নাটক

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'সম্বন্ধ সমাধি' নামে আর একখানি নাটক লিখেছিলেন রামনারাযণ বাল্যবিবাহের প্রথাকে ব্যঙ্গাঘাত করে। এই নাটক রচনার মূলেও গুণেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তাছাড়া, নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা তাঁর প্রহসনগুলির মধ্যে রয়েছে—'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সংকট' ও 'চক্ষুদান'।

রামনারায়ণের সামাজিক সমস্যামূলক নাট্যকৃতির সফলতা দেখে এই ধবনের নানা বিষয়ে নাটক রচনার উৎসাহ সেকালে প্রবল হয়েছিল। এই সব অনুকৃতনাটকের মধ্যে আছে—তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্য বিবাহ নাটক' (১৮৫৯?) শ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যোদ্বাহ' নাটক (১৮৬০), এবং নফরচন্দ্র পালের 'কন্যাবিক্রয় নাটক'। প্রথম তিনটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য তাদের নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। চতুর্থ নাটকটি লিখিত হয়েছিল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যাপণ গ্রহণের প্রতিবাদে।

রামনারায়ণের অনুকারিগণ

আলোচ্য যুগের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে নতুন সমাজ-বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবাবিবাহ' নাটক লিখে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুরাগী ছিলেন উমেশচন্দ্র ; বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল সমর্থন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন-সিদ্ধ হয় ; আর ঐ বছরেই উমেশচন্দ্র তাঁর নাটক লিখেছিলেন বিধবাবিবাহকে জনসাধারণের চোখে বরণীয় করে তোলার চেষ্টায়। দুটি বালবিধবার জীবনকথা নিয়ে নাটকের গল্পাংশ গঠিত হয়েছে। প্রথমটি কীর্তিরাম ঘোষের কন্যা সুলোচনা—বাল্যকালে বিধবা হওয়ার পরে তার পদস্খলন হয়, এবং সন্তান-সম্ভবিতা হয়ে নানা লাঞ্ছনা ও দুঃখভোগের পরে তার মৃত্যু ঘটে। অথচ অদ্বৈত রায়ের বিধবা মেয়ে প্রসন্ন পুনর্বিবাহিতা হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে থাকে। আসলে সুলোচনা-জীবনের ট্রাজেডি রচনাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। প্রসন্ন-কাহিনীর প্রচ্ছদপটে তার আবেদন তীক্ষ্ণতর হয়েছে। কেবল প্রচারের দিক থেকে নয়, সফল নাট্যকলার বিচারেও 'বিধবাবিবাহ' নাটকের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। সেকালের সামাজিক চিন্তার সঙ্গে রসচেতনাকেও এই নাটক উদ্বোধিত করেছিল। এর অনুসরণে আরো বহু নাট্যকৃতিরও উদ্ভব হয়েছিল।

উমেশচন্দ্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' অবলম্বন করেও ঐ নামের আর একখানি নাটক লিখেছিলেন উমেশচন্দ্র।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
উনিশ শতকের বাংলাদেশে সৃজনধর্মের মুক্তি

সাহিত্য জীবনসম্ভব। জীবনধর্মের বিকাশ তথা বিশেস দেশ-কালে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা-উদ্দীপনার সম্ভারকে বক্ষে ধারণ করেই যুগে যুগে সাহিত্য-শিল্পের আবির্ভাব। এদিক থেকে সাহিত্যের সৃজন-কলা জীবনলক্ষণেব অনুসারী। অর্থাৎ, ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে জীবনের বিশেষ একটি প্রবণতা ও আশা-বাসনা যখন জাতির মনোভূমিতে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ধবে, জীবনশিল্পী তখন সাহিত্যে তাঁব বাঙময় রূপ রচনা করেন। রামমোহন-প্রভাবিত নগর-বাংলায় নবীন আকাঙ্ক্ষার দোলা লেগেছিল উনিশ শতকের প্রথমাবধি। তার পরে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যাসাগরের সমাজবিপ্লবের প্রয়াস, নারীশিক্ষার প্রবর্তন—সবকিছুব মধ্য দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত নবজীবন বাসনা ক্রমশ অবারিত বিকশিত হয়ে উঠছিল। সাহিত্যে সেই দোলায়মান জীবন-চিন্তার বিস্রস্ত বিচ্ছিন্ন রূপ আভাসিত হয়ে উঠেছিল পাঠ্য-পুস্তকের পূর্ণতা-বিধান, সাময়িক পত্র-পত্রিকার সু-গঠন, ও জাতীয় আদর্শ-সংগঠনেব সর্বাত্মক চেষ্টায়। বহুমুখী এই জীবন-সাধনায় সাহিত্যেব প্রধান আশ্রয় ছিল গদ্য। সে গদ্য মৌলিক সৃজনকর্মের বাহন হতে পারে নি তখনো। অনুবাদ, বিজ্ঞান-দর্শনের আলোচনা, সমাজ-আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গ বিষয়, ইত্যাদিই ছিল এই গদ্য-প্রধান সাহিত্যে বিবেচনাব প্রধান আশ্রয়। এ-যুগের প্রায় একমাত্র পদ্যশিল্পী ঈশ্বর গুপ্তের কবিকর্মও ছিল আসলে তাঁর সাংবাদিক প্রতিভারই ছন্দোময রূপ। নাটকের রূপাঙ্গিক ও ভাব-সৌন্দর্যও এই যুগে সুগঠিত হয় নি। কেবল বিপ্লবাত্মক আকাঙ্ক্ষার জীবনস্ফীতি নাটকের নবীন দেহে নূতন আগ্রহের সাড়া জাগিয়েছিল।

সাহিত্যের
নব জীবনাঙ্কুব

ফল কথা, জাতির জীবনের সকল দিকেই গতি ও মুক্তির আবেগ প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি জীবনে তার ঐতিহাসিক ফল ঘোষণা করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন,—"বলিতে কি, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।" মধুসূদন-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে এই সর্বমুখী আন্দোলনের ঐতিহাসিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু, সার্থক সাহিত্যকর্ম কেবল বাহ্যবস্তুর হুবহু প্রতিফলন বা ফটোগ্রাফি নয়। জীবনের মূলীভূত বাসনাকে আত্মস্থ করে তার প্রাণময় মূর্তি রচনাই সফল শিল্পীর সহজ ধর্ম। মধুসূদনের আগে বাংলার নাগরিক সমাজে নবজীবনের লক্ষণ পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছিল। কিন্তু, সেই শক্তিকে ধারণ করে আত্মস্থ করবার মতো প্রতিভার অভাব ছিল। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যই নয়, উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি জীবনেও মধুসূদন ছিলেন রেনেসাঁসের জীবন-মূর্তি। পরবর্তী

সৃজনী সাহিত্যেব
মূলীভূত জীবনরূপ

আলোচনায় তার শিল্প কর্মের বিশিষ্টতা পরিচায়িত হবে। তার আগে লক্ষ করতে হয়. আলোচ্য সময়ের রেনেসাঁস-এর আন্তর পরিচয়।

পূর্বে বলেছি, রামমোহন, ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরের ত্রয়ীব্যক্তিত্ব উনিশ শতকের বিপ্লব-ধর্মের মূর্ত প্রতীক ছিল। রামমোহন তাঁর স্বদেশবাসী তরুণদের ইংরেজি শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন—মানুষ হিশেবে তাঁদের স্বাধীন, স্বযংস্বতন্ত্র করে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। রামমোহন প্রতিভাব দুটি দিক—এক, তাঁর উগ্র-স্বতন্ত্র স্বাধীনতা-প্রীতি ; আর এক, স্বদেশ ও স্বধর্মনিষ্ঠ মনেব প্রবল আত্মগৌরব। স্বধর্ম বলতে এখানে প্রধানত বুঝি ভারতীয় উপনিষদাশ্রিত মানবিকতাবোধকেই। রামমোহন-ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক বাংলান উষালগ্নে তাঁকে দেশছাড়া করেছিল রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়। আবার, এই একই ব্যক্তিত্ব স্বদেশে দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে—সতীদাহ নিবারণেব বৈপ্লবিক চেষ্টা : আর আত্মীয়সভা স্থাপনেব গঠনমূলক সাধনায়। এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বদেশভক্তির ব্যক্তিগত জীবনাদর্শকেই শিক্ষাগুরু ডিবোজিও অগ্নিবীজ রূপে ছড়িয়ে দিযেছিলেন বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণদের প্রাণে। ফলে, প্রথম থেকেই এঁবা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেন এক নব জাতীয়তাবাদের দ্বাবা। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি, এমন কি সাহিত্য-সাধনাব ক্ষেত্রেও, এই জাতীয় উদ্দীপনাই ছিল এঁদের একমাত্র লক্ষ্য। জাতিকে শ্রদ্ধেয় কবে তোলাব জন্য সমাজকে সুস্থ বলিষ্ঠ করে তোলার দায়িত্বও এঁরা অনুভব করেছিলেন।

স্বাতন্ত্র্য, স্বদেশভক্তি, সমাজ-গঠন

মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক ছিল নারীর প্রতিষ্ঠাহীন লাঞ্ছনার ইতিহাস। মোগল যুগের বাংলায় পুরুষের নৈতিক অধঃপতন প্রায় অনিবার হয়েছিল। আর, কুলাঙ্গনাদেব নৈতিক বিশুদ্ধিবক্ষাব অসুস্থ উদ্যমে পুরুষসমাজ প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণেব চেষ্টা কবলে প্রতিপক্ষ এমন কথাও বলেছিলেন যে, স্বামীর চিতায় দগ্ধ কবে মারলে নাবীর অসতী হবার আশঙ্কা আর থাকে না। অতএব, স্বামিদেবতাদেব নিশ্চিন্ততা বিধানেব জন্যেও সতীদাহের প্রথা প্রচলিত থাকা উচিত। সেকালে নারীর কোনো পৃথক অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকৃত হত না সে ছিল একান্তরূপে সমাজের, তথা পুরুষেব সম্পত্তিব একটি অংশমাত্র। প্রাচীন শাস্ত্রাচাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, নারীকে স্বাধীন হতে দেওয়া চলবে না ; বাল্যে পিতা. যৌবনে স্বামী, এবং বার্ধক্যে পুত্রেব অধীনে রাখতে হবে তাকে। নবযুগেব শিক্ষিত তরুণেবা বুঝেছিলেন, যে-সমাজে নারীব প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নয়, সেই জাতিব অভ্যুদয় ইতিহাসের হাতে পুনঃপুন বাবিত হয়ে থাকে। তাই, সমাজের মানবিক মুক্তি বিধানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নারীব স্বধীনতা ও স্বতন্ত্রতাব সুযোগ রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন তাঁরা।

নাবী-স্বাতন্ত্র্যেব আদর্শ

প্রথমত বহুবিবাহ এবং কৌলীন্য ইত্যাদি মধ্যযুগীয় নারী-লাঞ্ছনাকর প্রথা সমাজে একান্ত নিন্দিত হয়েছে। অপর দিকে, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহের প্রবর্তন, নারী-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা—সব কিছু মিলে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি, বিকাশ ও পূর্ণতা দেবাব প্রয়াস প্রবল হয়েছে। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয়তার অস্বীকৃতি, বা তাব প্রতি ব্যঙ্গপূর্ণ আঘাত রচনাব চেষ্টা মূলত এই বিচিত্রমুখী প্রয়াসের নেতিবাচক দিক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা, অথবা রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকে এই সহজ চেষ্টাকেই গতানুগতিক সাহিত্য-রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু, সেকালের বিপ্লব আন্দোলনের গতি ও মুক্তিব শক্তি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জাগরণে,—যে শক্তি মধ্যযুগীয় সমাজদেহ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ব্যক্তিত্বের অধিকারকে জোরের সঙ্গে জাগ্রত করতে পেরেছে। বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো গদ্য লেখায়

সাহিত্যে বিপ্লব-চেষ্টা

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাহিত্যিক অঙ্কুর মুকুলিত হতে দেখি। কিন্তু, উল্কার মতো আলো ও উত্তাপের জ্বালাময় আত্মবিদারণের মধ্যে যিনি এই বিপ্লববাগ্নিকে সার্থক শিল্পরূপ দিলেন, তিনি বাংলা সাহিত্যের মহাপ্রাণ শিল্পী শ্রীমধুসূদন।

মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্ব—তথা তাঁর কাব্যধর্মেরও দুটি উপাদান—(১) তীক্ষ্ণ জাতিত্ববোধ এবং (২) আবেগকম্পিত মানব প্রেমের ফল-পরিণাম স্বরূপ নারীব্যক্তিত্বের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা। মধুসূদনের জাতিত্ববোধ কোনো রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হল না, তাঁর নারী-প্রীতিও ছিল না কোনো সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধী। স্বদেশপ্রীতির একটি মানবিক আদর্শকে তিনি কবির অনুভব দিয়ে একান্তে বরণ করেছিলেন ; জন্মভূমিকে বন্দনা করে বলেছিলেন—'শ্যামা জন্মদে'। এই শ্যামা জননীর প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি 'National Poetry',—'National Theatre' রচনার ব্রত ধারণ করেছিলেন। তাঁর জাতিত্ববোধ কোনো রাজনীতি-সচেতন জাতীয়তাবাদের (Nationalism) সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এক জন্মভূমির সন্তানদেরই তিনি একটি জাতির গণ্ডিবন্ধনে বেঁধেছিলেন। অন্যদিকে, সেই জন্মভূমির ভৌগোলিক পরিধিও তাঁর চোখে গৌড়-বঙ্গের সীমাকে ছাড়িয়ে অনেকটাই যেতে পারে নি। তাই, তাঁর কবিতা রচনার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির জাতীয় কাব্যসৃষ্টি, তাঁর নাট্যসৃষ্টির মূলে ছিল বাঙালির জাতীয় নাট্যশালা সংগঠনের আকাঙ্ক্ষা। বস্তুত, কেবল মধুসূদন নয়, উনিশ শতকের নগর বাংলায় বঙ্গভূমি ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে এই সচেতন শ্লাঘাবোধই ছিল সেকালের বিপ্লব-চেতনার উৎস। আর, সেই শ্লাঘনীয়তাকে বাস্তবরূপ দেবার আকাঙ্ক্ষাতেই সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য—সকল দিকেই আত্মমুক্তি বিধান, ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচন, নারী-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা সাধন —এ ছিল প্রায় সর্বজনীন প্রয়াস। সর্বমুখী মুক্তি-কামনার এই নির্বন্ধন আবেগ-উচ্ছ্বাসই বাংলা সাহিত্যে নবীন সৃজন-ধর্মেরও মুক্তিবিধায়ক হয়েছিল। মধুসূদন ছিলেন এই সর্বাত্মক জাতীয় কামনার দীপ্ততম জীবন্মূর্তি, তাঁর সমগ্র শিল্প-সাহিত্যের সাধনা ছিল এই জীবন্মুক্তির শঙ্খধ্বনি। এই জন্যেই নবযুগের সাহিত্যের তিনি জাতীয় কবি , রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম সফল পথিকৃৎ।

ষড়-বিংশ অধ্যায়
মুক্তি-যুগের বাংলা কাব্য

আগে বলেছি, বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রাণধর্মের মুক্তি সাধন করেছিলেন মধুসূদন। আর এই মুক্তি-সাধনায় তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি চেতনার জীবন্মূর্তি। অর্থাৎ, সমগ্র উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ধরে বাঙালির শিক্ষা, সমাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, এমন কি, গদ্য-পদ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যেও নবজীবনের যে আকাঙ্ক্ষা গোপনে অঙ্কুরিত হয়েছিল, মধুসূদন তার প্রথম এবং সফলতম রূপ-নির্মাতা। এদিক থেকে বলা উচিত, মধুসূদনের আবির্ভাবের আগেই তাঁর রচনা-যোগ্য শিল্প ও জীবন-লক্ষণ ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। এই বিচারে কবি রঙ্গলাল (১৮২৭-১৮৮৭) মধুসূদনীয় কাব্যকলার সফল পূর্বসূরিত্ব দাবি করতে পারেন। বস্তুত তিনি তা করেছেনও।

কবি রঙ্গলাল

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার প্রধান প্রেরণা ছিল প্রবল জাতিত্ব-গৌরব ও বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব-চেতনা। বাংলা কাব্যের জগতে রঙ্গলালের প্রথম আবির্ভাব এই জাতিত্ব-গৌরবের পুঁজিকে আশ্রয় করেই। 'কিশোরকালাবধি'ই কাব্য কলার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি ছিল ; চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই তিনি 'ইংলন্ডীয় কবিতার বিশুদ্ধ প্রণালীতে' কবিতা লিখে সমসাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করতেন। তা ছাড়া, প্রথম বয়সেই 'ভেক ও মূষিকের যুদ্ধ' নামে একখানি 'উপকাব্য'ও লিখেছিলেন। কিন্তু রঙ্গলালের প্রথম উল্লেখ্য—তথা শ্রেষ্ঠ কাব্য ছিল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। এর পূর্ববর্তী রচনাবলি তাঁর 'ক্ষমতা-পরিচায়ক' নয়, একথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-এর রচনার ইতিহাস নিম্নরূপ ঃ—১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বীটন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটনের স্মরণোদ্দেশ্যে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হরচন্দ্র দত্ত ঐ সভায় 'Bengali Poetry' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধের আলোচনা করেছিলেন কৈলাসচন্দ্র বসু। দুজনেরই প্রতিপাদ্য ছিল ইংরেজি কাব্য-কবিতার তুলনায় সমধর্মী বাংলা রচনার আনুপর্বিক অপকর্ষ। প্রসঙ্গত তাঁরা বলেছিলেন,—স্বাধীন জাতির পক্ষেই সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব। ইংরেজরা বহু শতাব্দী ধরে স্বাধীন ; তাই তাঁদের সাহিত্যও দেশ-কালোত্তীর্ণ রসে মণ্ডিত। কিন্তু বাঙালি দীর্ঘদিন ধরে পরাধীন ; ফলে তাঁদের সাহিত্যকর্মও দুর্বল, নিকৃষ্ট। রঙ্গলাল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা ও আলোচকের স্বজাতি-নিন্দাকর মন্তব্যে তিনি পীড়াবোধ করেন। অল্পদিন পরে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' লিখে তিনি এই অভিমতের তীব্র বিরোধিতা করেন। সেযুগের বাংলাদেশে জ্ঞানগরিষ্ঠ ছিলেন রঙ্গলাল ; স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁর সহজ গৌরববোধকে পাণ্ডিত্যের শক্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা কাব্য-কবিতা থেকে বহুল উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ইংরেজি সাহিত্যের উৎকর্ষ যদিও তর্কাতীত, তবু বাংলা কাব্যও কোনো দিক থেকেই নিকৃষ্ট নয়।

রঙ্গলালের কবি-কর্মের উৎস,—জাতিত্ব-গৌরব

রঙ্গলালের এই প্রয়াস আত্মসচেতন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে একান্ত আদৃত হয়েছিল। অনেকে তখন তাঁকে তাঁর প্রবন্ধের সমর্থনে আদর্শ বাংলা কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ জানান।

এই অনুরোধের উত্তরেই 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর জন্ম। বস্তুত, ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের গরিমা ও মহিমা প্রকাশই ছিল এই কাব্য রচনার প্রধান লক্ষ্য। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'ই বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক কাব্য। রঙ্গলালের মধ্যে একটি প্রগাঢ় ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর ভাষা-জ্ঞানও ছিল প্রখর। বহু দুর্লভ প্রত্নগ্রন্থের অর্থ তিনি পরিস্ফুট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেবল এই ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর বিষয় চয়ন করা হয়নি। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কবি নিজেই বিশদ করে বলেছেন ভূমিকায় :

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধান কালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কাল মধ্যে এ দেশের পূর্বতন ও উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুতেতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।"

পদ্মিনী উপাখ্যানের ভাব ভূমি

'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর বিষয়বস্তু টড্ এর 'রাজস্থান' থেকে নেওয়া। মূল কাহিনী-সার রাজপুত ইতিহাসের [illegible] থেকেই জানা। লেখকের স্বীকৃতি থেকেই জানা যায়,— দেশীয় স্বাধীনতাযুদ্ধ ও অতীত ঐতিহ্য বিষয়ে তিনি ছিলেন গৌরবান্বিত। আর সেই বিস্মৃত গৌরববোধকে কবি তাঁর স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি Byron এবং Tom Moore প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের রচনাংশের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ স্বদেশপ্রীতির উৎসাহে দীপ্ত রচনাংশের একাধিক ক্ষেত্রে ঐ সব কবির রচনার ছাপ আছে। এই কাব্য রচনার এক বছর আগে থেকেই ভারতে তথা বাংলাদেশে, 'সিপাহি-বিদ্রোহ'র সূচনা হয়েছিল। রঙ্গলাল কিন্তু তাঁর কাব্যে এই আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছেন,—

'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ স্বদেশ গৌরব

"হে বিভো করুণাময়। বিদ্রোহ বারিদচয়
আর যেন বিষ না বরিষে।"

বস্তুত সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিরা সাধারণভাবে এই আন্দোলনের প্রতি বিরূপ ছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। রঙ্গলাল তাঁর কাব্য রচনা করে স্বদেশবাসীদের মধ্যে জাতি-গৌরবের একটি ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন । এ-বিষয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ফলপ্রসূও হয়েছিল। সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সাধারণ জাতীয় বাসনারই অনুবর্তন করেছিলেন তিনি তাঁর কাব্যে। এদিক থেকে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নবজাগ্রত বাংলার জাতীয় মহাকাব্যের মর্যাদা দাবি করতে পারত। কিন্তু রচনাভঙ্গির গতানুগতিকতা ও মন্দগতি, তথা যুগাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ আত্মীকৃত করে উঠতে না পারার দুর্বলতা, সে সম্ভাবনাকে দূরপরাহত করেছিল। তবু, বাংলা কাব্যে মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটেছিল রঙ্গলালের আকাঙ্ক্ষারই পূর্ণতা বিধান করে। বস্তুত রঙ্গলাল এ-কথা দাবিও করেছেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী'র (১৮৬২) ভূমিকায়।

'কর্মদেবী'র আগেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তা-সত্ত্বেও এই কাব্যে কবি তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর আদর্শকেই অনুসরণ করেছিলেন। এক দিকে ছিল জাতীয় গৌরবের আবেগ-দীপ্তি, আর

একদিকে নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ আত্মদানের করুণা ও মহিমাপূর্ণ আদর্শের প্রেরণা। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ ভীমসিংহ এবং তাঁর পুত্র ও অনুচরদের দুঃসাহসী সংগ্রামের উদ্দীপনাকে ছাপিয়ে উঠেছিল পদ্মিনীর বীরত্ব, নারীত্ব এবং সতীত্বের মহিমান্বিত রোমান্টিক আবেগ। 'কর্মদেবী'-তেও তাই হয়েছে। এই কাব্যের কাহিনীও রাজপুত-কথা থেকে নেওয়া। যশল্মীর প্রদেশের শাসকের ছেলে সাধুর প্রবল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্য দুঃসাহসিক প্রয়াসের বর্ণনা আছে কাব্যের একাংশে। স্বদেশের মুক্তি অর্থে সাধু কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বোঝে নি, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিও করেছিল ঃ-"স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই।"

রঙ্গলালের 'কর্মদেবী'

ঔরিন্ট-রাজক ন্যা কর্মদেবী এই দুঃসাহসী বীরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হয়েছিলেন, সাধুও গোপন সাক্ষাতে তার রূপগুণে মুগ্ধ হন। অবশেষে দুর্জয় রণাঙ্গনে ঐ বিজয়ী সাধুর গলায় প্রকাশ্যে মালা পরিয়ে দিলেন কর্মদেবী। অথচ তিনি ছিলেন রাঠোর রাজের বাগদত্তা। খবর পেয়ে অপমানিত রাজা নবদম্পতিকে প্রতিরোধ করে দাঁড়ালেন! যুদ্ধে সাধুর মৃত্যু হল। শোকাভিভূতা নববধূ তার বাম বাহু কেটে ভাই-এর কাছে পাঠালেন—কুলকবি যেন এই হস্ত গ্রহণ করে 'সতীত্বের সংগীত আখ্যানে' তাঁর চবিতকথা রচনা করেন। ডান বাহু কেটে দিয়ে অনুরোধ করলেন সাধুর পিতার কাছে পাঠাতে :—

"জানিবেন এই কথা, তিনি ভাই,
বধূ তাঁর সুত-যোগ্য বটে।"

তার পরে বাহু-হীনা কর্মদেবী স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হলেন বাবার কাছে প্রার্থনা করে—যেন শ্মশানের "এই স্থানে সরসী খনন করি, নাম দেন কর্ম সরোবব।"

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী'-ও (১৮৬৮) রাজপুত-কথাশ্রিত। আকবরের হিন্দু নারীলোলুপতার কাহিনী এই কাব্যের ভিত্তি। তাঁর চতুর্থ কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) রচিত হয়েছিল উড়িষ্যার রাজ-ইতিহাসের সঙ্গে লোকপ্রবাদ ও কল্পনার সূত্র গ্রথিত করে। উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তম, এবং কাঞ্চীরাজের বিবাদে কাঞ্চীরাজকন্যার হস্তান্তর ও পুরুষোত্তমের হাতে লাঞ্ছনার পরে উভয়ের বিবাহমিলন কাব্যটির বিষয়বস্তু। এই কাব্যে রঙ্গলাল দেব-মহিমা বর্ণনার অলৌকিক গল্পজগতে প্রথম পাড়ি জমিয়েছেন।

'শূরসুন্দরী' ও
'কাঞ্চী কাবেরী'

কবির অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'কুমারসম্ভব', এবং 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে সংস্কৃত নীতি-কবিতাবলির অনুবাদ। 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' ছাড়াও গদ্যে তিনি লিখেছিলেন 'শরীর সাধন বিদ্যার গুণোৎকীর্তন।' রঙ্গলালের সাংবাদিক দক্ষতাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 'এডুকেশন গেজেট'-এর তিনি ছিলেন প্রথম সহ-সম্পাদক; সম্পাদক ছিলেন 'রসরাজ' নামক বাংলা পত্রিকার।

রঙ্গলালের অপরাপর
রচনা

রঙ্গলালের কাব্য সাধনার পরিণতি-পথ ধরে কবি মধুসূদনের আবির্ভাব। এক অর্থে এঁরা দুজনেই ছিলেন সমকালীনকবি। আগে বলেছি, রঙ্গলালের প্রথম উল্লেখ্য কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর পরেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ' কাব্য-দুখানি রচিত হয়েছিল। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য রচিত হয়েছিল এই দুটি কাব্যের প্রকাশের পরে। তাহলেও, মধুসূদনের রচনার পরিণতি রঙ্গলালের কাব্যে কখনোই লক্ষিত হয় নি। বরং তাঁর আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতাই যেন পূর্ণতর রূপ পেল মধুসূদনে; উনিশ শতকের নগর বাংলার নবজীবন-জাগরণ ঘটেছিল তাঁর জীবনে—তাঁর রচনায়।

বিপ্লব-মূর্তি মধুসূদন

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি কপোতাক্ষ তীরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম হয়েছিল মধুসূদনের; তাঁর "জন্মদাতা মহামতি রাজনারায়ণ, জননী জাহ্নবী।" সহজ বিদ্রোহীব অধীরতা, আর সিদ্ধকাম কবি হবার দুরন্ত পিপাসা, মাত্র উনিশ বছর বয়সে তাঁকে ধর্মত্যাগে প্রবুদ্ধ করেছিল। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে শ্রীমধুসূদন হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথম বিবাহের স্কচ্ পত্নী রেবেকার সঙ্গে মতবিভেদ হেতু বিবাহ পণ্ড হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়া পত্নী, ফরাসি মহিলা হেন্‌রিয়েটা আমৃত্যু (১৮৭৩) তাঁর আত্মখণ্ডিত জীবনের নিরন্তর সঙ্গিনী ছিলেন।

কবি ও পণ্ডিত মধুসূদন

মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ছিল যেমন দুরন্ত প্রবল, তেমনি তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল বহু বিস্তৃত। প্রথম বয়সে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা উপেক্ষার পর্যায়ে পৌঁচেছিল। অনেকটা ইচ্ছা করেই বাংলা বলা, বা লেখা, তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ, এই বাংলা ভাষাকেই নবজাগরণের শক্তিপূত করেছিলেন তিনি, বাংলা ছন্দের করেছিলেন বন্ধন-মোচন। এখানেই শেষ নয়, ইংরেজি-বাংলা ছাড়াও হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি এবং সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষায় তাঁব অধিকার ছিল সুগভীর। ঐ সব ভাষার কাব্য-সাহিত্যে তাঁব প্রবেশ-ক্ষমতা ছিল অবারিত। মধুসূদনের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তাঁর আন্তরিক ভাবানুভূতিকে বাঁধতে পারেনি; কিন্তু তাঁর প্রকাশ সুমিত সুগঠিত করেছিল। বস্তুত, মধুসূদন-প্রতিভার আধুনিকতার বহিরঙ্গ ভিত্তি এখানেই।

বাংলা কবিতায় আঙ্গিক-সচেতনতা

সার্থক শিল্পের দুটি উপাদান : অনুভূতির অমিশ্র আন্তরিকতা, আর সমুচিত প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা। সফল সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দুটি উপাদানই 'অপৃথক্ যত্ননির্বর্ত্য'। সিদ্ধকাম শিল্পীর রচনায় এ-দুটিই আবার সচেতন কলাকৃতিব দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের অনাধুনিক কালের বহু উৎকৃষ্ট রচনাও অশিক্ষিতপটু কবি-কর্মের অভিব্যক্তি। অন্যপক্ষে আধুনিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আঙ্গিক-সচেতনতা। একালেব শিল্পীর পক্ষে কলাকর্ম আর কেবল একটি instinct নয়, সহজাত ভাবানুভূতির সুমিত কর্ষণের ফলশ্রুতি। বাংলা কাব্যে, তথা, বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাতেই, এই সচেতন আঙ্গিক-চিন্তা তথা সুগঠিত দেহাবয়বের যোজনা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব নাট্যকার হিশেবে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় রামনারায়ণের 'বত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল পাইকপাড়ার রাজাদের প্রবল উৎসাহ, ও অর্থব্যয়ে। যুরোপীয় দর্শকদেব সুবিধাব জন্যে মধুসূদনকে দিয়ে মূল নাটকের একটি ইংরেজি চুম্বকানুবাদ করিয়ে নেওযা হয়েছিল। মূল নাটকের চেয়েও সেই অনুবাদ বেশি প্রশংসিত হয়। অথচ, মধুসূদনের পক্ষে সেই দুর্বল নাটকের অভিনয় অতিশয় অতৃপ্তিকর হয়েছিল। বাংলা নাট্যশিল্পের সেই দুর্বলতা দূর করবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন (১৮৫৯)। কথিত আছে ভুলে-যাওয়া বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকার তখনো হাস্যকরতার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি।

'তিলোত্তমাসম্ভব' ও অমিত্রাক্ষব

কবিতার ক্ষেত্রেও কাব্য-শরীরের সুসংগঠনের দাবি নিয়ে মধুসূদনের প্রথম আত্মপ্রকাশ। নাটক লিখতে গিয়ে তিনি প্রথম সংলাপ উপযোগী বাংলা ভাষার অভাব অনুভব করেছিলেন ; ভেবেছিলেন, দুর্বল-দেহ গদ্যের চেয়ে অমিত্রাক্ষর পদ্যের দ্বারাই নাটকীয় সংলাপ রচনা সফলতর হতে পারবে। 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকে এই ধরনেব সংলাপ রচনার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু, বাংলাদেশের

দর্শক পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য হবে ভেবে সেই চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। তখন থেকেই তাঁব আকাঙ্ক্ষা হয় অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করে এ বিষয়ে বাঙালি পাঠকের অভ্যাসকে সুগঠিত করে তোলার। এই ব্যাপারে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন রাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বাজি রাখেন তিনি—বাংলা ভাষায় সার্থক সাবলীল অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনা করে দেবেন-ই। এই উপলক্ষে অমিত্রাক্ষর কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) নিয়ে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব। এদিক থেকে কাব্যশরীরের নবীন রূপবিন্যাসই ছিল তাঁর কবিকর্মের প্রাথমিক উদ্দেশ্য । বলা বাহুল্য, কাব্যাঙ্গিক সচেতনার এই আধুনিক বৃত্তি তাঁর প্রতীচ্য কাব্য-সাহিত্য পাঠের প্রত্যক্ষ ফল।

তাহলেও মধু-দনের ব্যক্তিগত প্রবণতা অন্ধভাবে প্রতীচ্যের আদর্শ অনুসরণ করেনি। অমিত্রচ্ছন্দের মৌল আদর্শ তিনি গ্রহণ করে ছিলেন মিলটনের Blank Verse-এর অনুকরণে। কিন্তু কাব্য-সুষমা দূরে থাক, ছন্দের বহিরঙ্গ উজ্জ্বলতাও যে নিছক পরানুকরণের দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না, একথা তাঁর গোচর ছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গেও মধুসূদন বলেছিলেন,—বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষাব সমৃদ্ধ বংশজাত। অতএব, এই শব্দভাণ্ডারের যথাযোগ্য প্রয়োগের ফলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা অসম্ভব নয়। বস্তুত, প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাংলা কবিতার মূলগত পয়ার ছন্দের সীমানাকে প্রসারিত করেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সফল রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমুন্নতিব মূলভূমিতে জীবনের যে অপাব মুক্তি ও উত্তাল গতির স্পন্দন তরঙ্গিত হয়েছিল, তার থেকে মধুসূদন আপন কবিপ্রাণের প্রেরণা আহরণ করেছিলেন। তারপর উনিশ শতকের নগর-বাংলাব নবজাগরণের জীবন-বাসনার গভীরে সেই কাব্যপ্রেরণাকে যুক্ত কবে নূতন শিল্পরূপের জন্ম দিয়েছেন বিচিত্র কাব্য, নাটক ও গদ্য-রচনায়। মধুসূদন যেখানে সিদ্ধকাম কবি, সেখানে তিনি সুমিত-সুন্দর নবীন কাব্য-রূপেরই নয়, পূত নব-জীবনধারারও উদ্বাহক—ভগীরথ।

মধুসূদনেব প্রতীচ্য-প্রীতি বনাম স্বকীযতা

'তিলোত্তমাসম্ভব'-এ তাঁর কবি-কীর্তির এই সফলতা পূর্ণ প্রতিভাত হতে পাবে নি। কাবণ, ঐ কাব্য রচনার পেছনে বাইরের উৎসাহ যত ছিল, অন্তরের প্রেরণা ছিল না প্রায় একেবাবেই। বাজি রেখে মধুসূদন এই কাব্য লিখেছিলেন, আঙ্গিক-সফল অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাই তাঁর প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি নয়। যথার্থ সৃজনের ক্ষেত্রে ভাষা কেবল ভাবের বাহন—'তিলোত্তমাসম্ভব'-এ একথা আর একবার প্রমাণিত হল। এই কাব্যে অমিত্রচ্ছন্দের গতি-প্রকৃতিও আড়ষ্ট আচ্ছন্ন।

'তিলোত্তমা'ব কাব্যমূল্য

মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। এটি তাঁব সর্বোৎকৃষ্ট কলা-কৃতি না হলেও সর্বাপেক্ষা কীর্তিপ্রসূ কাব্য। বস্তুত 'মেঘনাদবধ'-এব জন্যেই মধুসূদন আজ নবীন বাংলার কবিকুল-চূড়ামণি। এই রচনার ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টিতে সার্থক রূপ পেয়েছে!—"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এই পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন

'মেঘনাদবধ'-এ বিপ্লব-উত্তাপ

করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য : ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে ; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনো মতে হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

বিদ্রোহী শক্তির এই স্পর্ধিত আত্মপ্রকাশেই মধুসূদনের কবি-কৃতিকে অতুল্য স্বকীয়তা দিয়েছে। বাল্মীকিকে বন্দনা করে কবি তাঁর রচনা শুরু করেছিলেন; রচনাকালে পুনঃপুন স্মরণ করেছেন হোমার, মিল্টন, দান্তে, ভার্জিল, ট্যাসোর মতো প্রতীচ্য কবিকুল-শিরোমণিদের কথা। ফলে 'মেঘনাদবধ' প্রাচ্য-প্রতীচ্য কবি-কীর্তির সঞ্চয়-ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। তাহলেও, উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাংলার জীবনীশক্তি-প্রদীপ্ত হয়ে এই কাব্য বিশ্ব-কাব্যকলার সাদৃশ্য সূত্রে সমকালীন বাংলার জীবন-বেদনাকেই শিল্পরূপে গ্রথিত করেছে। উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের দুঃসাহসী শৃঙ্খলভঙ্গ অভিযানের মূর্ত প্রতীক 'মেঘনাদবধ'-এর রাবণ। আর বাংলার চিরন্তন জীবনধর্মের অমর মাধুরী প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য নারী চরিত্রে; পুত্রের কল্যাণ কামনায় তপস্যারতা মন্দোদরী, লঙ্কা প্রবেশ-পূর্ব যুদ্ধভূমি এবং পরে স্বামীর শ্মশানভূমিতে সাধ্বী বীরাঙ্গনা প্রমীলা, সীতার চরণোপান্তে সরমা—বাঙালির জীবন-প্রাঙ্গণ এঁরা সকলেই সহজ প্রাণধর্মে দীপ্যমান—"তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি।" ব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র্যবোধে সচেতন এই নবীন নারী-চরিত্রাবলির মধ্যে চিরকালের কল্যাণী বাঙালিনীর রূপমূর্তিটি কবি রচনা করেছিলেন—যাঁরা ত্যাগে, আত্মদানে, পরহিত-সাধনে পরম উৎকণ্ঠায় সদার্দ্র-চিত্তা। এই নারী স্বভাবেরই একটি সুন্দর পরিচয় আভাসিত হয়েছে 'মেঘনাদবধ'-এর নবম সর্গে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বন্দিনী সীতাকে সরমা মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুখোমুখি প্রতিষ্ঠিত করে মধুসূদন সীতার মূর্তি এঁকেছেন :—

'মেঘনাদবধ'-এর স্বকীয়তা,—নারী-কল্পনা

"ভবতলে মূর্তিমতী দয়া
সীতা-রূপে, পর-দুঃখে কাতরা সতত,
কহিলা, সজল-আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—
'কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো, সদা,
প্রবেশি যে গৃহে—হায়, অমঙ্গলা-রূপী
আমি! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!

বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ। ত্যজিলা প্রাণ পুত্র-শোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার, লো, এবে
শূন্য রাজ-সিংহাসন। মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম ভুজ-বলে,
রক্ষিতে দাসীয় মান! হ্যাদে দেখ, হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে ;—"

কেবল রাবণের অপরিণামদর্শী দুঃসাহসিকতাই নয়, সীতার মতো বিগলিতপ্রাণা নারীর সৃজন-শৈলীও 'মেঘনাদবধ এর মহাকাব্য-কীর্তিকে বাঙালি ধর্মের স্বকীয়তায় মণ্ডিত করেছে।

অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনায় মধুসূদনের যুগোত্তীর্ণ কবিকীর্তির এক শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর 'মেঘনাদবধ'। কিন্তু বাংলা পদ্যের গতানুগতিক মিত্রচ্ছন্দে মর্মস্পর্শী কাব্যরচনার দক্ষতাও তাঁর অসাধারণ ছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'মেঘনাদবধ'-এর একই বছরে প্রকাশিত 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য এই তথ্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 'ব্রজাঙ্গনা' আসলে 'মেঘনাদবধ'-এর পূর্বজাত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন এই স্বয়ম্পূর্ণ লিরিক কাব্যটি রচনা করেছিলেন; তখন এর নাম ছিল 'রাধাবিরহ'। নামেই কাব্য-বিষয়ের স্পষ্ট প্রকাশ। ড. সুকুমার সেন সে পরিচয় আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন—"হৃদয়-পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহিয়াছে সেই নারীই মধুসূদনের কাব্য-নাটকের নায়িকা।...ইহার মধ্যে দুইটি নায়িকা সবার উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—ভাগ্য-বঞ্চিতা সীতা, আর বল্লভ-বঞ্চিতা রাধা। বিরহ-বিধুর রাধা এবং যমুনাতীর ও কদম্বতল কবির কল্পনাকে বার বার নাড়া দিয়াছে।"—'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে।

মিত্রাক্ষর কাব্য 'ব্রজাঙ্গনা'

মিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে কবির সংশয় ও কুণ্ঠা ছিল। তাই রচনার পরেও প্রায় একবছর কাব্যটিকে অপ্রকাশিত রেখেছিলেন। প্রকাশ কালে 'রাধাবিরহ' কাব্যের নূতন নাম হয় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদনের যে গীতি-ব্যাকুলতা অস্ফুট, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে তাই শতদল-এর মতো পূর্ণ বিকশিত। 'মেঘনাদবধ' রচনা করতে করতেই কবি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন—"I suppose, I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad...there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me and I think I have a tendency in the Lyrical way." কবির এই রোমান্টিক লিরিক-প্রবণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে আগাগোড়া 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে—রয়েছে 'মেঘনাদবধ'-এরও চতুর্থ ও নবম সর্গে। কিন্তু তার সফলতম প্রকাশ 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। কাব্যের সার্থকতা কবিপ্রাণের নির্বাধ মুক্তিতে। এই বিচারে মধুসূদনের আবেগপূর্ণ হৃদয়ের আন্তরিকতম শিল্প-রূপ 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও। এই কাব্য ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয় পরের বছরের গোড়ার দিকে। আপাত দৃষ্টিতে এর বহিরঙ্গে রয়েছে ইটালির কবি ওভিদ্-এর [Publius Ovidius Naso] 'Heroides' নামক কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব। 'Heroides'-এর প্রত্যেকটি কবিতা একটি করে পূর্ণাঙ্গ পত্র। বিভিন্ন নায়িকা বা নায়ক তাঁদের পতি, প্রিয় বা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেমাকুল চিত্তে এই সব পত্র রচনা করেছিল। Ovid-এর কাব্যে একুশটি পত্র-পত্রিকা ছিল ; মধুসূদনও সমসংখ্যক কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন। প্রথম বারে ১১টি পত্র নিয়েই 'বীরাঙ্গনা'র প্রকাশ ঘটে; বাকি জীবনে কবি 'বীরাঙ্গনা'কে পূর্ণাঙ্গ করে

'বীরাঙ্গনা'য় কবির গীতি-ব্যাকুলতা

তোলার চেষ্টা করেছেন বারে বারে ; কিন্তু আর একটিও পত্র-কবিতা রচনা করে শেষ করতে পারেন নি।

'বীরাঙ্গনা'র কেবল বহিরাঙ্গিকেই নয়, অনেক কয়টি পত্র-কবিতার বিষয়চয়নেও মধুসূদনের ওপরে Ovid-এর প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু যেমন 'মেঘনাদবধ'-এর, তেমনি 'বীরাঙ্গনা'-তেও, উনিশ শতকের বাংলার নবীন স্বাতন্ত্র্য-কামনাকে বক্ষে বহন করে বিভিন্ন নায়িকার চরিত্রে রূপ নিয়েছে শাশ্বত বাঙালিনী। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ বাঙালি নারীত্বের সুমহৎ লক্ষণ ঘোষণা করে লিখেছেন—"তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্য-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া, তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, চিতাকে তুমি বিবাহ-শয্যার ন্যায় আনন্দসুন্দর করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতির দ্বারা পূত হইয়াছে।" নারীর সেই পাবনী রূপ স্পষ্ট হয়েছে 'মেঘনাদবধ'-এর নবম সর্গে—প্রমীলার চিতারোহণ দৃশ্যে। কিন্তু, কেবল পতির জীবনান্তেই নয়, প্রতিদিনের পথ-চলাতেও নারীর আত্মাহুতি, তার সংযম ও আত্মত্যাগ বাংলার জীবন-ভূমিকে পুণ্যবাহিত করেছে পদে পদে। উনিশ শতকের স্বভাব-ধর্মে নারী আর কেবল পতির 'ছায়েবানুগতা' নয়। তবু, তার নবজাগ্রত আত্মসচেতনতাও অন্তরে অন্তরে আত্মদানে সমান অকুণ্ঠ। 'বীরাঙ্গনা'র প্রথমেই শকুন্তলা-পত্রের শুরুতে এই পরিচয় স্পষ্ট :—

'বীরাঙ্গনা'য় অঙ্গনাধর্ম

"বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
হে রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিযাছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী!"

পত্রের পরাংশে শকুন্তলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, রাজার 'বিভব'-এর প্রতি তার বিন্দুমাত্র লোভ নেই ; রাজ-সেবা, তথা পতিসেবার কর্তব্যের তাগিদেই সে বিস্মৃত স্বামীর শরণ নিতে চেয়েছে। বাঙালি নারীর আত্মসম্ভ্রমবোধের বৃন্তে এই আত্মদানের উৎকণ্ঠা এক অভিনব রোমান্টিক সৌন্দর্যের সঞ্চার করেছিল। মধুসূদন তাকে মোহময় সংগীতের সুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন আগা গোড়া 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। 'মেঘনাদবধ'-এ অমিত্রাক্ষরের ওজস্বিতা দৃপ্ত রূপ পেয়েছে,—'বীরাঙ্গনা'য় তা লিরিক প্রবাহে বিগলিত হয়েছে সুললিত গীতি-ঝঙ্কারে। ওপরের প্রারম্ভিক ছত্র কটিই তার সুন্দর প্রমাণ।

মধুসূদনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ কাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচিত হয়েছিল প্রবাসে—১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যে মধুসূদন বাংলাভাষায় প্রথম 'সনেট' কবিতার প্রবর্তন করলেন—ইটালির কবি দান্তে ও পেত্রার্কার অনুসরণ করে। মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য-কবিতার মতো চতুর্দশপদী কবিতাতেও কাব্য-শরীরে প্রতীচ্য আঙ্গিকের অনুকৃতি রয়েছে ; কিন্তু তার অন্তরঙ্গে আছে কবি-প্রাণের নিভৃত বেদনার আকুলতা। ড. সুকুমার সেন এই আকুলতার পূর্ণ পরিচয় উদ্ধার করে লিখেছেন,—"সেই সুদূর সাগর পারের দেশে যখন ঘরছাড়া কবির চিত্তে 'মন-কেমনের হাওয়ার পাকে' অনেক স্মৃতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখনই সেই সনেটগুলির জন্ম। দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার রেশ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে ঝঙ্কৃত রহিয়াছে!" এখানেই কবিতাগুলির যথার্থ শিল্প-মূল্য।

চতুর্দশপদী কবিতা

মধুসূদনের পরেই উনিশ শতকের বাংলা কাব্যের স্মরণীয় শিল্পী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৩৮-১৯০৩) জীবৎকালের বিচারে হেমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের কনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একই বছরে তাঁর জন্ম হয়েছিল, হেমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেছিলেন বঙ্কিমের এক বছর পরে। কিন্তু রচনাকাল ও কবি-মনোভাবের বিচারে তিনি মধুসূদনের সহকর্মী, তথা, তাঁর ভাবানুসারী ছিলেন। মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর প্রকাশকাল ১৮৬০ ; আর হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে; মাত্র এক বছর পরে। কিন্তু মধুসূদনের সমতুল্য ভাব ও প্রকাশের মুক্তি হেমচন্দ্র কোনোদিনই আয়ত্ত করতে পারেন নি। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি কিছু কিছু কবিতা লিখতেন ; তখন ভারতচন্দ্রই ছিলেন তাঁর কবি-গুরু। পরে রঙ্গলালের রচনাদর্শকে তিনি অধিক পরিমাণে অনুসরণ করেছিলেন। এদিক থেকে কবি হিশেবে হেমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের এক ধাপ পশ্চাৎবর্তী। কিন্তু 'বৃত্রসংহার' নামে যে কাব্যকে আশ্রয় করে তৎকালীন বাংলায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে তিনি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'-এর অনেকাংশে অনুসরণ করেন। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে নবজাগ্রত মুক্তি চেতনার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বাণী-রূপ পেয়েছিল 'মেঘনাদবধ'-এ। তাছাড়া আঙ্গিকের দিক থেকেও মধুসূদন এই কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকাব্য-কলার একটি মিশ্ররূপ অনুসরণ করেছিলেন। এদিক থেকে 'মেঘনাদবধ' বাংলা ভাষার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য। মধুসূদনের পরে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে উৎসারিত করে এ-ধরনের মহাকাব্য রচনার একটি সাধারণ সংস্কার প্রবল হয়েছিল। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্যায়কে 'মহাকাব্যের যুগ' বলা হয়। মধুসূদনের পরেই মহাকাব্য-যুগের স্মরণীয় কবি হেমচন্দ্র। যদিও এ-পথে তাঁর কবি-কৃতির সফলতা যথেষ্ট উল্লেখ্য নয়।

কবি হেমচন্দ্র

তাহলেও আর একদিকে হেমচন্দ্রের স্বকীয়তা ছিল অতুল্য। সেকালের বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপিত কবিতার এমন প্রাচুর্য পূর্ববর্তী আর কোনো শিল্পীর রচনায় লক্ষ করা যায় না। এদিক থেকে হেমচন্দ্রের পরিবেশ-সচেতনতা ছিল অসাধারণ। তাঁর ছাত্রজীবনে কলকাতা, তথা বৃহত্তর বাংলায় রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল একের পর এক ঘটনাবলির মাধ্যমে। সেকালের স্বার্থপরবশ ইংরেজদের তথাকথিত 'ব্ল্যাক্ এক্ট' বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া হিশেবেই শিক্ষিত বাঙালির সংঘবদ্ধতা সর্বপ্রথম সংহত হয়েছিল। তখনকার দিনে বাংলাদেশের দূর-দূরান্তে ইংরেজেরা বাস করতেন জমিদারি বা ব্যবসায়ের উপলক্ষে। অথচ, তাদের অপরাধের বিচার হতে পারত কেবল কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট-এ, শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দ্বারা। এই সুযোগে দেশীয় প্রজা, এমন কি রাজকর্মচারীদের ওপরেও তারা প্রচুর অত্যাচার করতেন। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গভেদে আইনেরও যে পার্থক্য ছিল, তার সুযোগ নেবার চেষ্টা এরা করতেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এই আইন রদ করে মফস্বলেও ইংরেজদের জন্য সমান বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব হওয়া মাত্র তারা সংঘবদ্ধতার জবরদস্তি দিয়ে সে চেষ্টা প্রতিহত করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিক্ষিত সমাজেও সংঘবদ্ধ প্রতি-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে; গড়ে ওঠে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। তাছাড়া 'সিপাহি বিদ্রোহ' (১৮৫৭) ও নীল বিপ্লবের (১৮৫৯-৬০) প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল হেমচন্দ্রের উদীয়মান যৌবন-সীমায়। রাজনৈতিক উত্তেজনার সেই বিক্ষোভকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি হেমচন্দ্র ; তাঁর বহু গীতিকবিতায় সেই ক্ষোভ যন্ত্রণাতপ্ত আক্ষেপের আকারে প্রতিফলিত হয়েছে। 'ভারত বিলাপ' নামক কবিতায় এই অনুভবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কলকাতার অমূল্য সম্পদ বর্ণনা করে কবি লিখেছেন,—

হেমচন্দ্রের কবি-কর্মের অতুল্যতা

"অহে বঙ্গবাসী জান কি তোমরা
অলকা-জিনিয়া হেন মনোহরা,
কার রাজধানী কি জাতি ইহারা?
এ সুখ-সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।
নাহি যদি জান, এস এই খানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিধানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।।
অদূরে বাজিছে 'রুল ব্রিটানিয়া'
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটন বাসীরা
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়?
হায়রে কপাল ওদেবি মতন
আমরাও কেন করিতে গমন
না পাবি সতেজে বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস?
ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।
কি হবে বিলাপ করিলে এখন
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
তখনি সে সাধ ঘুচেছে।"

মূল কবিতাটি দীর্ঘতর। তাহলেও উদ্ধৃত অংশ থেকেই সমকালীন রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে হেমচন্দ্রের একাত্মতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, হেমচন্দ্র যেখানে যথার্থ কবি—সেখানে সমসাময়িক জীবনের অসাম্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে তাঁর আক্ষিপ্ত সচেতনতাই সফল কাব্যরূপ রচনা করেছে। প্রথম উল্লেখ্য কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী'তেও এই তথ্যের সমর্থন রয়েছে।

হিন্দুকলেজের শিক্ষা তরুণ বাঙালিকে এক আদর্শসংঘাতের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল,—কেবল রাজনীতির প্রেক্ষাভূমিতেই নয়, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও। ফলে বিবাহ, পরিবার ও সমাজ-বন্ধনের আবহমান আদর্শের প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়। এমন অবস্থায় একই বছরের মধ্যে পর পর দুই উচ্চশিক্ষিত তরুণ আত্মহত্যা করেন। এঁদের একজন ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ—হেমচন্দ্রের অ[illegible]ল্য প্রতিবেশী। দুজনে একসঙ্গে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন (১৮৫৮)। অশিক্ষিতা বাল্যবিবাহিতা স্ত্রীকে যথার্থ ভূমিকায় গ্রহণ করতে না-পারার যন্ত্রণাই ছিল শ্রীশচন্দ্রের আত্মবিনাশের প্রধান কারণ। 'চিন্তাতরঙ্গিনী'তে হেমচন্দ্র এই জীবন সমস্যার সম্পর্কে 'চিন্তা' করতে গিয়ে অশিক্ষিতা বালিকা বধূর বেদনাকেই করুণাঘন করে তুলেছেন। কিছু কিছু ইংরেজি

'চিন্তাতরঙ্গিনী'

কবিতার ছাপ থাকলেও এই রচনায় রঙ্গলালের প্রভাবই বেশি।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য 'বীরবাহু'র (১৮৬৪) উদ্ভব হয়েছিল একান্তভাবে স্বদেশ প্রীতির উদ্দীপনাকে আশ্রয় করে। কাব্য-পরিচয় দিয়ে কবি নিজে লিখেছিলেন, —"উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।" এই কাব্যে রঙ্গলালের প্রভাব স্পষ্ট।

'বীরবাহু' কাব্য

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'আশাকানন' নামে একখানি 'সাঙ্গরূপক কাব্য' লিখেছিলেন হেমচন্দ্র। "মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরেজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগাবি' কহে।" 'ছায়াময়ী কাব্য' (১৮৮০) লিখিত হয়েছিল "প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় কবি ডান্টের লিখিত ডিভাইনা কমেডিয়ার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস" দেবার জন্যে।

'আশাকানন' ও 'ছায়াময়ী'

'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) হেমচন্দ্রের একটি বহু আলোচিত গীতিকাব্য। কাব্য-বিষয়ের আলোচনা করে 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখিত হয়েছে,—"দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুত, আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইযাছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতা মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।" 'দশমহাবিদ্যা'র ভাব-বিষয়ের অস্পষ্টতা নিয়ে পণ্ডিত মহলে একদা প্রচুব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া এই কাব্যের ছন্দ-শৈলীতেও অভিনবতা সঞ্চারের চেষ্টা আছে; কবি জানিয়েছেন "সেগুলি কোন সংস্কৃত অথবা প্রচলিত বাংলা ছন্দের অনুসবণ নয়।"

'দশমহাবিদ্যা'

এর পরে হেমচন্দ্র 'নাকেখৎ' নামে একটি 'হাস্যকাব্য' লিখেছিলেন (১৮৮৫ খ্রি)। তাবপরে প্রকাশিত 'চিত্তবিলাস' কাব্য (১৮৯৮) কয়েকটি গীতিকবিতার সংকলন। হেমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রচনা 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের আকারে লিখিত। ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধেব পৌবাণিক গল্প নিয়ে এর বিষযবস্তু গড়ে উঠেছে। একদিকে আলংকারিক মহাকাব্যরীতি অনুসরণের অতিপ্রয়াস, অন্য দিকে বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির অভাব 'বৃত্রসংহাব' এর শিল্পরূপকে সুগঠিত হতে দেয় নি। সুদীর্ঘ ২৪ সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্য প্রথমে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে (১৮৭৫) সর্গ সংখ্যা ছিল ১১ ; দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৭৭) ১৩। 'বৃত্রসংহার'-এর স্থানে স্থানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অসফল অনুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে ; অন্যান্য স্থলে রয়েছে বিচিত্র রকমের মিত্রচ্ছন্দেব ব্যবহাব। প্রাচ্য প্রাতীচ্য নানা কাব্যের অনুসরণের প্রাচুর্যে কবির স্বকীয়তা কোথাও পরিস্ফুট হতে পারে নি এই কাব্যে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ'-এর দুর্বল অনুকরণ আছে গল্প ও সর্গ-কল্পনার অনেক স্থলে।

'বৃত্রসংহাব ও অন্যান্য কাব্য

হেমচন্দ্র দুইখানি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। 'টেম্পেস্ট'-এব অনুবাদের (১৮৬৮) বাংলা নামকরণ করা হয়েছিল 'নলিনীকান্ত' ; দ্বিতীয় নাটকটি 'রোমিও-জুলিয়েট'-এর অনুবাদ (১৮৯৫) । রচনা হিশেবে কোনোটিই উল্লেখ্য নয়।

হেমচন্দ্রের নাট্যানুবাদ

মহাকাব্যযুগের কবিকৃতিতে একটি নূতন স্বাদের সঞ্চার করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫১-১৮৯৮ খ্রি.)। চিন্তার ধীরোদাত্ততা ও বিষয় বর্ণনার দৃপ্ত ওজস্বিতা মহাকাব্যের একটি সাধারণ লক্ষণ বলে কথিত হয়। এদিক থেকে বাঙালির স্বভাব-প্রবণতা মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয়। মধুসূদন নিজেও মহাকাব্য লিখতে বসে লিরিক আগ্রহের প্রেরণা অনুভব

করেছিলেন। মধুসূদনের মধ্যে তবু ছিল বাঙালি-দুর্লভ ওজস্বী ব্যক্তিত্ব ; বৈপ্লবিক অগ্নিতপ্ততা।

কবি অক্ষয় চৌধুরী

তাই, প্রবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ও রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনা নিয়েও তিনি বাঙালি জীবনের সার্থক মহাকাব্য লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু, উদাত্ত-গভীর ওজস্বিতার অনুসরণ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র আসলে নিজ গীতি-স্বভাবের বিরোধিতাই করেছিলেন ; তাই কাব্য হিশেবে 'বৃত্রসংহার' আগাগোড়া সফল হয় নি। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে সেকালের বাংলা কাহিনী-কাব্যকে মুক্তি দিয়েছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। প্রাচীন গল্পের শৌর্য-কথাকে বাঙালিধর্মী প্রেমবেদনায় মন্থর, কল্পনাঘন এক অভিনব রোমান্টিক সৌন্দর্যে ভরে তুলেছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে নবীনচন্দ্র তাঁর কাহিনীকাব্যসমূহে এই রোমান্স-নিবিড় 'গাথা' রচনার শিল্প-পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের গাথাকাব্য রচনাতেও অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব আছে।

রোমান্স-এর নিবিড় স্পর্শ আছে তাঁর 'উদাসিনী' কাব্যে (১৮৭৪)। অজ্ঞাত-পরিচয় রাজকন্যা সরলা, ও সুরেন্দ্র নামক যুবকের প্রথম প্রণয়; দুজনের জীবনে আকস্মিক বিপৎপাত;

'উদাসিনী' কাব্য

এবং প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসে তাদের পুনর্মিলনের রোমান্স-করুণ গল্প 'উদাসিনী' কাব্যের বিষয়বস্তু। এই মিলন ব্যাপারে বনদেবী এবং রতির ভূমিকা রোমান্টিক সৌন্দর্যকে আরো ঘনবদ্ধ করেছে। 'উদাসিনী' কাব্য দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। ইংরেজ কবি টমাস পার্নেল-এর 'হার্মিট্' কাব্যের প্রভাব রয়েছে এতে।

অক্ষয় চৌধুরীর আর একটি কাব্য 'ভারতগাথা' রচিত হয়েছিল পাঠ্যগ্রন্থের আকারে। হিন্দুযুগ থেকে শুরু করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের পদ্য চুম্বক রচিত হয়েছিল

'ভারতগাথা' ইত্যাদি

এতে। পদ্যাংশের অনেক স্থলে প্রকাশ আবেগ-উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। 'সাগর সংগমে' গাথাকাব্য পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। অক্ষয়চন্দ্রের আরো বহু রচনা লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেনসিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত। সেদিকে খেয়ালও করিতেন না।" তাহলেও যতটুকু রচনা-পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে অক্ষয়চন্দ্রের আত্মবিস্মৃত স্বপ্নাকুলতার প্রকাশ সংশয়াতীত হয়েছে। 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতায় সেই স্বপ্ন-সুন্দরতার আকাঙ্ক্ষা সার্থক রূপ পেয়েছে :-

"মহান জলধি জলে
প্রাণ ঢেলে দিব বলে
সুদূর পর্বত হতে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ
না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া।"

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসংগীত'-এর প্রথম সংস্করণে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল; আসলে রবীন্দ্র-কবিতাকে সংবর্ধিত করতেই লেখা হয়েছিল অক্ষয় চৌধুরীর কবিতা।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) আধুনিক বাংলায় মনস্বী ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক পণ্ডিত রূপে পরিচিত। অথচ, এই মহাপণ্ডিত মনীষীর অন্তরে আত্মগোপন করেছিল একটি স্বভাব-কবির প্রাণ। কবি শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিচয় একালে বিস্মৃতপ্রায়। ড. সুকুমার সেন বলেছেন,—

"ইহার অন্তরবাসী কবি-মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষক ও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাবে স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন।" কিন্তু স্বল্প সুযোগেও শিবনাথ যে-কয়টি কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে সৌন্দর্য-পিপাসু একটি কবি-মনের পরিচয় ভাস্বর হয়ে আছে। তাঁর প্রথম কাব্য 'নির্বাসিতের বিলাপ' প্রথমে সূচিত হয়েছিল 'সোমপ্রকাশ'-এর পৃষ্ঠায়। কবি জানিয়েছেন, কঠোর অপরাধের জন্য কোনো ভদ্রসন্তান চিরজীবনের মতো নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁর যাত্রার দিনে তিনি প্রবল মনঃকষ্ট অনুভব করেন; এবং "সেই উপলক্ষে গুটিকতক পংক্তি লিখিয়া সোমপ্রকাশ-এ" প্রকাশ করেছিলেন। পরে জনপ্রিয়তার দাবি এড়াতে না পেরে এই কবিতাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ কাব্য-রূপ দেন (১৮৬৮)।

কবি শিবনাথ শাস্ত্রী

এ-ছাড়া, শিবনাথ শাস্ত্রী আরো চারখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে 'পুষ্পমালা' (১৮৮৫) ও 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮) নামে কবিতা-সংকলন দুখানি অনেক সফল খণ্ডকবিতার সমষ্টি। 'হিমাদ্রি-কুসুম' (১৮৮৭) পাঁচটি ছোট-বড় নীতিকবিতার সংকলন ; আর 'ছায়াময়ী' (১৮৮৯) ছিল রূপককাব্য।

রচনাপঞ্জী

নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) প্রথম কাব্য 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রথম খণ্ড প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। এদিক থেকে তিনি অক্ষয় চৌধুরীর পূর্ববর্তী কবি ; শেষোক্ত কবির প্রথম রচনা 'উদাসিনী'র প্রকাশকাল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৭৮) গীতিকবিতার সমষ্টি। নবীনচন্দ্রের ব্যক্তি-স্বভাবের অতি-সচেতন আত্মপ্রীতি প্রথম যৌবনের অপরিণত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ করে এই পুস্তিকার প্রথম খণ্ডটিতে। তা না হলে, 'অবকাশরঞ্জিনী'র দুটি খণ্ডেই কোনো কোনো কবিতায় কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নিঃসন্দেহে হৃদ্য হয়েছে। কিন্তু একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, ঐ সব কাব্য-কবিতাতে নবীনচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেনি ; তা ঘটেছে বিভিন্ন কাহিনীকাব্যে। 'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) নামক ত্রয়ী কাব্যের সফলতা ও ব্যর্থতার সঞ্চয় নিয়েই সাহিত্যের ইতিহাসে নবীনচন্দ্রের সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা। এই কাব্যত্রয়ীতে মধুসূদনের মতো মহাকাব্য রচনার উদ্যম করেছিলেন তিনি ; ভারতের চিরন্তন মহাকাব্য মহাভারতকে নূতন মূল্যবোধের পটভূমিকায় নবরূপ দিতে চেয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের সে প্রয়াস পুরো সফল হয়নি ; মহাকাব্য রচনায় তাঁর সার্থকতা প্রশ্নাতীত নয়। তাহলেও রসগ্রাহী পাঠকের মনে আবেগস্ফীত ঐ কাব্যত্রয়ীর ভাব-আবেদন অল্প নয়। তার কারণ কৃষ্ণজীবনের পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন-ইতিহাস যথাক্রমে চিত্রিত হয়েছে ঐ তিনটি কাব্যে, নবীনচন্দ্রের স্বপ্ন-কল্পনাতুর দৃষ্টির রোমান্টিক আতিশয্য নিয়ে। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', ও 'প্রভাস' মহাকাব্য হিশেবে ব্যর্থ; কিন্তু রোমান্টিক গাথাকাব্যের আকারে অভিব্যক্ত জীবন-চিত্রের আন্তরিক মাধুর্য উপেক্ষা করা অসম্ভব। আর গাথাকাব্যের স্বপ্নালুতা রচনায় নবীনচন্দ্র প্রথমাবধি অক্ষয় চৌধুরীর রোমান্টিক মনঃপ্রবণতা ও কলাকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখানেই তিনি, কবি হিশেবে, অক্ষয়চন্দ্রের অনুসারী না হলেও অনুজ।

নবীনচন্দ্র সেন ও 'অবকাশরঞ্জিনী'

ত্রয়ীকাব্য

নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এর পূর্বে তাঁর একমাত্র প্রকাশিত কাব্য ছিল 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রথম খণ্ড। এই দ্বিতীয় কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার একটি প্রধান কারণ, বাঙালির ইংরেজ-অধীনতার অব্যবহিত ইতিহাসটিকে অতি-উচ্ছ্বাসে সিক্ত করে

'পলাশির যুদ্ধ'

কবি এখানে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু পরাধীনতার জ্বালা ও বন্ধন-মোচনের উদ্দীপনার চেয়ে, অকারণ বেদনার রোমান্টিক আকৃতিই তাতে প্রবল হয়েছিল। ফলে, 'পলাশির যুদ্ধ'তেই নবীনচন্দ্রের রচনাধারায় গাথাকাব্যের লক্ষণ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। এর সফল বিস্তার ঘটে পরবর্তী কাব্য 'রঙ্গমতী'-তে (১৮৮০)।

'রঙ্গমতী'

ড. সুকুমার সেন এই কাব্যে স্কট-এর আখ্যায়িকাকাব্যের আদর্শ অনুসরণের কথাও উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যেও স্কট-বায়রনের অনুসরণ উচ্ছ্বসিত। তাছাড়া, 'রঙ্গমতী'-তেই আবার কাহিনী ও রূপ-বিন্যাসে অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী'র প্রভাব প্রচুর। চট্টগ্রামের বাঙামাটি অঞ্চলের রাষ্ট্রিক সংঘাতের পটভূমিতে রাজকুমার বীরেন্দ্র ও তার প্রণয়িনী কুসুমিকার বিপদ-মিলনের রোমান্টিক কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

অপরাপর কাব্য ও রচনাপঞ্জী

নবীনচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রধান উল্লেখ্য তিনখানি জীবনীকাব্য :— 'খৃষ্ট', 'অমিতাভ' ও 'অমৃতাভ'। প্রথম কাব্য দুটির পরিচয় নামেতেই প্রকাশ; 'অমৃতাভ' লিখিত হয়েছিল চৈতন্যজীবনী অবলম্বন করে। তাছাড়া 'ভগবদ্‌গীতা' ও 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র পদ্যানুবাদও করেছিলেন নবীনচন্দ্র। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে লিখেছিলেন 'নির্মাল্য' নামে নাটক আর লিখেছিলেন গদ্য আখ্যায়িকা 'ভানুম[illegible]'। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক মর্যাদা দাবি করতে পারে পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত আত্মচরিত 'আমার জীবন'। কবিজীবনী হিশেবে আত্মসচেতন এই গ্রন্থটি যেমন কৌতূহলজনক, তেমনি সমকালীন ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও কৌতুককর তথ্যের সমাবেশ রয়েছে তাতে। এই গ্রন্থে আলোচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সমষ্টির মধ্যে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথও।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) ছিলেন হেমচন্দ্রের অনুজ সহোদর, আর নবীনচন্দ্রের পরম বন্ধু। এঁর প্রকাশিত কাব্যসংখ্যা চার ; এদের মধ্যে তিনখানিই গীতি-কবিতার সংকলন 'চিত্তমুকুর' (১৮৭৮), 'বাসন্তী' (১৮৮০) এবং 'চিন্তা' (১৮৮৭)। গীতিকবিতা রচনায় ঈশানচন্দ্রের দক্ষতা ছিল সেকালের পক্ষে প্রায় অতুল। কিন্তু, ইতিহাসের প্রয়োজনে তাঁর একমাত্র গাথারচনা 'যোগেশ' কাব্যের চাহিদা বেশি। এই কাব্যের কাহিনী ও [illegible]ক্ষকর্মে কবির ব্যক্তি-জীবনানুভব ব্যথাদীর্ণতায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ঈশানচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতা ছিল অপার। জীবনের নানামুখী সমৃদ্ধি সত্ত্বেও মাত্র ৪২ বছর বয়সে তিনি নিজের হাতে নিজের প্রাণান্ত ঘটিয়েছিলেন। সেই দুর্ঘটনার পশ্চাৎবর্তী কবিমনোভাব বেদনা-ধূমায়িত ব্যঞ্জনা পেয়েছে 'যোগেশ' কাব্যে। নায়ক যোগেশ নিজের বিবাহবাসরে স্ত্রীর একটি বান্ধবীকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন থেকেই যোগেশের পরিবার-জীবন ও নীতিচেতনার মধ্যে মানস দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে, সেই জটিলতা আরো তীব্র হয়েছিল মহিলাটির বিবাহের পরে। অবশেষে দুঃসহ হৃদয় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যোগেশ একদিন আত্মহত্যা করে। যোগেশের এই যন্ত্রণা ছিল, আগেই বলেছি, কবির গোপন মর্ম-সঞ্জাত। আন্তরিকতার এই তপ্ত স্পর্শ তাঁর কাব্যকে জ্বালাময় সর্জবতা দান করেছিল। দুঃসহ এই জীবন-জ্বালা ঈশানচন্দ্রের গীতি-সং[illegible]তারও প্রধান উৎস।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদনোত্তর বাংলা কাব্যে নূতন আঙ্গিক-সচেতনার সৃষ্টি করেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)—যদিও তাঁর প্রতিভা তত বলিষ্ঠ ছিল না। রাজকৃষ্ণ কেবল কবিতাই লেখেন নি,— গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাস, খোসগল্পে তাঁর রচনাব সংখ্যা ছিল ৭০, কিংবা তারও বেশি।

আর সকল ক্ষেত্রেই ভাব-সৌন্দর্যের চেয়ে রূপাঙ্গিকের প্রতি তাঁর অবধান ছিল সমধিক। প্রথম কাব্য 'বঙ্গভূষণ' (১৮৭৪) মধুসূদনের অনুসরণে লেখা ৬৩টি সনেট-এর সমষ্টি। বিষয় ছিল "বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী।" শিশুদের জন্য কবিতা লিখেও ইনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাছাড়া কবি-রাজকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব—তিনি প্রথম 'কাব্যাত্মক গদ্য'কে 'পদ্য-পৌঙক্তিক প্রণালী'তে সাজিয়েছিলেন; কবির অজ্ঞাতেই যেন গড়ে উঠেছিল আধুনিক গদ্যকবিতার অ-সচেতন পূর্বরূপ। যেমন :—

রাজকৃষ্ণ রায

"আকাশ নীল,—অনন্ত নীল ;—
মানব চক্ষু অনন্ত নয় ;—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল।"

রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনার পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে পরে যথাস্থানে।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯২২) কবিতা ছাপাবার এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের নামে কবিতা লিখে তিনি 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা'য় ছাপতে দিয়েছিলেন—কিন্তু তা অনুপযুক্ত বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে ভুবনমোহিনী দেবী এই ছদ্ম নামে কবিতা লিখে পাঠালে ঐ একই পত্রিকায় তা সাদরে গৃহীত হয়েছিল। তাঁর লেখা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' প্রথম (১৮৬৫) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭৭) পড়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার-ও এই 'মহিলাকবির' (?) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁর কোনো বন্ধু ভুবনমোহিনীব ঠিকানায় "কাপড়টা, বইটা" উপহার পাঠাতেন। নবীনচন্দ্রের লেখা আরো দুটি কাব্যের নাম 'আর্য-সঙ্গীত' ও 'সিন্ধুদূত'।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের (১৮৩৮-১৯১৭) দুটি কবিতা স্বাধীনতা আন্দোলনেব উত্তপ্ত দিনে লোকমুখে অগ্নিশিখার মতো ঘুরে বেড়াত। একটিব নাম 'যমুনা লহবী', অপরটি 'ভারত বিলাপ'। দ্বিতীয় কবিতাটিব প্রারম্ভিক ছত্র ছিল —

গোবিন্দচন্দ্র বায

"কতকাল পরে! বল ভারত রে।
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।"

এঁর রচনাবলি 'গীতকবিতা' চার খণ্ডে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

কাঙাল হরিনাথ নামে বহুল পরিচিত হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) আসলে ছিলেন সমাজবিপ্লবী সাংবাদিক। তাঁর রচনাপঞ্জীতে কাব্য, উপন্যাস ও নাটক—তিন বকমের বচনাই রয়েছে। কবিতার মধ্যে কাঙাল ফিকিরচাঁদ ভণিতায় লেখা বাউল গানগুলি মনোরম। সুদীর্ঘ আট বছর ধবে 'ফিকিরচাঁদ ফকিরেব গীতাবলী' ষোলো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া স্কুলপাঠ্য পদ্য কবিতা বাদ দিলে 'অক্রূর সংবাদ' এবং 'সাবিত্রী' নামে এঁর দুখানি গীতাভিনয় নাটিকার উল্লেখ করতে হয়। হরিনাথের লেখা উপন্যাসের নাম 'চিত্তচপলা'।

কাঙাল হরিনাথ

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরোধিতা করে জগদ্বন্ধু ভদ্র এককালে কৌতুকের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্যের প্রারম্ভিক ছত্রগুলি নিম্নরূপ :—

'ছুছুন্ধবীবধ' ও জগদ্বন্ধু ভদ্র

'দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিযা
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে,—

এ ছাড়া বৈষ্ণব পদ-সংকলায়িতারূপে জগদ্বন্ধুর প্রতিষ্ঠা সর্বস্বীকৃত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়
মধুসূদনের যুগের বাংলা নাটক

বাংলা কাব্যের মতো বাংলা নাটকেরও মুক্তি ঘটেছিল মধুসূদনের হাতে। উনিশ শতকের নগর বাংলায় সমাজ বিপ্লবের যে যৌথ সমবেত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়েছিল, তারই অনুবর্তনে নাটক লিখে রামনারায়ণ তর্করত্ন জনপ্রিয় 'নাটুকে' উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনায় নাট্যাঙ্গিকের পরিচ্ছন্নতা কিংবা বলিষ্ঠতা কিছুই ছিল না। আগে বলেছি, রামনারায়ণেব কৃতিত্ব আসলে নাট্যনক্সা রচনায়। অন্যদিকে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদাব এবং হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপীয়রের সুগঠিত নাট্যরীতির অনুসরণ করলেও সার্থক নাটক লিখতে পারেন নি; কারণ বাঙালির যৌথ জীবন-স্বভাব এবং সমকালীন সমাজের সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ তাঁদের ছিল না। মধুসূদন লোকোত্তর প্রতিভার শক্তিতে সফল নাট্য রচনার এই দুটি উপাদানকে ভারসম মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করলেন; গড়ে উঠল বাংলা নাটকের শিল্প-রূপ।

বাংলা নাটকে মধুসূদন

আগে বলেছি, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেলগাছিয়ার নাট্যশালাব উদ্বোধনের সময় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে অতৃপ্ত মধুসূদন রসোত্তীর্ণ নাট্যরচনায় উদ্যোগী হন। সেই চেষ্টার সার্থক ফল তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। এই নাট্যাঙ্গিকে 'foreign air'-এর কথা মধুসূদন নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন। তাহলেও, কেবল প্লট-এর বিচারেই নয়, রূপসজ্জার দিক থেকেও, 'শর্মিষ্ঠা' আগাগোড়া ভারতীয়। সংস্কৃত আদর্শেই মূলত এর কল্পনা ও গঠন; এমন কি নাট্যারম্ভে 'প্রস্তাবনা', এবং শেষে, 'ভরত বাক্যে'র অনুরূপ দুটি গীতও ছিল প্রথম সংস্করণে। পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে এই দুটি অংশ বাদ পড়লেও 'শর্মিষ্ঠা'র শিল্প-দেহে আদৌ প্রতীচ্য নাট্যরূপের ছাপ কম। সফল বচনার উৎস আসলে গভীর জীবনানুভব ও শিল্পীর পরিচ্ছন্ন প্রকাশ ক্ষমতা। তাছাড়া রূপাঙ্গিক প্রতীচ্য হল, না প্রাচ্য হল, রসসিদ্ধ নাটক রচনার পক্ষে সেটা কিছু বড় কথা নয়। বহু ভাষাবিদ্ মধুসূদনের আধুনিকতাধর্মী শিল্পিপ্রাণ কাব্যদেহের সুগঠিত রূপরচনা সম্পর্কে সদাসচেতন ছিল। ফলে, দেশীয় রচনারীতিও তাঁর পরিচ্ছন্ন রূপসচেতনতাব স্পর্শে বলিষ্ঠ ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। এখানেই 'শর্মিষ্ঠা'র বহিরঙ্গের যথার্থ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য সহজে বৃদ্ধি পেয়েছে সমকালীন জীবন-বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত অনুবর্তনের ফলে। এই নাটকে বাংলাদেশের সহজে-বঞ্চিত নারীত্বের ব্যক্তি-সচেতন বেদনাকে কবি নবরূপ দিয়েছেন।

'শর্মিষ্ঠা'

মূল গল্পটি মহাভারত থেকে নেওয়া। সংস্কৃত মহাভারতে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা দুজনকেই দেখি প্রেমাকুল প্রগল্ভ মূর্তিতে। এঁরা দুজনেই অনপেক্ষিতভাবে যযাতির প্রণয় কামনা করেছিলেন। যযাতির কামাতুরতাও সেখানে উগ্র। মধুসূদন রোমান্টিক পূর্বরাগের পরিবেশ রচনা কবে সেই আদিম গল্পকে সুস্মিত মধুরতা দান করেছেন। তাঁর রচনায় দেবযানী-শর্মিষ্ঠা উভয়ের বেলাই যযাতি ছিলেন প্রথম প্রেম-যাচক; নায়িকা দুজনেই সেখানে অনুরাগ-কুণ্ঠায় লজ্জারুণ। প্রণয়ের এই স্নিগ্ধ রূপ

'শর্মিষ্ঠা'র প্লট ও বাঙালি জীবন-ধর্ম

রচনায় কালিদাসের কবি-কল্পনা মধুসূদনকে নিশ্চিত ভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠার চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অনন্যনির্ভর স্বতন্ত্র। মহাভারতে দেবযানীর তুলনায় শর্মিষ্ঠাই ছিলেন পরুষ-রুক্ষ-ভাষিণী, ঈর্ষা-কাতরা। কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পী মধুসূদন তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন এই শর্মিষ্ঠারই সর্বরিক্ত রূপমূর্তির কণ্ঠে। মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজে নারীত্বের অকারণ নিপীড়ন কবিকে ব্যথিত করেছিল। তেমনি, অপার নিরাসক্তি ও করুণ তিতিক্ষার মধ্যে দুঃখ বরণের অকুণ্ঠ দুঃসাহস দেখে তাঁর শিল্পি-প্রাণ শ্রদ্ধানত হয়েছিল সেকালের নারীধর্মের প্রতি। অপার সৌন্দর্যে বিভাসিত মর্যাদাময়ী রাজকন্যা জীবনের বহুমুখী সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে, সমাজ ও জাতির কল্যাণ কামনায়, যেখানে আজীবন দাসীত্ব বরণ করেছে স্বেচ্ছায়, শর্মিষ্ঠা-জীবনের সেই মুহূর্তটিকে ঘিরে বাঙালি নারীর ত্যাগ-মহিম জীবন-গাথা রচনায় মধুসূদন তন্ময় হয়েছেন। আবেগ-কল্পনার এই উচ্ছ্বসিত প্রাণময়তা 'শর্মিষ্ঠা' নাটককে বাঙালি জীবনধর্মে সমৃদ্ধ করেছে; এখানেই তার যথার্থ শিল্প-সফলতা। 'শর্মিষ্ঠা'র বহিরঙ্গীয় সৌন্দর্যও সাফল্য পেয়েছে এই জীবন-উচ্ছ্বাসকে যথাসম্ভব সুমিত রূপ দান করেই।

শিল্পী হিশেবে মধুসূদন আসলে ছিলেন কবি,—মহাকবি। তাই নাটকের গদ্য সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও কাব্যগন্ধী অলংকারবহুল ভাষার অতিশয় প্রয়োগ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। স্থানে স্থানে যেমন চরিত্র রচনায়, তেমনি ভাষা-ভঙ্গিতেও, কালিদাসের পূর্ব-প্রভাব অবশ্য রয়েছে। তাহলেও, বাংলা নাটকের পক্ষে পদ্য-স্বভাবিত গদ্য সংলাপ যে সার্থক হতে পারে না, সে-কথা কবি বুঝেছিলেন। তাই নিজের শিল্প-প্রকৃতি, আর নাট্যশৈলীর দাবি,—এই দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় বিধান কবতে গিয়ে তিনি নাটকে অমিত্রাক্ষর পদ্য সংলাপ প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বস্তুত সেই উপলক্ষেই মধুসূদনের প্রথম অমিত্রাক্ষর পদ্য রচিত হয়; তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'তে (১৮৬০)। 'শর্মিষ্ঠা'র সংলাপে কয়েকছত্র মিত্রাক্ষর পদ্য আছে; 'পদ্মাবতী'তে আছে মাত্র কয়েক ছত্র অমিত্রাক্ষর। বাঙালি রসিকজনের কান এবং মন অমিত্রাক্ষর-সহ হয় নি বলেই নাটকের সংলাপে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর কবিতা আর ব্যবহার করেন নি। কিন্তু 'পদ্মাবতী' নাটকের ঐ কয়টি মাত্র ছত্রই এ-বিষয়ে তাঁর দক্ষতার চূড়ান্ত পরিচয় বহন করে। তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর এই নাটকের বিদেশী গল্পে মনোভিরাম দেশীয় জীবন-পরিবেশ রচনার সার্থকতা। গ্রিক পুরাণের 'Apple of discord'-এর গল্প নিয়ে 'পদ্মাবতী'র প্লট্ রচিত হয়েছে। কিন্তু সে খবর যাঁদের অজানা, তাঁদের পক্ষে এর বিদেশীয় উৎসের কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। 'শর্মিষ্ঠা'র রোমান্টিক রসঘনতা এখানে নিবিড়তর হয়েছে।

'পদ্মাবতী' নাটক

তার চেয়েও বিস্ময়কর মধুসূদনের প্রহসন দু'টি,—নাট্যকার মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'পদ্মাবতী' রচনার আগে এবং 'শর্মিষ্ঠা' রচনার প্রায় একই সময়ে লেখা। সমসাময়িক জীবনের বিভিন্নমুখী অনাচারের বিরুদ্ধে মধুসূদনের মোহমুক্ত শিল্পদৃষ্টি এখানে প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রথমটির বিষয়বস্তু সেকালের 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজের নৈতিক ব্যভিচার—আধুনিকতার নামে উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতার কদর্য কাহিনী। অপরটিতে আছে কপট ধার্মিক নারীমাংস-লোলুপ বৃদ্ধ জমিদারের দুরাচরণের গল্প। উভয়ক্ষেত্রেই রোমান্স-স্বপ্নাতুর কবির বাস্তব-দৃষ্টির যথার্থতা ও চরিত্রায়ণের অনুপুঙ্খতা বিস্ময়কর। তার চেয়েও বিস্ময়কর তাঁর রুচির শুচিতা ও প্রকাশের শালীনতা। প্রহসন দুটির সংলাপ পদ্যভারমুক্ত, যথাযথ, এবং সম্পূর্ণরূপে চরিত্রানুগ হয়েছিল। তার চেয়েও বড় কথা, —বিভিন্ন চরিত্রের

মধুসূদনের রচিত প্রহসন-দ্বয়

ব্যভিচারী স্বভাবকে প্রকট করেও মধুসূদনের লেখা সংলাপ কোথাও রুচিহীন হয়ে পড়ে নি। অথচ অন্যায়ের প্রতি ব্যঙ্গের রূঢ় আঘাতও কৃপাণ-কঠোর হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের সর্বশেষ উল্লেখ্য নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'তে (১৮৬১) তাঁর রোমান্স স্বপ্নাতুর রচনাশৈলী পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এটিই তাঁব একমাত্র পূর্ণাঙ্গ রচনা, যাতে সচেতনভাবে প্রতীচ্য নাট্যাঙ্গিক প্রায় আদ্যন্ত অনুসৃত হয়েছে; যদিও সংস্কৃত নাট্যকথা ও নাট্যকলার প্রভাবও কিছু কম নয়। নাটব টির গল্প টড্-এর 'রাজস্থান' থেকে নেওয়া; এ-সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন,— "For two nights, I sat up for hours pouring over tremendous pages of Tod and at about 1 a.m. last Saturday, the muse smiled." উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারী পাণিগ্রহণ বিষয়ে জয়পুর ও মেরুদেশের রাজা জয়সিংহ এবং মানসিংহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। দুজনেই নিজ নিজ দাবি আদায় করবার জন্য উদয়পুর আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। রাজ্য ও জাতির উদ্ধারের আর কোনো উপায় না দেখে স্বয়ং রাজা তাঁর লক্ষ্মী-প্রতিমা একমাত্র কন্যার মৃত্যু বিধানের আদেশ দেন। সে আদেশ পালনের ভার পড়ে রাজভ্রাতার ওপর, যিনি কৃষ্ণকুমারীকে ভালবাসতেন কন্যার মতো। নিদ্রিতা কৃষ্ণকুমারীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁব হাত কেঁপে ওঠে, কণ্ঠে পরিস্ফুট হয় হৃদয়ের ব্যাকুল অভিমান। কৃষ্ণকুমারী জেগে উঠে সব কথা শুনে স্বজাতির কল্যাণে নিজের হাতে নিজের জীবনান্ত করেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজা উন্মত্তবেগে ছুটে আসেন নিজ আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক

ইংরেজি আদর্শে লেখা উল্লেখ্য বাংলা ট্রাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। তার মুখ্য আবেদন মধুসূদনের বাঙালিধর্মী রোমান্টিক জীবন-বেদনার একান্ততায়। আঙ্গিকের দিক থেকে এই রচনাতেও জড়তা এবং শিথিলতা কিছু কম নেই। বিশেষ করে সংলাপ অংশে এ-সব ত্রুটি অতিমাত্রায় চোখে পড়ে। তাহলেও প্রতীচ্য ট্রাজেডির মোটামুটি রূপাধারে একটি অনুভবনীয় জীবন-বেদনাকে উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছিল; নাট্য বিষয়ের এই বাঙালিধর্মিতাই মধুসূদনের সফলতার প্রধান কারণ।

'মায়াকানন' নামে আর একখানি নাটক রচনা শেষ হলেও মৃত্যুর আগে কবি তা সংশোধন করে যেতে পারেননি। 'রিজিয়া' নাটক তাঁর মৃত্যুকালেও অসম্পূর্ণ ছিল।

মধুসূদনের পরেই এ-যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-১২৮০ বাংলা সাল)। প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'ই (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ) ছিল তাঁর খ্যাতির প্রধান উৎস। এ নাটক মূলত রস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি। সমকালীন বাংলাদেশে নীল চাষের জবরদস্তি উপলক্ষে বিদেশী নীলকরেরা এদেশে নারী নির্যাতন, নরহত্যা, লুঠতরাজ ইত্যাদি পৈশাচিক দুষ্কর্ম অবাধ করে তুলেছিলেন। সেই দুঃসহ অবস্থার যন্ত্রণা আগ্নেয় রূপ ধরেছিল ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল চাষীদের দেশব্যাপী ধর্মঘটে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশন বসেছিল; ঐ একই বছরে 'নীলদর্পণ' রচনা করে গ্রন্থের ভূমিকায় দীনবন্ধু আশা প্রকাশ করেছিলেন,—"নীলকর দুষ্ট রাহুগ্রস্ত প্রজাগণের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহানুভব [রাজপ্রতিনিধি] গণ অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন।"

দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধুর আকাঙ্ক্ষা বিফল হয় নি। 'নীলদর্পণ' রচনার দরুন ঐ সব দুরাচরণের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত সমাজের বিক্ষোভ অগ্নিদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, মূলগ্রন্থে লেখক নিজের নাম গোপন করেছিলেন। ইংরেজ শাসকদের অবগতির জন্য নাটকটির ইংরেজি করানো হয়। কেউ কেউ মনে করেন, অনুবাদক ছিলেন স্বয়ং মধুসূদন। অনুবাদকর্তার নাম অবশ্য

স্বাভাবিক কারণেই গোপন করা হয়েছিল। কেবল ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশক হিশেবে নাম ছাপানো হয়েছিল বলে পাদ্রী জেমস লঙ্‌-এর এক হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল। রাজা কালীপ্রসন্ন সিংহ সে টাকা তৎক্ষণাৎ আদালতে জমা করে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। লঙ্‌ মুক্তি পেলেন, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন আরো জ্বলে উঠল—'নীলদানব'কে শৃঙ্খলিত করে তবেই তা শান্ত হয়েছিল।

'নীলদর্পণ' নাটক

'নীলদর্পণ'-এ নাট্যরসসৃষ্টির চেয়ে অসহায় চাষীদের যন্ত্রণাকে তপ্ত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল। ফলে, অনেক সময়ে দুর্ঘটনা, উৎপীড়ন ও পৈশাচিকতার আত্যন্তিক চিত্রণ সহজ রসবোধকে ক্লিষ্ট করেছে। নাটকের সংলাপ ও ঘটনাবিন্যাসেও শিল্পদক্ষতার পরিচয় স্পষ্ট নয়। ভাষা কোনো স্থলে অতি গ্রাম্য, কোথাও-বা কৃত্রিম আলংকারিতার আড়ম্বরে অতিস্ফীত। মূল গল্পাংশও দ্বিধাবিভ ক। প্রথম অংশে রাইচরণ, সাধুচরণ, তোরাপ ইত্যাদি সাধারণ চাষী ও তাদের স্ত্রী-কন্যা-পরিবারের প্রতি নীলকর সাহেবদের পাশবিক পীড়নের উৎকট অথচ সম্পূর্ণ বাস্তব জীবনরূপ চিত্রিত হয়েছে। তাদের গ্রাম্য বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে আদিম সরলতায় ভরা চারিত্রধর্মকে লেখক ক্যামেরার মতো যথাযথ বিশ্বস্ততার সঙ্গে উদ্ধার করেছেন। গল্পের অপর অংশে আছে এক আদর্শ জমিদার পরিবারের কথা, অসহায় প্রজাদের নীলকর-পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা সমূলে বিনষ্ট হয়েছিলেন। জমিদার গোলোক বসু, তাঁর বড় ছেলে, তথা জমিদারির চালক আদর্শ যুবক নবীনমাধব, ছোট ছেলে কলকাতায় পাঠরত বিন্দুমাধব, গোলোক বসুর স্ত্রী ও দুই পুত্রবধূ সকলে মিলে অপূর্ব সুখের সংসার। তোরাপ ও রাইচরণকে অত্যাচার থেকে বাঁচাতে গিয়ে এবং রাইচরণের সন্তানসম্ভবা কন্যা ক্ষেত্রমণিকে উড্‌-এর পাশবিক পীড়ন থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নবীনমাধব সপরিবারে নীলকরদের রোষ-ভাজন হন। মিথ্যা মামলার দায়ে হাজতবাস করতে গিয়ে গোলোক বসু উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন ; নবীন বসু নীলকরদের অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রথমে আহত ও পরে নিহত হন। তাঁর শোক-উন্মাদিনী জননী উন্মত্ত হয়ে কনিষ্ঠা বধূকে গলা টিপে হত্যা করেন, তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে কৃতকর্মের যন্ত্রণায় নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। 'নীলদর্পণ'এর চাষী ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের কণ্ঠে তাদের নিজেদের ভাষার হুবহু প্রতিরূপ গড়ে তুলেছেন দীনবন্ধু; স্থানেস্থানে তা শিক্ষিত সমাজের পক্ষে দুর্বোধ্য, এমনকি মাঝে মাঝে অশালীনও। তেমনি ভদ্রসমাজের জন্য তিনি যে সংলাপ রচনা করেছেন, তা কৃত্রিম এবং হাস্যকররূপে অলংকার-কণ্টকিত। তবু 'নীলদর্পণ' সফল সৃষ্টি; জীবনের নাট্যরূপ রচনার দক্ষতায় নয়—নাটকের আধারে সমকালীন জাতীয় জীবন-যন্ত্রণাকে জীবন্ত রূপ দিতে পারার সার্থকতায়।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী'তেও (১৮৬৩) দু'টি গল্প পাশাপাশি প্রবাহিত—একটি কল্যাণ-পরিণামী রোমান্টিক প্রণয়-কথা, অপরটি স্থূলতা-ধর্মী অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জীবন-কাহিনী। দ্বিতীয়োক্ত গল্পটিই নাটকে জমেছে বেশি, যদিও তাতে দীনবন্ধুর রসিকতা স্থূল আদিরসকে আশ্রয় করেছে বারে বারে।

'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) দীনবন্ধুর লেখা প্রহসন ; নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিনষ্টিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এতে। নিমচাঁদ চরিত্রে মধুসূদনের ব্যঙ্গ-প্রতিরূপ অঙ্কিত হয়েছে বলে একদা অনুমান করা হয়েছিল ; দীনবন্ধু অবশ্য সে অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর অন্যান্য নাট্য রচনার মধ্যে আছে, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'লীলাবতী নাটক' (১৮৬৭), 'জামাই

দীনবন্ধুর অপরাপর রচনা

বারিক' (১৮৭২) ও 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)। সাতখানি নাটকের সঙ্গে দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ 'সুরধুনী কাব্য' ও 'দ্বাদশ কবিতা',—সর্বমোট এই তিনখানি কবিতাপুস্তকও লিখেছিলেন দীনবন্ধু। দ্বিতীয় খণ্ড 'সুরধুনী কাব্য' প্রকাশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর পরে।

মধুসূদনের পরেই নাটকে আর এক নূতন সুরের সৃষ্টি করেছিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ; মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাট্যপ্রবাহের ইতিহাসে তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্বসূরী—প্রায় গুরু-কল্প। কালের দিক থেকে মনোমোহন বঙ্কিমোত্তর শিল্পী। তাঁর প্রথম রচনা 'রামাভিষেক' নাটক (১৮৬৭) প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশের পরে। কিন্তু ভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ঈশ্বর গুপ্তের মতো তাঁর শিল্পিমানস পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতীচ্যধর্মী 'থিয়েটার'-এর রূপাধারে তিনি বাঙালির নাট্যস্বভাব-সমুচিত যাত্রা শিল্পকে নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন। লেখক নিজে বলেছেন,—"ভারতবর্ষ যে য়ুরোপ নয়, য়ুরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, য়ুরোপীয় রুচি ও স্বদেশীয় রুচি যে সম্যক পৃথক পদার্থ", এ-সব কথা জেনে তবেই বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হওয়া উচিত। মনোমোহন নিজে তা করেছিলেন, আর এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা। এ পর্যন্ত বাংলা নাটক প্রধানত পারিবারিক বা ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত বিদগ্ধমনের সহচারিতা করেই ঐসব নাট্যরচনা সফল হয়েছিল। কিন্তু, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির রস-বাসনাকে চরিতার্থ করাই হয়েছিল প্রধান উদ্দেশ্য। আর মনোমোহন বুঝেছিলেন, বাঙালির জাতীয় প্রবণতা ঘটনা-শ্লথ, আবেগস্ফীত, সংগীতপ্রধান যাত্রা-রস আস্বাদনের অভিমুখী। প্রথম নাটক 'রামাভিষেক'-এ তিনি এই প্রবণতার পরিপোষণে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের যথার্থ জন্ম এখানেই ; পরে গিরিশচন্দ্র এই নাট্য-ধারায় নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

নাট্যকার মনোমোহন

মনোমোহনের অন্যান্য পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে আছে,—'সতী' নাটক (১৮৭৩) 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক (১৮৭৫), 'পার্থ পরাজয়' নাটক (১৮৮১), 'রাসলীলা' নাটক (১৮৮৯) ও 'আনন্দময়' নাটক (১৮৯০)। এইসব নাটকে ভক্তি-প্রাধান্য ও ধর্মানুরক্তিই একমাত্র বড় কথা নয়; সেই সঙ্গে স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপনাও ছিল প্রবল। মনোমোহন হিন্দুমেলা, তথা বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ঊষালগ্নে নবজীবনের চারণ ছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে গান ও সংলাপ উভয়ের মধ্যেই পরাধীনতার বেদনা ও আত্মমোক্ষণের প্রতিশ্রুতি দীপ্ত হয়ে আছে।

রচনাপঞ্জী ও নাট্যধর্ম

'প্রণয় পরীক্ষা' নামে মনোমোহন একটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন; তাঁর লেখা একমাত্র প্রহসনের নাম 'নাগাশ্রমের অভিনয়'। এ ছাড়া তাঁর পদ্য রচনাও ছিল বিচিত্র রকমের,—শিশুকবিতা, ঈশ্বর-গীতি থেকে আখড়াই, পাঁচালি, বাউল, টপ্পা,—এমন কি সামাজিক ও রাজনৈতিক গান ইত্যাদি। 'দুলাল' নামে একখানি ঐতিহাসিক 'নবন্যাস'ও তিনি লিখেছিলেন; 'সংবাদ বিভাকর' এবং 'মধ্যস্থ' নামে দু'খানি পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন।

অন্যান্য রচনা

সেকালের বাংলা নাটকে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন মনোমোহন বসু, আর রাজকৃষ্ণ রায় তাতে যোগ করলেন নতুন আঙ্গিকের পরিচ্ছন্নতা। কবিতার ক্ষেত্রেও দেখেছি, রাজকৃষ্ণ রায় ছন্দ ও রূপ-কর্ম নিয়ে সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'পদ্য পৌংক্তিক' গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্যের কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। নাটকের ক্ষেত্রে

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ

'হরধনুর্ভঙ্গ'-তে (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) তিনি 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রথম সফল প্রয়োগ করেন, ইতিহাসের বিচারে নাট্যসংলাপে তথাকথিত গৈরিশছন্দের সার্থক পূর্বরূপ এখানেই সূচিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক, গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে ত্রিশখানারও বেশি নাটক লিখেছিলেন রাজকৃষ্ণ। তার মধ্যে জনপ্রিয়তার বিচারে সবিশেষ উল্লেখ্য পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'নরমেধ যজ্ঞ' ও 'অনলে বিজলী', ঐতিহাসিক নাটক 'বিক্রমাদিত্য'; আর 'কলির প্রহ্লাদ', 'জগা পাগলা' ইত্যাদি প্রহসন।

এ যুগের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখনীয় বিশেষ আর কেউ নেই। কেবল স্মরণ করতে হয়,

মহিলা বচিত প্রথম বাংলা নাটক

মহিলা রচিত প্রথম বাংলা নাটক এই সময়েই লিখিত হয়েছিল। ড সুকুমার সেন জানিয়েছেন, এই লেখিকার নাম ছিল কামিনীসুন্দরী দেবী, তাঁর প্রথম নাটক 'উর্বশী' রচিত হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এঁর লেখা আরো দু'খানি নাটকের নাম 'উষা' ও 'রামেব বনবাস'।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
চিন্তামূলক বাংলা গদ্য ও বাংলা উপন্যাস

মধুসূদনের প্রথম নাটক রচিত হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা'র রচনাকাল ১৮৬০। এর পরে মধুসূদন-প্রতিভার পূর্বাদর্শকে অনুসরণ করেই নবযুগের বাংলা কবিতা ও নাটক ক্রমবিকশিত হয়েছিল। অপরদিকে রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) প্রথম 'বক্তৃতা' গ্রন্থিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, আর প্রথম ভাগ 'ধর্মতত্ত্ব দীপিকা'র প্রকাশকাল ১৮৬৬। বাংলা গদ্যে মননশীল সুগভীর চিন্তার স্পর্শ লেগেছে এখানেই। আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকে যেমন মধুসূদন, তেমনি বাংলা গদ্য প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর মর্যাদা রাজনারায়ণ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। এঁরা দু'জনেই হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী, এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন-রাজনারায়ণ-ভূদেব প্রভাবিত এই যুগকে হিন্দু কলেজীয় যুগ বলতেও বাধা নেই। কারণ হিন্দু কলেজ-এর শিক্ষা ও রুচি সেকালের তরুণ মনে যে মুক্তি ও নবজীবন বোধের সঞ্চার করেছিল, সাহিত্যের সকল দিকে নবীন বিকাশের মূলেও ছিল সেই অভিন্ন প্রেরণা।

হিন্দু কলেজীয় যুগ

বাংলা সাহিত্যে রাজনারায়ণ-ভূদেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যথার্থ গদ্য প্রবন্ধের প্রথম প্রবর্তন। আগে বলেছি, গদ্য আটপৌরে জীবনের প্রয়োজন নির্বাহের ভষা। এই ভাষায় বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি, তথা বুদ্ধি ও হৃদয়-ধর্মের কর্ষণ তখনই সম্ভব হয়, মনন ও অনুভবের জাতীয় সামর্থ্য যখন শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ করে। বাংলা গদ্যে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার প্রথম স্পর্শ লেগেছিল রামমোহনের রচনায় ; অথচ ভাষা তখনো সুগঠিত হয় নি। অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে চিন্তামূলক গদ্য সুগঠিত হয়েছিল। তাহলেও বিদেশী জ্ঞানকে নিজ দেশের আয়ত্তগম্য করার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। মনীষী রাজনারায়ণের লেখায় বাংলা গদ্যে লেখকের নিজস্ব মৌলিক চিন্তার দোলা লেগেছিল। ভাবনা-গভীর গদ্য প্রবন্ধের জন্ম তাঁর হাতেই।

বাংলা প্রবন্ধের মুক্তি-রূপ

রাজনারায়ণের প্রবন্ধ ছিল বিচিত্র বিষয়ক। তাঁর রচনা-সংকলন 'বিবিধ প্রবন্ধ'-র রচনাভঙ্গিতেও বিষয়ানুমত বিচিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর বলা উচিত, 'আশ্চর্য স্বপ্ন', 'স্বদেশীয় ভাষানুশীলন', 'আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিচার'—ইত্যাদি সকল বিষয়কেই 'বিবিধপ্রবন্ধ'-র অন্তর্গত করা হয়েছে। তাঁর মুখ্য রচনাবলির মধ্যে আছে ঃ—

প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণ বসু

(১) 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫ ও ১৮৭০ খ্রি.)
(২) 'ধর্মতত্ত্ব দীপিকা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৬, ১৮৬৭)
(৩) 'আত্মীয় সভার বৃত্তান্ত' (১৮৬৭)
(৪) 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪)
(৫) 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের বৃত্তান্ত' (১৮৭৬)
(৬) 'বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮)

বাংলা প্রবন্ধের আঙ্গিক-গঠন আরো সুরেখ হয়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) হাতে। প্রাবন্ধিক হিশেবে রাজনারায়ণ বসুর চেয়ে ভূদেব অনেক বেশি সচেতন ছিলেন ; তাঁর বইগুলির নামকরণ থেকেও এ-কথা বোঝা যায়। এই রচনাপঞ্জীর মধ্যে আছে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪), 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ (১৮৯৪) ইত্যাদি। গ্রন্থগুলির নামের মধ্যেই রয়েছে বিষয়ের প্রকাশ। বাঙালির পরিবার, সমাজ, আচার-বিবেক ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আদর্শ ও কর্তব্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেছেন ভূদেব,—একের পর এক লিখেছেন প্রবন্ধাবলি। তাঁর চিন্তা ও বিচার অনেক সময়ে অতি-রক্ষণশীল বলে উপেক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু, গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে,—সুদৃঢ় বিশিষ্ট মতবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর প্রতিটি রচনার মূলে ছিল নিরপেক্ষ চিন্তা ও দূরযানী যুক্তি বিচারের প্রাঞ্জলতা। সে বিচার, এবং সে মনীষা, একালের পক্ষেও বিস্ময়কর।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধাবলি

প্রধানত প্রাবন্ধিক হিশেবেই সাহিত্যের ইতিহাসে ভূদেবের প্রতিষ্ঠা। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ উপন্যাসের লেখকও তিনি। তাঁর লেখা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৬-৫৭) দুটি গল্পের সমষ্টি। প্রথমটির নাম 'সফল স্বপ্ন',—দ্বিতীয়টি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। দুটি গল্প পরস্পর সম্পর্কহীন। লেখক জানিয়েছেন, 'Romance of History' নামক ইংরেজি গ্রন্থের প্রথম গল্পটি নিয়ে 'সফল স্বপ্ন' লিখিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টিরও গল্পাংশে ঐ বই-এর প্রভাব আছে। প্রথম লেখাটি একটি সরস উপাখ্যান, কোনো এক পথিকের জীবনে এক রাত্রির অসম্ভব স্বপ্ন কি আশ্চর্য রকমে সত্য রূপ ধরেছিল, তারই সকৌতুক বর্ণনা আছে এতে। দ্বিতীয় গল্পটি যথার্থ ঔপন্যাসিক রোমান্স-এর আকারে লেখা। ঔরঙ্গজিবের কন্যা রোসিনারাকে কৌশলে বন্দী করে আনেন শিবাজী ; ক্রমশ দুজনে দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন; এবং পরিণামী ত্যাগের সকরুণ মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রোসিনারার প্রেম ;—এইটুকু নিয়েই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর গল্প। এই কাহিনীর বহুলাংশের, বিশেষ করে রোসিনারা চরিত্রের, সফল ছায়াপাত ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে—আয়েষার চরিত্র কল্পনায়।

ঔপন্যাসিক ভূদেব

ভূদেবের গদ্য প্রবন্ধের ভাষা চিন্তাভার-সন্নত —গম্ভীর। কিন্তু তাঁর গল্পের ভাষা লঘু না হলেও রস-চঞ্চল। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ (১৮৯৫) এই শিল্পিজনোচিত দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছতা পেয়েছে। এ-সব ছাড়া ভূদেব বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলপাঠ্য গদ্য পুস্তকও লিখেছিলেন।

ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়াও এ-যুগে আরো কিছু কিছু গদ্য গল্প রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বাংলা ভাষার 'প্রথম উপন্যাস' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। আসলে এই বইটি, আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সেকালের সমাজ জীবনের ব্যঙ্গমূলক নক্সা বলেই গণ্য হওয়া উচিত। এ-ধরনের গদ্য রচনা প্রথমে গ্রন্থবদ্ধ করেছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) ও 'নববিবি বিলাস'-এ (১৮৩১?)। প্রথম ও শেষ গ্রন্থটি এ-বিষয়ে তাঁর সফলতম রচনা; প্রথমটিতে অশিক্ষিত, অর্থ-মত্ত, হঠাৎ-বাবুদের চারিত্রিক দৈন্যকে ব্যঙ্গের কষাঘাত করা হয়েছে; শেষগ্রন্থে আঘাতের কেন্দ্র ছিলেন 'নববিবি'রা, নববাবুদের স্বভাব-ফলের 'প্রধান মূল' যাঁরা।

'নববাবু' ও 'নববিবি বিলাস'

প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে; প্রথম সংস্করণে লেখক ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন— 'টেকচাঁদ ঠাকুর'। ড. সুকুমার সেনও বলেছেন, "বইটিকে প্রধানত নকশা বা চিত্রসমষ্টি বলা চলে।" সেকালের কলকাতার এক ধনী পরিবারের দুটি ছেলের বিনষ্টি ও জ্ঞানালোক সন্ধানের দু'টি পরস্পর-বিরোধী গল্পকে কেন্দ্র করে এর আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে ; পটভূমিতে আছে সেকালের বৃহত্তর সমাজ। এই গ্রন্থের আরো একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য—তথাকথিত সাধুরীতির গদ্য রচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। লোকমুখের 'চলতি' ভাষাকে এই গল্পে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। কিন্তু, ভাষা-শিল্পী হিশেবে এই রচনার জন্য তাঁকে অতিরিক্ত কোনো কৃতিত্ব দেওয়া চলে না। শুধু তাই নয়, মূল গল্পের গঠনেও শিথিলতা রয়েছে যথেষ্ট, সেকালের ভঙ্গুর জীবন-ধারার নক্সা হিশেবে যদিও অনেক জায়গার বর্ণনা বিচ্ছিন্নভাবে মূল্যবান।

প্যারীচাঁদ মিত্রেব 'আলালেব ঘবেব দুলাল'

মৌলিক স্রষ্টা হিশেবে প্যারীচাঁদের প্রতিষ্ঠা কোনো কোনো মহলে অতিস্ফীত হয়ে থাকলেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতা ছিল অনস্বীকার্য। এই তথ্যের অসংশয়িত পরিচয় রয়েছে 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎ কিঞ্চিৎ' (ঈশ্বর উপনিষদাদি বিষয়ক আলোচনা—১৮৬৫), 'ডেবিড্ হেযারেব জীবন-চরিত' ইত্যাদি গ্রন্থ-গ্রন্থিকায়। তাছাড়া, 'বামাবঞ্জিকা' (১৮৬০), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) ইত্যাদি কথোপকথন ও গল্পমূলক রচনা আসলে নীতি শিক্ষার ছলে লেখা। 'গীতাঙ্কুর' নামে তাঁর লেখা ব্রহ্মসংগীতেব একটি সংকলনও বয়েছে। আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া আরো একখানি ব্যঙ্গ নক্সা লিখেছিলেন প্যারীচাঁদ,—'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)।

প্যাবীচাঁদেব বচনাপঞ্জী

একদা 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার জন্য প্যাবীচাঁদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বলে সংবর্ধিত হয়েছিলেন। প্রথমত, আঙ্গিকের দিক থেকে 'আলাল' একেবারেই উপন্যাস গুণান্বিত নয়। তাছাড়া, আলোচ্য নক্সা জাতীয় ব্যঙ্গ-বাস্তবতাপূর্ণ রচনাশৈলীরও প্রথম প্রবর্তক প্যারীচাঁদ নন,—তাঁর অনেক আগেই ভবানীচরণ সমধর্মী একাধিক উল্লেখ্য রচনা লিখে প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি, মিসেস হ্যান্না ক্যাথেরীন ম্যুলেনস নাম্নী এক বিদেশিনী মহিলাও অনুরূপ সামাজিক নক্সা লিখেছিলেন প্যারীচাঁদের 'আলাল' রচনার আগে। গ্রন্থটির নাম 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)। লেখিকা খ্রিস্টধর্মের প্রচার-কারিণী ছিলেন। ভারতীয় খ্রিস্টান সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর জীবনযাত্রার নক্সাই এতে সহৃদয়তার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।

'ফুলমণি ও করুণাব বিবরণ'

এসব ছাড়াও, প্যারীচাঁদের ব্যঙ্গ-নক্সা রচনার চেষ্টা প্রথম শ্রেণীর সফলতা দাবি করতে পারে না ; তাঁর প্রচেষ্টার পরিণততর সিদ্ধি ঘটেছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোমপ্যাচার নক্সা'-য়। এই বই-এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে; পরে দুইভাগে একত্র করে প্রকাশ করা হয়। কালীপ্রসন্ন ছিলেন বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল। নিজের তেরো বছর বয়সে, বাংলা-ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি বিদ্যোৎসাহিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ; এই সভা পরবর্তী কালে কবি মধুসূদন, ও 'নীলদর্পণ' প্রকাশক জেমস্‌ল ঙকে সম্বর্ধিত করে ঐতিহাসিক কীর্তি অর্জন করেছিল। সর্বস্ব পণ করে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের গদ্যানুবাদ করিয়ে কালীপ্রসন্ন বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী এই মূলানুবাদ কর্মে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের পুরোধা হয়েছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আট-নয় বছরের একান্ত পরিশ্রমের পরে দুই

কালীপ্রসন্ন সিংহ

খণ্ডে এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয় ; প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৬৬।

বিদ্যোৎসাহিণী সভার অনুষঙ্গ হিশেবে বিদ্যোৎসাহিণী থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে অভিনয়ের জন্য কালীপ্রসন্ন প্রথমে 'বিক্রমোর্বশী নাটক' অনুবাদ করেন ; পরে লিখেছিলেন পুরাণাশ্রিত নাটক 'সাবিত্রী সত্যবান'। 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একখানি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। সেকালের কলকাতার সমাজ, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বণ, সভাসমিতি ইত্যাদি জীবনের বিচিত্র দিকে যে-সব অসংগতি এবং কুশ্রীতা সঞ্চিত হয়েছিল, হুতোম তাদের সব-কিছুর ওপর ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছিলেন। এমন কি, সমকালীন সমাজের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নৈতিক দুর্বলতার ওপরেও তাঁর আঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাতে ঘরে-পরে অকারণ নিন্দার বোঝা সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর জীবনে প্রচুর। তবু, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য সুচির প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখ্য উপাদান এর ভাষা। আগাগোড়া বইটি কলকাতার লোক-সাধারণে প্রচলিত কথ্য ভাষায় লেখা। তাতে চলিত বাংলার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিও অনেক স্থলে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ও অপরাপর রচনা

হুতোমের নক্সা, ব্যঙ্গরীতি এবং ভাষাপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে বহুজনের অনুকরণীয় হয়েও উঠেছিল। এইসব অনুসরণকারীদের মধ্যে হুতোমের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৬)। প্রথম গ্রন্থ 'সমাজ চিত্র' (১৮৬৫) তিনি নিশাচর ছদ্মনামে প্রচার করেন এবং 'সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয় শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাস মহাশয়েষু' উৎসর্গ করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ রূপে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১৯০৪) স্মরণীয়। এর প্রথম সংস্করণ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়, 'এই এক নূতন! আমার গুপ্ত কথা' নামে। এই গ্রন্থের লেখক হিশেবে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল শোভাবাজারের উপেন্দ্রকৃষ্ণদেব বাহাদুরের নাম।

আলোচ্য যুগের গদ্যরচনার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে মধুসূদনের 'হেক্‌টর বধ'-এর উল্লেখ না করলে। এটি 'ইলিয়াড্‌' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। সুর ও ভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই রচনাটিতে মধুসূদন বাংলা গদ্যের এক অননুকরণীয় ওজস্বী রূপ গড়ে তুলেছিলেন। অথচ সে-ভাষার হৃদ্যতাও কিছু কম নয়।

হেক্‌টর বধ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসের জন্ম-যুগ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে নূতন গতির দোলা লেগেছিল, তার প্রথম পদসঞ্চার মধুসূদনের কাব্য-কবিতায়; দ্বিতীয় দৃঢ়তর পদক্ষেপ বঙ্কিমের উপন্যাস সাহিত্যে। উপন্যাস-কলাকে সাধারণভাবে আধুনিক জীবনের শিল্পরূপ বলা হয়ে থা.ক। এদিক থেকে তার ভাব-উপাদান প্রধানত দুটি :—(১) মধ্যযুগের আবেগ-ভক্তি প্রধান নির্বিচার আদর্শবাদের প্রতি সংশয়, এবং (২) নূতন আত্ম-প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন-বিচারের আকাঙ্ক্ষা। মধুসূদনের কাব্যে অন্ধ পুরাতন-প্রীতির প্রতি ক্ষোভ এবং নবীনের প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ অবারিত হয়েছে। তাহলেও, পুরাতনকে ছাড়তে চাইলেই তার বাঁধন কিছু আলগা হয়ে যায় না। নূতনকে কামনা করা মাত্রই তা করায়াত্তও হয়ে পড়ে না। এই দুয়ের টানা-পোড়েনের দ্বন্দ্বে উনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে নব্য বঙ্গের জীবনধাবা তরঙ্গক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন সেই ঝড়ের আঘাতে জর্জরিত। সেকালের ইতিহাস সন্ধান করলে দেখব,—আদর্শ-সংঘাতের একই বিপর্যয় আরো বহু শিক্ষিত তরুণের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। বাংলার জীবন বিকাশেব এই সমস্যা-জটিল অনুকূল প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস বচনাব পথ উন্মোচিত করেন। আধুনিক জীবন যে-পরিমাণে উন্নত, সেই পরিমাণেই পরস্পর-বিরোধী উপাদান ও আদর্শের সংঘাতে কণ্টকিত। যে সভ্যতা যত অগ্রসর, পথেব কাঁটা তুলে এগিয়ে যাবার দক্ষতা এবং কৌশল-ও তার তত বিচিত্র। আর আধুনিক জীবন-সম্ভব উপন্যাসের শৈলী জীবনের এই দ্বন্দ্ব-জটিলতা-বৈচিত্র্যের সমন্বয়-গুণেই বাস্তব,—যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ। বাংলাদেশের নবজাগ্রত জীবনধর্মকে তার জটিলতা-সমুখ সম্পূর্ণতায় রূপ দিতে চাওয়ার আগ্রহবশে বঙ্কিমের হ · তে প্রথম জন্ম নিল সার্থক বাংলা উপন্যাস-কলা। এর আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ রোমান্টিক উপন্যাসের সফল অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তারই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটেছে নানা দিক থেকে।

বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র

'দুর্গেশনন্দিনী',—তথা প্রথম দুই পর্বে লেখা বঙ্কিম-উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে সেকালের সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা-জটিলতা। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। তারপরে পর পর দেখা দেয় 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। এই তিনখানি গ্রন্থ বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রথম পর্বের অন্তর্গত। দ্বিতীয় পর্বে আছে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৫) 'রজনী' (১৮৭৭) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)। ওপরের তালিকায় বিভিন্ন রচনাবলির গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশের কালই উল্লিখিত হয়েছে; এর আগে দ্বিতীয় পর্বের এই প্রায় সব কয়টি গ্রন্থই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিম-উপন্যাসের তৃতীয় পর্যায়ে সমাজ-বিপ্লবের উদ্যোগকেও ছাপিয়ে প্রধান হয়েছিল শিল্পীর রাজনৈতিক সচেতনতা, তথা স্বদেশ ও স্বধর্মপ্রেম। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২),

বঙ্কিম-উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়

'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৮) এই পর্যায়ের উপন্যাস-ত্রয়ী। 'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সর্বশেষ উপন্যাস; তাঁর একমাত্র সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে, 'আনন্দমঠ'-এর একই বছরে। শ্রেণীগত বিচারে 'রাজসিংহ' বঙ্কিম-উপন্যাসের জগতে একক। তাহলেও ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে শিল্পীর বিঘোষিত স্বদেশ ও স্বধর্মপ্রীতির প্রভাব তাতেও প্রতিফলিত।

বঙ্কিম-উপন্যাসের জীবন-প্রচ্ছদ

বঙ্কিমের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস-ত্রয়ীকে রোমান্স বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আগে বলেছি, এখানেই সমকালীন জীবন-সমস্যার প্রথম পরিস্ফুট ছায়াপাত ঘটেছে। রামমোহন রায়ের হাতে উনিশ শতকের নবীন জীবন-বিপ্লবের শুরু। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী চেষ্টা ও হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল তরুণ ছাত্রদলের উদ্দীপনা,—সব কিছু মিলে এই বৈপ্লবিক প্রবণতার উদ্‌যাপন সম্ভব হয়েছিল। আর, প্রথম থেকে লক্ষ করেছি, এ-যুগে নবজাগরণের বৈপ্লবিক অভিযান আগাগোড়া ছিল নারী-কেন্দ্রিক। বস্তুত মধ্যযুগের বিপর্যয়-কালে নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং তার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা, দুই-ই প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। সতীদাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তন, নারীর উত্তরাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, নারী-শিক্ষার প্রবর্তন, ইত্যাদি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত সমাজে নারী-ব্যক্তিত্বের নূতন উন্মোচনের পথ ক্রম-উৎসারিত হতে আরম্ভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগে সাহিত্য রচনা করেন, তখন থেকেই নগর-বাংলায় ইংরেজি শিক্ষিত নারীসমাজে ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহ সূচিত হতে থাকে। তাতেই ক্রমশ দানা বাঁধছিল নানা অজ্ঞাতপূর্ব জটিলতার পূর্ব-সম্ভাবনা। একদিকে পুরাতন সমাজব্যবস্থায় নারীকে মাতা-কন্যা-বধূ-প্রিয়া রূপে পুরুষের প্রয়োজনলগ্ন করে রাখার আবহমান আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে স্বাতন্ত্র্য-সচেতন নারীর আত্মমর্যাদার দাবি ; এই দুয়ের সংঘাত-সমস্যা ক্রমেই দুরপণেয় হয়ে উঠতে পারত। সেই জীবন-সমস্যাকেই বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে সামগ্রিক ভাবে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। এদিক থেকে অনেকটা পরিমাণে তিনি ছিলেন অনাগত-বিধাতা। জীবন নিয়ে যে আলোড়ন যুগ-চেতনার সীমান্তে এসে পৌঁছেছিল, অথচ যার পূর্ণ প্রকাশ তখনও ঘটেনি,—বঙ্কিম সেই গোপন সম্ভাবনার অতলে ডুব দিয়েছিলেন—অনাগত সমস্যার সমাধান কামনা করে।

'দুর্গেশনন্দিনী'

'দুর্গেশনন্দিনী'তে এই জীবন-সমস্যা কল্পনা-সঞ্জীবিত রোমান্স-এর আকার পেয়েছে। তিনটি নারী চরিত্রের জীবন-জটিলতাকে কেন্দ্র করে গোটা গল্পটির বহিরঙ্গ গতি তরঙ্গিত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেগবান ও সক্রিয় চরিত্র বিমলার। অভিরাম স্বামীর কানীন কন্যা বিমলা ; শূদ্রাণী গর্ভজাত। অথচ অভিরাম স্বামীর দুর্লভ প্রতিভার সফল উত্তরাধিকারিণী সে। অভিরাম-শিষ্য রাজা বীরেন্দ্র সিংহ তার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু অসামাজিক উৎসসম্ভবা একটি নারীকে রাজবংশের কুলবধূত্বে বরণ করবেন কী করে? যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কারের বাধাকে বঙ্কিম এখানে অতিক্রম করতে চেয়েছেন নবযুগের পক্ষ থেকে। বীরেন্দ্র সিংহের লোভাতুরতার কড়িকাঠে বিমলার নারীত্বকে তিনি বলি দেন নি। বৈধ বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদের মিলিত করেছেন। কেবল সমাজের মুখ রক্ষার জন্য বীরেন্দ্র সিংহের জীবৎকাল পর্যন্ত এই গোপন বিবাহ-কথা অপ্রকাশিত থেকেছে। অন্যপক্ষে, বীরেন্দ্র সিংহের একমাত্র কন্যা তিলোত্তমাও অসামাজিক উৎস-জাতা। বীরেন্দ্র সিংহের প্রথমা স্ত্রী, তিলোত্তমার মৃতা জননীও ছিলেন অভিরাম স্বামীরই অবৈধ সন্তান। দুর্গেশনন্দিনী-তিলোত্তমাও বীরেন্দ্রসিংহের শত্রু-পুত্র জগৎসিংহের মধ্যে গোপন প্রণয়, এবং

পিতৃবন্দী জগৎসিংহের কাছে নবাব-কন্যা আয়েষার গোপন আত্মসমর্পণ ; সবকিছু মিলে যেমন গল্পের, তেমনি সমকালীন জীবন-জটিলতার একটি রূপরেখাও উদ্ঘাটিত হয়েছে। নিজের কালের জীবনের এই অনুদ্গত সমস্যাকে নিয়ে বঙ্কিম ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়েছেন। ঐতিহাসিক পরিবেশ বা তথ্যযোজনা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় ; কিন্তু অতীতের বৃহৎ প্রচ্ছদকে শিল্পী তাঁর কল্পনার অবাধ মুক্তির ভিত হিশেবে সফল ব্যবহার করেছেন। এখানেই রোমান্সের যথার্থ উৎস। আয়েষা-জগৎসিংহ-কাহিনীতে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর ক্ষুদ্রপরিসর গল্প সামগ্রিকতা পেয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা'য় মোগল হারেমের রঙ্গিণী মতিবিবি এবং আবাল্য যোগিনী কপালকুণ্ডলার নারীজীবনের দ্বন্দ্ব নবকুমারের নিষ্ক্রিয় পৌরুষকে আশ্রয় করে রোমান্স-নিবিড় হয়ে উঠেছিল। 'মৃণালিনী'-তে বাংলার প্রথম পরাধীনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারী-প্রণয়ের বিচিত্র রোমান্সের ছবি আঁকা হয়েছে মৃণালিনী-হেমচন্দ্র আর পশুপতি-মনোরমার জীবন-কথা নিয়ে। বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের মৌল প্রবণতা ছিল দুটি বিশেষ পথে ঃ— (১) সমকালীন সমাজ-জীবন-সচেতনতা, এবং (২) স্বদেশের অতীত ঐতিহ্য-প্রীতি ও তাৎকালিক পরাধীনতার বেদনাবোধ। প্রথম ক্ষেত্রে বঙ্কিম ছিলেন যুক্তি-চিন্তাশীল বিচারক, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছিলেন স্বপ্নাবেগ-প্রবণ কবি। এই দ্বিবিধ প্রবণতারই অঙ্কুর উঁকি দিতে দেখি প্রথম পর্যয়ের উপন্যাস ত্রয়ীতে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্কিমের সমাজ-চিন্তা পূর্ণতর রূপ ধরেছে উপন্যাসের ক্রমবিকশিত পরম্পরাসূত্রে। তৃতীয় পর্যায়ে কবি-বঙ্কিমের স্বদেশ-প্রেমস্বপ্ন চিত্রিত হয়েছে—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—'রোমান্সের আতিশয্য'-র মধ্য দিয়ে।

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'

দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসধারার মুখবন্ধে রয়েছে 'চন্দ্রশেখর'। এক সন্ধিলগ্নের সমাজ-জীবনের শিল্পী হিশেবে বঙ্কিম এখানে দুঃসাহসী। চন্দ্রশেখরের মতো বরেণ্য পুরুষের গৃহ ত্যাগ করেছে তাঁর বিবাহিতা পত্নী শৈবলিনী। চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী ভক্তি করে তার নারীমনের আন্তরিকতায় ; কিন্তু ভালোবাসে সে বাল্যসঙ্গী প্রতাপকে, সামাজিক নিয়মে যার সঙ্গে তার বিবাহ নিষিদ্ধ। নারীহৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির দ্বন্দ্ব, সধবা নারীর পতিগৃহ ত্যাগ, ইত্যাদি নানা দিক থেকে বঙ্কিম এই উপন্যাসে বিপ্লবের দূরতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু নারীর স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বীকার করেও সমাজ-শৃঙ্খলার বিরোধিতায় প্রশ্রয় দিতে শঙ্কিত হয়েছেন। তাই মানসিক বিকার ও পুনঃসংবিৎ লাভের পরে শৈবলিনীকে পতিগৃহে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। এখানে বঙ্কিম-রচনায় দ্বৈধ রয়েছে; ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-কল্যাণের মহৎ আদর্শ—দুয়ের মধ্যে ভারসম সামঞ্জস্য বিধানের দিকে ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাতে উপন্যাসের পরিণতিতে জটিলতা এবং অস্পষ্টতাও দেখা দিয়েছে, এমন অভিযোগ করে থাকেন কেউ কেউ। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ সপত্নীক যুবক এবং বিধবা যুবতীর প্রণয়-দ্বন্দ্বের সামাজিক-পারিবারিক জটিলতার জীবনরূপ চিত্রিত হয়েছে সবিস্তারে। আর এখানেও বিশেষ করে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমের কল্যাণ-পরিণামী জীবন-বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সকল সমস্যা-জটিলতাকে ছাপিয়ে। 'রজনী'র অভিনব উপন্যাস-দেহে এই জীবন-বিশ্বাসের প্রথম প্রকাশ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসাবলী

এই পর্যায়ের আন্য রচনা 'ইন্দিরা' ও 'রাধারাণী' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়—উপন্যাস-ধর্মী বড় গল্প। এই গল্প দুটির রোমান্টিক প্রণয়-পরিবেশেও সমকালীন জীবন-চেতনার ছাপ অস্পষ্ট নয়।

'রাজসিংহ', আগে বলেছি, বঙ্কিমের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন-এ লেখক নিজেই এ-কথা স্বীকার করেছেন,—"আমি পূর্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই।...এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজীবের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শিল্পীবঙ্কিম এই উপন্যাসে একটি অখণ্ড-সফল জীবনরূপ এঁকে তুলেছেন। আর এই উপন্যাসেই তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্বের অপর একটি উপাদান—জাতীয় গৌরববোধ প্রথম প্রকট হয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই 'বিজ্ঞাপন'-এ আবার লিখেছেন,—"ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার পূর্বে কখনো লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।"

'রাজসিংহ'

বঙ্কিমের এই স্বদেশভক্তি রাজনৈতিক বিপ্লব কামনার সার্থক রূপ পেয়েছে 'আনন্দমঠ'-এ। একদা 'আনন্দমঠ'-এর ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। বঙ্কিম নিজে বইটির ঐতিহাসিকতার কথা অস্বীকার করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর কাহিনী, বিন্যাস ও জীবন-কল্পনা সবকিছুই বঙ্কিমের সৃজনী প্রতিভার রচনা। ড. যদুনাথ সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "তাঁহার [বঙ্কিমের] সন্তানেরা বাঙালি ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব সন্ন্যাসী ফকীরেরা সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐসব অত্যাচার করে, তাহারা কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক, এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আসল 'সন্ন্যাসীরা' ছিল শৈব।" স্পষ্টই দেখছি, বঙ্কিম নবীন যুগের নতুন মানস ধর্মের বিপ্লবী রূপ আঁকতে চেয়েছেন গীতার সুপ্রাচীন হিন্দু আদর্শবাদকে আশ্রয় করে। এখানেই ছিল তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবোধের উৎস। আর 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী,' 'সীতারাম' এই উপন্যাসত্রয় পাঠ করলে দেখব,—বঙ্কিম গীতার কর্ম-সন্ন্যাসের আদর্শের সঙ্গে প্রতীচ্যের প্রত্যক্ষবাদ ও হিতবাদ-এর আদর্শ যোগ করে তাঁর নবমানবতার কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এ সেই হিন্দু মনুষ্যত্বের বৈপ্লবিক রূপ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। 'দেবীচৌধুরাণী'তে দেখি সেই আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণরূপ; 'দেবীরাণী' প্রফুল্ল বঙ্কিম-কল্পনার আদর্শ কর্ম-সন্ন্যাসিনী। সীতারাম কর্মবীর হয়েও কর্মযোগ ভ্রষ্ট ; তাই তিনি হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থকাম। সমাজ-দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সংঘাতের মূল-ভূমিতে বাঙালির নবজীবন-সম্ভাবনার যে-অঙ্কুরটি ঔপন্যাসিক বঙ্কিম একদা খুঁজে পেয়েছিলেন, ত্যাগপূত কল্যাণব্রতের পুণ্যালোকে নিষিক্ত করে কবি বঙ্কিম তার ভাবী পূর্ণতার স্বপ্ন দেখেছেন এই শেষ উপন্যাস তিনটিতে।

বঙ্কিম-উপন্যাসের পরিণামী পর্যায়

বঙ্কিমের পরেই এ-কালের উপন্যাস-লেখক হিশেবে উল্লেখ্য শিল্পী তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গল্প বলার এক অদ্ভুত দক্ষতা ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের। তাঁর লেখাগুলিও প্রায়ই "কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া।" সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রচনাভঙ্গিতে রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রথম উল্লেখ্য উপন্যাস 'কণ্ঠমালা'-র প্রকাশ-কাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। এর আগে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় দুটি গল্প, 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'। 'মাধবীলতা' প্রথম গ্রন্থরূপ পেয়েছিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। 'জাল প্রতাপচাঁদ' ঐতিহাসিক রচনা হলেও সঞ্জীবচন্দ্রের বলার ভঙ্গিতে গল্পরসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভ্রমণ কাহিনী 'পালামৌ' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

সঞ্জীবচন্দ্র

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বঙ্কিমাকনুজ পূর্ণচন্দ্রেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর লেখা 'মধুমতী' বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ ছোটগল্প। 'শৈশবসহচরী' নামে একখানি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন।

প্রথম বাংলা ছোট-গল্প ও পূর্ণচন্দ্র

বঙ্কিম-যুগে বঙ্কিম-অনুরাগী ঔপন্যাসিকদেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক পণ্ডিত রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল দূরপ্রসারী। বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে আহ্বান করে এনেছিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমের পুনঃপুন পীড়াপীড়িতেই তিনি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন—এ-কথা নানা-ভাবে স্বীকার করেছেন রমেশচন্দ্র নিজে। তাঁর রচনাভঙ্গিতেও বঙ্কিমানুসরণের ছাপ স্পষ্ট।

বমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন, আর দুখানি লিখেছিলেন সামাজিক উপন্যাস। প্রথম দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) ও 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭) রচনা হিশেবে দুর্বল। 'বঙ্গবিজেতা'র বিষয়বস্তু আকবর-এর সময়কার ; গল্পের ঐতিহাসিক অংশের নায়ক টোডরমল্ল। কিন্তু তার আর একটি অংশ বঙ্কিম-অনুসারী রোমান্স-চিত্রণে উচ্ছ্বসিত। প্রথম অংশ যেমন ঐতিহাসিকতায় অতি-ভারাক্রান্ত, দ্বিতীয়াংশ তেমনি অতি-কল্পনায় স্ফীত। দুটি গল্প কোথাও একত্র-বদ্ধ হতে পাবে নি।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

'মাধবীকঙ্কণ'-এ পারিবারিক জীবনের রূপায়ণই মুখ্য, ইতিহাসের প্রেক্ষাভূমি গৌণ। শাজাহানের শেষ বয়সে তাঁব রাজ্যলোভাতুর পুত্রদেব প্রস্তুত বিপ্লবের স্রোতে দৈবাৎ ভেসে গিয়েছিলেন গৃহত্যাগী নায়ক নরেন্দ্র। মূল গল্পাংশে হেমলতা-নরেন্দ্র-শ্রীশচন্দ্রের প্রণয়-দ্বন্দ্ব রোমান্স-ঘন হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিশেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৮৮) অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটির গল্প-পটভূমি গড়ে উঠেছে শিবাজী-সমকালীন মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের প্রভার্ত-উজ্জ্বলতায়। দ্বিতীয়টির ঐতিহাসিক প্রচ্ছদ রচিত হয়েছে প্রতাপ সিংহোত্তর রাজপুত জীবনের সন্ধ্যালগ্নে। দুটিরই ঐতিহাসিক জীবন-ভূমিকে আলোকিত করে তুলেছে একান্ত প্রাসঙ্গিক রোমান্স-ঘন স্বপ্নাকুলতা।

রমেশচন্দ্রের দুখানি সামাজিক উপন্যাসের নাম 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। 'সংসার'-এ গ্রামীণ চাষী জীবনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে · চনার আকৃতি ও প্রকৃতি যথার্থই দুর্বল। উপন্যাস হিশেবে 'সমাজ' অপেক্ষাকৃত সংহত, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেই রমেশচন্দ্রের কীর্তি স্মরণীয় হয়ে আছে।

বমেশচন্দ্রেব সামাজিক উপন্যাস

বঙ্কিমানুব্রতী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) চিত্তাকর্ষক ভাষাশৈলী এবং বাস্তব তথ্যচিত্র-বর্ণনার সাফল্যে একদা বহুল জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'কাঞ্চনমালা', 'বেনের মেয়ে' তাঁব স্মরণীয় উপন্যাস-সৃষ্টি।

হবপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্কিমযুগে সামাজিক উপন্যাসের লেখক হিশেবে বঙ্কিম-প্রতিস্পর্ধী খ্যাতি লাভ করেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। বঙ্কিম-উপন্যাসে সাধারণত ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ বা মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনরূপ প্রাধান্য পেয়েছে। তারকনাথ লিখেছিলেন অর্ধ বা অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামীণ বাঙালির জীবনকথা। বহুলাংশে এই বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্যই তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'স্বর্ণলতা' (১২৮১ বাংলা সাল) সেকালে একান্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্লট, চরিত্র, অথবা অখণ্ড জীবন-বোধ সৃষ্টিব দক্ষতায় 'স্বর্ণলতা'

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায

কেন, তারকনাথের কোনো রচনারই ঔপন্যাসিক আঙ্গিক সুদৃঢ় নয়। তবে, সমকালীন জীবনের একটি অনুপুঙ্খ নক্সা-রূপ একান্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বিকশিত হয়েছে তাঁর আগাগোড়া রচনায়। মাঝে মাঝে কৌতুক-সরসতাও বেশ দীপ্ত। ফলকথা, শিল্পশৈলীর উৎকর্ষ নয়, জীবন-রূপের অভিনবতা, এবং আংশিক নিবিড়তাও, তারকনাথের রচনাবলিকে একদা হৃদ্য করে তুলেছিল। 'স্বর্ণলতা' ছাড়া এই রচনাপঞ্জীতে রয়েছে 'হরিষে বিষাদ' বা 'নায়ক-নায়িকা শূন্য উপন্যাস' (১৮৯৮) ও 'অদৃষ্ট' (১৮৯২)। 'বিধিলিপি' নামে একখানি উপন্যাস লেখকের মৃত্যুকালে অসমাপ্ত হয়েছিল। 'তিনটি গল্প' আসলে তিনটি গল্পেরই সমষ্টি।

বঙ্কিম-যুগে বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত আর একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। ইনি লিখেছিলেন ঐতিঃ'সিক উপন্যাস 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। বইটি দীর্ঘ দুইখণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিল।

প্রতাপচন্দ্রেব বঙ্গাধিপ পবাজয়

প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে; দ্বিতীয়খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৮৪। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের আগাগোড়া জীবন-কথা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটি ও অতিবিস্তার গ্রন্থটিকে যেমন প্রামাণিক করে তুলেছে, তেমন রসস্নিগ্ধ করতে পারেনি। এমন কি উপন্যাসের আকারে লিখিত হলেও বইটি সুখপাঠ্য নয়। প্রতাপচন্দ্রের লেখায় স্কট-এর ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাব প্রচুর।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ন-দিদি'। নারী-সুলভ স্পর্শকাতরতাকে রোমান্স-এর মাধুর্যে নিবিষ্ট করে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে

স্বর্ণকুমাবী দেবী

প্রথম সার্থক-কীর্তি মহিলা ঔপন্যাসিকও তিনিই। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে লেখা রোমান্স। অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'ছিন্নমূল', 'মালতী', 'হুগলীর ইমামবাড়া', 'কাহাকে?' ইত্যাদি ; সব কয়টিই রোমান্স-প্রধান লেখা। তা ছাড়া স্বর্ণকুমারীর ইতিহাসাশ্রিত রচনার মধ্যে আছে 'মেবার রাজ', 'বিদ্রোহ', 'ফুলের মালা' ইত্যাদি। আবো আছে 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী', 'মিলন বাত্রি' ও 'স্বর্ণলতা'। শেষোক্তটির প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,—"বাঙালি সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।"

এ-ছাড়া স্বর্ণকুমারী গল্প, কবিতা ও নাটকও লিখেছিলেন। বিখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পান্তের বোমান্টিক রহস্যজাল স্পষ্ট করার প্রয়াস নিয়ে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়। সেকালের একদল উপন্যাস পাঠকের একমাত্র উপভোগ্য ছিল গল্পরস। সেই কৌতূহল নিবৃত্তির অতি উৎকণ্ঠায় রোমান্স-এর রহস্য-

দামোদব মুখোপাধ্যায়

সুন্দরতাকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা ছিল না তাঁদের। সেই গল্প-কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে দামোদর বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র 'ক্রোড়পত্র' হিশেবে 'মৃণ্ময়ী' উপন্যাস (১৮৭৪) প্রথম লিখে প্রকাশ করেন। কপালকুণ্ডলা মৃণ্ময়ী হয়ে উঠেছেন, এ-খবর জেনেই গল্পামুদে একদল পাঠক খুশি হয়ে ওঠেন ; দামোদরের রচনা জনপ্রিয় হয়। উৎসাহিত হয়ে দামোদর এবার 'দুর্গেশনন্দিনী'র গল্প সম্পূর্ণ করে লিখলেন 'নবাবনন্দিনী বা আয়েষা'। গালগল্প লেখার ভাল হাত ছিল দামোদরের, কিন্তু রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচনার দক্ষতা ছিল না। তাঁর মৌলিক রচনাগুলি প্রায়ই অপরাধ-প্রধান ডিটেকটিভ গল্প-ধর্মী। অন্যান্যের মধ্যে দামোদর গ্রন্থাবলিতে রয়েছে 'বিমলা', 'দুই ভগিনী', 'জয়চাঁদের চিঠি', 'মা ও মেয়ে', 'কর্মক্ষেত্র', 'সোনার কমল', 'যোগেশ্বরী', 'অন্নপূর্ণা', 'প্রতাপসিংহ', 'নবীনা' ইত্যাদি। এ-ছাড়া ইংরেজ

লেখকের উপন্যাসের বঙ্গানুবাদও করেছিলেন দামোদর,—এদের মধ্যে 'কমল-কুমারী' স্কট-এর এবং 'শুক্লবসনা সুন্দরী' কলিন্‌স্‌-এর উপন্যাস অবলম্বনে লেখা। মহাভারতের গল্পাংশ নিয়ে একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন 'সুকন্যা' নামে।

শিবনাথ শাস্ত্রী

কবি ও প্রবন্ধ-লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী উপন্যাসও লিখেছিলেন কয়েকখানি ; এদের প্রায় কোনোটিই উপাখ্যানের পর্যায় ছেড়ে যথার্থ উপন্যাস নামের যোগ্য হয়ে ওঠে নি। এই রচনাপঞ্জীর মধ্যে আছে 'মেজবৌ' (১৮৭৯), 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়নতারা' (১৮৯৯) ও 'বিধবার ছেলে'।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

পল্লীবাংলার জীবন-চিত্রকে একদা একান্ত হৃদ্য করে এঁকেছিলেন ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ এঁকে লিখেছিলেন,—"আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে।...সরল মানব-হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে,—এবং সুখদুঃখ-পূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে নিরানন্দময় ইতিহাস, তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম-কাঠালের বাগান, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত ও সন্ধ্যা, এরি মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তরল কল-ধ্বনি, বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না নিয়ে যে মানবজীবন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।" শ্রীশচন্দ্রের শিল্পি-স্বভাব কবিগুরুর উক্তিতেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। এঁর চারখানি উপন্যাস হচ্ছে যথাক্রমে 'শক্তিকানন' (১৮৮৭), 'ফুলজানি' (১৮৯৪),'কৃতজ্ঞতা' (১৮৯৬) ও 'বিশ্বনাথ' (১৮৯৬)। 'ফুলজানি' উপন্যাসের দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

হাস্য-রসাত্মক কথাসাহিত্য

বঙ্কিমযুগের উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন সুর ও স্বাদের প্রবর্তন করেছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অথচ এঁরা দুজনেই ছিলেন একান্ত বঙ্কিম-ভক্ত। এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছি, বঙ্কিমের হাতেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম মুক্তি। আর বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্য প্রধানত গড়ে উঠেছিল সেকালের যুগসন্ধি জনিত জীবন-জটিলতার যন্ত্রণাভূমিকে কেন্দ্র করে। ফলে, কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলিতেই নয়, আলোচ্যকালের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র সাধারণভাবে ছড়িয়ে আছে এক গাম্ভীর্যের সুর,—গভীর জীবন-চিন্তার ভারে তা ভারাক্রান্ত। এই গভীরতার পরিবেশে সরস চঞ্চলতার সূত্রপাত করেন ইন্দ্রনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথের রচনা ছিল প্রধানত ব্যঙ্গরস প্রধান। তাঁর প্রথম গদ্য রচনা 'কল্পতরু' (১৮৭৪) বাংলার প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস বলে পরিচিত। লেখক নিজেই প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন, "আমি satire-টাকে বাঙালির উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম।" 'কল্পতরু'র satire ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রচনা করেছিল। এর আগে ইন্দ্রনাথের প্রথম satire রচিত হয়েছিল পদ্যে, নাম ছিল 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' (১৮৭০)। 'ভারত উদ্ধার'-ও পদ্যে লেখা,—সেকালের বাঙালির স্বদেশ-প্রেমের দুর্বলতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তাতে। 'ক্ষুদিরাম' গদ্যে লেখা গাল-গল্প, প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে।

এছাড়া, ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পরে 'পঞ্চানন্দ' 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐ সব রচনাকে একত্র গ্রথিত করে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'পাঁচু ঠাকুর' প্রকাশিত হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যনাথও বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরসিক হিশেবে প্রখ্যাত। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মতো তাঁর রচনায় ব্যঙ্গের তীব্র জ্বালা নেই। বরং প্রচ্ছন্ন কটাক্ষের অন্তরালে নিহিত ছিল স্নিগ্ধ কৌতুকরস। ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও দূরপ্রসারী ; তাঁর চিত্তবৃত্তির

মূলে ছিল প্রসন্ন অনাসক্তি। দুঃসাধ্য সাধনের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিরাসক্ত কৌতুক-রসাকুলতাকে যুক্ত করে তিনি তাঁর সকল গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রথম রচনা 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসেই (১২৯৯ বাংলা সাল) এই রচনাশৈলী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কঙ্কাবতী'কে লেখক বলেছেন 'উপকথার উপন্যাস'। রূপকথার কঙ্কাবতীর গল্পকে বাস্তব জীবনরসে সিক্ত করে এক নবরূপ দিয়েছেন লেখক। এ গল্প কেবল শিশুদেরই মুগ্ধ করে না, বিদগ্ধজনকেও রসাবিষ্ট করে। 'কঙ্কাবতী' ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে আরো রয়েছে 'ফোক্লা দিগম্বর' (১৯০১), 'মুক্তামালা' (১৯০১) ও 'ময়না কোথায়'। এঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে স্মরণীয় হচ্ছে 'ভূত ও মানুষ', 'মজার গল্প' ও 'ডমরু-চরিত'। সব কয়টি গল্পেই হাস্যরসস্নিগ্ধতার সঙ্গে রয়েছে কৌতুক-প্রসন্নতা। 'ডমরু চরিত' প্রকাশিত হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পরে। ড. সুকুমার সেন 'ডমরু চরিত'-এর সাহিত্যিক অমরতা গুণের প্রশংসা করেছেন,—এর তুলনা করেছেন Cervantes-এর 'Don Quixote'-এর সঙ্গেও।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথের মতো ত্রৈলোক্যনাথও একদা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র পৃষ্ঠপোষিত 'জন্মভূমি' পত্রিকাতেও তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ফলকথা, 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এঁদের ব্যঙ্গ-হাস্য-মিশ্রিত রচনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নিজের মধ্যেও তীব্র ব্যঙ্গরস-দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংবাদিকের তথ্যদর্শন-ক্ষমতা।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

আর, তার সফল সাহিত্য-রূপ প্রকাশ পেয়েছে চারভাগে সমাপ্ত 'মডেল ভগিনী'তে (১২৯৩-১২৯৫? বাংলা সাল)। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনার বহুস্থানে শোভনতার অভাব প্রকট হয়েছে। তা হলেও, সেকালের কলকাতার পরিবেশ ও সামাজিক অনাচার-দুর্বলতা তীব্র ব্যঙ্গ -উজ্জ্বল বর্ণনার ফ্রেমে-আঁটা-ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এঁর অন্যান্য ব্যঙ্গ রচনার মধ্যে আছে 'বাঙালি চরিত', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'মহীরাবণের আত্মকথা', পাঁচ পর্ব 'কালাচাঁদ' ইত্যাদি। এই সব রচনায় সেকালের পরিচিত ব্যক্তিদের উপলক্ষ করে ব্যঙ্গের পরোক্ষ আঘাত করা হয়েছে। 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' নামে তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি রোমান্স-ও লিখেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র। ড. সুকুমার সেন এই গ্রন্থকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করেছেন। সমকালীন জীবনের বাস্তব রূপ এই গ্রন্থেও চিত্রসমতুল যাথাযাথ্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে।

ত্রিংশ অধ্যায়
বাংলা প্রবন্ধের বিকাশ-কথা

গদ্য-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সব্যসাচী'। সৃজনী শিল্পের নিত্য-নব রূপ রচনায় তিনি ছিলেন অনবদ্য। কিন্তু জাতির চিন্তা ও মননকে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ করে তোলার দিকেও তাঁর সাধনা অতন্দ্র ছিল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমের কথাই বলেছেন বিশেষ করে। সে-ছিল আসলে বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক সত্তা। আগে বলেছি, বাংলা গদ্য প্রবন্ধের দেহ-সংগঠন প্রথমে গড়ে উঠেছিল মনীষী রাজনারায়ণ ও ভূদেবের রচনাকে আশ্রয় করে। বাঙালির সমাজ, সাহিত্য, পরিবার, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, আচার-আচরণকে যুক্তি-চিন্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বর্ষণে বিচার করেছেন এঁরা বুদ্ধির আলোকে। কিন্তু বঙ্কিম বাংলা প্রবন্ধে বুদ্ধি-ধর্মের সঙ্গে হৃদয়াবেগের যোগ সাধন করলেন। তাঁর হাতে মননশীল প্রবন্ধের রচনা হয়ে উঠল সাহিত্য-স্বাদী। এই সাহিত্যগত স্বাদ ভেদে বঙ্কিমের রচনা দ্বিবিধ।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিম

প্রথম শ্রেণীর রচনায় প্রাবন্ধিক বঙ্কিম রাজনারায়ণ-ভূদেবেরই উত্তরসূরী। তাঁদেব মতোই মনন চিন্তায় বলিষ্ঠ তাঁর এক ধরনের প্রবন্ধ ; অথচ তাতে সাহিত্যিকের প্রাণের স্পর্শ যুক্ত হয়ে অপূর্ব রসানুভবেরও সৃষ্টি হয়েছে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ 'বিবিধ প্রবন্ধ'র অধিকাংশ রচনাই এই রকমের সাহিত্য-রসান্বিত প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাহিত্য রসান্বিত প্রবন্ধ

'বিবিধ প্রবন্ধ' ছাড়া বঙ্কিমের লেখা গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের পর্যায়ে আছে 'বিজ্ঞান রহস্য', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব'। অন্য পক্ষে আরো এক রকমের প্রবন্ধ রচনায় তিনি প্রবন্ধের বন্ধন মোচন করেছেন। প্রথম প্রকারের রচনাকে সাহিত্য-স্বাদী প্রবন্ধ বললে, এদের বলতে হয় প্রবন্ধ-সাহিত্য। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা আসলে সাহিত্যিক নির্মিতি, যদিও তা অনেকটা পরিমাণে প্রবন্ধের আকারে লেখা। প্রতীচ্য সাহিত্যে এই অভিনব রচনাঙ্গিকের প্রবর্তক ছিলেন Montaigne (১৫৩২-১৫৯২) নামে এক ফরাসি লেখক। তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'Essais' ; ইংরাজিতে তাই এই ধরনের রচনা 'Essay' নামেই পরিচিত ; আমরা এদের বলব 'সাহিত্যিক প্রবন্ধ'। এই রচনাশৈলীর সাহিত্য-স্বভাব ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,—" As a form of literature, the essay is a composition of moderate length, usually in prose, which deals in an easy, cursory way with a subject. and in strictness with that subject only as it affects the writer." সাহিত্যিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা,—এর বিষয়বস্তু হচ্ছে এমন কিছু, যা লেখকের হৃদয়বৃত্তিকে স্পর্শ করতে পারে ; তাকে করে তুলতে পারে উদ্দীপ্ত। আসলে, এই ধরনের রচনায় যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে লেখক তাঁর নিভৃত-স্বকীয় শিল্পি-প্রাণকে অনাবৃত্ত মুক্তি দিতে পেরেই যেন পরমানন্দিত হন। শিল্পিহৃদয়ের আত্মলীন মুক্তির এই আনন্দই সাহিত্যিক প্রবন্ধের রস-উৎস। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'কমলাকান্তের

সৃজনধর্মী
প্রবন্ধ-সাহিত্য

দপ্তর'-এর 'আমার দুর্গোৎসব'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া বঙ্কিমের লেখা সাহিত্যিক প্রবন্ধের আরো দুটি গ্রন্থ রয়েছে 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। পরের দুটি রচনার সুর বহিরঙ্গে রস-লঘু ; কিন্তু অন্তরঙ্গে ব্যঙ্গ-তীব্র। 'মুচিরাম গুড়'-এর স্যাটায়ার-ই বঙ্কিম-বচনার মধ্যে সবচেয়ে ঝাঁজালো।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই সে-যুগে সাহিত্যিক-প্রবন্ধ লিখে যাঁরা খ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সমুল্লেখ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এঁদের দুজনেরই লেখা বঙ্কিম তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমের সঙ্গে এঁদের রচনার সমধর্মিতার প্রমাণ এখানেই। অক্ষয়চন্দ্র প্রধানত রস-প্রবন্ধ রচনাতে দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজে 'সাধারণী' নামে একটি সাপ্তাহিক ও 'নবযুগ' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনা করতেন। ঐ সব পত্রিকায়, এবং 'বঙ্গদর্শন'-এও, তাঁর বহু রস-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পবে যে-সকল গ্রন্থে ঐ-সব রচনা সংকলিত হয, তাদের মধ্যে আছে,—'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৪), 'আলোচনা' (১৮৮২), 'সনাতনী' (১৯১১), 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) ইত্যাদি। অক্ষয়চন্দ্র কিছু কিছু পদ্য-ও লিখেছিলেন ; 'শিক্ষানবিশের পদ্য' ও 'গোচারণের মাঠ'-এ তাব পরিচয় আছে। 'হাতে হাতে ফল' নামে একখানি প্রহসনও ইনি লিখেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য রচনায় রস-ভাবনার সঙ্গে তথ্য-জিজ্ঞাসা ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত হয়েছিল। 'নানাপ্রবন্ধ' গ্রন্থের (১৮৮৫) নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ-সম্ভারে এই দুর্লভ সমন্বয়ের শিল্প-রূপ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। 'রাজবালা' নামে একখানি উপন্যাস, এবং কিছু সংখ্যক কবিতাও তিনি লিখেছিলেন।

বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায

বঙ্কিম-ভক্ত, এবং অতি-রক্ষণশীল প্রবন্ধ-লেখক হিশেবে চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) সবিশেষ স্মরণীয। চন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীর সঙ্গে বঙ্কিমের চেয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখার সাদৃশ্যই বরং বেশি। কিন্তু ভূদেবের চিন্তার প্রসার ও মতবাদের উদারতা চন্দ্রনাথে দুর্লভ ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি-বিচার ক্বচিৎ রক্ষণশীলতার সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে পেরেছিল। এঁর প্রবন্ধ-রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' (১৮৮১), 'ফুল ও ফল' (১৮৮৫), 'হিন্দুবিবাহ' (১৮৮৭), 'ত্রি-ধারা' (১৮৯১), 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২), 'কঃ পন্থা (১৮৯৮), 'সাবিত্রীতত্ত্ব' (১৯০০) ইত্যাদি। 'পশুপতিসম্বাদ' নাম দিয়ে একখানি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন।

চন্দ্রনাথ বসু

বঙ্কিমোত্তর প্রবন্ধ রচনার ইতিহাসে সাহিত্য আলোচনা করে সুখ্যাত হয়েছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁর একমাত্র সন্দর্ভ-সঙ্কলন 'সাহিত্যমঙ্গল' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। আরো বহু নিবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। এ-ছাড়া, বিবিধ কাব্য ও কৌতুক-চিত্র তিনিও রচনা করেছিলেন। সে-সবের মধ্যে রয়েছে 'দুর্গোৎসব', 'উদ্ভট কাব্য'. 'সাতনরী', 'খণ্ডকাব্য', 'সহরচিত্র', 'সোহাগ চিত্র' ও 'কৌতুক চিত্রাবলী'।

ঠাকুবদাস মুখোপাধ্যায

বঙ্কিম-শিষ্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১ খ্রি.) বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও ছিলেন শীর্ষবর্তী একজন। বঙ্কিম-ধারার অনুরক্ত উত্তরসাধক হিশেবে একাধিক ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। সর্বাংশে সফল না হলেও ঐ সব রচনা মনোহর বাগ্‌ভঙ্গির গুণে ব্যাপক জনসমাদর লাভ করেছিল। প্রবন্ধের শরীরেও সেই স্নিগ্ধ ভাষার অন্বয় সাধন করেছেন হরপ্রসাদ। বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক গবেষণারীতির প্রবর্তকদের মধ্যেও তিনি স্মরণীয় একজন। তাঁর

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গবেষণা-নিবন্ধ ও অপরাপর গদ্য-রচনা প্রকাশভঙ্গির সরসতার জন্যই অনেক সময় ভারহীন হাল্কা বলে প্রতীয়মাণ হয়। তাঁর স্মরণীয় গদ্যগ্রন্থের মধ্যে গবেষণা প্রবন্ধগুলি ছাড়াও রয়েছে 'বাল্মীকির জয়' নামক পুরাণাশ্রিত উপাখ্যান এবং 'মেঘদূত' ব্যাখ্যা।

বঙ্কিম-ভক্ত তরুণতম বাংলা গদ্য-লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলা প্রবন্ধ-বিকাশের ইতিহাসে সবিশেষ স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের ভক্তি অন্তিমকাল পর্যন্ত একান্ত প্রগাঢ় ছিল। তাহলেও লেখক হিশেবে তিনি বঙ্কিমযুগেরই উত্তরসাধক।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অক্ষয়কুমার দত্ত দুটি গ্রন্থে বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছিলেন একই লেখনী দিয়ে। বঙ্কিমের প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তারই নূতন ফলশ্রুতি লক্ষ করি রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায়। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিতনামা অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথমে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। পরে তার সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয় দার্শনিক চিন্তন এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা। এই ত্রি-বিষয়ের সংযোগে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক নূতন ত্রিবেণীবন্ধন ঘটেছিল রামেন্দ্রসুন্দরের সরল প্রাঞ্জল রসোত্তীর্ণ রচনাবলিতে। 'প্রকৃতি' (১৩০৩), 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্মকথা' (১৩২০), 'শব্দকথা' (১৩২৪), 'বিচিত্র জগৎ' ও 'যজ্ঞকথা' রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলিতে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়।

প্রবন্ধ-লেখক হিশেবে কালীপ্রসন্ন ঘোষের জনপ্রিয়তা সমসাময়িক কালের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। এককালে এঁর 'প্রভাতচিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা', 'নিশীথচিন্তা' ইত্যাদি প্রবন্ধ সংকলন বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। নিছক ঐতিহাসিক কৌতূহল নিবৃত্তি করা ছাড়া আজ এদের সার্থকতা আর বড় একটা নেই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

কেশবচন্দ্র সেন-এর খ্যাতি লেখক হিশেবে তত নয়, যত বাগ্মী হিশেবে। আর তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতাই ধর্মীয় প্রসঙ্গে বিধৃত। তাহলেও, পরবর্তী কালে লিখিত আকারে সংকলিত হওয়ার পরে এদের প্রাবন্ধিক গুণ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ধর্ম-চিন্তার সঙ্গে, তাঁর ঐ-সব রচনায়, সহজ স্বদেশানুরাগ যুক্ত হয়ে নতুন স্বাদুতার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর রচনাবলির অন্তর্গত হয়ে আছে 'ব্রহ্মোৎসব', 'আচার্যের উপদেশ', 'সেবকের নিবেদন' ইত্যাদি। 'জীবনবেদ' (১৮৮৪) অনেকটাই যেন কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনী।

কেশবচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,— এই তিন জনেই আলোচ্য কাল-সীমার মধ্যে গদ্য রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে গদ্য-লেখক হিশেবে সবচেয়ে উল্লেখ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মননের মধ্যে সহজ দার্শনিকের প্রবণতা ছিল ; অথচ হৃদয় ছিল রোমান্টিক কবির। দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে কবির ভাবুকতা যুক্ত হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের আলোচনা একদিকে হয়েছে তথ্য-বিচারে তির্যক ; আর একদিকে ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে কবি-সুলভ ঋজুতা আর স্বচ্ছতা। কাব্য, গণিত, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি নানা-বিষয়ে পবন্ধ লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ; অথচ প্রকাশভঙ্গী সর্বত্রই ছিল সরস। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলির মধ্যে আছে,—চারখণ্ডে সম্পূর্ণ 'তত্ত্ববিদ্যা', 'নানা চিন্তা', 'প্রবন্ধমালা', 'চিন্তামণি' ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের প্রথম ভারতীয় কর্মী। সংখ্যায় যথেষ্ট না হলেও তাঁর সাহিত্যিক প্রয়াস গুণগত বিচারে উপেক্ষণীয় নয়। সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে ছিল 'বোম্বাইচিত্র', 'বৌদ্ধধর্ম', 'আমার বাল্যকথা' ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কীর্তি নাট্যকার হিশেবে প্রায় অবিসংবাদিত। কিছু কিছু প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন ; 'প্রবন্ধ মঞ্জরী'তে তা অংশত

সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

সংগৃহীত হয়ে আছে।

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ না করলে। স্বামিজী প্রধানত ধর্মগুরু ও সমাজ-উদ্ধারক রূপেই দেশপূজ্য। তাঁর ধর্ম-সাধনার আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকতার লোভে আধিভৌতিকতাকে বর্জন করে নি ; বিশ্বজননীর আরাধনায় বসে তিনি দেশ-জননীকেও বন্দনা করেছেন আবেগ কম্পিত ভাব ও ভাষায়। স্বামিজীর হৃদয়ের সহজ-বিশ্বাসের তীব্র আকুলতা তাঁর গদ্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দায়িত কবিতার কম্পন-মুখরতা দান করেছে। তাঁর বহু প্রবন্ধই প্রথমে বক্তৃতার আকারে কথিত হয়েছিল। কী কথার ভাষায়, কী রচনার ভাষায়, সর্বত্র স্বামিজীর আবেগমথিত মননশীল গদ্য পদ্য-স্বভাবিত। তাঁর স্বল্পসংখ্যক বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে ‘বর্তমান ভারত’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘পরিব্রাজক’ ইত্যাদি অবিস্মরণীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

এই সময়ে কিছু সংখ্যক জীবন-চরিত ও আত্মচরিত-জাতীয় গ্রন্থও রচিত হয়েছিল, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে যা অবশ্য স্মরণীয়। এই সব রচনাবলির মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের— ‘রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত’ (১৮৮১) ; যোগীন্দ্রনাথ বসুর ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত’ (১৮৮৫) ; বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি বিদ্যাসাগরের চরিত ; শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘আত্মচরিত’ এবং ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, কার্তিকেয়চন্দ্র বায়ের ‘ক্ষিতীশ বংশাবলী’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীবনচবিত ও আত্মচরিত

এঁদের মধ্যে শিবনাথের সাহিত্য-কৃতি নানা দিক থেকেই স্মরণীয়। গদ্য, পদ্য, উপন্যাস-গল্পের বিচিত্র পথে তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন। শিবনাথের মধ্যে একটি শিল্পিপ্রাণ আত্মগোপন কবেছিল। সে সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না দিয়ে তিনি সমসাময়িক সমাজ ও ধর্মীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। সেই বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রেও তাঁর নেতৃশক্তি স্মরণীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। বিপ্লবি-মনীষী শিবনাথের অন্তর-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পূর্ণস্ফুট হয়েছে তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪), 'আত্মচরিত' (১৯১৮), ‘রামমোহন রায়’ ইত্যাদি তাব মধ্যে প্রধান।

প্রাবন্ধিক শিবনাথ

একত্রিংশ অধ্যায়
মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটক

বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকেই নাট্য রচনাতে নূতন উদ্দীপনা ও প্রয়োজনবোধের সূচনা হয়েছিল। নাটককে এ-দেশে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য। কেবলমাত্র পড়ে বা শুনে নাট্যকলার পূর্ণ রসাস্বাদ সম্ভব নয় ; অভিনয়-দর্শনের মধ্য দিয়ে এর রস উপভোগ করতে হয়। ফলে নাট্যমঞ্চ একদিকে যেমন নাটকের পূর্ণ রস-স্ফুরণের সহায়তা করে, তেমনি মঞ্চের প্রয়োজন ও দাবি নাট্যকারের রচনাকে উৎসাহিত, এবং সুনিয়মিত করতেও সহায়তা করে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বাংলার নাট্যাভিনয় পারিবারিক বা ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চের সীমায় আবদ্ধ ছিল। এমন অবস্থায় মঞ্চ-মালিক বা তাঁর অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়ের রুচি অথবা খেয়ালের ওপরেই অনেক সময়ে নাটকের নির্বাচন ও অভিনয় নির্ভর করত। পেশাদারি আদর্শে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার ফলে নিয়মিত নাটকাভিনয়ের পথ সুগম হল। সেই সঙ্গে দর্শক-সাধারণের চাহিদা পূরণের দায় এবং দায়িত্ববোধও জাগ্রত হল। এইরূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে বাংলা নাটক জাতীয় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার অভিমুখী হয়ে উঠল ক্রমশ। আর নগর বাংলার ইতিহাসে তখন [১৮৬৭ থেকে] জাগরিত হয়ে উঠেছে হিন্দুমেলার যুগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা দেশে নূতন জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই জাতীয়তার আদর্শ কেবল অতীত গর্ব-সর্বস্ব ছিল না ; শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেহ ও শিল্প-চর্চা, অর্থনৈতিক উন্নতি; জাতীয় জাগরণের সকল দিকেই এই আন্দোলনের প্রচেষ্টা ছিল ঐকান্তিক। নাটকের মধ্যেও সেই কর্ম-প্রবর্তনাময় আদর্শবাদ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক

হরলাল রায় আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য-সাহিত্যেই এই নব চেতনার প্রথম বিকাশ লক্ষ করি। হরলালের 'হেমলতা' নাটকে (১৮৭৩) এ-যুগের পরাধীনতার বেদনা-বোধ প্রথম প্রকট হয়েছে। তাঁর 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকের (১৮৭৪) বিষয়বস্তু বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় ও তৎপরবর্তী ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঠিত। গ্রন্থের নাম থেকেই বুঝি, জাতীয় পরাধীনতার বেদনানুভব এতেও সুগভীর। হরলাল আরো তিনখানি অনুবাদ-নাট্য লিখেছিলেন,—'শত্রুসংহার' সংস্কৃত 'বেণীসংহার' অবলম্বনে লেখা ; 'কনকপদ্ম'-র উৎস সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। ইংরেজি 'হ্যামলেট' অবলম্বনে লিখিত হয়েছিল 'রুদ্রপাল' (১৮৭৪)। হরলালের নাট্যাবলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুল অভিনীত-ও হয়েছিল।

হরলাল রায়

হরলালের রচনা সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে থাকলেও তাদের নাট্যগুণ সংশয়াতীত নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই (১৮৪৯-১৯২৫) এ-যুগের প্রথম নাট্যকার, যাঁর রচনায় হিন্দুমেলার জাতীয় প্রণোদনার সঙ্গে নাট্যশৈলীও প্রশংসনীয় উৎকর্ষ লাভ করেছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যপ্রভাব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প-চেতনায় একটি সুমিত সংযমের অনুভব জাগরিত করেছিল। তাছাড়া,

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

প্রাচ্য-প্রতীচ্য একাধিক ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে ফরাসি ভাষার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অন্তরঙ্গ। তাঁর স্বভাব-অভিজাত চেতনা ফরাসি শিল্প-শৈলীর আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপূর্ব এক শালীন সৌন্দর্য রচনায় সহায়তা করেছিল। এ-দিক থেকে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প-কীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র মূল্য দাবি করতে পারে।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ'

প্রথম রচনা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এই (১৮৭২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্পস্বভাবের অনাবৃত প্রকাশ ঘটেছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তিত স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করে এই প্রহসনটি লিখিত হয়েছিল। পরবর্তিকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারী-স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনে অগ্রণীর আসন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু প্রথম বয়সের এই প্রথম প্রহসনে তিনি এর বিরোধিতাই করেছিলেন। ব্যঙ্গের আঘাত স্থানে স্থানে তীব্র হলেও কোথাও অশালী।ন হয় নি ; এবং অনেকটা এই কারণেও, রসরচনায় রসিকতার মাত্রা সীমা অতিক্রম করে নি। এখানেই নাট্যশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

অলীকবাবু

এঁর দ্বিতীয় প্রহসন 'অলীকবাবু', প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৭৭) 'এমন কর্ম আর করবো না' নাম দিয়ে। ঠাকুরবাড়ির একাধিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ এ'র নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে রয়েছে 'হিতে বিপরীত', 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'। শেষোক্ত দুটি রচনা ফরাসি শিল্পী মলেয়াঁর-এর প্রহসন অবলম্বনে লেখা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ নাট্য

সিরিয়াস নাটকের ক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদই বেশি করেছেন। এই শ্রেণীর লেখার মধ্যে আছে,—'অভিজ্ঞানশকুন্তল', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশী', 'উত্তরচরিত', 'মালতীমাধব', 'রত্নাবলী', 'বেণীসংহার' ইত্যাদি প্রায় ১৭ খানি সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকের অনুবাদ। দুখানি ইংরেজি নাট্যানুবাদের মধ্যে 'জুলিয়াস সিজার'-ও ছিল। অধিকাংশ নাটকেরই অনুবাদকালে মূল রচনার সমকালীন জীবন-পটভূমিকে লেখক, পৃথকভাবে, স্বত-উদ্‌ঘাটিত করে তুলেছেন, ভূমিকায়। একালের অনুভব-সীমায় সেকালের জীবন-পরিচয় অপূর্ব রস-মূল্যের আকর হয়েছে।

মৌলিক নাটক
১। 'পুরুবিক্রম'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের সংখ্যাই সবচেয়ে কম,—মাত্র চারখানি। কিন্তু নাট্য-শৈলীর উৎকর্ষ ও সমকালীন জীবনানুভূতির গভীরতার বিচারে ঐ কয়খানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। আগেই বলেছি, ভারতের নবজাগ্রত স্বদেশ-প্রেমের একটি সক্রিয় রূপ-সৃষ্টিই ছিল তাঁর শিল্পি-প্রাণের প্রধান আকাঙ্ক্ষা এদিক থেকে, অতীত ভারতের গৌরব-গাথাকে ভবিষ্য-কল্পনার রোমান্টিক স্বপ্নের সূত্রে গেঁথে হৃদ্য রসানুভূতির সৃষ্টি করেছেন তিনি। প্রথম নাটক 'পুরুবিক্রম'-এ (১৮৭৪) এই নাট্য-স্বভাবের সফল বিকাশ ঘটেছে। গ্রিকবীর সেকেন্দার ও পুরুর বিক্রম-কথা নাটকটির প্রধান বিষয়বস্তু। পুরুর প্রতি কুল্লুপর্বতের কুমারী রাজ্ঞী ঐলবিলার, ঐলবিলার প্রতি রাজা তক্ষশীলের, এবং সেকেন্দরের প্রতি তক্ষশীল-ভগ্নী অম্বালিকার রোমান্টিক প্রণয়-কথা মূল কাহিনীর সৌন্দর্য ও নাটকীয় ঘটনা-জটিলতাকে ঘনতর করেছে। আর, কি ঘটনাবিন্যাসে, কি সংলাপ রচনায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিমিতিবোধ গোটা নাটকটিকে রসনিবিড় করে রেখেছে।

২। 'সরোজিনী'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাট্য রচনা 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫) আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে লেখা। নারী-প্রণয়ের বিচিত্রমুখী জটিলতা, ঐতিহাসিক গুণ ক্ষুণ্ণ না করেও, এই নাটকের রোমান্টিক ঐশ্বর্য অপার বর্ধিত করেছিল। 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—ইত্যাদি বিখ্যাত

গানটি কিশোর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই নাটকের জন্যে।

'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটক। প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতী দৈবক্রমে সেলিমের অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাকার সময় উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়-আকর্ষণ ঘটে। প্রতাপের ইচ্ছাক্রমে অনুজ শক্তসিংহ অশ্রুমতীকে উদ্ধার করে আনেন। মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে অশ্রুমতী আমরণ ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে। প্রণয়-বুভুক্ষু সেলিম অবশেষে শ্মশানে অশ্রুমতীর শেষ প্রণয়ের পরিচয় বক্ষে করে ফিরে যান ; ততক্ষণে তাঁর প্রেম কামনা-মুক্ত হয়েছিল।

৩। অশ্রুমতী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী'-র (১৮৮২) গল্প ইতিহাসাশ্রিত হলেও আগাগোড়া রচনায় রোমান্টিক উপাদানই সমধিক।

৪। 'স্বপ্নময়ী'

কিছু সংখ্যক ফরাসি গল্প-কবিতারও অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ; 'ফরাসীপ্রসূন' গ্রন্থে তা বহুলাংশে সংকলিত আছে। তা ছাড়া, আরো কিছু প্রবন্ধাদিও রয়েছে তাঁর রচিত।

অপরাপর রচনা

হিন্দুমেলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আর একজন উল্লেখ্য নাট্যকার ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। এঁর লেখা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক-এর (১৮৭৫) অভিনয় সরকারি আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরাধীনতার ক্ষোভের সঙ্গে হুগলির শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যভিচার-কথা যুক্ত হয়ে এই নাট্য-কাহিনী একদা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। উপেন্দ্রনাথ 'শরৎ সরোজিনী' নামে আর একখানি নাটক এবং 'দাদা ও আমি' নামে একখানি প্রহসনও লিখেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস

মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটকের ইতিহাসে নট এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১) ভূমিকা প্রায় অতুল্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নটশ্রেষ্ঠ রূপেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। গিরিশচন্দ্রের নিজের অলৌকিক অভিনয়-নিপুণতার প্রভাবে অসংখ্য দর্শকের মনে সেকালে তাঁর নিজের ও অপরের বহু নাটক অবিস্মরণীয় রস-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে সেই অভিনয়-উৎকর্ষের পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে গিরিশচন্দ্রের নাট্যাবলির যথার্থ গুণ বিচার করে ওঠা একদা দুরূহ হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেই কেবল সু-অভিনেতা ছিলেন না, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের পরিচালক হিসেবে অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দু মুস্তাফি, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত অভিনেতৃ-প্রতিভার লালন ও পরিচালনাও করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র :—
নট ও নাট্যকার

কিন্তু নট হিশেবে যত, নাট্যকার হিশেবে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা তত সার্থক ছিল বলে মনে হয় না। সবসুদ্ধ ৭৫ খানি সম্পূর্ণ ও চারখানি অসম্পূর্ণ নাটক-নাটিকা-প্রহসনের রচয়িতা ছিলেন তিনি। আর তাদের অধিকাংশের মধ্যেই স্বদেশ-প্রীতি এবং ধর্মোন্মাদনা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। আগে বলেছি, নাট্যকার হিশেবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন বিশেষভাবে মনোমোহন বসুর ভাব-শিষ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের পৌরাণিক গল্পাদিতে বাঙালির নিত্যকালের ভক্তি-রসধারার উৎস সঞ্চিত হয়ে আছে। মনোমোহন তাকেই নবযুগের নবীন স্বদেশ-প্রীতির মূল্যে সিক্ত করে নূতন নাট্যাবেদন সৃষ্টি করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে সমসাময়িক দেশ-ভক্তির প্রবণতা প্রথমাবধি প্রায় সহজাত হয়েছিল। পরে, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব-প্রভাবের ফলে, তাঁর পৌরাণিক নাটকে আধ্যাত্মিক ভক্তিরস সব চেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। বাঙালির চেতনা সহজে আবেগ-মথিত। তাই, ভক্তি-স্নেহ-প্রীতির মহৎ আদর্শ মাত্রই তার চেতনাকে উদ্বেলিত করে থাকে। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিচিত্তও ছিল অতি-

গিরিশ-নাট্যপ্রতিভা

আবেগে স্ফীত। ফলে, তাঁর রচনায় ভক্তি-স্নেহ-প্রেমপূর্ণ হৃদয়বৃত্তির অতিকর্ষণ সেকালের বাঙালি দর্শকের ভাবুকতাকেও আবেগাপ্লুত করে তুলেছিল। কিন্তু আবেগবৃত্তির এই আতিশয্যের পথ বেয়েই গিরিশচন্দ্রের রচনায় নাটকীয় অসংযম-সংহৃতি ও অপরিমতি প্রবেশ ঘটেছিল। ফলে, তাঁর নাটক যেমন অভিনয়-সফল হয়েছিল, শিল্প-সুগঠিত হতে পারে নি তত।

গিরিশচন্দ্রের রচনায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক-পারিবারিক বিচিত্র বিষয়ে লিখিত নাটক-প্রহসন ইত্যাদি রয়েছে। এঁর লেখা উল্লেখনীয় নাট্যাবলির মধ্যে আছে 'পাণ্ডবের

রচনা-পরিচয়

অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩), 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৫), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৫), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১৮৮৬), 'প্রফুল্ল' (১৮৯১), 'জনা' (১৮৯৩), 'বলিদান' ও 'সিরাজদ্দৌলা' ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্রের লেখা 'ম্যাকবেথ' নাট্যানুবাদও একদা প্রচুর জনপ্রি:'তা অর্জন করেছিল।

নাটক প্রহসনাদি ছাড়া গিরিশচন্দ্র তিনটি উপন্যাস, কয়েকটি গল্প ও নক্সা, এবং কিছু সংখ্যক কবিতা আর প্রবন্ধ-ও লিখেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পরেই নট ও নাট্যকার রূপে প্রথমে স্মরণীয় অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। অভিনয ও নাটক-রচনার উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন গিরিশের নিষ্ঠাবান অনুসারী।

রসরাজ অমৃতলাল

কিন্তু রস-প্রবণতার দিক থেকে এই দুই শিল্পী ছিলেন বিভিন্ন। গিরিশচন্দ্র যেমন গভীর আবেগ-উচ্ছ্বাসের অভিমুখী ছিলেন, তেমনি অমৃতলালের প্রবণতা ছিল ব্যঙ্গতীব্র রসিকতার প্রতি। বাংলা দেশে 'রসরাজ' নামে তিনি একদা বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। অমৃতলালের এই খ্যাতি অকারণ ছিল না। কিছু কিছু গুরুগম্ভীর নাট্যরচনার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু গিরিশ—অনুসরণের প্রয়াস সে সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঐ সব রচনার মধ্যে আছে 'হীরকচূর্ণ', 'হরিশচন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী' ইত্যাদি। প্রথম-উক্ত লেখাটি অমৃতলালের রচিত প্রথম নাটক ; রচনাকাল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ। অন্যপক্ষে, অমৃতলালের রসদৃষ্টি ছিল ব্যঙ্গতীব্র,—সহাস। ফলে বিভিন্ন প্রহসনকে অবলম্বন করে ঝাঁজালো 'স্যাটায়ার' রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে ছিলেন। এ-সব ক্ষেত্রে তাঁর রুচিও ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো সুমিত-শালীন। গিরিশচন্দ্রের অনুরূপ স্খলিত-রুচি প্রহসন অমৃতলাল খুব বেশি সংখ্যায় লেখেন নি। তাঁর একাধিক প্রহসন রচনায় ফরাসি শিল্পী মলেয়োঁর--এর প্রভাব রয়েছে। 'কৃপণের ধন', 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' মলেয়াঁর-প্রভাবিত রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রহসনের মধ্য দিয়ে জাতির বিচিত্রমুখী দুর্বলতার ক্যারিকেচার করার লঘুতাই অমৃতলালের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যঙ্গের তীব্র আঘাত দিয়ে জাতির চিত্তকে উদ্বোধিত করার পরোক্ষ

নাট্যপঞ্জী

চেষ্টাও ছিল তার অন্তর্নিহিত। 'বিবাহ বিভ্রাট', 'বাবু', 'খাসদখল', 'বৌমা', 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' ইত্যাদি এদিক থেকে তাঁর সমুল্লেখ্য প্রহসন রচনা। নাটক, প্রসহন, চিত্রনাট্য ও গীতিনাট্য মিলে ৩২ খানারও বেশি নাটক লিখেছিলেন অমৃতলাল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪-১৯২৭) পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনার ছাপ রয়েছে। কিন্তু নাট্যকার হিশেবে তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত ; তাঁর কলাবোধ ছিল সহজতর। ফলে, মনোমোহন-গিরিশের প্রবর্তিত পৌরাণিক নাটকের

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

যাত্রাধর্মী আবেগাতিশায়িতাকে সংযত করে দৃঢ়বদ্ধ নাট্য-ঘনতা দিতে চেয়েছেন তিনি। ক্ষীরোদপ্রসাদের স্বভাবে আবেগের অতিশায়িতাই যে কেবল সুমিত ছিল, তা নয়; সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক আকৃতিরও প্রাবল্য খুব যে ছিল, তা মনে করার কারণ নেই। প্রাচীন পুরাণের কাহিনীকে ক্ষীরোদপ্রসাদ উনিশ শতকের

মানব-মাহাত্ম্যের নবমূল্যে উদ্ভাসিত করে দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে ছিল সমকালীন স্বদেশভক্তির প্রেরণাও। বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা ছিল প্রবল। অন্যপক্ষে, আবেগ-আতিশয্য থেকে মুক্ত ছিল বলে ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনায় নাট্যাঙ্গিকের গঠনও প্রায়শ পরিচ্ছন্ন। এঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ', 'আলিবাবা', 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' ইত্যাদি। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক ও উপকথা-ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের মোট নাট্যসংখ্যা প্রায় ৫০ খানি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) মৌল পরিচয়,—তিনি ছিলেন 'হাসির গানের রাজা'। গুরু গম্ভীর বিষয়ে, বিশেষ করে স্বদেশ-প্রেমের আকৃতিভরা সংগীত রচনাতেও, তাঁর কীর্তি দুর্লভ সফলতা অর্জন করেছিল। কিন্তু বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদী জনপ্রিয়তা এসব কোনা কিছুর চেয়েই কোনো অংশে কম নয়। বরং সমকালীন সাহিত্য-জগতে তাঁর নাট্য-কীর্তিই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার আকর হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র সমকালীন শিল্পী ছিলেন। কিন্তু কী কাব্যে, কী নাটকে, রবীন্দ্রপূর্ব ধারার পরিণতি সন্ধানেই তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের নগর-বাংলায় নাট্যশিল্প রচনার ধারা নূতন পথে মোড় ফিরেছিল, বিশেষ করে ইংরেজি নাট্যশৈলীর অনুস্বরণ করে। এদিক থেকে শেকসপীয়রের বিশ্বজয়ী নাট্যকলার প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। অন্যান্যের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ সচেতনভাবে শেকসপীয়রীয় কলাঙ্গিকের অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু কোথাও শিল্পি-প্রাণের প্রবণবতার অভাব, কোথাও-বা বিষয়-বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধ-ধর্মিতাব জন্য সে চেষ্টা যথেষ্ট সফল হতে পারে নি। দ্বিজেন্দ্রলালই সেই শ্রেষ্ঠ বাঙালি শিল্পী, শেকসপীয়বের অনুসরণে বাংলা রোমান্টিক নাট্য রচনায় যিনি সবচেয়ে বেশি সফলতা অর্জন করেছিলেন। কেবল আঙ্গিক সৃষ্টির দক্ষতাতেই নয়, প্রাণবান জীবন-রসের সংযোজনেও, শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল সমান সফলতা অর্জন করেছিলেন।

নাট্যপঞ্জী

প্রধানত ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত নাটক লিখেই দ্বিজেন্দ্রলাল সবচেয়ে বেশি সার্থক হয়েছেন। কিন্তু যথার্থ ভাবে তাঁর রচনাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। শেকসপীয়রের মতো ইতিহাসের গল্প নিয়ে তিনি রোমান্টিক নাটক লিখেছিলেন। তবু সঠিক শেকসপীয়রীয় আঙ্গিকের বিচাবে দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনাকেই 'মেলোড্রামা' না-বলে উপায় থাকে না। বস্তুত অতি-আবেগে স্ফীত এবং জীবনাবেদনের জন্যই তাঁর রচনা বাঙালির হৃদয় মথিত করেছিল একদিন। শেকসপীয়রীয় নাট্যদেহে বাঙালির নাট্যপ্রাণকে অনুস্যূত করতে পেরেছিলেন,—এখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকীর্তির সফলতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকের মধ্যে আছে,—'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), নুরজাহান' (১৯০৮), 'মেবারপতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের মধ্যে 'পরপারে' একদা বহুল জনপ্রিয় হয়েছিল ; কিন্তু তার স্থায়ি নাট্যমূল্য উৎকৃষ্ট পর্যায়ের নয়। প্রথম দিকে 'সীতা', ও 'পাষাণী' নামে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে দুটি গীতিনাটিকাও তিনি লিখেছিলেন। অন্যপক্ষে তাঁর লেখা বেশ কয়টি প্রহসনও উল্লেখনীয় রচনা। আসলে পর পর দুটি প্রহসন লিখেই দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যক্ষেত্রে প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই প্রহসন দুটির নাম যথাক্রমে 'কল্কি অবতার' ও 'বিরহ'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য প্রহসনের মধ্যে আছে 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার', 'প্রায়শ্চিত্ত', ও 'পুনর্জন্ম'। রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লেখা 'আনন্দবিদায়' তাঁর রচনাগুণ ও প্রতিষ্ঠার মর্যাদাহানি ঘটিয়েছিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়
বাংলা গীতি কবিতার মুক্তি

রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের কিশোর-বয়সের কাব্য-গুরু বলে স্বীকার করেছেন,—তাঁকে বলেছেন 'বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখি'। বিহারীলালের শিল্প-প্রতিভার সফল মূল্যব্যঞ্জনা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মধুসূদনীয় কাব্য-প্রবণতার আলোচনায় দেখেছি, জাতীয় প্রয়োজন-মথিত বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষা গীতি-কবির প্রাণেও মহাকাব্য লেখার প্রেরণা দুর্নিবার করে তুলেছিল। সে ছিল বাংলা কাব্যে নব-ক্লাসিকতার প্রবণতা। অথচ বাংলার কবি-প্রাণ চিরকালই আবেগ প্রবণ ; বাঙালির জাতীয় স্বভাব চিরদিন ভাবে উচ্ছ্বাসিত। মধুসূদনের মধ্যে সৃজন-সফলতার চরম ক্ষণেও সেই ভাব-প্রবণ গীতিবাসনার মর্মপীড়া লক্ষ করা গেছে ; 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখতে লিখতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছিলেন,—"Probably I have got a tendency in the lyrical way"। পরবর্তী কালে 'বীরাঙ্গনা' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদন সেই গীতি-প্রবণতাকে আংশিক মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যুগ-প্রয়োজনে তাড়িত কবিমনের পূর্ণ মুক্তি ঘটেনি ঐ সব কবিতায়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি মধুসূদনের উত্তরসূরী কবিদের মর্মচেতনায় গীতিকাব্যের প্রবল আবেগ মহাকাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র বিভঙ্গিত আবর্তের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বাঙালির লিরিক বাসনার পূর্ণ মুক্তি হয়নি ওঁদের কারো রচনাতেই। ক্লাসিকতালাঞ্ছিত গীতিধর্মের সেই আড়ষ্ট যুগে বিহারীলাল "নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত-উক্তিতে বিশ্বহিত, অথবা সভা-মনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না।"—অর্থাৎ বিহারীলাল বহির্জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও দাবির থেকে নিজের কবি-চেতনাকে একান্ত মুক্ত রেখে, একান্তে বসে শুনেছেন আপন মনের নিভৃত বাণী। আর অন্য-নিরপেক্ষ আত্মলীনতাই আসলে রোমান্টিক গীতিধর্মের উৎস। বিহারীলালের প্রতিভাকে আশ্রয় করে বাংলা কাব্যে রোমান্টিক লিরিসিজম-এর প্রথম সফল প্রকাশ ঘটেছিল। এখানেই তাঁর কবি-কর্মের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা।

বিহারীলাল ও রোমান্টিক গীতিকাব্য

কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্যের পক্ষে আত্মলীন অনুভূতির একান্ততাই একমাত্র সম্পদ নয় ; প্রকাশের যথৌচিত্য, এবং সম্পূর্ণতাও, কাব্য-ধর্মের আবশ্যিক উপাদান। বিহারীলালের কাব্যে প্রথমটি যেমন অপরিমিত-প্রচুর ছিল, তেমনি দ্বিতীয়টির ঘটেছিল একান্ত অভাব। তাই রবীন্দ্রনাথ কবিকে বলেছেন 'ভোরের পাখি'। নবীন ভাব-উষার আলোকসম্পাত কবি-প্রাণকে ভোরের পাখির মতোই কলকণ্ঠ করেছিল। কিন্তু নূতনের আবির্ভাবের সেই আনন্দ সম্ভাবনাকে তিনি পূর্ণ মূল্যে বাণী-মণ্ডিত করতে পারেন নি। বিহারীলালের কবিপ্রাণ তাঁর কাব্য-প্রবাহে পূর্ণ প্রকাশ পায় নি। ভাবের অতিস্ফীতির সঙ্গে অস্পষ্ট গদগদ ভাষণ তাঁর রচনাকে শৃঙ্খলাহীন,—কখনো বা দুর্বোধ্য করেছে।

বিহারীলালের কবি-স্বভাব

নিজের ভাব-স্তিমিত অর্ধাবিষ্ট, অর্ধ-উল্লসিত কবি-সত্তাকে নিজেই কবি সম্বোধন করেছেন

তাঁর 'সারদামঙ্গল' (১২৮৬ সাল) কাব্যে ঃ—

"হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু' নয়নে
কাহারে ধেয়াও।"

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মধ্যেও কখনো খুঁজে ।ান নি কবি,—
তাই 'সাধের-আসন' (১২৯৫-৯৬ সাল) কাব্যে লিখেছেন ঃ—

"কাহারে ধেয়াই, দেবি,
নিজে আমি জানি নে!"

দ্বিতীয়োক্ত কাব্যটি রচনার এক বিশেষ ইতিহাস রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের 'নতুন বৌঠান', কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের কাব্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। 'সারদামঙ্গল' প্রকাশের পরে তিনি নিজের হাতে একখানি আসন সেলাই করে তার মাঝখানে 'সারদামঙ্গল'-এর উদ্ধৃত ছত্র তিনটি লিখে দিয়েছিলেন। আসনটি উপহার দেবার সময়ে কাদম্বরী দেবী কবিকে ঐ কটি ছত্রের উত্তর লিখতে অনুরোধ করেন। সেই উত্তর হিশেবেই কল্পিত হয়েছিল 'সাধের আসন'। কিন্তু অনেকদিন পরে রচনা যখন শেষ হয়েছিল, তার আগে আসনদাত্রী লোকান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, বিহারীলালের কবি-কল্পনার মধ্যে আত্মলীন উচ্ছ্বাসের অধীরতা ও অকৃত্রিমতা যত ছিল, প্রকাশের সংযত সুমিতি ও স্পষ্টতা ততটা ছিল না। তাই কবি হিশেবে তিনি বিশেষভাবে নব-ভাবনার অগ্রদূত,—নবীন রচনার রূপদক্ষ শিল্পী নন। এঁর প্রথম রচনা ছিল একটি গদ্য রূপক,—'স্বপ্ন দর্শন' (১৮৫৮)। তাঁর পদ্য-রচনাবলির মধ্যে আছে 'সংগীত শতক','বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধু-বিয়োগ', 'প্রেম-প্রবাহিনী', 'সারদামঙ্গল', 'বাউল বিংশতি', 'সাধের আসন' ইত্যাদি। 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্য সংক্রান্তি' ও 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদনা, অথবা পরিচালনা- কর্মের সঙ্গেও কবির প্রত্যক্ষ যোগ দিল।

রচনাপঞ্জী

বিহারীলাল-এর রচনায় আত্মলীন গীতি-ভাবনার প্রথম প্রকাশ মাত্রাহীন উচ্ছ্বাসে অতি স্ফীত হয়েছিল। সেই পথ ধরেই বাংলা কাব্যের জগতে এলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), অনেকটাই যেন পূর্বসূরীর আলুলায়িত কাব্য-ভাবনার ৫ ।রে নূতন রূপ-শৃঙ্খলার বিন্যাস সাধন করে। রোমান্টিক ভাবনার ধারাকে তিনি ক্লাসিক্যাল দেহাধারে সংযত করে ধরেছেন। সুরেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'মহিলা' কাব্য দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮০ ও ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, কবির তিরোধানের পরে। ভগ্নস্বাস্থ্য কবি অল্প বয়সে লোকন্তরিত হয়েছিলেন। রোগশয্যায় শুয়ে "মাতা, জায়া, ভগ্নী ও নন্দিনীর মমতার ঋণ" শোধ করবার মানসেই তিনি এই কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'মাতা' ও 'জায়া' অংশ রচনার শেষে, 'ভগ্নী'-অংশ লিখতে আরম্ভ করেই কবির মৃত্যু হয়। ড. সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা কাব্য' বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' পাঠের ফল। বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী'-তে বাঙালি নারীর নয়টি বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য দেখে আবিষ্ট হয়েছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-সূচনায় বলেছেন,—

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

"গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।।"

আগেই বলেছি, সুরেন্দ্রনাথের নারী-মহিমাগাথা চারটি রূপমূর্তিরই সাধনা করতে চেয়েছিল। ভাব-কল্পনায় বিহারীলালের অনুসারী হলেও প্রকাশ-শৈলীর বিচারে তিনি ছিলেন

তাঁর পরিণততর উত্তর সাধক। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'ষড়ঋতু বর্ণনা', 'সবিতা সুদর্শন' ও 'ফুল্লরা কাব্য'। টড-এর 'রাজস্থান'-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন কবি 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' নামে ; 'বিশ্বসন্দর্ভ' নামে একটি গদ্য প্রবন্ধগ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর আরো কিছু গদ্য রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ ভাবে বাংলা-কবিতার রোমান্টিক গীতিধর্ম ভাব ও রূপের প্রথম পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫-১৯২০) রচনায়। তাঁর বহু কাব্য রবীন্দ্র-সমসাময়িক হলেও প্রায় সকল রচনাই রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দেহে ও ভাবে রোমান্টিক বিভার যে ব্যঞ্জনাময় উজ্জ্বলতা, তার সমধর্মী প্রকাশ লক্ষ করি দেবেন্দ্রনাথের র্চনাতে। এর থেকেই বুঝি, এই কবির সৃজনী-স্বভাব ছিল মূলত সমধর্মী।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রবীন্দ্রনাথ নিজে এই সত্যকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন 'সোনার তরী' কাব্যের উৎসর্গ পত্রে—দেবেন্দ্রনাথকে 'কবি ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করে। বিহারীলালের সহজে-আত্মলীন ভাব-স্বপ্ন ও সুরেন্দ্রনাথের অতিশয় রূপ-সচেতনতা দেবেন্দ্রনাথের রচনায় সমন্বিত হয়ে রোমান্টিক কাব্য-চরিত্রকে পূর্ণায়ত করেছিল। ফুলের সম্পর্কে তাঁর কবি-মনের প্রীতি-মধুরতা ছিল স্বপ্নময়। 'অশোকগুচ্ছ' আর 'গোলাপগুচ্ছ' তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্য ; আর সর্বপ্রথম প্রকাশিত কাব্যের নাম 'ফুলবালা' (১৮৮০)। শেষোক্ত রচনায় ১৮টি বিভিন্ন ফুলের রূপ-সুষমা সম্ভোগ করেছেন কবি—১৮টি বিভিন্ন কবিতায়। ফুলের নামে দেবেন্দ্রনাথের আরো দুটি কাব্য আছে 'শেফালিগুচ্ছ' এবং 'পারিজাতগুচ্ছ'। এ-সব কিছুই কবির নিবিড় পুষ্প-প্রীতির পরিচায়ক। প্রেমানুভূতির জগতেও তাঁর রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রীতি ছিল অতলস্পর্শ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'উর্মিলা কাব্য', 'নির্ঝরিণী', আর 'হরিমঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', 'অপূর্ব নৈবেদ্য' ইত্যাদি অজস্র অধ্যাত্ম ভাবময় কাব্য-কবিতা। শেষ জীবনে কবির লোকোত্তরতা-প্রীতি সুগভীর হয়ে উঠেছিল।

দেবেন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সফল ব্যঞ্জনা পেয়েছে—তিনি "অশোক মঞ্জরী হইতে তরুণতা এবং বধূর ভূষণ ঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য চুরি করিয়া লইতে পারেন।" সনেট রচনায় তিনি ছিলেন অনন্য।

বিহারীলালের প্রত্যক্ষ ভাব-শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। কালের বিচারে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক হলেও কাব্য-ভাবনার দিক থেকে ছিলেন

অক্ষয়কুমার বড়াল

রবীন্দ্র-পূর্ব বিহারীলালের যুগের শিল্পী। নারীর গার্হস্থ্য সৌন্দর্যের লুব্ধতায় তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সমধর্মী উত্তর সাধক। অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' (১৯১২) লিখিত হয়েছিল পত্নী-বিয়োগ উপলক্ষে। রোমান্টিক উৎকণ্ঠা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ; স্পর্শকাতরতার অনুভব কোথাও আনন্দে উদ্বেল, কোথাও-বা বিষণ্ণ-উদাস। এ ছাড়া আরো চারখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন,—'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ'। 'এষা' তাঁর সর্বশেষে প্রকাশিত কাব্য।

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) বিহারীলালের অনুসারী ছিলেন না,—ছিলেন তাঁর সমান-কর্মা বন্ধু। বিহারীলালের সমকালে কাব্যরচনা করেও রোমান্টিক ভাবনার সঙ্গে অপূর্ব চিন্তা-সংসক্তির যোজনা করেছিলেন তিনি। এদিক থেকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতুলনীয়। তার কারণও অবশ্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কবি-সুলভ স্বপ্নাবিষ্টতার সঙ্গে অনুস্যূত হয়েছিল দুর্লভ দার্শনিক চিন্তা। এ-দুয়ের সফল কাব্যরূপ ধরা পড়েছে তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (১৮৭৫) কাব্যে। 'যৌতুক না কৌতুক'

(১৮৮৩) নামে একটি গাথাকাব্যও লিখেছিলেন তিনি ; প্রথম জীবনে লিখেছিলেন 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ।

স্বর্ণকুমারী

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) কবিতা রচনা করেছিলেন বিহারীলালের অনুসরণ করে। তাঁর একখানি কাব্যের নাম 'গাথা' ; অপরটি 'কবিতা ও গান'। এঁর উপন্যাস-সাহিত্যের কথা পূর্বে বলেছি।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) বাঙালি গার্হস্থ্যের কর্ণ ধারণ করেও কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর ভাব-কল্পনার কেন্দ্র ছিলেন তাঁর স্বামী। এঁর কবিতা-গ্রন্থাবলির মধ্যে আছে 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম', 'অশ্রুকণা', 'আভাষ', 'শিখা', 'অর্ঘ্য', 'স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা' ইত্যাদি।

মানকুমারী বসু

কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪২) ছিলেন মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর 'প্রিয়-প্রসঙ্গ' গদ্য-পদ্য বিমিশ্র রচনা ; স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী শোকার্তির অনুভবে রচনাটি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এঁর কাব্য-গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে,—'কাব্য কুসুমাঞ্জলি', 'বীরকুমার বধ', 'বিভূতি', 'সোনার সাথী' ইত্যাদি। প্রবন্ধ এবং গল্প-উপন্যাসও লিখেছিলেন মানকুমারী।

কামিনী রায়

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) আলোচ্য কালের মহিলা-কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'আলোছায়া' (১৮৮৯) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য ; এটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্য-ও। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে,—'নির্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'মাল্য ও নির্মাল্য' ইত্যাদি। এঁর কবিতায় উৎকৃষ্ট সনেট-সংকলনও রয়েছে। তাছাড়া গদ্য, প্রবন্ধ, নাটিকা, গল্প, জীবনী ইত্যাদিও তিনি রচনা করেছিলেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবি-খ্যাতি তাঁর নাট্য-কীর্তির চেয়ে কম ছিল না। 'আর্য-গাথা' ১ভাগ (১৮৮২) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। অন্যান্য কাব্য-রচনাবলির মধ্যে আছে 'আর্যগাথা' ২য় ভাগ, 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র', আলেখ্য', 'ত্রিবেণী'।

রজনীকান্ত সেন

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) কাব্যের অধিকাংশ সুমধুর সংগীত-রসে সিক্ত। 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অমৃত' ইত্যাদি কাব্যে তাঁর কবিতা ও সংগীত সংকলিত হয়ে আছে। এঁর রচনার হৃদয়ামোদিতা তাঁকে একদা জনপ্রিয় 'কান্তকবি' নামে পরিচিত ও অভিষিক্ত করেছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন ব্যক্তি নন; নিছক একটি যুগের প্রতিভূও কেবল নন। বাঙালি জীবনের একাধিক যুগপ্রবাহকে তিনি ধারণ ও বহন করে ফিরেছেন তাঁর ব্যক্তিগত সাধনার আকর্ষণ-বিকর্ষণের চারপাশে; বিচিত্র রচনা-সম্ভারের মাধ্যমে একাধিক যুগ-স্বভাবকে রূপ দিয়েছেন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে। রবীন্দ্রনাথ যুগমানব নন, সমকালীন বাঙালি জীবন-ধর্মের মহা-অধিনায়ক তিনি। সেই নায়কতার ভূমিকা বহুলার্থক সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছে ইতিহাসের ফলকে। তাই সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলির ঐতিহাসিক পরিচয় একটিমাত্র পর্যায়সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা প্রায় অসম্ভব। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম ; উনিশ শতকের সমাপ্তি লগ্নে তিনি উত্তর-যৌবন প্রৌঢ়ী-মুখে উপনীত হয়েছিলেন। ১৯৪১ তাঁর দেহান্ত-কাল। ফলে, বিশ শতকের প্রথমার্ধও অস্ত-রবির রক্তিম আলোকে ভাস্বর। একদিকে উনিশ শতকীয় বাঙালি জীবন-চেতনার পরমা পরিণতি লাভ ঘটেছে তাঁর রচনাপ্রবাহে ; অন্যপক্ষে বিশ শতকীয় নব-ভাবনাও আপন তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তত দুটি যুগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তাঁর সৃজন-প্রেরণা।

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

নিজের লেখা প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ কাব্যের কথা কবি জানিয়েছেন, তার নাম 'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়'; পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রার পথে বর্তমানের শান্তিনিকেতন বাসকালে কাব্যটি রচিত হয়। সে বাস কালে কাব্যটি রচিত হয়। সে ১২৭৯ সালের কথা ; কবির বয়স তখন প্রায় ১২ বছর পূর্ণ হবার মুখে। তার আগেও শিশু-রবি নীল বাঁধানো খাতায় ছন্দের মিল বেঁধে বেঁধে কবিতা লিখতেন গোপনে,—সকৌতুক ভঙ্গিতে নিজেই তার বর্ণনা করেছেন 'জীবনস্মৃতি'-তে। কবি-কিশোরের হাতের সৃষ্টির সেই সব আদি রূপ লুপ্ত হয়ে গেছে, পরবর্তী কালে আর কোনো সন্ধান মেলেনি তাদের। আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, তাতে 'অভিলাষ' নামের একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তেরো বছর বয়সে কবিতাটি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (১২৮১ বঙ্গাব্দ) 'দ্বাদশবর্ষীয়' বালকের রচনা বলে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এটি তাঁর রচনা বলে নির্দেশ করেন। তাছাড়া, "হিন্দুমেলার উপহার রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সমন্বিত প্রথম মুদ্রিত রচনা"—বলেছেন ড. সুকুমার সেন। প্রকাশ কালে কবির বয়স ছিল চৌদ্দ প্রায় পূর্ণ হবার মুখে। তারপরে পূর্ণাঙ্গ গাথাকাব্য প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক,—'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সব লেখায় কবি-স্বভাবের স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে নি। পরের কথার অনুকরণ—পরের ওপরে নির্ভরশীলতা ছিল সেকালের রচনার বিষয় আর রচনা-শৈলীর বিশিষ্টতা। কবি নিজে জানিয়েছেন, তাঁর প্রথম মৌলকতা-চিহ্নিত কাব্য 'সন্ধ্যাসংগীত', —গ্রন্থাকারে এই কাব্যের প্রথম প্রকাশ কাল ১২৮৮ বাংলা সাল। তার পরে 'সোনার তরী' (১৩০০ সাল) আর 'চিত্রা' (১৩০২) পর্যন্ত ব্যাপ্ত কাব্যের ধারায় আত্মলীন গীতি কবিতা রচনার উনিশ শতকীয় ইতিহাসের সফলতম পরিণতি ঘটেছে। মোহিতনাথ সেন 'হিতাবাদী' সংস্করণ 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' সম্পাদনা করে 'সোনার তরী' পর্যন্ত কাব্য-ধারাকে শিল্পীর

রবীন্দ্র-রচনার অঙ্কুর ও প্রথম পর্ব

'হৃদয়-অরণ্য' সীমার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'চিত্রা' কাব্যে কবি-চৈতন্য হৃদয়-অরণ্যের দিগন্ত ভূমিতে বিশ্ব-জীবনের অভিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে চলেছে তার বিশ্বাভিসার। বিহারীলালের রচনায় বাংলা গীতিকবিতার প্রথম স্বভাবের পরিচয় দিয়ে কবি বলেছিলেন, "সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর" রূপ পেয়েছিল। কবির নিজের মনের কথা মনের মতো করে বলার সেই রোমান্টিক গীতি-প্রয়াস শিল্প-সুন্দর পূর্ণতা পেয়েছে 'চিত্রা' পর্যন্ত কাব্যধারায়। রবীন্দ্র-কবিতার প্রথম যুগ,—প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের সফল স্বপ্নমূর্তি রচনায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরু 'চিত্রা'-উত্তর কাল থেকে। নিজের কথাকে বিশ্বের কথার সূত্রে গেঁথে,—আত্মলীন স্বপ্ন-দৃষ্টিকে বিশ্ব-বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে ছড়িয়ে নিজের বিশ্ব-রূপকেই সন্ধান করেছেন কবি এই পর্যায়ে। নিজের সৃজনশীল সত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছিলেন,—"আমারই মধ্যে দুই দিক আছে এক আমাতেই বদ্ধ আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুয়েতে মিলেই আমার পরিপূর্ণ সত্তা।" একদিকে তাঁর ব্যক্তি-মন সকল স্বপ্ন-কামনা, আশা-নিরাশা-উষ্ণতা নিয়ে তাঁর ব্যক্তি-সীমাতেই একান্ত বদ্ধ। আর একদিকে কবির জীবন নিরন্তর

দ্বিতীয় পর্বের রচনা

গতিশীল—অন্তহীন কৌতূহল আর সুদূর পিপাসা তাঁর মনকে চঞ্চল করেছে প্রাতিবেশিক বিশ্বের পরিচয় জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়। ফলে একদিকে পরিচিত পৃথিবীর পরিবেশে বিবর্তন-পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র আলোড়নও কবির চেতনাকে মাতিয়ে তুলেছে। আর একদিকে তিনি নিজের কল্পনার আলোকে সেই বহির্জীবন-আন্দোলনকে নব নব রূপ দিয়েছেন আপন রচনা-প্রবাহে। বস্তু-বিশ্বের যতটা চোখে দেখা যায়, তার সঙ্গে বাকিটা ব্যক্তি-মনের কল্পনায় রাঙিয়ে তাঁর সৃজন-প্রেরণা চরিতার্থ হয়েছে। বস্তুত এই সফলতাতেই কবি-সত্তার পরিপূর্ণতা।

নিজের ব্যক্তিত্বের গণ্ডিকে অতিক্রম করে কবির বিশ্ব-মুখীনতার কৌতূহল প্রথম সন্নিবিষ্ট হয়েছিল ভারতীয় ঐতিহ্য-ধর্মের প্রতি। 'নৈবেদ্য' কাব্যে সেই আত্মসমাহিত ধ্যানী চেতনার কর্মোন্মুখতা বলিষ্ঠ প্রকাশ পেয়েছে। আসলে, 'নৈবেদ্য'র আধ্যাত্মিক অনুভূতিই কর্মোৎসাহ-বিরহিত হয়ে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য'-র ভগবদ্-ভাবুকতায় পরিণতি পেয়েছে। এখানেই কবির সৃজন-ধারারও সমাপ্তি ঘটতে পারত। বস্তুত সমকালীন শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সমালোচক অজিত চক্রবর্তী আসলে তাই প্রত্যাশা করেছিলেন। নদীর যেমন পরিণতি সমুদ্রে, তেমনি, তিনি মনে করেছিলেন, কাব্যেরও পরম পরিণাম আধ্যাত্মিকতায়। 'গীতাঞ্জলি'র মোহানায় এসে রবীন্দ্র-কাব্যধারার বিকাশ আপনা থেকে অবলুপ্ত হবে, এই ছিল তাঁর স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কবির চির-চঞ্চল প্রাণধর্ম সে আশাকে সফল হতে দেয়নি। 'গীতাঞ্জলি'-উত্তর পৃথিবীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিদাহ মানবতার ইতিহাসকে যন্ত্রণাহত করেছিল। সমকালীন ভারতবর্ষও সেই বিশ্বব্যাপী বিষ-দহন থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। ভারতবর্ষের বেদনার তরী বেয়ে কবির বিশ্বাভিমুখী মন এবার প্রতীচ্য-পৃথিবীর জীবন-ভূমিতে গিয়ে পৌঁছাল। এখন আর কেবল প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রীতি নয়, কেবল ভাব এবং বিশ্বাস দিয়ে নয়—তার সঙ্গে যুক্তি, বিচার, চিন্তাকেও গ্রথিত করে কবি-মন 'বলাকা'তে নূতন জীবন-পথের সন্ধানে বেরিয়েছে। 'বলাকা'-যুগে রবীন্দ্র-কাব্যমনীষার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ। তারপরে 'পূরবী'র সুরে নূতন বিশ্বানুভবকে শেষবেলাকার বেদনার রঙে রাঙিয়ে চলেছে নূতন কাব্য-পথে কবিমনের অভিসার।

'মহুয়া'র (১৯২৯) পরে কবি-চৈতন্যে নূতন পালের হাওয়া লেগেছে; 'বনবাণী'-'পরিশেষ' পেরিয়ে 'পুনশ্চ'-তে (১৯৩২) তার প্রথম স্পষ্ট পদসঞ্চার। ১৯৩০-এ বিশ্বব্যাপী আর্থিক

মান্দ্যের (economic depression) আঘাতে পৃথিবীর সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছিল। অপর পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যন্ত্র-সভ্যতার প্রসার নূতন উন্নয়ন সম্ভাবনার সঙ্গে নবীনতর সমস্যাকেও জাগিয়ে তুলছিল ক্ষণে ক্ষণে। উত্থান-পতনে বন্ধুর বিশশতকীয় সভ্যতার জীবন-পথকে ক্রমে ছেয়ে ফেলেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেই দুর্ঘটনা তুঙ্গে যখন, তখনই কবির দেহান্ত ঘটে। তাহলেও, যুদ্ধোত্তর সম্ভাবনার অনাগত প্রত্যাশাকে আভাসিত করে গেছেন তিনি সেই দুর্দিনেই। বিশ শতকে মানব সভ্যতার জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত অনিশ্চিত সম্ভাবনার মুখে দিশারির ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের তৃতীয় পর্যায়। 'শেষ-লেখা'তে তার পরিশেষ।

রবীন্দ্র-রচনার পরিণতি যুগ

এই ত্রিধা বিভক্ত পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত কাব্য-রচনার প্রবাহকে সুচিহ্নিত করেছে গল্প-উপন্যাস, নাটক-প্রবন্ধের বিচিত্র-দেহ তীর-ভূমি। সপ্ততি-বর্ষের জয়ন্তী উৎসবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করে কবি বলেছিলেন,—"নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্য-সূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ ভ্রমণ করতে করতে বিদায়-কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝেছি যে,—একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে,—সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র।" এর থেকে স্পষ্ট বুঝি, কথাসাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-কর্মেরই অনুষঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। আর তাঁর কাব্যাস্বাদনের পদ্ধতি নির্দেশ করে কবি বলেছিলেন,—"আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-যোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু, তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে।"

রবীন্দ্রনাথের সকল রচনাই তাঁর বিভিন্ন মনোঋতুর বিচিত্র ফুল ও ফল। কবি-মনের সেই সব বিশেষ ঋতু, তথা পৃথক পৃথক অনুভবের সূত্র থেকেই তাঁর রচনাবলির শিল্প-স্বাদ আহরণ করে নিতে হয়। আর সেই সূত্র অবলম্বন করে যে-কোনো ঋতুর পরিচয় সন্ধান করলে দেখব, প্রায় একই সময়ে লেখা কবিতা ও গল্প-নাটক-প্রবন্ধে মোটামুটি একই ভাবানুভব বিচিত্র ধরনে প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে রবীন্দ্র-রচনার ইতিহাসকে কাব্য, নাটক, গল্প, প্রবন্ধের পৃথক ভাগে বিভক্ত না করে, কবি-মনোভাবের ঋতু-বিকাশের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে বিধৃত করে দেখতে পারাই ভাল।

রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-যুগ

তাছাড়া এ-কথাও স্মরণীয় যে, রবীন্দ্র-যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস কবির একক রচনা-সীমাতেই আবদ্ধ নয় ; সমসাময়িক নানা শিল্পীর রচনায় তাঁদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই যুগ-স্বভাবের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে বিচিত্র রূপ-রসে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়
রবীন্দ্র রচনার উন্মেষকাল

১। অপরিণতির অঙ্কুর

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সূচনা আকস্মিক নয় ; উনিশ শতকের রোমান্টিক গীতি-কবিতার পূর্বসূত্র অনুসরণ করেই বাংলা কাব্যের সৃজন-ভূমিতে তিনি পদক্ষেপ করেছিলেন। বিশেষ করে, অস্ফুট-চেতন কিশোর কবির রচনায় পর-নির্ভরতা ও পূর্বানুসৃতির পরিচয় স্পষ্ট। আগে বলেছি, এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিহারীলালের ভাবানুসারী। অপরাপর পূর্বসূরীর রচনাপ্রভাবও রয়েছে এই সময়কার বিভিন্ন কাব্য-কবিতায়।

প্রথম বয়সের প্রায় সব কয়টি কাব্যই গাথার আকারে লেখা। গ্রন্থাকারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'কবিকাহিনী' (১২৮৫ সাল)। এটি আসলে কবির রচিত দ্বিতীয় কাব্য , প্রথম রচিত কাব্যখানি 'বনফুল'—আগে রচিত, এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হলেও, গ্রন্থরূপে প্রকাশ পায় আরো এক বছর পরে। 'বনফুল'-এর গল্পে অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী'র ছাপ স্পষ্ট। 'কবি কাহিনী'-তে বিকচ-যৌবন কবির স্বপ্নাবেশে স্বকীযতা আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে, বিশেষ করে সরস্বতীর কল্পনায়, বিহারীলালের প্রভাব রয়েছে বৃদ্ধ 'কবি'র শেষ অনুভূতিতে। তার পরেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১২৮৭ সাল)। এই নাট্য-গীতির রচনা ও পরিকল্পনায় বিহারীলালের প্রভাব নিজেও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' (১২৮৮) একই সালে প্রকাশিত আরো দুখানি অপরিণত নাট্যগাথা। 'কালমৃগয়া' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৯ বাংলা সালে। 'শৈশব সংগীত' ১২৯১ সালে প্রকাশিত হলেও রচিত হয়েছিল অনেক আগে, কবির বারো থেকে আঠারো বছর বয়ঃসীমায় রচিত কবিতাবলির নির্বাচিত সংকলন এটি।

অ-পরিণতির যুগের কাব্য

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র প্রকাশ ঘটে ১২৯১ সালে,—'সন্ধ্যাসংগীত'-এর প্রায় তিন বছর পরে। কিন্তু এ'র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছিল বহু আগে,—ভানুসিংহের প্রথম কবিতার রচনাকাল ১২৮৪ সাল। বৈষ্ণব কবিতার রস আস্বাদন করে কবি একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন ; বয়স তখন ষোল বছর মাত্র। প্রায় একই সময়ে 'অক্ষয়বাবুর' কাছে ইংরেজ বালক-কবি চ্যাটার্টন-এর গল্প শুনেছিলেন,—"চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই।" বৈষ্ণব ব্রজবুলি কবিতার রূপ-রসময় অভিনবতার সঙ্গে এই আশ্চর্য গল্পের প্রেরণা বালক-কবিকে পুলকিত করেছিল। অতএব, "কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত" হলেন। এই প্রেরণা থেকেই 'ভানুসিংহ-পদাবলী'র জন্ম ;—"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়া-ঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম, 'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে'।" এইটিই 'ভানুসিংহের' প্রথম পদ, কবির ছদ্ম নামে 'রবীন্দ্রনাথ'-শব্দার্থের অভিনব রূপান্তর সত্যই কৌতুককর। পরবর্তী ইতিহাসে কৌতুক আরো ঘন-বদ্ধ হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর এক বন্ধুকে কিছু পদ পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরিতে আবিষ্কৃত একটি পুরাতন পুথি থেকে পদগুলি সংকলিত। সকলেই এ-কথা বিশ্বাস

করেছিলেন। এমন কি, কবি জানিয়েছেন, এই প্রাচীন কবি সম্বন্ধে সমালোচনা-নিবন্ধ লিখে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানিতে ডক্টর উপাধি পেয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তথ্যাদি উদ্ধার করে জানিয়েছেন, কবির দেওয়া খবর "ভ্রমশূন্য নহে।" যাই হোক, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-ও অপরিণত যুগের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। পরানুকরণ,—পরনির্ভরতার প্রবণতাই ছিল সে যুগের প্রধান ধর্ম। তবু এই রচনা পরিণত রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে; তার কারণ ভাবের অস্ফুটতা ভাষা ও রচনাশৈলীর পরিণতির অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। তাছাড়া, সেকালের পাঠকদের কৌতুককর প্রতিক্রিয়াও এর রচনা-ইতিহাসকে সরল করে রেখেছে।

এই অপরিণত কালের একমাত্র উল্লেখ্য গদ্য 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৮ সালে। ১২৮৫ বাংলা সালে কবি বিলেত গিয়েছিলেন প্রথম বার—'মেজদা' সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেখান থেকে পুরোদস্তুর ব্যারিস্টার হয়ে আসবেন, এই ছিল গুরুজনদের আশা। কিন্তু ফিরে আসতে হয়েছিল দু বছরের মধ্যেই। কবির এই প্রত্যাবর্তন আকস্মিক ও রহস্যময়। তবু এর পেছনে 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার প্রভাব কিছুটা পরিমাণে অনুমান করা অন্যায় নয়। য়ুরোপে নারী-স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির তুলনায় এ-দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মুখর প্রতিবাদ ঐ পত্রাবলির অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। ঠাকুর পরিবারের বহুদিনের আশা-বিশ্বাস-সংস্কার তাতে শংকিত হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে 'ভারতী' সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'পত্র' লেখকের তীব্র মত বিনিময় হয় 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই। পরে সংযত পরিশোধিত আকারে লেখাটি গ্রন্থ-বদ্ধ হয় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে। এ-রচনার মধ্যেও অপূর্ণ কিশোর মনের অপরিণতির পরিচয় প্রধান। কবি বলেছেন,—"এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্য বয়সের বাহাদুরি।" পৃথক্ প্রবন্ধ হিশেবে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' নামক সাহিত্য-সমালোচনা নিবন্ধ কবির প্রথম প্রকাশিত রচনা হলে কথিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৩ বাংলা সালে।

অপরিণত গদ্য রচনা

২। উন্মেষকালের কাব্য-কবিতা

কবি বলেছেন,—"সন্ধ্যাসংগীতে আমি সর্বপ্রথম নিজের সুরে নিজের কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার ছন্দ, ভাষা, ভাব সমস্তই কাঁচা হইতে পারে এবং কাঁচা হইবারই কথা। কিন্তু দোষগুণ সমেত আমার।" অর্থাৎ, এখান থেকেই কবির রচনা-পদ্ধতি স্বধর্মের অভিমুখী হয়েছে। তাতে কবি উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ করে অনুভব এবং আবিষ্কার করতে না পারার বেদনাও অপার। সেই রহস্যময় রোমান্টিক বেদনাই 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কবিতাগুচ্ছের মূল উপজীব্য। কবি বলেছেন—"মানুষের মধ্যে একটি দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে-মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভাল করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন সেই অন্তর-নিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস প্রকৃতি বঞ্চিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না, ইহার বর্ণনা নাই—এই জন্য ইহার যে রোদনের ভাষা, তাহা স্পষ্ট

'সন্ধ্যাসংগীত'

ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে।"

'সন্ধ্যাসংগীত'-এর আলো-আঁধারে সেই সুরময় অনুভব-বেদ্য ভাষাকে সন্ধান করে ফিরেছেন কবি তাঁর মানস-দৃষ্টিতে—

"বুঝিগো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া, আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।"

'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পরের কাব্য 'প্রভাতসংগীত' প্রথম গ্রন্থিত হয় ১২৯০ বাংলা সালে। রবীন্দ্র কাব্যের ইতিহাসে 'প্রভাতসংগীত' প্রথম আত্মসচেতনার প্রভাত-আলোক বয়ে এনেছিল। এদিক থেকে কাব্যগুলির নামকরণ ব্যঞ্জনাবহ। সন্ধ্যার মতো আলো-আঁধারি আবছায়ার রহস্য-লোকে নিজের অজানা স্বরূপকে খুঁজে ফিরেছেন কবি 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ, আর তাতেই না পাওয়ার অতৃপ্তি বে...টিক বিষণ্নতা জন্ম দিয়েছে সারাটি কাব্য-কবিতায়। 'প্রভাতসংগীত'-

'প্রভাতসংগীত'

এ কবির সেই অস্ফুট মনোলোকে প্রথম নিঃসংশয় আলোকচ্ছটা প্রবেশ করেছে,—প্রভাতের মতো অনাবৃত সেই আলোতে কবি নিজের পরিচয় খুঁজে পেয়ে বিস্মিত, স্তম্ভিত উল্লসিত হয়েছেন। তারই উচ্ছ্বসিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' কবিতায়। এই কবিতা রচনার ইতিহাস বিবৃত করে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন,—"শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" তারই ফলে জীবনে এই সর্বপ্রথম কবির মনে হতে লাগল,—

"হৃদয় আজ মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুল ॥"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভবের অঙ্কুরোদগম এখানেই। জগতের ক্ষুদ্র তুচ্ছতম বস্তুকে তিনি কখনো একান্ত তুচ্ছ করে দেখেন নি। সমগ্র বিশ্বের 'নাড়িচলাচলে'র ওঠা পড়া ছন্দে মিলিত করে দেখেছেন। কোনো কিছুকেই তিনি স্বতন্ত্র একক করে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না,—সব কিছুকেই সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ করে দেখতে চাইতেন। ফলে, কবি বলেছেন,—কোন এক মুহূর্তে "পৃথিবীর সবত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম।" কিংবা,—"রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত, তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে।" ব্যক্তিকে এমনি করে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে, বিশেষকে নির্বিশেষের সঙ্গে জড়িয়ে অখণ্ড করে দেখবার আকাঙক্ষাকে ক্রম-সম্পূর্ণ করার সাধনাই বস্তুত রবীন্দ্র-কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ; 'প্রভাতসংগীত'-এর কবিতায় এই অনুভবের

প্রথম জন্ম।

'ছবি ও গান' 'প্রভাতসংগীত'-এর পরবর্তী প্রকাশিত কাব্য; দুটি কাব্য একই সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রভাতসংগীত'-এর পরবর্তী ভাবানুভবের অনুষঙ্গ চলেছে 'ছবি ও গান'-এ। কবি জানিয়েছেন,—"নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি স্বতন্ত্র ছবিকে যেন কল্পনার আলোক ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম....গানের সুর যেমন শাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে, তেমনি কোন একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেটিকে হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা 'ছবি ও গান'-এ ফুটিয়াছে।"—অর্থাৎ 'প্রভাতসংগীত'-এর 'চৈতন্য দিয়ে' দেখার প্রথম অনুভব তখনও দেহ-মন-প্রাণে নতুন সৌন্দর্য-চেতনার সঞ্চার করে ফিরছে। তাই কবির সুন্দর-পিপাসু দৃষ্টি বাইরের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগতের প্রতি উন্মুখ হয়ে আছে। কোনো তুচ্ছতাকেই তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে না—সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে নিখিলের অন্তহীন সৌন্দর্যের আভা। সেই মধুরিমাকে নিজের সুর-সুন্দর মন দিয়ে আকণ্ঠ পান করছেন,—আর শব্দে ছন্দে রূপ গ্রহণ করছে একটি করে সুর-তরঙ্গিত ছবি,—গানে আঁকা সৌন্দর্যের ছবি।

'ছবি ও গান'

ভাবানুভবের পরম্পরা বিচারে 'ছবি ও গান'-এর পরের কাব্য 'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩)। দীর্ঘদিন ধরে এই কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক কবিতার রচনাকাল ১২৯১ বাংলা সালে কবির নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-শোকের মধ্যে। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কিশোর-কবির কল্পনা-বিধাত্রী, এবং তাঁর ভাব-প্রেরণার কেন্দ্র-শক্তি ছিলেন। 'জীবন স্মৃতি'তে 'মৃত্যুশোক' প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য আরো বহু উপলক্ষ্যে কবি এই মানসী শক্তির অজস্র উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর অমূর্ত প্রভাব কবির শেষ বয়সের কাব্য-কবিতাদিতেও পরিস্ফুট হয়ে আছে। 'কড়ি ও কোমল'-এর কিছু সংখ্যক কবিতায় এই মৃত্যু-শোকের অভিভূত আর্তি রয়েছে। তাহলেও 'কড়ি ও কোমল' আসলে যৌবন-উন্মাদনার কাব্য। জীবনের সৌন্দর্য-রূপকে পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিচিত্র মধুরিমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। প্রথম যৌবনের উল্লসিত আকাঙক্ষা দিয়ে সেই অনন্ত সৌন্দর্য-সম্ভার প্রেয়সী নারীর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ভোগ করার স্পৃহা ক্ষণে ক্ষণে অদম্য হয়েছে :—

'কড়ি ও কোমল'

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধর-সংগমে।"

লক্ষ করা উচিত, দেহের সীমাতেও প্রেমের যে রূপ কবি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, তা কেবল ইন্দ্রিয়াকৃতির সীমায় বদ্ধ থাকে নি,—দেহের দেহলিতেও কবি "ভালবাসার তীর্থযাত্রী" স্বরূপকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-কবিকল্পনার মধ্যে নিছক দেহাসক্তি,—রক্তমাংসের রূপাতুরতা ছিল না কোথাও। তাই যৌবনের কামনা যখন সুন্দরকে দেহের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছে, কবির সহজ প্রবণতা তখন দেহকেও ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে প্রেমকে করেছে বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ।

যৌবনের বাসনা যত শান্ত হয়েছে, নিঃসীম প্রেমকে দেহের সীমায় বাঁধতে গিয়ে কবি-মনের অতৃপ্তি ততই পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। 'কড়ি ও কোমল'-এর শেষ পর্যায়েই সে

অনুভবের উদ্বেজনা ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে :—

"এ মোহ কদিন থাকে, এ-মায়া মিলায়,
কিছুতেই পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে—
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।"

'মানসী' কাব্যে (১২৯৭) এই মোহ থেকে মুক্তি ঘটেছে,—বহুল ঘাত-সংঘাতের মানসিক ঝড় পেরিয়ে। বাইরে যে প্রেমের শক্তি ছিল রূপান্বিত, এই কাব্যের পরিণতি-পর্যায়ে তাই মনের মাধুরীময় হয়ে 'মানসী' মূর্তি ধরেছে। এই কাব্যের 'উপহার' অংশে স্বয়ং কবি তাঁর বিশেষিত মানস-ঋতুর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,—

'মানসী'

"নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারাদিন রাত।
এ চির জীবন তাই, আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

জগতের রূপ-রস-গন্ধময় বহিঃসৌন্দর্যকে কবি তাঁর সীমায়িত মনের মধ্যে তখনও সম্পূর্ণ করে পেতে চেয়েছেন; অনন্ত-বিচিত্রকে উপলব্ধি করেছেন নিজের একান্ত-একক মনোময় রূপে। কিন্তু বিশ্বজগৎকে হৃদয়ের গভীরে অনুভব করায়,—দেহের আকৃতিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে মানসলোকে উত্তরণের চেষ্টায় কবিকে আত্মজয় করতে হয়েছে ধাপে ধাপে। ফলে 'মানসী'র ক্রমপরিণত ভাবনার ধারাও চলেছে দীর্ঘদিন ধরে; ১২৯৪ বাংলা সালের বৈশাখ থেকে ১২৯৭ সালের কার্তিক পর্যন্ত। এই সাড়ে তিন বছরে কবিতা-রচনার প্রবাহ অবিরত থাকে নি,—বারে বারে ছেদ পড়েছে,—প্রত্যেক নূতন পর্যায়েই পরিণততর ভাবনার আন্দোলনে নূতন ঝাঁকের কবিতা রচনা চলেছে কিছুদিন। 'মানসী'র কবিতা-প্রবাহকে কবি-মনোভাবের বিস্তারের প্রেক্ষিতে চার পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে আছে আক্ষেপ ও অভিমান। দেহের আকাঙ্ক্ষায় কেন আর প্রাণে সাড়া জাগে না, অতৃপ্ত যৌবনের সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা! 'ভুলে' 'ভুলভাঙ্গা' ইত্যাদি কবিতা এই পর্যায়ের রচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে, সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণাবোধ। কবি নিশ্চয় বুঝেছেন, দেহের বাসনার তৃপ্তি নেই—নেই কোনো চরিতার্থতা। তবু অন্ধ আকাঙ্ক্ষার অভ্যস্ততা কাটিয়ে ওঠা দুঃসহ হয়,—মনে হয় :—

"বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
ভালবাস, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।"

ক্রমে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়ে উঠেছে মনে মনে,—তৃতীয় পর্যায়ব্যাপী সুদীর্ঘ আত্ম-সংগ্রামের পরে। সেই অনুভবের আনন্দে লিখলেন 'রাজা ও রানী' নাটক। সে-কথা পরে বলছি ; এখানে

কেবল স্বীকার করে রাখি,—'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতার উন্মত্ত সীমিত প্রেমকে অতিক্রম করে অসীম প্রেমে উত্তরণের সফল সংঘাতচিত্র রয়েছে 'রাজা ও রানী' নাটকে। এদিক থেকে নাটকটি 'মানসী' কাব্য-ভাবনারই অনুসৃতি।

'রাজা ও রানী'র পরে 'মানসী'র চতুর্থ স্তর। সীমা-মুক্ত 'অনন্ত প্রেম'-এর সন্ধান মিলেছে এই পর্যায়ের আনন্দ-শান্ত কবি-মনে,—মনে হয়েছে :—

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
আজি সেই চির দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে.
রাশি রাশি হয়ে তোমার প্রেমের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি—
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি ॥"

প্রেমের এই ধ্যান-তন্ময় স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারার আনন্দ ক্রিয়াচঞ্চল রূপ ধরেছে 'বিসর্জন' নাটকে। আর এই ধারারই কাব্যানুবর্তন চলেছে 'বিসর্জন'-উত্তর আরো কিছু সংখ্যক কবিতায়।

'মানসী' কাব্যে কবি প্রথম আত্মমুক্ত প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন নিজের নিভৃত হৃদয়-অনুভবে। এখানেই কবি-চেতনার প্রথম মুক্তি; এদিক থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে 'মানসী'র প্রতিষ্ঠা অতুল্য। তা ছাড়া, আরো একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন কবি স্বয়ং :—"'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।" এক কথায়, ভাবে এবং রূপ-শৈলীতে রবীন্দ্র-কবিচেতনার প্রথম উন্মোচন 'মানসী' কাব্যেই।

'মানসী'র পরে 'সোনার তরী' কাব্যে (১৩০১ বঙ্গাব্দ) এই মুক্তির পটভূমি আরো ব্যাপক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। কাব্য-সাহিত্য মাত্রই জীবন-সম্ভব। জীবনের অনুভব আর অভিজ্ঞতা যত বিস্তৃত হয়, শিল্পীর কল্পনা ও রচনার প্রচ্ছদ ততই হতে থাকে ব্যাপ্ত,—ব্যাপ্ততর। এদিক থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সন্তান কিশোর রবীন্দ্রনাথের বাধা ছিল অনেক। পিতা থাকতেন দূরদেশে, প্রায়ই হিমালয়ের দুর্গমতায় ; বাড়ি ফিরে যখন আসতেন, তখনো বিনা অনুমতিতে তাঁর ছায়া মাড়াবার অধিকার ছিল না শিশুদের। অগ্রজ, যাঁরা বয়সে এবং চিন্তা-ভাবনায় ছিলেন কবির পিতৃতুল্য, তাঁদের মহলেও ছিল প্রবেশ নিষেধ। ঘুমিয়ে পড়বার আগে মার কাছে ঘেঁসবার উপায়ও অবরুদ্ধ। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে ভৃত্য-রাজকতন্ত্রে, অল্পদিন পিতার সঙ্গে হিমালয় চূড়ায়,—পেনেটির বাগান বাড়ির সীমা-বন্ধনে। মাতৃবিয়োগের পরে 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবী বন্ধন-পীড়াতুর শিল্পীর মনকে মুক্তি দিলেন,—টেনে নিলেন তাঁকে নিজের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে। সেখানে কবি বড়ো-মনের সঙ্গ পেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছেন, কিন্তু মনকে জীবনের অপার বৈচিত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন নি। হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় উদাত্ততা আছে, সীমাহীনতা আছে,—আছে পাথরে গড়া কাঠিন্যের ঢেউ। কিন্তু প্রকৃতির উত্তাল-উচ্ছলতা, কোমল-সুন্দরতার তরঙ্গমালা নেই তাতে। তাছাড়া, হিমালয়ের মহিমা বরণীয় হলেও, তা নিঃসঙ্গ-একক, মানব-সান্নিধ্যহীন। ঠাকুর বাড়িতে কবির সঙ্গী ছিলেন নিয়ত রসমগ্ন অক্ষয় চৌধুরী, আদর্শ ছিলেন বিহারীলাল,—তাঁর মনকে টেনেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও অপরাপর অনেকে। মানব-ধর্মের উত্তুঙ্গ মহৎ রূপকে দেখেছেন কবি সেখানে। তাতে হৃদয়ের প্রসার বাড়ে ; কিন্তু বিচিত্রতার ক্ষুধা মেটে না। তাই যৌবন-সীমায় এসে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত

যখন হয়েছেন, তখন থেকেই তিনি বাইরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন দেহে-মনে। এর আগে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের বা পেনেটির পর্যায়ে তাঁর মুমুক্ষু প্রাণ মানস অভিযানের সীমাতেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। 'মানসী' লিখবার সময়ে কবি গাজিপুরে গিয়েছিলেন—সেখানে গোলাপ-খেতের অবারিত প্রাচুর্যের মধ্যে নিজের হৃদয়কে নিঃসীম মুক্তি দেবার আকাঙক্ষায়। নতুন পরিবেশে নতুন সুর লেগেছে মনে। কিন্তু আত্মার মুক্তি ঘটে নি। তাতে কেবল ছিল "নতুন স্বাদের উত্তেজনা"। ফলে "নতুন নতুন ছন্দের বুনুনির কাজ" চলেছে, কিন্তু আত্মার গভীরে নতুন গানের সুর জাগে নি। তা জেগেছে 'সোনার তরী'র পর্যায়ে। এই সময়ে পিতার আদেশে কবিকে উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে পরিচালনা কর্মে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। এই অবকাশে চেতনার আমূল প্লাবিত করে দেখা দিয়েছিল নবজীবন-বোধের উত্তাল তরঙ্গধারা।

'সোনাবতরী' ঃ—
প্রেবণা ও পটভূমি

'সোনার তরী'-কাব্যের পশ্চাৎবর্তী ভাব-প্রেরণা সম্বন্ধে কবি বলেছেন ঃ—"আমি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণে আলোকছায়ার তুলি। এখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচেছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি,—সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শে সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা,—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য-সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে।"

'সোনার তরী' সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা,—এখানেই জীবনের অপার বিস্তৃত অন্তহীনতার বোধ কবির মনে অবিচল প্রত্যয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ-পর্যন্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের এমন মুক্ত বিচিত্র রূপ কখনো ধরা পড়েনি তাঁর চেতনায়। অভিনবভাবে—অসীমকে জানার আনন্দ তাতে নির্বাধ হয়ে দেখা দিল। কত রহস্য, কত অজ্ঞাত অনুভব উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। একদিকে অনন্ত পাথার পদ্মা, পদ্মাতীরের গগনচুম্বী নিঃসীম প্রান্তর, আর তারই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিচিত্র সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় চঞ্চল মানবজীবনের চিত্র ছুটে চলেছে চলচ্চিত্রের মতো। কবি কেবল অনুভব দিয়েই এদের স্বাদ গ্রহণ করেন নি, জীবনের কর্মপ্রবাহকে এঁদের জীবন-ধারার সঙ্গে দিয়েছেন মিলিয়ে। অপার-বিস্তৃত জীবন-রূপের লীলা চলেছে কেবল মনে মনে নয়,—"দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার।" নতুন অনুভব ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই কাব্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আপন কবি-জীবনের আদর্শ ও সাধনাকে এবারে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেন রবীন্দ্রনাথ :—

"অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীত রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।

হৃদয়-অরণ্যের পথ-সংমোচন

ধরণীর শ্যাম করপুট-খানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থ ভরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়।
সাগরের জলে, অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তারপরে ছুটি নিব।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর—
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের কথা
বিদায়ের আগে দুচারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।"

বস্তুত, এখানেই রবীন্দ্রনাথের আত্ম-উন্মোচন বিকশিত হয়ে উঠেছে। আগে বলেছি, 'সোনার তরী' পর্যন্ত কাব্য-প্রবাহকে কবির 'হৃদয় অরণ্য'-বাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিহারীলালের কবি-স্বভাব-চিহ্নিত উনিশ শতকের আত্ম-বিহ্বলতার থেকে মুক্তির সুর লেগেছে এখানেই। মানুষের জীবনের অব্যক্ত ব্যাকুলতা,—তার ছোট সুখ, ছোট হাসির অপার কাব্য-সম্ভাবনা কবিমনকে আলোড়িত করে তুলেছে । এবার থেকে তাই দৃঢ় প্রত্যয়ে স্থির করেছেন নতুন কবিতা লিখবেন এই বৃহৎ পৃথিবীর জন্যে,—এই পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের সুখ-দুঃখের অসংখ্য ছোট-বড় কথা নিয়ে। নিজের আত্মগত কুণ্ঠার গভীরতা থেকে একবার যখন পৃথিবীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন,—তখনি মনে হয়েছে,—এ যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের চেনা :—বলেছেন,—

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল,অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল গন্ধরেণু"

'সমুদ্রের প্রতি' তাকিয়ে মনে হয়েছে,—এর ভাষা যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের জানা ; মর্মের গভীরে সে অজ্ঞাত ভাষার রহস্য সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করেছে চেনা-অচেনা ধ্বনির ব্যাঞ্জনায়।

তবু 'সোনার তরী'র প্রায় সব কবিতাই প্রচ্ছন্ন বেদনার সুরে করুণ। কারণ বিশ্বের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের অনন্তলোকে কবি-আত্মার আহ্বান এসে পৌঁচেছে ;এ-কথা কবি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছেন, সর্বপ্রথম 'সোনার তরী' কবিতাতেই। অথচ, সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্ত পৃথিবীর মাঝখানে বেরিয়ে আসবার সাধ্য ছিল না তখনো কবি-চেতনার। ঠাকুরবাড়ির মুখচোরা, আত্মকেন্দ্রিক শিশুটি,—এই মুক্ত-যৌবনেও নিজের মনের কল্পলোকের খাঁচায় বাঁধা পাখিটি যেন,—তার আক্ষেপ :"হায়, মোর শকতি নাহি উড়িবার।" আসলে তখনো চলেছে হৃদয়-অরণ্যে বাস।

'সোনাবতবী'তে অপূর্ণতাব কাকণ্য

তার থেকে পূর্ণ মুক্তি প্রথম ঘটলই 'চিত্রা' কাব্যে (১৩০২)। এর আগে, একই বছরে গ্রন্থিত হয়েছিল 'নদী' কাব্য। এটি শিশু-কবিতা,—এখন 'শিশু' কাব্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনটি কবিতা ছাড়া আগাগোড়া কাব্যটি যুক্তাক্ষর হীন, কাব্যের ছন্দেও শিশুহৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নদী-বাসের অনুভব অক্ষয় রসরূপ পেয়েছে এই কাব্যে।

'নদী'

'চিত্রা' কাব্যের পরিচয় 'চিত্রা' নামক মুখবন্ধ-কবিতাতেই স্পষ্ট হয়ে আছে। জীবনের অনামিকা প্রেরণাময়ীকে ডেকে কবি বলেছেন,—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

আবার দ্বিতীয় স্তবকে তাঁকেই বলেছেন,—

"অন্তব মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।"

'চিত্রা

এই অনুভবের তাৎপর্য স্বয়ং কবি-ই ব্যাখ্যা কবেছেন,—"বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্ম-জীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্টো কথা। কবি বলেছে, 'কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জড়তায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমাব স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা ত[illegible]ার কাছে।' জীবনের ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অ[illegible]র একাকিনী, কবির কাছে এই দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।"

অর্থাৎ বাইরের রূপ-রস-গন্ধাদির মধ্যে সৌন্দর্যের যে বর্ণালি স্বাদ আভাসিত হয়ে ওঠে চৈতন্যের বহিরঙ্গে, অন্তরে অন্তরে তার সব-কিছুর সৌরভময় নিরঙ্গ অনুভবকে অখণ্ড করে পাবাব আকাঙ্ক্ষা হয় তীব্র। বাইরের বিরাট বিশ্বভূমিকে অন্তরে অন্তরে যখন বলতে পারি, "আমার,— একান্ত আমার"—তখনই কবি-চৈতন্য সফল সম্পূর্ণ, সার্থক। 'চিত্রা' কাব্যে এই দ্বিমুখী প্রাপ্তির পূর্ণতা ঘটেছে। তাই এর একদিকে রয়েছে 'উর্বশী', 'প্রেমের অভিষেক' প্রভৃতি কবিতায় নিরঙ্গ সৌন্দর্য-রস-সম্ভোগের আন্তর তৃপ্তি। আর একদিকে 'সুখ', 'পূর্ণিমা' ইত্যাদি কবিতায় বহিঃসৌন্দর্যকে আকণ্ঠ পান করতে পারার চরিতার্থতা হয়েছে নির্বাধ —সংযত-মুক্ত।

'চিত্রা' কাব্যানুভবের আর একটা বিশেষত্ব 'জী নদেবতা'-কল্পনার উদ্ভব ও উন্মোচন। 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা', 'চিত্রা' প্রভৃতি কবিতায় কবি তাঁর অন্তর-চেতনার লালনরতা এক সর্বময়ী অধীশ্বরীকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন একসঙ্গে মনের গহনে এবং বাইরের অনুভবে।

'জীবনদেবতা' কবিতায় এই অনামিকা শক্তির নামকরণ হল। তখন থেকেই এঁর দার্শনিক স্বরূপ ব্যাখ্যা নিয়ে নানা বিতর্ক চলেছে। বিভিন্ন মতের তালিকায় কবি তাঁর নিজের মতটুকুকেও লিপিবদ্ধ করে গেছেন:—"যিনি 'আমি' নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র হইতে লোক-লোকান্তর যুগ-যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি অনাদি-কালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া চলিয়াছেন আমি জানি না, সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্যে আমি যাঁহাকে খণ্ড খণ্ড স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্ত ভাবে সুখ-দুঃখ অশ্রু হাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, 'চিত্রা' গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই, যিনি বিশেষরূপে আমার, অনাদি অনন্ত কাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎ সংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন.......'চিত্রা' কাব্যে তাঁহারই কথা আছে।"

অর্থাৎ 'সোনার ‹রী'-'চিত্রা'র পর্যায়ে কবি আপন চেতনার অন্তহীনতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলেন; মনে মনে বুঝেছিলেন,—জন্মে জন্মান্তরে, দেশে দেশান্তরে বিচিত্ররূপে তাঁর নিজেরই চেতনার নিরন্ত লীলা চলেছে। তাদের সকল কিছুর খবর কবির নিজের জানা নেই। তবু এ-বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ় যে, বহু জীবনের খেয়াতরী বেয়ে আজকের বেলাভূমিতে পৌঁচেছেন তিনি ; আবার এই জীবনের নৌকা বেয়ে পাড়ি দিতে হবে অনাগত অনন্ত জীবনের ঘাটে ঘাটে। অথচ যেমন অতীতে, তেমনি অনাগতে, ঐ সব জীবন-লীলায় কবির নিজের কোনো অধিকার ছিল না, থাকবেও না। এমন কি এই চলমান জীবনের প্রত্যক্ষ সৃজন-ভূমিতেও নিজের পূর্ণ অধিকারের প্রতিষ্ঠা অনুভব করতে পারছেন না কবি। তাঁর নিজের কথা যখন কবিতায় রূপ পাচ্ছে, তখন সে-যেন আর কারো কথা, আব কারো ভাবনায় অপরূপ হয়ে উঠছে। ভেতরকার সেই রহস্যময়ী শক্তি-রূপাকে ডেকে তাই কবি বলেন :—

জীবনদেবতা ও কবিব আত্মমুক্তি

"একি কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।"

ইনিই কবির জীবনদেবতা ; তাঁর 'অন্তর্যামী'। তাহলেও যুগে যুগান্তরে—জন্ম জন্মান্তবের মধ্য দিয়ে কবির এই যে ক্রমবিকাশ, তা তো বিশ্ব-বিযুক্ত নয়! বিশ্বের একজন হয়ে বিশ্বের সঙ্গেই কবি পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠছেন দিনে দিনে। কিন্তু আত্ম-চেতনাদীপ্ত একান্তবদ্ধ আত্ম-প্রীতির ফলে, বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না কবি। তা পেয়েছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে—বলতে পেরেছিলেন :—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো।
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো ॥"

সেদিন জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতার বিভেদ-গণ্ডী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কবির মনে প্রাণে। কিন্তু 'চিত্রা' কাব্যে কবি-চৈতন্য 'আমি'-রসময়। বিশ্ব থেকে নির্বাসিত হয়ে, বিশ্বকে নির্বাসিত

করে নিজের একক-সুন্দব বিকাশের রূপলোকে ডুব দিতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। 'চিত্রা' কাব্যে যৌবন-সৌন্দর্যের আকৃতি নিয়ে কবি-আত্মার বিশ্বাভিসার শুরু হয়েছে। এখানেই 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে তাঁর মুক্তি।

'চিত্রা'ব পরে গ্রন্থিত কাব্য 'চৈতালি' প্রথমে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় নি ; ১২০৩ সালে 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অঙ্গ হিশেবে এর প্রথম প্রকাশ। ড. সুকুমার সেন 'চৈতালি' থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভাব "জীবনমুক্তিব কাল" নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ, এই সময় থেকে কবি 'আমি-ময়' জগতেব সীমা-ভূমি পেরিয়ে বিশ্বের সহজ সৌন্দর্য-লোকে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এখান থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে নব-পর্যায় আভাসিত হতে আরম্ভ করেছে। সে আলোচনা চলবে পরের অধ্যাযে।

৩। উন্মেষ কালের নাট্য-সাহিত্য

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি

আগে দেখেছি, ববীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র কর্ম-প্রবর্তনা, ও আজীবন সাধনার সকল ক্ষেত্রেই নিজেব অন্তরের একটি মাত্র সত্তার পুনঃপুন প্রকাশ লক্ষ করেছেন , সে আর কেউ নয় 'কবিমাত্র'। নাটকে, গল্পে, প্রবন্ধে,—বচনাব সকল ধাবায এই কবিমাত্র-ভাবনাই নানামুখী প্রকাশ লাভ কবেছে। একদিক থেকে ববীন্দ্রনাট্য ও ববীন্দ্রকাব্য-প্রবাহেরই অংশ। প্রত্যেকটি নাট্য-বিষয়ের অন্তরালে সমকালীন কবি-মনোভাবের আভাস কাব্য-ব্যঞ্জিত হয়ে আছে।

কালমৃগযা

আগে বলেছি, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রথম রচিত হয়েছিল অপরিণতির কালে। তারপবে লেখা হয 'কালমৃগযা' (১২৮৯)। এই নাটকটি 'সন্ধ্যা সংগীত' এর পবে লেখা হয়েছিল ; দশবথেব হাতে অন্ধমুনিব পুত্রের মৃত্যু ছিল গল্পেব ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগযা' নাটক দুটিকে বলেছেন, "গানের সূত্রে নাট্যের মালা" ; বলেছেন,—"একটা দস্তুরভাঙ্গা গীত-বিপ্লবেব প্রলযানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।" জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ও ববীন্দ্রনাথ মিলে তখন বাংলা গানে ইংরেজি সুর বসিয়ে নতুন সুর-বিপ্লব সৃষ্টির নেশায় মেতেছিলেন। নতুন ভাবের বিশেষিত দোলা লাগেনি তাতে। 'কালমৃগয়া'র কয়েকটি গান বাল্মীকিপ্রতিভা'ব দ্বিতীয়-সংস্করণে গৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া এই নাটকটি আর প্রকাশিত হয নি।

'প্রকৃতিব প্রতিশোধ'

পরের নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিত হয়েছিল কারোয়ার-এর সমুদ্র-বেলায়। কাব্যে তখন 'ছবি ও গান'-এর যুগ চলেছে ; প্রকৃতির সর্বব্যাপক পটভূমিতে কবি-চিত্তের চলেছে নিত্য-লীলা-সংগম। সেই অনুভব অনুপূরিত হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ। কবি নিজেই বলেছেন,—এটি 'নাট্যকাব্য'। "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই, তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"—'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ কবিমনের এই অনুভবই কাব্য-স্বাদুতা পেয়েছে নাটকের রূপাধারে। গল্পের নায়ক এক সন্যাসী, বিশ্ব-সংসার ছেড়ে অনন্তকে লাভ করবার সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন ; স্নেহ-মায়ার বন্ধনকে জয় করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। একটি বালিকা তাকে স্নেহ-পাশে বেঁধে ফিরিয়ে আনল সংসার-লোকে, সন্ন্যাসী তখন অনন্তকে খুঁজে পেলেন ঐ ছোট্ট বালিকার প্রীতির গহনে ; কিন্তু তাকে স্বীকার করা কঠিন হল। নাটকের অবসান তাই বিয়োগ ব্যথাক্রান্ত। কারোয়ারের সমুদ্র-বেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

কবি-কল্পনার সীমা-অসীম ভাবনাকে দ্বন্দ্ব দোলায় দুলিয়েছে।

'মায়ার খেলা' (১২৯৫) রচিত হয়েছিল 'কড়ি ও কোমল'-এর পরে। 'মানসী'র কবিতাবলি তখন রচিত হচ্ছিল। 'কড়ি ও কোমল'-এর দেহ-লোভাতুর প্রণয়বাসনা আর 'মানসী'র দ্বিতীয় পর্যায়ের সবেদন মুক্তি-কামনার মধ্যে কবি-হৃদয় যে মানসিক দ্বন্দ্বে বিক্ষত হচ্ছিল, তারই দৃশ্য-রূপ আভাসিত হয়েছে 'মায়ার খেলা'র নাট্য-দেহে। কবি নিজে একে 'গীতনাট্য' বলেছেন,—বলেছেন, "এতে নাট্যরস মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য।...ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।" এই হৃদয়াবেগের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"কড়ি ও কোমলের যৌবন-সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও মানসীর মানস-সুন্দরীর জন্য অন্বেষণ জনিত দুঃখবাদ—এই দুই-এর মাঝে যখন কবির মন দোল খাইতেছে, তখনই মায়ার খেলা রচিত হয়। লিখিবার সময় সে যুগের মনের প্রধানতম সুরটি কবি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।"

'মায়ার খেলা'

'মানসী'র দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুভব অনুযায়ী এই নাটকে সুখ ও প্রেমকে কবি দুভাগে ভাগ করে দেখেছেন। 'মায়ার খেলা'র শেষ কথা :—

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়, এমনি মায়ার ছলনা।"

শান্তা অমরকে ভালবেসেছিল, তার প্রেমে আত্মসুখের উল্লাস ছিল না ; অনুচ্ছ্বসিত সে প্রেম ছিল শান্ত, মৌন, গোপনচারী। অমরকে সে প্রেম খুশি করতে পারে নি। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে সে কাছে এল প্রমদার। প্রমদা প্রেমে বিশ্বাস করে না ; ভোগ-সুখ তার একমাত্র কাম্য। অবশেষে অমরের হৃদয়-স্পর্শে তার মধ্যে প্রেমের অনুভব জেগে উঠেছে যন্ত্রণার তপ্ততা নিয়ে। কিন্তু ততদিনে অমরও নিজের সীমায়তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। তার অতৃপ্ত অ-পূর্ণ জীবনের ম্লান মালিকাখানি যখন তুলে ধরেছে নিরুদ্দেশের পানে, তখন শান্তা স্বেচ্ছায় তাকে নিয়েছে বরণ করে ঃ—

"যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব।
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জন
তোমার হৃদয় ভার আমি হরিব।"

এই তদাত্ম প্রেমে শান্তা অমরকে ভরে তুলেছে, কিন্তু প্রমদার হৃদয় হয়েছে চিরসুখহীন।

'মায়ার খেলা'র পরে দুবছরে দুটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল পরপর,—'রাজা ও রানী' (১২৯৬) এবং 'বিসর্জন' (১২৯৭ সাল)। 'মানসী'র কবি-মনোভাবের বিকাশ ও পরিণতি চলেছে তখনো ; এই নাটক দুটি সেই কাব্য-ভাবনারই অনুপূরক। এখানে স্বত-ই প্রশ্ন হবে,—কবির ভাবনা ও কল্পনা যেখানে নূতন পূর্ণতার মুখোমুখি হয়েছে, সেখানে কবি-কথার অভিব্যক্তির জন্য নাট্য-রূপের কেন প্রয়োজন হয়! সন্দেহ নেই, প্রত্যেকটি রচনার পেছনেই বহিরঙ্গ প্রেরণার ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সন্ধান করলে দেখব, কবির উপলব্ধির আনন্দ-আবেগ প্রথম উচ্ছ্বাসের প্লাবনে যখন মনের বাঁধ ভেঙেছে, তখন গীতি-কবিতার সংক্ষিপ্ত কোমল পরিসরে তাকে আর ধরে ওঠা যায় নি। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ যেখানে সক্রিয় উত্তেজনায় অনূদিত হতে চেয়েছে, সেখানেই কবির অনুভব নাটকের আধারে খুঁজেছে আপন আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের প্রায়

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের মৌল স্বভাব

সকল নাটকেই তাঁর কবি-হৃদয়ানুভূতি কর্মসংঘাতময় রূপে অনূদিত হয়েছে ; তাঁর নাট্য-রচনা আসলে কাব্যপ্রবাহের রূপময় রূপান্তর।

'রাজা ও রানী', আগে বলেছি, 'মানসী'র তৃতীয় পর্যায়ের পরে এবং চতুর্থ পর্যায়ের আগে রচিত হয়েছিল। সীমা-সংকীর্ণ প্রেমের গণ্ডী পার হয়ে মুক্ত প্রেমের অবারিত আকাশে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা প্রবল হৃদয়-সংঘাতে কর্মানূদিত হয়েছে এই নাটকে। রাজা বিক্রম রানী সুমিত্রাকে ভালবাসেন সারা দেহ-মনের শক্তি দিয়ে। কিন্তু অন্ধ তার প্রেম ; রানীকে তার বৃহৎ ব্যাপক কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্ত, একক ভাবে লাভ করতে চান তিনি নিজের জন্যে। অন্যপক্ষে রানীর প্রেম সর্বব্যাপ্ত,—অসীম। তিনি চান, বৃহৎ কর্তব্য সাধনার মধ্য দিয়ে তাব পতিপ্রেম বিশ্বপ্রেমে যুক্ত হবে। এখানেই বাঁধল দুজনের বিরোধ, অবশেষে "সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিবোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো।"

'রাজা ও বানী'

সুমিত্রা ও বিক্রমের এই ভাব-দ্বন্দ্ব সমুচিত ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমশ নাট্যরূপ ধারণ করেছে। এই কারণেই, অনেকে মনে করেন, 'রাজা ও রানী'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। কিন্তু কবি নিজে বলেছেন, এর পরিণতিতে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে ; "কুমার ও ইলার বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতা্ দ্বারা নাটককে ব'্া দিয়েছে।" কুমারসেন সুমিত্রার ভাই, এবং ইলা তার প্রণয়িনী ; বাগ্‌দত্তা। এদের মধ্যে মুক্ত প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। সম্ভাবিত বিবাহের মুখ থেকে কুমার তাই অনায়াসে ছুটে আসতে পেরেছে মৃত্যু বরণ করবার দীপ্ত উৎসাহে। কিন্তু সফল প্রেমের এই ত্যাগ-মহিমা্ চিত্রণে 'মানসী'র কবি-হৃদয়ের লিরিক উৎসাহ অতি-উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়েছিল। ফলে, বিক্রমের ও সুমিত্রার মূল ভাব ও কর্ম-সংঘাতকে ছাপিয়ে কুমারসেনের রোমান্টিক মৃত্যুব পরিণামী মূল্যই প্রধান হয়ে উঠেছে নাট্যশেষে। তাতে নাট্যগুণ কাব্য-কল্পনার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে গেছে।

'বিসর্জন' রচিত হয়েছিল 'মানসী'র চতুর্থ পর্যায়ের পরে। তখন 'অনন্তপ্রেম'-এর অনুভব কবি-চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে আমূল। 'বিসর্জন'-এ তাই নাট্যরূপ পেয়েছে। চিরাগত প্রথায় রচিত রবীন্দ্র-নাটকের মধ্যে এটিই সর্বাপে্ সুগঠিত। নাট্য-বিষয়ের পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছিলেন,—"এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবেব মধ্যে বিরোধ বেঁধেছে,—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম হল জয়যুক্ত।"

'বিসর্জন'

'বিসর্জন' নাটকে প্রেমের এই শক্তি প্রথম গতি পেয়েছে দেবী-মন্দিরে বলি-প্রথার বিরোধিতায়। অপর্ণা ভিখারিনী মেয়ে, তার পালিত ছাগ-শিশুকে ধরে এনে দেবীর মন্দিরে বলি দেওয়া হয়েছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে তাই নিয়ে সে নালিশ জানায়, দেবী-মন্দিরের চত্বরে রক্তচিহ্ন দেখে আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, জীব-জননীর তৃপ্তি কি হয় জীব-রক্তপাতে? তার আকুল কণ্ঠ রাজার অন্তরে প্রেমানুভবকে জাগরিত করে ; ত্রিপুরা রাজ্যে বলি নিষেধ করে দেন তিনি। রঘুপতি দেবীর পুরোহিত ; সংসার-ত্যাগী। মাতৃ-পিতৃহীন জয়সিংহ একাধারে তার পালিত পুত্র এবং শিষ্য। দুইজনে মিলে সংস্কার-নিয়মিত পূজা-আরাধনা করে তাদের দিন কাটে। তাই বলি-নিরোধের প্রস্তাবে রঘুপতি ক্ষিপ্ত

নাট্য-রূপের সফলতা

হয়ে ওঠেন, নিজের স্বার্থের জন্যে নয়—ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিলুপ্তি, তথা দেবীর রোষের ভয়ে! তাই তিনি বলেন,—সমস্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধেও "আমি আছি মায়ের সেবক।" সংস্কারান্ধ রঘুপতি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যে-কোনো উপায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত। রানী গুণবতীর অন্ধ সংস্কারকে জাগিয়ে তুলে পত্নীকে তিনি পতির বিরোধী করে তোলেন। রাজার পুত্রতুল্য অনুজ নক্ষত্ররায়কে তপ্ত করে তোলেন বিদ্রোহ ও নর-হত্যার পথে। প্রজাদের মধ্যে রচনা করতে চান অন্ধ বিপ্লব।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য আঘাত পান স্ত্রীর কাছে, ভাইয়ের কাছে, বাইরে পরিজনদের কাছে। তবু তিনি নিঃসংশয়। কেবল দ্বিধা-সংশয়ের যন্ত্রণায় মর্মে মর্মে অধীর হয়ে ফেরে জয়সিংহ। একদিকে তার জন্মের সংস্কার আর গুরুভক্তি তাকে টানে হিংসার পথে ; আর একদিকে ক্ষণে ক্ষণে প্রেমময়ী অপর্ণা এসে মনকে দোলা দিয়ে ডাক দেয়—"জয়সিংহ, চলে এস এ মন্দির ছেড়ে।"—সংস্কার ও শক্তির অন্ধতা বিদীর্ণ করে প্রেমের মুক্ত ভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেবার আন্তরিক আহ্বান তার। কিন্তু জয়সিংহ আজন্ম দুর্বল। নিজের শক্তিতে ভর করে দাঁড়াবার সাধ্য তার নেই ; তাই ভেতরে-বাইরে সংশয়ের দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত। অবশেষে সকল জ্বালার অবসান হয় দেবীমন্দিরে তার আত্মহত্যায় ; জয়সিংহ নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে প্রার্থনা করে :—"এই যেন শেষ রক্ত হয়, মাতা!"

জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির আযৌবন স্নেহাতুর পিতৃ-চেতনা চরম আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে প্রেমের সত্যকে প্রথম সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করে। পাষাণী মূর্তিকে নদীজলে 'বিসর্জন' দিয়ে, অপর্ণার হাত ধরে সে বেরিয়ে আসে মুক্ত পথে। জয়সিংহের আত্ম-'বিসর্জন'-এর মধ্য দিয়ে রানী গুণবতীরও সংস্কার-মুক্তি ঘটে ; মুক্ত-প্রেমের পূর্ণ রূপ অনুভব করে রাজার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন তিনি। উভয়ে উভয়ের মধ্যে প্রেমের শাশ্বত শুদ্ধ রূপকে নূতন করে আবিষ্কার করেন। 'মানসী'র 'অনন্তপ্রেম'-চেতনার নাটকীয় সম্পূর্ণতা এখানে।

'বিসর্জন'-এর মূলগত ভাব ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন,—"যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করেছে।...ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্য-সামন্ত, অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই, কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে।" অপর্ণা ও গোবিন্দমাণিক্যের অবিচল দৃঢ়তা, এবং জয়সিংহের ব্যাকুল অন্তঃসংঘাত এই কবি ভাবনাকে দ্ব্যর্থহীন ব্যঞ্জনা দিয়েছে আগাগোড়া নাটকে। অপর পক্ষে পশুবলির প্রসঙ্গে রাজা ও রঘুপতির বিরোধে নাটকের বহিঃসংঘাতও ঘনবদ্ধ হয়েছে। বাইরের ঘটনা ও হৃদয়ের অনুভব সমসূত্রে কেন্দ্রিত হয়ে অখণ্ড রস-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।

'বিসর্জন'-এর পরের নাটক 'চিত্রাঙ্গদা'—এটি গীতি-নাট্য। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৯ সালে, যদিও রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল এক বছর আগে। কবি-মনে 'মানসী'র 'ঋতু' তখন অবসিত হয়েছে ; 'মানসী'র প্রকাশও ঘটে গেছে তার আগে। মনের অবচেতনায় গোপনে এগিয়ে আসছিল 'সোনার তরী'র 'ঋতু'। তাই বি-দেহ প্রেমের উৎকণ্ঠা আজ দ্বিধাহীন। দেহী প্রেমের সীমাবদ্ধতা আর অতৃপ্তির সম্পর্কে কবি যেমন নিঃসংশয়, তেমনি দেহহীন প্রেমের সম্পূর্ণতায় স্থির-বিশ্বাসী। সেই অসংশয়িত বিশ্বাস অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার মহাভারতীয় গল্পকে আশ্রয় করে সার্থক কাব্য-রূপ পেয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য নয়, পূর্ণাঙ্গ গীতিকাব্য।

'চিত্রাঙ্গদা'

আজীবন পৌরুষ-ব্রতচারিণী চিত্রাঙ্গদার সুপ্ত নারীত্ব জেগে ওঠে অর্জুনের বিশ্বজয়ী শূরত্বের

স্পর্শে। কিন্তু, নারীর কোমল যে দেহ-বল্লরী পুরুষের কামনার ধন, তাকে কখনো তো সাজিয়ে তোলে নি বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা। তাই পরুষ-কঠিন দেহে প্রত্যাখ্যানের গ্লানি আপাদ-মস্তকে বহন করে ফিরতে হল তাকে অর্জুনের কাছ থেকে। মদন ও মদন-সখা বসন্তের শরণ ভিক্ষা করল চিত্রাঙ্গদা। মদন-বসন্তের যুগ্ম চেষ্টায় মুঞ্জরিত চিত্রাঙ্গদার অপরূপ দেহ-সৌরভ এবারে অর্জুনের পৌরুষকে অস্থির করে তোলে। দিনের পর দিন যায় তাদে‍‍ আত্ম-বিস্মৃত দেহ-সম্ভোগে। চিত্রাঙ্গদার আত্মগ্লানি ছদ্মবেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার চেতনাকে দংশন করে, মুক্তি নেই তবু শরীরের বাঁধন হতে। অবশেষে একদিন যথারীতি অতৃপ্তি দেখা দিল অর্জুনের অবসন্ন দেহে-মনে। এবার তিনি মুক্তি কামনায় অস্থির। সেই চরম মুহূর্তে বৎসরান্তে ঝরে পড়ল চিত্রাঙ্গদার ধার-করা রূপ-সম্ভার। চিত্রাঙ্গদাকে তার যথাযথ রূপে আবিষ্কার করে অর্জুনের প্রেম হল 'ধন্য',—সম্পূর্ণ।

পরিবেশ-কল্পনা ও সংলাপের ব্যঞ্জনাময়তা বশে সমগ্র রচনার মধ্যে একটি অখণ্ড গীতি-সুরই ঝঙ্কৃত হয়েছে; গীতিকবির স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম অনুভব নাটকের আধারে কবিতার সৌরভে বিভান্বিত হয়েছে।

'গোড়ায় গলদ' (১২৯৯ সাল) রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গদ্য নাটক। কেবল গভীর ভাবের নাটক রচনাতেই নয়, সরস নাট্য-সৃষ্টিতেও কবি-প্রতিভার দক্ষতা ছিল অতুল্য। 'গোড়ায় গলদ' একটি সরস কমেডি। ভ্রান্তি-বিলাসই এব মূল কথা।

৪। উন্মেষযুগের গল্প-উপন্যাস

(ক) উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ‌উপন্যাস 'করুণা' কবির জীবৎকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি; 'ভারতী' পত্রিকার (১২৮৪-৮৫ সাল) পাতাতেই আবদ্ধ হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত পববর্তী সময়ে 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থখণ্ডে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবি যে তাঁর এই কৈশোর রচনাকে পবে আর প্রকাশিত হতে দেন নি, এর থেকেই 'করুণা'র অপূর্ণ-গঠনের প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে আছে। বস্তুত, এই পর্যায়ের অপরাপর উপন্যাসেও কবি-স্বভাবের সহজ প্রকাশ সম্ভব হ‍‍ নি; সব কটি‍ ‍ই বঙ্কিম-রচনাব অনুকরণের ছাপ স্পষ্ট।

প্রথম উপন্যাস 'করুণা'

প্রথম গ্রন্থিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' (১২৮৯) প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পরে। কবিতার জগতে কবি-স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গদ্যে, বিশেষত গদ্য উপন্যাসে, স্বকীয়তার সুর জাগে নি তখনো। তার একটি কারণ আগেই বলেছি,—রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চেতনা মূলত ছিল কবি-স্বভাবান্বিত। গদ্যের সাহিত্য-ভূমিতে কবির অধিকার বিস্তার করতে সময় লেগেছিল। তাছাড়া, অব্যবহিত পূর্ব যুগে, কবির চোখের ওপরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অতুল্য সিদ্ধিবাহী কথাশিল্প রচনা করে গেছেন, দিনের পর দিন। এমন অবস্থায়, পূর্বসূরীব প্রখর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। 'বৌঠাকুরানীর হাট' বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্স-এর আদর্শে লেখা। অথচ, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস ইতিহাসাশ্রিত শিল্প-রচন‍ অনুকূল ছিল না। তাই অপরিণত অনুকরণের পর্যায় এই উপন্যাস অতিক্রম করতে পারে নি।

'বৌঠাকুরানীর হাট'

তাহলেও, গল্পের ভাব-বিষয়ে কবি-মনের মৌলিকতা প্রস্ফুট হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছিল 'বৌঠাকুরানীর হাট'। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই

যশোবাধিপতি প্রতাপাদিত্য বাংলার জাতীয় বীর রূপে বন্দিত হয়ে আসছিলেন ; মোগল বাদশাহির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই উপলক্ষে নিজের পিতৃ-প্রতিম স্নেহাতুর খুল্লতাতকে হত্যা করেছিলেন, মতভেদের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পিপ্রাণে স্বাধীনতার চেয়ে মানবিকতার দাম ছিল তুলনারহিত। তাই প্রতাপাদিত্যকে তিনি বীর বলে শ্রদ্ধা করেন নি,—হৃদয়হীন বলে তিরস্কার করেছেন। মূল গল্পাংশের কাঠামো প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' থেকে গৃহীত হয়েছিল। কবি নিজেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের দাবি করেছেন। তাহলেও ইতিহাসের দ্বন্দ্বভূমি পরিত্যাগ করে পারিবারিক জীবনের প্রেম-ঘন পটভূমিতে গ'ল্পের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। প্রতাপাদিত্য ক্ষমতান্ধ ; ক্ষমতার লোভে পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেছিলেন ; পুত্র উদয়াদিত্যকে প্রথমে কারারুদ্ধ এবং পরে নির্বাসিত করেছিলেন। একমাত্র জামাতা রামচন্দ্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন ; পালিয়ে গিয়ে সে আত্মরক্ষা করে। পিতৃরাজ্য ছেড়ে যাবার সময়ে ছোট বোন বিভাকে সঙ্গে নিয়েছিল উদয়াদিত্য,—স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে বলে। কিন্তু ক্ষিপ্ত রামচন্দ্র ততদিনে অন্য বিবাহ করেছে ; বিভা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এল উদয়াদিত্যের কাছে ; ভাইবোনে যাত্রা করল কাশীতে। রামচন্দ্রের রাজ্যখণ্ডে যে ঘাটে বিভার নৌকা এসে লেগেছিল, অনুরক্ত প্রজাদের মুখে মুখে তার নতুন নামকরণ হল 'বৌঠাকুরানীর হাট'।

গল্পে কবি-ধর্মের পরিচয়

এর পরের উপন্যাস 'রাজর্ষি' (১২৯৩ সাল) প্রকাশিত হয় 'কড়ি ও কোমল'-এর পরে ; কিন্তু প্রকৃত গ্রন্থ রচনার সময়ে 'কড়ি ও কোমল'-এর সুরই চলেছিল মনে মনে। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতি-কাহিনীর টুকরো নিয়ে মূল গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু 'কড়ি ও কোমল' যুগের অনুমত রোমান্স-ঘন ভাবনাই আসলে প্রকাশ পেয়েছে এই ঐতিহাসিক কাহিনীর কাঠামোয়। 'জীবনীকার' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন,—'স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা'র সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহের কাছে হয়ত কবি এই গল্পের চুম্বকটুকু পেয়েছিলেন। কৈলাসচন্দ্র এই সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। যাই হোক, রচনার মূল প্রেরণা যে স্বপ্ন-লব্ধ, সে কথা স্বয়ং কবিই জানিয়েছেন। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে দেওঘরে যাচ্ছিলেন ; ট্রেনে ভীষণ ভিড়। রাত্রে তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন,—কোনো এক মন্দিরের সিঁড়িতে রয়েছে রক্তচিহ্ন ; আর একটি ছোট্ট বালিকা তার বাবার হাত ধরে সকরুণ প্রশ্ন করছে,—"এ কি, এ যে রক্ত!"—এখানেই কবি-মনে উপন্যাসের প্রথম জন্ম ; তারপরে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের গল্প যোগ করে দিনে দিনে চলেছে তার রচনা।

'রাজর্ষি'

গোবিন্দমাণিক্য দেবীর মন্দিরে পশুবলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ; তাতেই সর্বত্যাগী অথচ সংস্কারান্ধ রঘুপতির সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল। গোবিন্দমাণিক্য জানেন, জীবজননী কখনো জীব-রক্তপাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। রঘুপতির অন্ধ-বিশ্বাস, বলি বন্ধ হলে দেবীর রোষ দুর্নিবার হবে। অতএব, পশু-হত্যার বদলে নরহত্যা ঘটাতেও তার বাধা নেই। কারণ রঘুপতি বিশ্বাস করেন, পশুবলির অভাবে জাগ্রত দেবী-রোষ নরবলিতে শান্ত হবে। রাজভ্রাতা,—নিঃসন্তান রাজার একমাত্র আশ্রয় দুর্বল-চেতা নক্ষত্ররায়কে নিয়ে তিনি ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতলেন। অবশেষে সমস্ত রাজ্যকে বিদেশীর আঘাতে জর্জরিত করতে না চেয়ে গোবিন্দ-মাণিক্য বেছে নিলেন স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন। এই গল্পের খণ্ডাংশ আশ্রয় করে পরবর্তী কালে 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাস ও নাটকে তফাত অনেক।

'রাজর্ষি'র শিল্পরূপ

'রাজর্ষি'র যুগে প্রেমাতুর কবি-চিত্তের প্রচ্ছন্ন অতৃপ্তি আর অভিমান রূপ পেয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে ; বিশেষ করে উপন্যাসের সমাপ্তি মুহূর্তে। কিন্তু কাহিনীর ঐতিহাসিক অংশ এবং কল্পনাশ্রিত অংশের মধ্যে সুষমতা বিহিত হতে পারে নি। শুধু তাই নয়, গল্পের অতি-বিস্তার এবং শিথিলতাও মূল আবেগকে জমাট বাঁধতে দেয় নি। ফল-কথা, সফল উপন্যাসের প্রেরণা জাগে নি তখনো কবির মনে।

(খ) ছোটগল্প

অন্যপক্ষে সার্থক ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে আবার এই যুগেই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের জন্ম ও বিকাশ; রবীন্দ্রনাথের হাতে তেমনি ছোটগল্পের জন্ম, বিকাশ,এবংপরিণতিও।

প্রথম গল্প 'ভিখারিনী'

১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় কিশোর কবি প্রথম গল্প লিখেছিলেন,—'ভিখারিণী'। এটি ছোটগল্প নয় ঠিক, দীর্ঘ চারখণ্ডে বিভক্ত 'বড় গল্প'। কিন্তু বাস্তব জীবন-প্রেক্ষণার পরিচয় নেই গল্পের প্লট-এ ; কিশোর মনের অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস ও বিষাদঘনতাই প্রকাশিত হয়েছে গল্পের ক্ষীণ সূত্রকে উপলক্ষ মাত্র করে।

এর পরে 'ঘাটের কথা ও 'রাজপথের কথা' নামে দুটি গল্প প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে; যথাক্রমে 'ভারতী' ও 'নবজীবন' পত্রিকায়। এ-গুলোকেও যথার্থ ছোটগল্প বলা চলে না; ড. সুকুমার সেন এদের যথার্থ নামকরণ করেছেন —'গল্প-চিত্র'। 'মুকুট' প্রথমে গল্পরূপে আবির্ভূত হলেও পরে নাট্যরূপে স্থায়িত্ব পেয়েছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের মরসুম দেখা দেয় উত্তরবঙ্গে—পদ্মাপারের জীবনভূমিতে। বাইরের প্রকৃতি, আর অন্তরের মনোলোকে এই সৃজন-লীলার পরিপ্রেক্ষিতটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন স্বয়ং কবি,—"শিলাইদহে পদ্মার বোটে ছিলাম আমি একলা ;

ছোটগল্প ও উত্তর বঙ্গের জীবনভূমি

নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মত সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সেদিকে ধূ-ধূ করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি জনহীন, তৃণশস্যহীন। মাঝে-মাঝে জল বেঁধে আছে। সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখির দল। নদীর ওপারে গাছপালার ঘনছায়ায় গ্রামের জীবনযাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, চাষীরা গোরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেতে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে মন্থর গতিতে চলতে থাকে, ডিঙি নৌকা পাটকিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু-হু করে জল চিরে যায়, জেলে নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা, প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানা প্রকার নালিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে।...বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বাড়লে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে।...আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পথে ফেরা এই অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।"

ছোটগল্প সেই শিল্পরূপ, যাতে 'বিন্দুর মধ্যে' জীবনের 'সিন্ধুরূপ'কে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। কল্লোল-মুখরিত জীবনের স্রোত নদীস্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে চলে অনন্তের পানে। কত পর্বত, কত প্রান্তর, কত জনপদের সীমা পেরিয়ে,—তাদের কোল ঘেঁষে চলে কল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর জলধারা। কেউ সে জলে স্নান করে,—তৃষ্ণার্ত হয়ে কেউ করে তা পান। আবার

কেউ তা কলসি ভরে বয়ে নিয়ে যায় ঘরে। সেখানে সেই জলে স্নান-পানের প্রয়োজন নির্বাহিত হয়। ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া সেই জলের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধের কোনো পার্থক্য ঘটে না মূল নদীর জলের সঙ্গে। তাতে কেবল থাকে না স্রোতস্বিনীর নিরন্তর প্রবহমাণতা। তেমনি জীবন-স্রোতও চলেছে ইতিহাসের ঘাটে ঘাটে বিভিন্ন যুগের কোল ঘেঁষে; নানা শিল্পীর ভাব-কল্পনাকে মুখরিত করে। কেউ বা সেই স্রোতস্বিনীর অতলে ডুব দেন,—তারই ধারায় ভাসতে ভাসতে স্নান-পানের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। তিনি আধুনিক মহাজীবনের মহাকাব্যকার, ঔপন্যাসিক। কিন্তু ছোটগল্পের শিল্পী সেই জীবন-স্রোতের তীরে এসে নিজের কল্পনার কলসিটি ভরে নেন, এক মুহূর্তের অনুভবের অতলে ডুবিয়ে। তারপর নিজের ব্যক্তিমনের গভীরে বসে, নিজের শিল্প-ভাবনা দিয়ে রচনা করেন গোটা জীবনের এক একটি নিটোল মুক্তা-রূপ।

ছোটগল্প-শৈলী

এই বিশেষ ধরনের শিল্প-সাধনার পক্ষে নদী-মাতৃক উত্তরবঙ্গের জীবনভূমিতে কবির নিয়ত চলমানতা এক আশ্চর্য সার্থক পটভূমি রচনা করেছিল। নদীস্রোতের মাঝখান দিয়ে চলেছে কবির 'বোট'; দুপাশ বেয়ে ছুটে চলেছে প্রকৃতি ও মানব-জীবনের অপার বিস্তীর্ণ পাথার। চলতে চলতে, জীবনের এক একটি ক্ষণ-দৃষ্ট রূপের গভীরে ডুব দিয়েছেন কবি ; তাকে আশ্রয় করে গড়ে তুলেছেন মুহূর্তের বিন্দুতে নিটোল মুক্তোর মতো সম্পূর্ণ এক একটি গল্প।

এক দিক থেকে এ-ছিল সমকালীন কবিতা রচনারই আর এক রকমফের। কবি বলেছেন,—"একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ও'র কী না দশা হবে। কিংবা ধর, একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু দেখেছি, বাকিটুকু নিয়েছি কল্পনা করে।"—ওপরের বর্ণনায় যথাক্রমে 'সমাপ্তি' ও 'ছুটি' গল্প দুটির অভিজ্ঞতার উৎস বিবৃত হয়েছে। কিন্তু সেটুকু বড় কথা নয়। লক্ষ করলে দেখি,—টুকরো ছবির অসম্পূর্ণ দেখাকে কবি সম্পূর্ণ অখণ্ডতা দিয়েছেন তাঁর কবি-কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে। এ-যেন জীবনের টুকরো কথা নিয়ে কবিমনের গদ্যে কবিতা লেখা। রবীন্দ্রনাথের হাতে আলোচ্য যুগে বাংলা ছোটগল্প একেবারে জন্মলগ্নেই পূর্ণাঙ্গ দেহ পেয়েছে; এর পেছনে রয়েছে তাঁর কবি-দৃষ্টিরই অখণ্ডতা। একথা যেন না ভুলি যে, গল্পগুচ্ছের শিল্পীও আসলে কবি।

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের স্বরূপ

গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম গল্প গ্রন্থ 'ছোটগল্প' ১৩০০ বাংলা সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে গল্পসংখ্যা ছিল সর্বমোট ষোলটি। অধিকাংশ গল্পই পরে গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডে গ্রন্থিত হয়। আলোচ্য সময়ের সীমায় প্রকাশিত আরো তিনটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে আছে 'বিচিত্র গল্প' (১৩০১), 'কথাচতুষ্টয়' (১৩০১) ও 'গল্পদশক'। এই গ্রন্থগুলির কোনোটিই পরে আর মুদ্রিত হয় নি ; প্রায় সকল গল্পই স্থান পেয়েছে 'গল্পগুচ্ছ'র বিভিন্ন খণ্ডে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশের সাল-তারিখই প্রধান বিবেচ্য নয় ; সমসাময়িক কালে রচিত গল্পাবলির মর্মগত ভাব-সূত্রটিকেই সন্ধান করতে হয়। বাইরের বিচারে এ-সময়ে গল্প লেখার দাবি এসেছে সাময়িক পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে [১২৯৮-১৩০২]। কবি জানিয়েছেন,—"সাধনা [পত্রিকা] বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী পত্রিকার জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য-প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহ লিখিয়াছিলাম।" 'হিতবাদী'তে ছয়টি গল্প (১২৯৮)

গল্প-গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হবার পরে 'সাধনা'পত্রে (১২৯৮-১৩০২) ছোটগল্পের প্লাবন এসেছিল। কিন্তু এটুকু বাইরের কথা। ভাবের স্বরূপ সন্ধান করলে দেখি, পদ্মার ভূমিকা মনের কোণে বৃহৎ জীবন ও ব্যাপক প্রকৃতির অনুভব তিলে তিলে পুঞ্জিত করে তুলছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন,—"আমার সমগ্র কাব্য-সাধনার এই একটি মাত্র পালা আছে ; তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।" কাব্যের ইতিহাসে দেখেছি,—"অসীমের সীমা" রচনাব প্রথম আকাঙক্ষা অঙ্কুরিত হয়েছে 'মানসী'র পর্যায়েই। কিন্তু সে আকাঙক্ষার মুক্তি 'সোনার তরী'-'চিত্রা'য়। সেই ঋতুরই ফসল এই ছোটগল্পগুলিও।

'হিতবাদী'তে প্রকাশিত ছয়টি গল্প হচ্ছে,—'দেনাপাওনা,' 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'। 'সাধনা'য় প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে আছে, 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'জীবিত ও মৃত', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' ইত্যাদি। নিছক নাম করেও গল্পের সংখ্যা প্রায় অ-নিঃশেষ হবে। কিন্তু গল্পগুচ্ছের পাঠক লক্ষ করবেন,—এই সময়কার অধিকাংশ গল্পেই বিশেষ জীবনের বিশেষ অনুভূতি সর্বজনীন অনুভবের নির্বিশেষ রসলোকে উন্নীত হয়েছে।

উন্মেষ যুগের গল্প-স্বভাব

'পোস্টমাস্টার' গল্পের জীবন-বেদনা যে কেবল দুর্ভাগিনী রতনের নয়, সর্বরিক্ত মানবতার অনিবার্য ট্রাজেডি-ভরাতুর,—কবি নিজেই সে-কথা বলেছেন ;—পোস্টমাস্টার চিরদিনের জন্যে তাকে ছেড়ে গেলেও "রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট অফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে ; প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের মধ্যে প্রাণ-পণে জড়াইয়া ধরা যায়। অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।"

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে ব্যক্তি-হৃদয়ের অরূপ অনুভব সর্বব্যাপ্ত বিশ্বজনীনতায় আরো অপরূপ হয়ে উঠেছে। 'কাবুলিওয়ালা' গল্প হিশেবে 'পোস্টমাস্টার'এর চেয়েও উৎকৃষ্ট ; কারণ বাৎসল্যের যে সূত্র এক বাঙালি বাবু ও দূরদেশবাসী আর এক কাবুলিওয়ালার অন্তর-চেতনাকে মানবতার রাখিবন্ধনে একই মিলনের ডোবে বেঁধে দিয়েছিল, গল্পের সহজ প্রকাশ-ধারায় তা স্বতোভাস্বর হয়ে উঠেছে। এই সময়ে লিখিত গল্প-সংখ্যা প্রায় ৩৭টি; সর্বত্রই বিশেষ মুহূর্তের অনুভব সর্বজনীন বিশ্বানুভবের সুরে অনুরণিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ জীবনের বিশেষ ক্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বজীবনের ব্যঞ্জনা এসে পৌঁচেছে;—এখানেই নিহিত আছে 'গল্পগুচ্ছ'র ছোটগল্পের শিল্প-প্রাণ।

৫। উন্মেষ যুগের গদ্য প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে বলেছিলেন,—"আমি কখনো কখনো এমন সব লেখা লিখেছি যা পাঠকেরা সমালোচনা বলে গণ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু তা বস্তুত শিল্পকর্ম—বিশ্লেষণের সামগ্রী নয়।" তাঁর সমালোচনা-জাতীয় রচনা সম্বন্ধেই কেবল একথা সত্য নয়, সমান সত্য সকল রকমের গদ্য প্রবন্ধাবলি সম্বন্ধেই। তাই বলে রবীন্দ্র-প্রবন্ধে চিন্তা ও মননের অভাব রয়েছে

বিন্দুমাত্রও, একথা মনে করবার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবি-মনীষী। তাঁর পদ্য-রচনাবলির রসস্রোতেও মনীষার অতলতা অনুভবনীয়। কিন্তু লোক-দুর্লভ চিন্তা ও মনীষাকে শিল্পীর সৌন্দর্য-কল্পনায় রাঙিয়ে বুদ্ধির দীপ্তিকে কাব্যের লাবণ্যে ভরে তুলেছেন কবি। তাঁর গদ্য রচনায় পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বলতা আছে, প্রখরতা নেই। তাঁর চিন্তায় আছে গভীরতা-জনিত স্বচ্ছতা, কিন্তু জটিলতা নেই। সব কিছুই কবি-চেতনার ভাব-বিভায় সমুজ্জ্বল। একেবারে প্রথম যুগের গদ্য প্রবন্ধাবলিতেই এই রস-স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

উন্মেষ যুগের গদ্য-রচনা

এই সময়ে প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থ চারটি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থিত হয় ১২৯০ সালে ; আত্মগত-প্রবন্ধ 'আলোচনা'র প্রকাশকাল ১২৯২। 'সমালোচনা'র (১২৯৪) নামকরণেই গ্র: বিষয়ের পরিচয় নিহিত। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' প্রথমে দুভাগে প্রকাশিত হয়েছিল ; 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারির ভূমিকা' (১২৯৮) ও 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' (১৩০০)। 'সমালোচনা' সাহিত্য-সমালোচনা মূলক রবীন্দ্র-প্রবন্ধের প্রথম সংকলন। এই প্রাথমিক আলোচনাতেই তরুণ কবির সাহিত্য-বিচারবোধ ও সত্য দৃষ্টির নিঃসংশয় পরিচয় স্বতঃপ্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য বা কাব্য মাত্রই যে জীবন-সম্ভব, গভীর জীবনানুভব ছাড়া সার্থক কাব্যের সৃষ্টি যে অসম্ভব, সে কথা নিঃসংশয় প্রাঞ্জলতার সঙ্গে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন।—একাধিক প্রবন্ধে জীবন-বোধহীন কল্পনাকে বলেছেন উন্মাদের স্বভাব। আবার অনুভূতির সত্যতাই যে কাব্য-সৃষ্টির একমাত্র উপাদান নয়, সুষ্ঠু প্রকাশও সফল কাব্যের অপরিহার্য গুণ, এ-কথাও বললেন 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামক প্রবন্ধে। বস্তুত কাব্যতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থেই প্রথম বৈজ্ঞানিক বিচার-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেখলেন।

গদ্য-গ্রন্থাবলী

'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'র সূচনা কবির দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রার উপলক্ষে। ১২৯৭ বাংলা সালে মাস দু-তিনের জন্যে কবি ইংলন্ডে গিয়েছিলেন। সেই সময়কার দিনলিপির মতো করে লেখা এই গ্রন্থ। এতে ছোট-বড় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-কবির প্রতিদিনকার অন্তরঙ্গ রূপটি যেমন ক্ষণে ক্ষণে আভাসিত হয়েছে; তেমনি কবি-স্বভাবের কল্পনা-সৌন্দর্যও মাঝে মাঝে পেয়েছে অনবদ্য প্রকাশ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

রবীন্দ্ররচনায় বিকাশ কাল

১। বিকাশ কালের কাব্য-কবিতা

'সোনার তরী'-'চিত্রা'র পরে রবীন্দ্রকাব্যে নূতন ঋতুর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় 'নৈবেদ্য'-র যুগে। কিন্তু যেমন প্রকৃতির জগতে, তেমনি কবির মনোলোকেও ঋতুর পরে ঋতুর আবির্ভাব একটানা হয় না একের পর এক করে। দুই ঋতুর মাঝখানে ঋতুসন্ধির কালও রয়েছে। দোটানার সময় সেটা। গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা। মাঝখানের ঋতুসন্ধির কালটাতে এক একদিন হঠাৎ-বর্ষার মাঝে নেমে আসে হিমের স্পর্শ। আবার দিনের পর দিন চলতে থাকে উগ্র গ্রীষ্মের তপ্ততা। একদিন যদি প্রকৃতি অনাগতের প্রতি উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখনি আরো দুদিন ফিরে তাকায় পিছুর টানে। কবি-মনের অবস্থাও তেমনি' 'চিত্রা'র পরে 'নৈবেদ্য'র পূর্ববর্তী কাব্যপ্রবাহে চলেছে কবি-প্রাণের ঋতুসন্ধি ; একবার মন ঝুঁকছে অনাগতেব প্রতি, আর একবার,—বার বার ফিরে তাকাচ্ছে অতীত 'চিত্রা'-ঋতুর দিকে।

রবীন্দ্রকাব্যে ঋতু-সন্ধি

এই ভাবের প্রথম অভিব্যক্তি 'চৈতালি'তে। 'চিত্রা'র ঠিক পরের কাব্য 'চৈতালি'। 'চিত্রা'তে দেখেছি, 'আমি-ময' কবি-চেতনা বিশ্বাভিসারে বেরিয়েছিল। নিজের আমূল চৈতন্যের পূর্ণতার মধ্যে জগতেব অনন্ত-বিচিত্র সৌন্দর্যকে উপলব্ধি কবে চরিতার্থ হয়েছিলেন কবি। সেই আনন্দিত চিত্তেব অধীবতা নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আপন অন্তরবাসী একান্ত-গোপন অহং-কে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন কবি 'চৈতালি'তেও :— তারই অতলে দেখে নিতে চেয়েছেন জীবনেব অপার বিস্তীর্ণ বিশ্বরূপ :—

"তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে,
এসো মোর সার্থক সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব সমর্পণ।
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
মনের বেদন-নিবেদন।"

চৈতালি'তে ঋতু-সন্ধি

আবাব এই কাব্য-ঋতুতেই আর একদিন সেই 'অন্তর-বাসিনী'-কে ডেকে কবি বলেছেন,—

"বৃথা চেষ্টা রাখি দাও। স্তব্ধ নীরবতা
আপনি তুলবে গড়ি আপনার কথা!
আজি সে রয়েছে ধ্যানে—এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবন সম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া,
বসন্ত কুসুমমালা এসেছ পরিয়া.

এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি—
নিকুঞ্জে নিভৃতে আজি নাই কোনো গীতি"।

নতুন যে গীতি-ধারার ধ্যানে কবির হৃদয়-তপোবন এখন স্তব্ধ হয়ে আছে, বারে বারে বলেছি, 'নৈবেদ্য'-র যুগ-চেতনার তা বাহক। আপন অনুভবের আবেগ-লোকে বিশ্বজীবনের যে স্বাদ কবি একবার পেয়েছিলেন, তাকেই ভারতের শাশ্বত আদর্শের আলোকে নবায়িত করে দেখবার আকাঙ্ক্ষা সুদৃঢ় হয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যে। সাধারণ ধারণা, ভারতের দৃষ্টি স্বভাবত আধ্যাত্মিক; তাই কর্মমুখর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সে সহজে বিমুখ। এই ভাবনার মধ্যে ভারতের বিশ্বচেতনার সম্পূর্ণ সত্য স্বভাব প্রকাশিত হয় না। কর্ম ও ধ্যান-যোগের সামঞ্জস্য বিধান, কর্মকে ধ্যানে, ধ্যানকে কর্মে পরিণত করার যৌথ প্রয়াসেই ভারতীয় সাধনার সম্পূর্ণ পরিচয়। 'নৈবেদ্য'র যুগে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে কবি এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তাই বলেছিলেন:–

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

'চৈতালি'তে অনাগতের আকাঙ্ক্ষারূপে সেই জীবন-প্রত্যয় অঙ্কুরে আভাসিত হতে আরম্ভ করেছে—

"কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে।'
দেবতা কহিলা, 'আমি', শুনিল না কানে।
সুপ্তিময় শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, 'কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা।'
দেবঁতা কহিলা, 'আমি', কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, 'তুমি কোথা প্রভু।'
দেবতা কহিলা, 'হেথা।' শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিল, 'ফির।' শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়'।"

'চৈতালি'র পরে গ্রন্থিত কাব্যপ্রবাহের মধ্যে আছে যথাক্রমে 'কণিকা', 'কথা' এবং 'কাহিনী'। তিনটি কাব্যেরই প্রকাশকাল ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। কিন্তু কবিতা রচনার হিশেবে 'কথা' আর 'কাহিনী' এই কাব্য দুটির সূচনা হয়েছিল প্রথমে ; ১৩০৪ বাংলা সাল থেকে এই কাব্যপ্রবাহের রচনার শুরু। 'চৈতালি'র ভাব-প্রেরণা ক্রমশ পরিণতি পেয়েছে এই কাব্যত্রয়ীতে।

'চৈতালি'-উত্তর কাব্য-ত্রয়ী

'কণিকা'য় আছে মহৎ, বৃহৎ, নিরঙ্গ জীবনাদর্শকে ক্ষুদ্রাবয়ব কথার আধারে ধরে পিনদ্ধ দেহ-রূপ দানের চেষ্টা। ভারতবর্ষের জীবন, ভারতবর্ষের মূল্যবোধ, সংক্ষিপ্ত কথনের ব্যঞ্জনাময় স্পষ্টতার মধ্যে সর্বদেশকালীন মহিমাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :—

'কণিকা'

"তপন উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়—
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্ত সিন্ধু তীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।"

কবিতাটির নাম 'নতি স্বীকার' ; নামেতেই রচনার ভাব-ব্যঞ্জনা দ্ব্যর্থহীন হতে পেরেছে। সর্বস্ব দিয়েও, আমৃত্যু মহৎকে নতি জ্ঞাপনের ভারতীয় জীবনাদর্শ বৃহত্তর মানবিক আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে। 'কণিকা'র সকল কবিতাতেই ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন।

'কণিকা'য় যা তত্ত্ব বা আদর্শ, 'কথা' এবং 'কাহিনী'কাব্যে তাই গল্প-রসরূপ পেয়েছে। প্রথম সংস্করণ 'কথা'র বিজ্ঞাপন-এ কবি জানিয়েছিলেন,—"এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধকথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সম্বন্ধীয় ইংরেজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরেজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে।" এখানে লক্ষ করবার কথা দুটি। প্রথমত,—ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে কবি এবার প্রাচীন ভারতের পুরাণ-গল্প-ইতিহাসের জগতে প্রবেশ করেছেন। এক একটি পদ্য-'কথা'য় ভারতীয় জীবনাদর্শের এক একটি নিটোল সুন্দর রূপ অখণ্ড পূর্ণতায় বাঁধা পড়েছে। দ্বিতীয়ত কবি নিজেই স্বীকার করেছেন,—মূলের সঙ্গে এইসব কবিতার যোগ হুবহু নয়। বলা বাহুল্য, কবিতার বিষয় নির্বাচনে এবং তার কল্প-রূপ রচনায় কবির নিজস্ব স্বাধীনতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ কেবল তাই নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন যুগের আদর্শ ও মূল্যবোধকে তাঁর সমসাময়িক নবযুগের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন যুগের মূল্যে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

'কথা' ও 'কাহিনী'

'কথা' এবং 'কাহিনী' রচনার কাল বাংলাদেশে 'কার্জনি' দুঃশাসনের প্রস্তুতি এবং বিধ্বংসের সূচনা-লগ্নে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির বিক্ষোভ অগ্নিতপ্ত হয়ে উঠছিল; দিকে দিকে চলছিল জাতীয় বিপ্লব রচনার সর্বমুখী প্রস্তুতি। অন্যদিকে দেশীয় প্রজাদের আত্মমুক্তির উদ্দীপনা যত বেড়েছে, বড়লাট এলগিনের আওতায় আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন ততই হতে চেয়েছে শ্বাসরোধী। ফলে, দেশীয়দের উৎসাহ আবার ততই উত্তেজনাতপ্ত হয়েছে। সেই উত্তপ্ত বারুদস্তূপে জ্বলন্ত অগ্নিশলাকার মতো এসে পড়লেন বড়লাট লর্ড কার্জন। তার হৃদয়হীন অমানবিকতা 'বঙ্গভঙ্গ'-কে উপলক্ষ করে ভারতব্যাপী প্রথম বিপ্লবান্দোলনের সৃষ্টি করল। বিপ্লবের একটা ধারা চিরকাল বয়ে গেছে ফল্গু প্রবাহের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে। সে-ধারা ছিল সশস্ত্র; রক্তাক্ত বিপ্লব রচনার প্রয়াসী। ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে তার অগ্নি-রূপ ঘরেবাইরে জ্বলেছিল দাবানলের মতো; ১৯৪৫-৪৬-এ বিহারের পুলিশবিদ্রোহ, বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহের পরিণামে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার সার্থক উদ্‌যাপন ঘটে। জাতির মুক্তি-সাধনায় এই শক্তিব্রতের সমুচিত মূল্য ইতিহাসকে একদিন আবিষ্কার করতেই হবে। কিন্তু এ-দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে রূপটি স্বতঃপ্রকাশিত, তা জনমনের ঐতিহ্য-প্রীতি ও স্বদেশভক্তির অবিচল ভিত্তিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধীর আজীবন তপস্যা সেই সহজ প্রীতি ও ভক্তিকে আত্মশক্তির বোধনে সুদৃঢ়—অপরাজেয় করেছে। বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গের আলোচ্য প্রস্তুতি-লগ্নে জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে নবীন মহিমাবোধ, ভারতবর্ষের আদর্শ ও জীবন-মূল্য সম্পর্কে নবতর সচেতনতা জাগ্রত হচ্ছিল দিনে দিনে।

দেশের পুরাতন জীবনাদর্শকে নবযুগের উপযোগী করে নবীন মূল্যে উদ্ভাসিত করার এই মহাব্রত গ্রহণ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। 'কথা' এবং 'কাহিনী'কাব্য দুটি সেই ব্রত উদ্‌যাপনের পীঠভূমি।

এদিক থেকে কবির নিজস্ব আদর্শ-চেতনার বিশিষ্টতা ছিল অতুল্য। সমসাময়িক কালে রাজনৈতিক আন্দোলনে 'আবেদন-নিবেদন', প্রস্তাব পেশ ও প্রস্তাব পাশের উৎসাহই ছিল প্রবল। কবি চিরকাল তার প্রতিবাদ করেছেন; সেদিনও করেছিলেন। আত্মজাগরণ ও আত্মশক্তির বিকাশেই ভারতের মুক্তি,—বিদেশী রাজার দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে নয় ; এ-কথা সেদিন থেকেই তিনি অনুভব করেছিলেন দৃঢ় মনে। তাই ভারতের পুরাণ-কথা ও গাথা, প্রাচীন ইতিহাস ও কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে শাশ্বত ভারতের স্বরূপকেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন ; আবিষ্কার করেছেন 'কথা' এবং 'কাহিনী'র বিভিন্ন কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ অবিরল কাব্য-সাধনা করে গেছেন জীবন-সিন্ধুর তীরে বসে। তাই বিভিন্ন যুগের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে যখনই নতুন নতুন অভিঘাতের তরঙ্গ জেগেছে জীবনের মূলে, তাঁব কবি-ভাবনার গভীরেও তখনই আবর্ত রচিত হয়েছে সেই অভিনব জীবন-চিন্তার। ফলে অনেক সময়ে মনে হয়েছে,—কোনো বিশেষ সমকালীন ঘটনার ছান্দসিক রূপই বুঝি প্রকট হয়েছে তাঁর কোনো কোনো কবিতায়। অথচ জীবনের প্রত্যক্ষ দাবিকে যেমন অস্বীকার করেন নি কবি, তেমনি তারই কাছে নিঃশেষে অঞ্জলি দিয়ে বসেন নি নিজের সকল সাধনাকে। অব্যবহিতকে আশ্রয় করে চিরন্তনের উদ্বোধনে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন তিনি।

'কাহিনী'-র 'গান্ধারীব আবেদন' কবিতাব প্রসঙ্গে এই বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে। 'কথা' এবং 'কাহিনী'র কবিতা-রচনার ধারা প্রথমে যখন সূচিত হয়েছে, তার প্রায় এক বছর পরে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কার্জন বড়লাট হয়ে এসেছিলেন। 'গান্ধারীর আবেদন' রচিত হয় তার স্বল্পকাল আগে, সম্ভবত ১৮৯৭-এর শেষার্ধে। তাহলেও কার্জনের কালে বিদ্রোহের যে প্রখর আগুন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়ে গিয়েছিল পূর্ববর্তী বড়লাট এলগিনের (১৮৯৪-৯৮) কাল থেকেই। "বাস্তবিক লর্ড এলগিনের আমলেই ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের দুর্গতি শুরু হয়। লর্ড কার্জন এসে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন মাত্র।" 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় সেই সর্বভারতীয় রোষের ছবি অনেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেদিন। প্রকাশের আগে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট্-এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পড়ে শুনিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—ঐ কবিতা পাঠের সময়ে "আমরা ছাত্র। তখন আমাদের মনের মধ্যে নূতন স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা ঐ নাটিকার মধ্যে আমাদের দেশের সাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত হইয়াছিল মনে করিয়াছিলাম।" তাতে অনুমান করা হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্ট,—ভারতে অবস্থিত বৃটিশ শাসক-শিশুদের প্রতি যা স্নেহান্ধ ; দুর্যোধন নাকি ছিলেন আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচার ; গান্ধারী ব্রিটিশ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি। এমনি করে পাণ্ডবদের মনে করা হয়েছিল নির্যাতিত ভারতীযের প্রতীক। সমসাময়িক প্রেস-আইনের প্রতিবাদ এবং আরো নানা ছোটখাটো ঘটনার ছায়াপাতও এতে কল্পনা করা হয়েছিল। আজ সে-সব অনুমান অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক, একথা অবিস্মরণীয় যে, স্বদেশ ও স্বজাতির সমকালীন প্রয়োজনের আলোকে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষকে নূতন করে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছিলেন 'কথা' এবং 'কাহিনী'তে। এই সাধনারই পূর্ণ সিদ্ধি ঘটেছে 'নৈবেদ্য'তে।

'গান্ধাবীব আবেদন' কবিতা

'কথা' এবং 'কাহিনী'র পরের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কল্পনা' (১৩০৭)। এর অধিকাংশ কবিতাই

১৩০৪ সালে লেখা ; অল্প কয়েকটি কবিতা রচিত হয়েছিল ১৩০৫-০৬ সালে। তাই এই কাব্যের-ও প্রধান বৈশিষ্ট্য যুগসন্ধি-লক্ষণের প্রচুরতায়। বস্তুত 'চিত্রা'-উত্তর ঋতু-সন্ধির কাব্য হিশেবে 'কল্পনা'র সৌন্দর্য অতুল্য,—অপরূপ। রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসেও এ'র শ্রেষ্ঠতা অবশ্য-স্বীকার্য। তার কারণ, সন্ধি-লগ্নের দ্বিমুখী আকাঙ্ক্ষা এই পর্যায়ের কবিতায় পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে। কিছু কিছু কবিতায় 'চিত্রা'র আত্মমগ্ন চেতনার বিশ্ব-সৌন্দর্য-লোভাতুরতা অপরূপ মাধুর্যে ভরে উঠেছে। প্রেমের সত্যের আলোকশিখায় আপন আত্মার বিশ্বরূপ দেখেছেন কবি 'প্রণয়প্রশ্ন'তে :—

'কল্পনা'র অতুল্যতা

"চির মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি,
চরণে আমার বীণা ঝংকার বাজে কি,
এ কি সত্য।
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া,
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য।
তপ্ত-কপোল-পরশে অধীর সমীর মদির-মত্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য।
কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
জীবনমরণ-বাঁধন বাহুতে বাঁধা রে,
এ কি সত্য।
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীবব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য।
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি, আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চির ভক্ত,
এ কি সত্য।"

'মদন ভস্মের পরে' কবিতায় এই ব্যক্তি প্রেমকেই বিশ্বে ব্যাপ্ত করে দে খছেন কবি :—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ-কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে.
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুনমাসে নিমেষমাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।"

কেবল সৌন্দর্যের পিপাসা নয়,—ওপরের ক তাংশগুলির প্রকাশভঙ্গিতেও সুন্দরের অপরূপ বিকাশ অবশ্যই লক্ষ করবার মত।

এই অতীত-ভাব-সুরভিত স্বপ্নলোকের পাশে পাশে মনের গহনে এসে পৌঁচেছে অনাগত যুগ-চেতনার 'আহ্বান'; সবকিছু ফেলে তারই সুরে সাড়া দিয়েছেন কবি :—

"রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক পথ চাওয়া দুটি চোখ
যত্নে গাঁথা মালা।
* * *
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোব ;
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে, বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।"

কিন্তু চলতে চাইলেই এগিয়ে চলা যায় না। অতীতের আকর্ষণ অকারণ-মায়ার গ্রন্থিজালে পায়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়। সেই মোহজাল ছিন্ন করে এগিয়ে চলার সাধনা, নিজের বক্ষ দীর্ণ করার দুঃসাধ্যতায় ভরপুর। 'বর্ষশেষ' কবিতায় সেই আত্মমুক্তির নিষ্ঠুর নির্মায়িক সাধনায় আত্মসমর্পণ করলেন কবি,—

"হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ, প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।"

'বৈশাখ'-এর রুক্ষ-মূর্তির সম্মুখে কবি অবশেষে মায়ামোহমুক্ত রুদ্রতপস্যায় নিঃশেষ আত্মসমর্পণ করেছেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান যখন হয়েছে চিরকালের জন্য, তখন চিন্তা-ভারমুক্ত মনের 'অকারণ পুলক' ক্ষণিক উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে 'ক্ষণিকা'য়।

'ক্ষণিকা'

গ্রন্থরূপে 'ক্ষণিকা'র প্রকাশ 'কল্পনা'র পরেই ; ১৩০৭ সালে। এর কবিতাগুলিও রচিত হয়েছিল এক ঝাঁকে,—একই বছরে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ; গ্রন্থ প্রকাশিত হয় শ্রাবণে। এদিক থেকে 'ক্ষণিকা' নামেরও তাৎপর্য আছে। ক্ষণিক পুলকের এক ঋতু-লগ্ন মাত্র এই দুই মাস ধরে কবি-মনে উদ্ভাসিত হয়ে ফিরেছিল। কালের দিক থেকে কবিতাগুলি 'ক্ষণিকা' ভাব-চিন্তার বিচারেও তাই। 'কল্পনা'র দ্বন্দ্ব-মুক্ত অনুভব নিয়ে শেষ কবিতা লেখা হয় ১৩০৬ বাংলা সালের শেষে। তারপরের কবিতাগুচ্ছ 'ক্ষণিকা'র। বন্ধনহীন মুক্তির নির্ভার আনন্দানুভব এই কবিতাগুচ্ছের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অতীতের সঙ্গে তার যেমন যোগ নেই, তেমনি অনাগত সম্বন্ধে সে ভ্রূক্ষেপহীন। কিন্তু মানবজীবনের মুক্তি সর্ব-বিযুক্ত হতে পারে না, নিরবলম্ব জীবন বায়ুভূত নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। তাই অতীতের তীরকে কবি যে মুহূর্তে একেবারে ত্যাগ করেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই জীবন-স্রোত পেরিয়ে অনাগতের ভিত্তিভূমির আশ্রয় অনিবার্য হয়েছে। অতীত থেকে অনাগতের এই তীরভূমিতে পৌঁছুবার মধ্য-লগ্নে তরঙ্গায়িত আনন্দসাগরে সাঁতার কাটার পুলকিত অনুভব ছড়িয়ে আছে 'ক্ষণিকা'য়। আগেই বলেছি, নিরালম্ব ভাব-লোকের ভাসমানতা স্থায়ী হয় না, হতে পারে না। তা ক্ষণিক,—'ক্ষণিকা'। এই বিভগ্ন ঋতু-লগ্নের 'উদ্বোধন' করে কবি নিজের কাছেই তার স্বভাব ব্যাখ্যা করেছেন ;—

'শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে—
তাহাদেরি গান গারে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।
ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস নে কো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাহি না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে তারি গহ্বর পুরাতে,
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে।"

* * *

এই ক্ষণ-আশা-চারণেব অবসান ঘটল 'নৈবেদ্য'তে (১৩০৮ বাংলা সাল)। জীবনীকার প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায় জানিয়েছেন,—'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হইবার (১৩০৭ শ্রাবণ) অনতিকালের মধ্যে 'নৈবেদ্য' রচিত হইতে আরম্ভ হয়।" 'নৈবেদ্য' রবীন্দ্র-কবি-আত্মার ভারত আবিষ্কারের কাব্য। ভারতীয় চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার আধ্যাত্মিকতায়। কিন্তু আত্মার সে সাধনা কর্ম-বিমুখ নয়,—নয় বিশ্ব-বিমুখ! সমস্ত কর্তব্য সাধনায় পদে পদে আত্মার সম্পদ স্মরণ করে আত্মপরিণামের অভিমুখে কর্মের প্রয়াসকে পরিচালিত করা ভারতের স্বধর্ম। ধর্ম এবং কর্মশাস্ত্র এদেশে অভিন্ন। ঈশ্বরকে প্রতিদিনকার জীবনাচরণের মধ্যে আবিষ্কার ও আরাধনাতেই ভারতীয় আর্য-ধর্মের স্বকীয়তা। 'নৈবেদ্য' কাব্যে আধুনিক জীবন-ভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি সেই শাশ্বত ভারত-ধর্মকে আবিষ্কার করেছেন নিজের চৈতন্যেব মূলতম গভীরে। তাই, কবি বলেন, কর্মমুখর জগতের পথে যখন চলছিলেন আপন মনে :—

'নৈবেদ্য'

"তখন সহসা দেখি মুদিয়া নয়ন,
মহা জনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি,—কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধ বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্ত, সব চিন্তা, সব চেষ্টা 'পরে,
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গ-বিহীন দেব, তুমি বসি একা।"

সমস্ত কর্ম-সঙ্গে যুক্ত থেকেও দেবাদিদেব সঙ্গ-বিহীন—যিনি সকলের মধ্যে বিলীন-ব্যাপ্ত থেকেও সর্বাতিরিক্ত একক—চির-'একা', 'নৈবেদ্য কাব্যে তাঁকেই কবি আবিষ্কার করেছেন। জীবনদেবতার একক-চারণ আজ বিশ্বদেবতার সর্বব্যাপ্ত 'একমেবাদ্বিতীয়'তার অতলে আত্মসমর্পণ করে চরিতার্থ, সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই 'নৈবেদ্য'-র কবির ধ্যান-দৃষ্টিও আজ দ্বিমুখে সম-সচেতন। সমকালীন বিশ্বের কর্মভূমির জটিল অভিব্যক্তির প্রতি কবির সন্ধানী দৃষ্টি ঘরেবাইরে সদা সচকিত। অপর দিকে প্রতিটি ঘটনা, প্রতি সম্ভাবনাকে সর্বত্র পরিমাপ করেছেন

তিনি শাশ্বত আত্মার মূল্য-চেতনার আলোকে। আফ্রিকায় ব্রিটিশের বুয়র-নির্যাতনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে কবি বলেছেন,—

"এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয় দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদগার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থ দীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।"

সেই সঙ্গে তিনি একান্ত ভরসা করেছেন,

"তোমার নিখিলব্যাপী আনন্দ-আলোক
হয়ত লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধুতীরে।।
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।"

তাই স্বদেশের জন্য কবির একমাত্র 'প্রার্থনা':—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারেব স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।।"

নিজের জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা,—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গা সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

'নৈবেদ্য' কাব্য স্বদেশপ্রেম ও সর্বমানব-প্রেমের যৌথ সূত্রে বাঁধা পড়ে বিশ্বদেবের চরণে নিবেদিত হয়েছে ধ্যানী প্রাণের নৈবেদ্য-রূপে।

'নৈবেদ্য'-র জীবন ও কর্মসচেতন অধ্যাত্ম-সাধনা কবি-কল্পনাকে কোথায় পৌঁছে দিত তা বলা কঠিন। কেবল কাব্য-সাহিত্যে নয়, বৈষয়িক জীবনের কর্ম-ভূমিতেও সমকালীন প্রত্যয়ের বাস্তবরূপ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয়ে (১৩০৮)।

'স্মরণ'-এর উৎস

সেখানে কবি "ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মল ভাবে মানুষ" করে তুলতে চেয়েছেন,—"ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত" করতে চেয়েছিলেন তাদের। অন্তরে অন্তরে এই আদর্শের রূপ-বিধাত্রী ছিলেন আশ্রম-জননী কবি-জায়া। কিন্তু আশ্রম-জীবনের সূচনাতেই তাঁর দেহে দেখা দিল কালব্যাধি। ১৩০৮ বাংলার পৌষ মাসে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; ১৩০৯ বাংলার আষাঢ় মাসে মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হলেন; ভাদ্রে তাঁকে কলকাতায় আনতে হল চিকিৎসার জন্য; আর অগ্রহায়ণে হল তাঁর দেহান্ত। কবির অন্তর এবং বাইরের জীবনে এ-ক্ষতি অপূরণীয় হয়েছিল। কবি-জীবনে মৃণালিনী দেবীর প্রভাব সম্বন্ধে প্রভাতকুমার লিখেছিলেন—"কবির উপর কবি-প্রিয়ার অখণ্ড প্রতাপ ছিল। এমন কি কবি তাঁহাকে মনে মনে ভয় করিতেন।... বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়া কবি যে ভীষণ দায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আর্থিক অস্বচ্ছলতার দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাঁহার স্ত্রীকেই।"

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর সময়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ে কেবল অর্থাভাব নয়, নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। পরিবারের ভিতরে শিশু সন্তান কয়টি হয়েছিল নিরাশ্রয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার অসুস্থতার দরুন কবিকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে।

'স্মরণ'

রথীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতন স্কুলে। শিশু শমীন্দ্রনাথ কলকাতায়। মৃণালিনীর তিরোভাব কবির কর্মক্ষেত্রে ও পরিবার ক্ষেত্রে একসঙ্গে টেনে এনেছিল। ভাঙন সেই সঙ্গে জীবন-সঙ্গিনীর অভাব মনেও যে ভাঙন ধরিয়েছিল তারই স্বতঃস্ফূর্তি প্রত্যক্ষ করি 'স্মরণ'-কবিতাবলিতে।

'স্মরণ' কাব্য কবি-প্রিয়ার স্মরণে লেখা। ১৩১০ বাংলা সালে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে এর প্রথম প্রকাশ। রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে 'স্মরণ' একদিক থেকে অনন্য। নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে নিজের সৃজন-লোক থেকে চিরকাল কবি সন্তর্পণে পরিহার করেছেন। ব্যক্তিমনের অনুভব যতক্ষণ ভাব-ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে সর্বজনীন হয়ে না উঠেছে, ততক্ষণে প্রায়ই তাকে কাব্যে স্থান দেন নি। নিজের আনন্দ-বেদনার ব্যক্তিগত আবেগকে নিজের মধ্যে সংহত-গোপন করে রাখাই ছিল তাঁর স্বভাব। ব্যক্তি-মনের দুর্বলতাকে প্রকাশ করা লজ্জাকর মনে করতেন তিনি। তবু, জীবনের এই চরম অভাবকে অপ্রকাশিত রাখতে পারেন নি। 'স্মরণ'-কবিতাবলিতে মৃণালিনী দেবীর পতি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ধরা দিয়েছেন সম্পূর্ণ করে। এর আগে সদ্য-বিকচ যৌবন-লগ্নে 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে একই রকম ব্যক্তিগত অভিভূতির প্রকাশ করেছিলেন গদ্য-কাব্য 'পুষ্পাঞ্জলি'-তে। কিন্তু 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রধানত উচ্ছ্বাস ;—'স্মরণ' সার্থক কাব্য। এই কবিতাগুচ্ছের স্বাদ অভিনব, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি মনকে এই কবিতাবলিতে নিরাবরণ পরিচয়ে ধরা যায় :—

"—মরণের সিংহ দ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া,—

আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপমালা ; আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রু-নিমগন।
আজিকার এই বার্তা জানে নি শোনে নি কোনো জন।
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি,
আমার সংগীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।"

নিঃসঙ্গ, নিভৃত, একক কবি-মনের এই রূপ অভূতপূর্ব।

'স্মরণ'-এর পরের গ্রন্থিত কাব্য 'শিশু' ; এটিও ১৩১০ বাংলা সালে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উপক্রমণিকা সহ এতে কবিতা সংখ্যা ৬২ ; তার প্রথম ত্রিশটি-ই কেবল এই সময়ে (১৩০৯-১০ সাল) লেখা। বাকি কবিতাগুলি পূর্বে বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। পৃথক গ্রন্থরূপে পূর্বে প্রকাশিত 'নদী' কবিতাটিও এবার 'শিশু' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশুদের প্রতি। প্রথম জীবনের শিশু-কবিতা রচনার সঙ্গে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর শিশুমনের ব্যক্তিগত স্পর্শের কথা উল্লেখ করেছেন জীবনীকার প্রভাতকুমার। কিন্তু সে সব কবিতা বিভিন্ন সময়ের খুচরো লেখা। 'শিশু' কাব্যের বিশেষ ঋতুর বিকাশ ঘটেছে আলোচ্য 'স্মরণ'-উত্তর কালে রচিত প্রথম ত্রিশটি কবিতায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে উত্তর-যৌবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি নিজের শিশু-সত্তাকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন। তার চেয়েও বেশি করে এই সকল কবিতায় ছড়িয়ে আছে নিজের সন্তানদের মন-পরিচয়,—তাঁদের সদ্যোবিগতা জননীমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে। 'শিশু' কাব্যের ভাব-পটভূমি ব্যাখ্যা করে কবি লিখেছেন,—"খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী। তখন (মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পূর্বকালে) খুকী ছিল না—মাতৃ-শয্যার সিংহাসনে খোকাই (শমীন্দ্রনাথ) তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল। সেইজন্য লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে। সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।"

'শিশু'

স্মরণ রাখতে হয়, 'শিশু' কাব্যের আলোচ্য কবিতাবলি লেখা হয়েছিল আলমোড়ায় রেণুকার রোগশয্যার পাশে। এই কাব্যেও কবি নিজের বেদনার্ত চিত্তের উৎকণ্ঠাকে বিগত পরিবার-সুখের স্নিগ্ধ স্মৃতিতলে ডুবিয়ে নবতর জীবন-রসের সঞ্চার করেছেন। 'স্মরণ'-এর কবি কেবল বল্লভঃ 'শিশু'র কবি একাধারে 'খোকা', এবং তার মা আর বাবা-ও :—

"মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।

* * *

আমি বলি মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে?
শুনে তারা হেসে, যায় যে মা ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ

দুহাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে
আকাশ হবে আমাদের এই ছাদ!"

'শিশু'র পরের কাব্য হিশেবে স্মরণীয় 'উৎসর্গ'। এটির প্রথম গ্রন্থন-কাল ১৩২১ বাংলা সাল; কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই লেখা হয়েছিল ১৩০৮ সালের মধ্যে। এই কবিতাগুচ্ছে বিশেষ মনোঋতুর অভিব্যক্তি নেই। কারণ প্রায় সব কবিতাই লেখা হয়েছিল মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থা‹লির বিভিন্ন পর্যায়ের ভাব-ভূমিকা হিশেবে। তবে 'কল্পনা'-উত্তর যুগে রচিত হয়েছিল বলে,—ঐ ঋতুর ভাব-কল্পনার সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে 'উৎসর্গ'-কবিতাবলির।

'উৎসর্গ'

গ্রন্থন-কালের হিশেবে 'শিশু'র পরের কাব্য 'খেয়া'; এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩১৩ বাংলা সালে; কবিতা রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৩১২-তেই। ঐ একই বাংলা সালে ঐতিহাসিক বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা। কবি সেই ঝড়ের মুখে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন দেহে-মনে-প্রাণে। বাংলার এক প্রত্যন্ত থেকে অপর প্রত্যন্তে ছুটে বেড়িয়েছিলেন বিপ্লবের উল্কাবেগে। কিন্তু প্রথম আবেগের উদ্দীপনা মন্দীভূত হতে না হতেই দেহ-মন ছাপিয়ে এল অপার ক্লান্তি। কবি আর কর্মী যে অভিন্ন নয়, এ-কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। শুধু তাই নয়, এর আগে 'নৈবেদ্য'র কবিতাবলি রচনা শেষ হয়ে গেছে। ভারতের প্রাচীন তপস্বীর দৃষ্টিতে মানব-আত্মার অজরামর সত্য স্বরূপ তাঁর মর্মের গোচরীভূত। তাই স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যেও তিনি এমন কোনো সম্পদ চান না, যা বিশ্বের কোনো এক কোণেও মানব-ধর্মকে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথের চোখে তখন থেকেই জাতি-প্রেম এবং মানব-প্রেম অভিন্ন; বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন তাঁর মনকে টেনেছিল, কারণ বঙ্গভঙ্গের মূলে ছিল তাঁর স্বজাতীয় মানুষের ক‍ামনার প্রতি বিদেশী শাসকদের উপেক্ষা ও উৎপীড়নের ভাব। কিন্তু, কাজে নেমে যখন দেখলেন আন্দোলনের স্বপক্ষীয়েরাও ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করবার একমাত্র চেষ্টাতেই ব্যস্ত, তখন ক্লান্তির সঙ্গে দেখা দিল মনের বিরোধিতা। কর্মী যখন সংগ্রামী হয়, তখন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করাতেই তার উৎসাহ। অথচ কবি যেখানে ধ্যানী, সেখানে সকল পক্ষে সর্বত্র আত্মার সত্যকে অব্যাহত রাখাই তাঁর সাধনা। তাই দেহকে টেনে চালালেও, মনকে আর কিছুতেই চালানো সম্ভব হল না। [illegible] কর্মের স্রোতে তখন গিয়ে পড়েছেন অনেক দূরে, ফিরে আসা দুষ্কর; অনেক তর্ক, অনেক বিরোধের ঝড় উঠবে। তবু শেষ পর্যন্ত কবিকে মনের কথাই শুনতে হল,—ফিরতে হল স্বধর্মে। বাইরের জগতের নিন্দা-তর্ক-কোলাহল থেকে বহু দূরে নিজের মনের নিভৃত লোকে আপন আত্মার বাণীকে শুনবার,—আবিষ্কার করবার ধ্যানে বসলেন কবি এবারে। 'খেয়া' কাব্য কবি-জীবনের খেয়াতরী। বাইরের কর্মান্ধতার গতিবন্ধন থেকে আত্মার নিভৃত নিঃসীম সত্যানুভবের গহনে পাড়ি দেবার কাব্য।

'খেয়া'

এর পরের গ্রন্থিত কাব্য 'গীতাঞ্জলি'। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর-তপস্যার আত্ম-নিমগ্নতায়। অনেকে 'খেয়া'কেও ঈশ্বর-ভাবুকতাব কাব্য বলেছেন। কিন্তু 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা নয়, রবীন্দ্র-কাব্যঋতুতে 'নৈবেদ্য'রই পরিণাম। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ-কথা স্পষ্ট করে বলেছেন কবির পূর্ব-কাব্য ও জীবনের প্রমাণ উদ্ধৃত করে।—"খেয়া গীতাঞ্জলির ন্যায় কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক গীতিকাব্য নহে। খেয়ায় কবির অন্তরতম অনুভূতি রূপকে, চিত্রে, ছন্দে অকল্পিত সৌন্দর্যে বিশুদ্ধ কবিতা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।" এই সময়কার ব্যক্তিমনের আত্মাভিমুখী উৎকণ্ঠা সার্থক গীতিরূপ পেয়েছে বিচিত্র কবিতায়। তারই একটি :-

"আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালা দেবে কবে?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা
কেনা বেচা নানান হাটে হাটে।"

'খেয়া'র পরের গ্রন্থিত কাব্যই 'গীতাঞ্জলি' ; কিন্তু এর রচনা ও প্রকাশ ঘটে অনেক পরে। গ্রন্থাকারে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩১৭ বাংলা সালে ; আর কবিতা রচনা শুরু হয় ১৩১৬-র আষাঢ়ে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন একাধিক ঝাঁকে হলেও, মাত্র সাড়ে দশ মাস সময়ের সীমায় 'গীতাঞ্জলি'র ১৩৭টি কবিতা বা গান রচিত হয়েছিল,—"যথার্থ রচনার দিন হইতেছে ৯০ দিন।" একটা গভীর অনুভবের দোলা কবির মনে এসে সেদিন লেগেছিল, যা ঘরেবাইরের অজস্র কর্মসাধনার মধ্যে,—নিত্যদিনের ছুটে চলার মধ্যেও একাধিক সংগীতকে স্বত-উৎসারিত করেছে প্রায় প্রতিদিন। 'গীতাঞ্জলি' নামের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার লাভের অধিকারী করেছিল। তাহলেও এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যেও একটি নয়। কেউ কেউ বাংলা 'গীতাঞ্জলি'কে রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের অনুল্লেখ্য উপপ্রবাহ বলেও মনে করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি,' যাতে অন্যান্যের মধ্যে 'নৈবেদ্য'র কবিতাও ছিল বেশকিছু। তা-ছাড়া, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের মুখোমুখি প্রতীচ্য পৃথিবী পুরস্কার দিয়েছিল বিশুদ্ধ কবিকর্মকে নয়, সেই মহৎ বিশ্বাস ও তপস্যাকে, যাকে আশ্রয় করে তাঁরা সেদিনকার মৃত্যু-তরণের ভরসা ও সংকেত আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

'গীতাঞ্জলি'

সেই নূতন আশার আশ্রয় স্বয়ং কবিকে একদিন আবিষ্কার করতে হয়েছিল অপার দুঃখ-শোকের ঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। 'বলাকা' কাব্যের 'শঙ্খ' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি 'গীতাঞ্জলি'-যুগের পটভূমি ব্যাখ্যা করে পরে বলেছিলেন,—"জীবনে এমন একদিন এসেছিল, যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল, জীবনের কাজ বুঝি সব সারা হয়ে গেছে, এখন ভজন-পূজন, সাধন-আরাধনার মধ্যে জীবনের শান্তি খুঁজতে হবে।" 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' পর্যন্ত কবি-চেতনার এই ভজন-পূজন, সাধন-আরাধনার যুগ। যে বেদনাকে আশ্রয় করে এই ধ্যানলোকের পরপারে কবি-মনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, গোপনে গোপনে তার প্রথম মানস সঞ্চার 'স্মরণ'-যুগে,—কবি-প্রিয়ার মৃত্যুতে। অজানার সেই গোপন পদক্ষেপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে এল নবতর আঘাতের পর আঘাতে। মার মৃত্যুর নয় মাস পরে কন্যা রেণুকা-ও কবিকে ছেড়ে গেল ইহজন্মের বন্ধন ছিঁড়ে। তারও চার বছর পর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল বন্ধু-গৃহে। বিদ্যালয়ের ছুটিতে শমী বেড়াতে গিয়েছিলেন বন্ধুর বাড়িতে, হঠাৎ তাঁর কলেরার খবর পেয়ে কবি ছুটে যান। কিন্তু ১৩০৯ সালের যেদিন মৃণালিনী দেবীর দেহান্ত হয়েছিল, ১৩১৪ সালের ঠিক সেই দিন মৃত্যু হল শমীন্দ্রের। দূর থেকে, অবচেতনার মধ্যে যার ধীর পদক্ষেপ চলছিল বহুদিন ধরে, এই শোকের আঘাতে সেই রহস্যময় উপলব্ধির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল কবি-প্রাণ। পুত্রের মৃত্যুর দিন-কয় পরে চিঠিতে লিখেছেন,—"সমস্ত আঘাত কাটিয়ে জীবনযাত্রা যেমন

'গীতাঞ্জলি'র উৎস ও ধর্ম

চলছিল তেমনই চলছে, হয়তো একটা পরিবর্তন ঘটেছে—কিন্তু সে পরিবর্তন উপর থেকে দেখা যায় না—সে পরিবর্তন নিজের চোখেও হয়তো সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য গোচর হতে পারে না।"

মনের অগোচর সেই পরিবর্তনের সুর প্রথম প্রকাশ পেল আরো দিনকয় পরে,—যখন শিলাইদহের মাটিতে ফিরে গিয়ে নূতন গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠলো মনে মনে। ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাংলা সালে লেখা হল—"অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।"—বাইরে যখন শোক, ভয়, সংশয়, তখন সেই 'অন্তরতর',—অন্তরতমকে একমাত্র আশ্রয় করে নূতন সাধনার, নব উপলব্ধির তরী ভাসিয়ে দিলেন জীবনের দুঃখ-সিন্ধুতে :—

"চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখিব আবরণ গেল সরিয়া।"

'গীতাঞ্জলি'-ঋতুর জন্ম এখানেই, মাঝে কিছুদিন মনোলোকের সেই ঋতুস্বভাব বহিঃপ্রকাশ স্থগিত রেখেছিল। অনুকূল কালের হাওয়ায় হঠাৎ একদিন অঝোর ধারায় ঝরে পড়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যে 'গীতাঞ্জলি'র [illegible] মর্যাদা নি[illegible] বিতর্ক আছে। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের উত্তর যুগেব বিকাশে 'গীতাঞ্জলি'-ঋতুর অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। আগে দেখেছি, আত্মসত্য, মানবসত্য ও বিশ্বসত্যকে একসূত্রে জড়িয়ে অবিনশ্বর সত্যের অখণ্ড স্বরূপ কবি আবিষ্কাব করেছেন বারে বারে। তাঁর কবি-কর্মের এবং কবি-ধর্মেরও শ্রেষ্ঠ সম্পদ এখানে। 'চিত্রা'-ঋতুতে এই সত্য-বোধই কবির ব্যক্তিগত আবেগকে উদ্বোধিত করেছিল। 'নৈবেদ্য'-ঋতুতে এই সত্যবোধকেই আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় সজ্ঞান প্রত্যয়ের মধ্যে। কিন্তু কবি-প্রতীতির পূর্ণতা ধ্যানীর উপলব্ধিতে। আবেগ ও জ্ঞানের জগতে যে সত্যকে জানা গিয়েছিল,—উপলব্ধির অতলে ডুবে কবি তাকে চিরদিনের মত আত্মাব সম্পদ করে নিলেন। সেই শক্তিতে দীপ্ত হয়ে বলতে পারলেন,—"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো. সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" 'গীতাঞ্জলি'র উপলব্ধিকে আমূল আত্মার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন কবি নূতন বিশ্ব-লোকে 'বলাকা'র ঋতুতে। 'গীতাঞ্জলি', কবিব মানস-ইতিহাসের বিচারে, 'বলাকা'-ঋতুর প্রবেশ-দ্বার।

'গীতাঞ্জলি'র পরে 'গীতিমাল্য', তার পরে 'গীতালি'। এই দুটি কাব্যই গ্রন্থিত হয়েছিল ১৩২১ বাংলা সালে। 'গীতাঞ্জলি'তে উপলব্ধি-সাধ্য সত্যলোকে প্রবেশ, 'গীতিমাল্যে' সেখানে প্রতিষ্ঠা; এবং সর্বশেষে 'গীতালি'তে হৃদয়ের উপলব্ধিভূমি থেকে বৃহৎবিশ্বের মুক্তি-লোকে পুনঃপ্রবেশের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে; মনে হয়েছে,—

'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'

"জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বকে।
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায়ে শ্রীচরণে।
আপন মাঝে আপন জীবন
দেখে যে মন কাঁদে।

নিমেষগুলি শিকল হয়ে
আমায় তখন বাঁধে।"
এই বন্ধন থেকে নব মুক্তি 'বলাকা'য়।

২। বিকাশ-যুগের নাট্যসাহিত্য

এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'মালিনী'—এটিও গীতিনাট্য ; রচনাকাল ১৩০৩ বাংলা সালের প্রারম্ভ। 'চৈতালি'র কবিতাগুচ্ছের মধ্যভূমিতে 'মালিনী'র জন্ম ; কিন্তু গল্পের মূল সূত্রটি মনে জড়িয়েছিল বহু পূর্ব থেকে। বিলেতে থাকবার সময় একবার কবি 'তারক পালিতের বাসায়' শুয়ে স্বপ্ন দে'খছিলেন,..."যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতে শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।" পরে 'মহাবস্তু অবদান'-এর উপাখ্যানের সঙ্গে পুরাতন সেই স্বপ্ন-সূত্র গেঁথে নূতন নাট্যকাব্য গড়ে উঠল।

'মালিনী'

কাশীরাজ-কন্যা মালিনী বুদ্ধ-শিষ্য কাশ্যপের কৃপালাভ করে বৌদ্ধভিক্ষুণী হয়েছেন। সনাতন হিন্দু-ধর্মের মহাপীঠ বারাণসী কাশী; প্রজারা ব্রাহ্মণ নেতৃত্বের ছত্রতলে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর নির্বাসন দাবি করল রাজসভায়। খবর শুনে স্বয়ং মালিনী রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ-কৃপাপুষ্টা নারীর শান্তস্নিগ্ধ বিভায় অভিভূত হয়ে ব্রাহ্মণ্য রোষ স্তিমিত হয়ে এল ; থামল না কেবল বিপ্লব-নেতা ব্রাহ্মণ ক্ষেমংকর ও তার বন্ধু সুপ্রিয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ক্ষেমংকরের গতি ছিল গ্রন্থ-কীটের মতো। তাই সংস্কার তার অন্ধ, কঠিন, নিষ্ঠুর। ক্ষেমংকর বিদেশ যাত্রা কবল,—সেখান থেকে সৈন্যদল এনে বিপর্যস্ত হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে বলে। দেশে রেখে গেল আত্মার আত্মীয় সুপ্রিয়কে।

কাহিনী

সুপ্রিয় মাঝে মাঝে শাস্ত্র-বিচার করতে যেত মালিনীর সঙ্গে। পুথির কঠিন বন্ধন থেকে শাস্ত্রের রুক্ষ-নীরস নীতিকথাকে কখনো আত্মস্থ করতে পারে নি সুপ্রিয় ; এবার ধর্মের প্রাণ চঞ্চল রূপ প্রত্যক্ষ করল মালিনীর মধ্যে; প্রাণের আকর্ষণে ধরা দিল প্রাণ। এমন সময়ে ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে গোপনে খবর পাঠাল,—সৈন্য জুটেছে, এবার সে দেশে ফিরছে স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। সুপ্রিয় সে খবর রাজাকে না জানিয়ে পারল না,—তিনি গোপনে গিয়ে ক্ষেমংকরকে বন্দী করে আনলেন। ফিরে এসে, এবারে তিনি স্থির করলেন মালিনী ও সুপ্রিয়-র হৃদয়-বন্ধনকে স্থায়িরূপ দেবেন বিবাহের বাঁধনে। ক্ষেমংকরের হত্যার আদেশ হল রাজার তরফে। কিন্তু মালিনীর প্রার্থনায় রাজা তাকে ক্ষমা করবার সিদ্ধান্ত করলেন মনে মনে। এমন সময় ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে কাছে ডেকে গোপনে কথা বলার অছিলায় তার মাথায় শিকলের আঘাত করে হত্যা করল তাকে। রাজা তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করলেন, কিন্তু মালিনী ছুটে এসে তার প্রাণভিক্ষা করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

এখানেও 'বিসর্জন'-এর মতোই প্রাণের ধর্ম ও সংস্কার-ধর্মের সংঘাত ঘটেছে,—জয় হয়েছে প্রেম ও ত্যাগ-ধর্মের। কিন্তু 'মালিনী'র যুগ 'চৈতালি'-ঋতুর কবি-মনোভাবের দ্বারা বিশেষিত। তাই 'বিসর্জন'-এর সংঘাত-তীব্রতা নেই এতে,—সুদৃঢ় প্রত্যয়ের অবিচলতাই বরং প্রখর। ফলে 'মালিনী'-তে নাট্যধর্মের চেয়ে গীতিধর্ম

কাব্য-স্বাদ

নিবিড়তর হয়েছে। নাটকের আধারে 'মালিনী' একটি ঘনবদ্ধ গীতিকাহিনী।

এর পরের নাটক 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩ সাল) রবীন্দ্র-শিল্পের ইতিহাসে একটি অভিনব ধারার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ-ধারার সূত্রপাত 'ব্যঙ্গ-কৌতুক'-এ ধৃত 'বশীকবণ' ইত্যাদি ব্যঙ্গ—নাটিকায়। 'গোড়ায় গলদ'-এ তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রকাশ দেখেছি পূর্বের পর্যায়ে। কিন্তু'গোড়ায় গলদ'-এর শিল্প-সুষমা অবিস্মরণীয় নয়। ফলে, রবীন্দ্রনাথের রস-নাট্যের প্রথম স্থায়ী সৌন্দর্য-রূপ প্রকাশ পেল 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-তে।

কবিকে আমরা চিরকালই ভাবুক, মনীষী বলে জানি। তাই গভীর অনুভব ও একান্ত চিন্তার প্রখর জ্যোতিই তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি চিরকাল। সেই ছায়াহীন দৈবী দ্যুতির ফাঁকে ফাঁকে স্মিত হাস্যেব মৃদু নক্ষত্রালোকও যে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়েছে, তা সাধারণ বাঙালির কল্পনাতীত। কারণ হাসিকে আমরা লঘু বলেই জানি। অর্থহীন চপলতার মধ্যে কৌতুক-হাস্যের জন্ম; অকারণ অসূয়া থেকে জেগে ওঠে তীব্র ব্যঙ্গ-রস; —এইটুকুই আমাদের সাধারণ ধারণা। কিন্তু ববীন্দ্র-সাহিত্যে অসংশয়িত ভাবে দেখি, হাসির মধ্যে জীবনের নির্বন্ধন দীপ্তি ঠিকরে পড়েছে অকারণে; ব্যঙ্গের অতলে আত্মগোপন করে আছে কবি-হৃদয়েব গোপন সহৃদয়তা। সমকালীন জীবনের অসংগতি যেখানে কবি চি[illegible] [illegible]ণিত করেছে অথচ সহানুভূতির প্রলেপে তাকে সুমিত করা সম্ভব হয় নি, সেখানেই শিল্পীব সহৃদয়তা ব্যঙ্গেব কুঠার হাতে নিয়েছে,—ধ্বংসের ভূমিতে নব-জীবনেব ফসল রচনা কবতে। 'মানসী' কাব্যে নিজের রচনাব মূলীভূত উদ্দেশ্য কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন :—

রবীন্দ্রনাথেব রস-সাহিত্য

"স[illegible] চাহে বেদনা দিতে বেদনা ভ[illegible] প্রাণ।
হাসিব ছলে সবাবে চাহি করিতে লাজ দান।।"

এই উদ্দেশ্যকে সার্থক কবেই ববীন্দ্রনাথের রস-চেতনা সুকুমাব শিল্পরূপেব সৃষ্টি করতে পেরেছে হাস্যকব প্রসঙ্গেও। হাসি ও বিদ্রূপেব মধ্যেও কবিপ্রাণ সংশয়াতীত ব্যঞ্জনায় বিকাশ পেয়েছে। আব আগেই বলেছি, সে-বিকাশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সফলতা 'বৈকণ্ঠের খাতা'-তে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ব মূল রস ব্যঙ্গবস নয়, —পণ্ডিতেবা ব[illegible]ছেন,—কৌতুক [illegible]। লক্ষ কবলে দেখব,—হাসির লঘু ছন্দে গভীর জীবন রসকে,—জীবনের বিচিত্র দুর্বল[illegible]র প্রতি কবি-হৃদয়ের সকরুণ মমতাবোধকেই অভিব্যক্ত করেছে এই নাটক। তাই এব কাহিনীই নয় কেবল,—অভিনয়ও ববীন্দ্র সাহিত্য-পাঠকেব সর্বজনীন প্রীতি পুষ্ট। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'চিত্রা'-ঋতুব বচনা; কবির সমকালীন মানসের মানব-জীবনাকৃতিকে স্বচ্ছন্দ-স্নিগ্ধ রূপ দিয়েছে এই লঘু নাটকটি।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র পরে অনেক দিন আর নাটক লেখা হয় নি; নূতন [illegible]কে নূতন নাটক লিখতে দেখি ১৩১৫ বাংলা সালে —'শাবদোৎসব'। কাব্যে তখন 'খেয়া'র যুগ শেষ হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা লেখা চলছে একটি-দুটি করে। 'গীতাঞ্জলি'র যুগ উপলব্ধি-তন্ময়তার রসে পূর্ণ। জীবনের একটি ধ্রুব সত্য রূপের সন্ধানী কবি চিরকাল। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগ থেকে তা[illegible] আকাঙ্ক্ষায় চলেছে কবিচিত্তের নিয়ত অভিসার। এক কথায় তাকে বলা চলে, -- বিশ্বসত্য,—বিশ্ব-জীবনসত্য। 'চিত্রা'র যুগের আবেগ-স্পন্দিত মনে, 'নৈবেদ্য'-যুগের জ্ঞান-তপস্যায়, সেই সত্য-রূপের সন্ধান ধরা দিয়েছে দুবার। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র সাধনা ধ্যানীর; জীবনের অজরামর-অক্ষয়, অথচ আনন্দ-রূপ-অমৃত সত্যের সন্ধানে সেই আনন্দ-লোকেরই

'শাবদোৎসব' ও ববীন্দ্রনাট্যেব সাংকেতিকতা

অতলে ডুব দিয়েছে কবি-সত্তা। সেখানে প্রত্যয় কেবল বোধির দ্বারা নয়, উপলব্ধির শক্তিতে নিঃসংশয়। তাই এবার থেকে যেমন শংকা নেই, তেমনি নেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ফলে, এবার থেকে কেবল নাটকই নয়, উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে অখণ্ড কাব্যকবিতা। যে-জীবনের আভাস তারা ব্যঞ্জিত করে, সে বাইরের কর্ম-মুখর জটিল জীবন নয় ; সেই জীবনের অগ্নি-স্নাত নবীন কল্প-রূপ;—সে রূপের পূর্ণতা কবির অবিচল প্রত্যয়ের তপঃসিদ্ধির গভীরে। প্রথম সংস্করণ 'শারদোৎসব'-এর নান্দী শ্লোকে নাটকের এই নবীন কাব্য-ধর্মের ব্যঞ্জনা অসংশয়িত প্রকাশ পেয়েছে :—

"শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্য ধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়,
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।"

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হতে পারে যে, কবি আজ জীবনের যে পরিচয়কে সন্ধান করে ফিরছেন,—বহিরঙ্গ রূপের জগতে তা বাঁধা নেই। জীবনের অরূপ, অপরূপ, আনন্দ-স্বরূপকে আবিষ্কার করতে ব্রতী হয়েছে তাঁর কবি-প্রাণ। ইনি নিছক ঈশ্বর নন। জীবনের আদিশিল্পীকে ঈশ্বর বলে জেনে কবির স্রষ্টা-মনের তৃপ্তি নেই; সৃষ্টির আনাচে-কানাচে সেই ঐশ্বর্যকে আনন্দরূপে, সুন্দররূপে আবিষ্কার করেই তাঁর তৃপ্তি। তাই 'শারদোৎসব' এবং পরবর্তী নাট্যপ্রবাহে ঈশ্বর-তত্ত্বই প্রধান হয়ে নেই; বস্তুত কোনো তত্ত্বকেই কবি বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেন নি। জীবনের ছোট-বড় অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মধ্যে আনন্দময় সুন্দরের অনন্ত পরিচয়কেই আবিষ্কার করেছেন। কবির এই অনির্বাচ্য আনন্দ-সৌন্দর্য-চেতনার সংকেতকে বহন করেই 'শারদোৎসব'-এর পরবর্তী অধিকাংশ নাট্যকৃতি সাংকেতিক নাটকের রূপ পেয়েছে।

'শারদোৎসব'-এ শরৎ-প্রকৃতির মধ্যে অরূপ সৌন্দর্যের সন্ধান চলেছে। একান্ত শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানব-প্রাণের মধ্যে "নাড়ির রক্ত চলাচলের যোগ" অনুভব করেছিলেন। সেই নাড়ির বন্ধনকে আশ্রয় করে প্রকৃতি ও মানবাত্মার মূলীভূত অপরূপ সুন্দরের পরিচয়কে অনুভব করতে চেয়েছেন। সেই অনুভব-কামনার মূলে রয়েছে 'গীতাঞ্জলি' যুগের অবিচল প্রত্যয়। কবি বলেছেন,—"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি, তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটি একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎ-প্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটার সঙ্গেই শরৎ-প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করেছে, সেই দুঃখের রূপ মধুরতম। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে, ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে-লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সেই আনন্দের থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটা এই, ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়?"

'শারদোৎসব'-এ জীবনের স্বাদ ও সংকেত

'শারদোৎসব'-এর পরবর্তী নাট্য-প্রবাহের প্রায় সব কয়টিতেই একজন 'রাজা' আছেন

অধিরাজ হয়ে ; ইনিই আনন্দময় অমৃত, কবি এঁকে বলেছেন 'দুঃখ রাতের রাজা'! দুঃখের জ্বালাময় তপস্যার অগ্নি-পথ পেরিয়ে তবে তাঁর সান্নিধ্য পেতে হয়, পেতে হয় পরমানন্দ সুন্দরের অধিকার। প্রায় প্রতিটি নাটকে একজন করে বৃদ্ধ রয়েছেন—অথবা রয়েছেন একজন করে ঠাকুর্দা;—যিনি আনন্দের বার্তাবহ—সুন্দরের দূত।

এই নাটকে লক্ষেশ্বর নামে বণিক স্বার্থের জন্য, টাকা ও অর্জনের লোভে সকলকেই ভয় করে, ঈর্ষা করে। সন্দেহ বশে সকলের কাছ থেকে নিজের সম্পদ গোপন করতে চায়। অন্যদিকে রাজা হলেন সমগ্র উৎসবের মহা-পুরোহিত, "যিনি আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বার হয়েছেন ; লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে তিনি চান। সেই পদ্ম যে চায়, সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলেই লাভ সহজ হয়ে সুন্দর হয়ে তার হাতে আপনি ধরা দেয়।"

কিন্তু সুন্দর পেলব নয়,—রুদ্র-কঠিন। দুঃখের তপস্যা দিয়ে, আত্মত্যাগের চরম মূল্য দিয়ে এই সুন্দরের অধিকার পেতে হয় তিলে তিলে—দিনে দিনে। 'শারদোৎসব'-এর ছুটির মাঝখানে বসে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করছে। রাজ-সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখতে পেলেন। তাঁর তখনই মনে হল শারদোৎসবের মূল অর্থ ঐ "ঋণশোধের সৌন্দর্য।"—এই অনুভবটি, অসংশয়িত প্রত্যয়ের আলোকে অখণ্ড অনবদ্য কবিতা-রূপ পেয়েছে সারাটি নাটকে। এই গীতি-সুন্দর রচনার অভিনয়ে নাটকীয়তার যে দৌর্বল্য ছিল, তাকেই পরিশোধিত করবার চেষ্টায় পরে লেখা হয়েছিল 'ঋণশোধ' (১৩২৮ বাংলা সাল)।

'ঋণশোধ'

'শারদোৎসব'-এর পরের নাটিকা 'মুকুট' (১৩১৫)। ১২৯২ বাংলা সালে 'মুকুট' নামে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বালক'-পত্রিকায়। সেই কাহিনীই এবারে রূপান্তরিত হল নাটকের আকারে, নাটকটি বালকদের জন্যেই লেখা ; স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত বলে আশ্রম বিদ্যালয়ের বালকদের পক্ষে সহজে অভিনয়-যোগ্য হতে পেরেছিল। সাধারণ নাট্যাকৃতিতে লেখা 'মুকুট' সহজ সংক্ষিপ্ত আকারে একটি রসবদ্ধ নাটিকা।

'মুকুট'

'মুকুট'-এর পরে লেখা হয় 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬)। 'বউঠাকুরানীর হাট' এর নাট্যরূপ এটি; কিন্তু প্রথম সংস্করণ 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের থেকে এই নাটকের তফাত দূরপ্রসারী। 'প্রায়শ্চিত্ত' আসলে হয়েছিল রাজা রামচন্দ্রের; বিভার স্বামীর! যিনি দ্বিতীয়বার দার-গ্রহণ করতে গিয়েও বিভাকে ভুলতে পারছিলেন না,—বলেছিলেন,—"সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছিনে। কাল রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।" রামচন্দ্রের মধ্যে বিভা-প্রেমের বিকাশ আত্মম্ভরিতার কাঠিন্যকে গলিয়ে গলিয়ে দুঃখ-তাপের মধ্য দিয়ে তাকে অপরূপ করেছে। 'প্রায়শ্চিত্ত'কে সংহততর রূপ দিতে চেয়েছেন কবি 'পরিত্রাণ'-এ (১৩৩৬)। এই নাটক দুটিতে, ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,—"ন্যায় ও সত্য ধর্মের একটা অধ্যাত্ম আকৃতি" থাকলেও, "তাহা রূপক অথবা সাংকেতিক রহস্যময় নয়।"

'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ'

'রাজা' (১৩১৭) ও 'ডাকঘর' (১৩১৮) নামক নাটক দুটি রচিত হয়েছিল 'গীতাঞ্জলি'র পরে,—প্রায় পর-পর। রবীন্দ্র-নাটকে সাংকেতিকতার প্রথম স্পষ্ট রূপায়ণ ঘটে এই দুটি রচনাতেই। কবি বলেছেন,—"রাজা নাটকে [রানী] সুদর্শনা আপন রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ

'রাজা'

বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে মিলনে পৌঁছে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ।" 'রাজা'র নাট্য-বিষয় এতে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। রূপের মোহজাল অরূপের আনন্দ-সুন্দর অমৃত-রূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সুদর্শনার রূপ-তৃষ্ণা তার সামনে অপরূপের স্বত-আবির্ভাবকে বিড়ম্বিত করেছিল। অথচ দাসী সুরঙ্গমা! জীবনের সকল তৃষ্ণাকে অকাতরে ত্যাগ করে,—সহজ আত্মদানের মাধ্যমে অরূপের প্রেম-রূপকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে সে প্রাণ দিয়ে। তাতে রানীর আক্রোশ আরো বেশি। অবশেষে বিপ্লব, যুদ্ধ, অগ্নিদাহের মধ্য দিয়ে নিজের তৃষ্ণা ও আত্মাদরকে তিলে তিলে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে অরূপ-এর আনন্দকে আত্মার গভীরে উপলব্ধি করলেন সুদর্শনা। সেদিন তিনি সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদার সমধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

'অরূপরতন'

পরবর্তী কালে কবি এই নাটকের সংক্ষিপ্ত সংহত রূপান্তর করেন 'অরূপরতন' (১৯২৬) নামে। 'রাজা' নাটকের মতো 'অরূপরতন'-এও সাংকেতিক ভাব-ব্যঞ্জনা নাটকীয় ঘটনাসংহতিকে ব্যাহত করে নি। দুটি নাটকই একাধিকবার অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছিল।

'ডাকঘর'

'ডাকঘর'-এ নাটকীয়তার চেয়ে সাংকেতিকতা নিবিড়তর। রবীন্দ্রনাথের গীতি-প্রতিভার উপলব্ধি-তন্ময় প্রত্যয় ঘনতম কাব্য-সুষমায় বিকশিত হয়েছে এই নাটকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাট্যের মধ্যে 'ডাকঘর' একটি ; অসংখ্য ভাষায় এব অনুবাদও হয়েছে। অনেকের ধারণা, এতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের বন্ধন-বেদনার সকরুণ রূপ মুক্তি পেয়েছে রুগ্ন নিরুদ্ধ বালক অমলের মধ্যে। ভৃত্য-রাজকতন্ত্রে বাঁধা বালক-কবির মুক্তি-বাসনার করুণ-মধুর পরিচয় ব্যক্ত আছে 'জীবনস্মৃতি'-তে। অথচ সেই বন্ধন-সীমাতেই কবির প্রাণে অসীম অনন্ত-সুন্দরের আভাস ধরা দিত ক্ষণে ক্ষণে। অমলের মনেও তেমনি সেই অপার অপরূপ অরূপের বার্তা এসে পৌঁচেছে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যময় 'ডাকঘরে'র মধ্য দিয়ে। তাই রূপময় আকৃতি ক্ষীণ,—জীর্ণ হয়ে আসে তার দেহ-সীমায়। চিকিৎসক এবং অমলের অভিভাবকেরা দেহের খাঁচায় তাব মুক্তি-ভিক্ষু প্রাণকে বাঁধতে গিয়ে গৃহ-সীমায় তাকে আবদ্ধ করেন। অবশেষে দেহাবসানের পূর্ব মুহূর্তে প্রহরী 'রাজা'র আগমনবার্তা জানিয়ে যায় তাকে; মৃত্যুর মধ্য দিয়ে,—রূপ-সমাপ্তির সার্থক উদ্‌যাপনের ক্ষণে অরূপ 'রাজা' এসে মুক্তি দেন অমলের মনের বদ্ধ বেদনাকে।

'অচলায়তন' ও 'গুরু'

'অচলায়তন' নাটক 'ডাকঘর'-এর পরে প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বাংলা সালে। কিন্তু এর মূল রচনা হয়েছিল ১৩১৮- তে—'ডাকঘর'-এর আগে। 'গীতাঞ্জলি'-উত্তর সেই যুগের ভাবনা ছিল মুক্তি-বাসনার নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ। এই নাটকে রাজার ভূমিকা নিয়েছেন গুরু। 'অচলায়তন'-এর উঁচু প্রাচীরের আড়ালে বাইরের আলো বাতাস মাথা খুঁড়ে মরে ; এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের মনকেও অচলায়তনের মতো এক-একটি ছোট অন্ধকূপে পরিণত করেছে। তাদের ভাবনা,—এমনি করেই গুরুর আবির্ভাব-দিনের জন্য প্রস্তুত হবে তারা। সেই আকাঙ্ক্ষায় অর্থহীন শাস্ত্র-বাক্য মুখস্থ করে, 'নির্বোধের মতো' না বুঝে পরের কথার অনুসরণ করে চলে অন্ধের মতো। হত্যা,—এমন কি আত্মহত্যাতেও দ্বিধা নেই, কারণ কিছুকেই তাদের কঠিন বোধ হয় না ; অর্থহীন সংস্কারের অন্ধতা তাদের হৃদয়কে—অনুভব-শক্তিকে করেছে স্তব্ধ। এমন পরিবেশে পঞ্চক ছিল মুক্তির দূত। সারাজীবন অচলায়তনের শিক্ষার প্রথম পাঠও সে কণ্ঠস্থ করে উঠতে পারেনি ; অথচ অচলায়তনের অধিনায়ক মহাপঞ্চকেরই সে সহোদব! অচলায়তনের বাইরে দ্বার নিরুদ্ধ ; তবু পঞ্চক বারে

বারে ছুটে যায় দর্ভক ও শোনপাংশুদের পাড়ায়,—অচলায়তনের অধিবাসীদের কাছে যারা অস্পৃশ্য। ওখানেই দাঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হয় পঞ্চকের। কর্মবীর শোণপাংশুদের শ্রম-সাধনা দাঠাকুরের প্রাণস্পর্শে কর্মলীলা—তথা আনন্দ-সাধনায় পরিণত হয়। অবশেষে দর্ভক ও শোনপাংশুদের নিয়ে তিনি অচলায়তনের কঠিন প্রাচীরে আঘাত করে ধূলিসাৎ করেন তাকে; সেই মুক্ত আলো-বাতাসে এসে মহাপঞ্চক দেখেন, শোণপাংশুদের যিনি দাঠাকুর, তিনি অচলায়তনের চিরসাধ্য 'গুরু'। পঞ্চক এবং মহাপঞ্চক একসঙ্গে লাভ করল তাঁকে। পঞ্চক বিদ্রোহ ও মুক্তি, মহাপঞ্চক নিষ্ঠা এবং বন্ধন। নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্রোহের শক্তির মিলনে 'গুরু'র—জীবনের অপরূপ শাশ্বত স্বরূপের পরিচয় হল সম্পূর্ণ। 'অচলায়তন'-এর পরিবর্তিত রূপ 'গুরু' রচিত হয়েছিল ১৩২৪ বাংলা সালে।

৩। বিকাশকালের উপন্যাস ও গল্প

(ক) উপন্যাস

এ-যুগের প্রথম উপন্যাস 'চোখের বালি'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—উপন্যাসটি "১৩০ ৫ সালের গোড়ার দিকে 'বিনোদিনী' নামে কবির খাতার মধ্যে খসড়া করা অবস্থায় পড়িয়াছিল।" পরে ১৩০৮ সালের শুরু থেকে এক বছর সাতমাস ধরে নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'চোখের বালি' নামে। এটি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা-ঋদ্ধ, আগাগোড়া তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত, প্রথম উপন্যাস। শুধু তাই নয়, 'চোখের বালি'তেই 'রোমান্টিক'-এর মোহ-মুক্ত হয়ে বাংলা উপন্যাস নর-নারীর মনস্তত্ত্ব-জটিল বাস্তব জীবন পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। বাংলা কথা-সাহিত্যে 'চোখের বালি' এক নব চেতনার—নতুন রচনাঙ্গিকের পথিকৃৎ। এই উপন্যাসে কবির সমাজ-চেতনা বিপ্লবি-সমুচিত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে। নরনারীর জীবনে যৌন প্রভাবের দেহ-মনোময় রহস্য-জটিলতার এমন সুমিত সাহসী ব্যাখ্যা এর আগে হয় নি কখনো বাংলা সাহিত্যে। কবির চোখে এমন বস্তুঘন দৃষ্টি, সত্যকে তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার এমন সফল তৎপরতা, প্রায় অ-কল্পিত। জীবনীকার প্রভাতকুমার এই সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যার সফল প্রয়াস করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন 'নৈবেদ্য'-যুগের বৈশিষ্ট্য; 'ক্ষণিকা'র কল্পলোক-চারণের সঙ্গে তুলনা করেছেন 'নৈবেদ্য'-র জ্ঞান-বিচার-ঋদ্ধ প্রাণ-চেতনার। এই পর্যায়ে জীবনের অখণ্ড সত্যকে কবি জ্ঞান দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখছেন,—সমস্ত যুক্তিবিচারের ভিত্তি হিশেবে গ্রহণ করেছেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের অভিজ্ঞতাকে। এই জীবন-দর্শনের পেছনে কবির সহজ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছিল সদা-সচেতন। সেই সঙ্গে বিচার করে, তলিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়ে, তথ্য-বিচারের মধ্য দিয়ে বস্তুময় জীবনের সত্য পরিচয়-লোকে পৌঁছান গেছে। উপন্যাসকে 'আধুনিক জীবনের মহাকাব্য' বলা হয়; কবির অন্তর-চেতনার সঙ্গে বিচারমূলক বস্তু-সন্ধান-প্রয়াস যুক্ত হয়ে জীবনের এক মহাকাব্যরূপ রচিত হতে চেয়েছে 'চোখের বালি'-তে।

চোখেরবালি'র নবীন দৃষ্টি : নূতন আঙ্গিক

সুবৃহৎ উপন্যাস 'চোখের বালি'; প্রধানত দুইজোড়া চরিত্রের জীবন-সমস্যার সীমায় বারে বারে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে—মহেন্দ্র, বিহারী, আশা, বিনোদিনী। প্রদীপ্ততম নারী-ব্যক্তিত্ব যেন রূপ ধরেছিল বিনোদিনীর মধ্যে। মহেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল তার। কিন্তু মহেন্দ্র বড়লোকের খেয়ালি ছেলে; বিধবা মা এবং খুড়িমা, রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার স্নেহে তার খেয়াল-

খেলা আবাল্য স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল ; তাতে মায়ের ইন্ধনই ছিল প্রবল। কেবল খেয়ালের বশেই মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন করে দিল; আবার আবাল্য-বন্ধু বিহারীর জন্যে কনে দেখতে গিয়ে ঐ খেয়ালের বশেই আশাকে বিয়ে করে বসল। তারপরেই তার দাম্পত্য-জীবন শৃঙ্খলা-শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে অতি উল্লাসে স্ফীত হয়ে উঠল। মায়ের চিত্ত তখন বধূর প্রতি ঈর্ষায় উৎপীড়িত হয়ে উঠেছিল ; আশাকে নিয়ে মহেন্দ্র মাত্রাজ্ঞান হাবিয়েছিল মায়ের সম্বন্ধেও। দ্বিতীয়ত আশা অন্নপূর্ণার স্নেহাস্পদা—তার ভাইঝি,—যে অন্নপূর্ণা রাজলক্ষ্মীর চেয়েও বুঝি মহেন্দ্রের বেশি ভক্তি-ভাজন। ক্রমে অন্নপূর্ণাকে কাশী-বাসিনী হতে হল ; বিধবা বিনোদিনী ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্রে আশ্রয় পেল রাজলক্ষ্মীর গার্হস্থ্যে। অনেকটা বধূর প্রতি ঈর্ষার বশেও রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের যৌবনমত্ত চিত্তের সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন ; বিনোদিনীর আক্রোশও ক্ষিপ্ত হয়েছিল। আশা বালিকা, আশা অসহায়, পর-নির্ভরশীলা ; পুরুষকে ভোলাবার—জয় করবার কোনো অস্ত্রেই শান দিতে শেখেনি সে। তবু কেন সে মহেন্দ্রকে পাবে?—আর বিনোদিনী নারীত্বের সকল শক্তিতে দীপ্তিময়ী হয়েও কেন হবে বৈধব্য-পীড়িত,—বঞ্চিত? এই অন্ধ আক্রোশ তাকে মত্ত করেছিল আশার হাত থেকে মহেন্দ্রকে কেড়ে নেবার অসংগত সাধনে। মহেন্দ্রের মধ্যে প্রবৃত্তিটাই বড। তাই বিনোদিনী-আগুনে সে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে আগুন জ্বলল, তাতে কেবল আশাই নয়,—রাজলক্ষ্মীর সংসারও পুড়ে ছাই হবার জোগাড় হল ; চারদিকে অগ্নিজ্বালা ও অন্তর্দাহ নিয়ে শান্ত রইল কেবল বিহারী। আশার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হযেছিল ; কিন্তু মহেন্দ্র মাঝে থেকে কেড়ে নিয়েছিল ভাবী বন্ধু-পত্নীকে। তাতে বিহারীর সচেতন মনে কোনো নালিশ দেখা দেয় নি ; বরং মহেন্দ্রের জন্য আশার সম্বন্ধে দাবি ত্যাগ করে সে খুশিই হয়েছিল। আবাল্য বন্ধুত্বের মাধ্যমে সে মহেন্দ্রর ছায়া হয়ে গিয়েছিল ; নিজের পৃথক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব-ও ছিল তার চেতন মনের অতীত। তবু বিয়ের পরেও আশার প্রতি বিহারীর মনের গোপন দুর্বলতা স্নেহের স্বচ্ছ ধারায় প্রকাশিত হত। সে কেবল একদা বাগ্‌দত্তা নারী বলেই নয়, আশা অন্নপূর্ণার স্নেহের পুত্তলি ছিল বলেও। অন্নপূর্ণার প্রতি বিহারীর ভক্তি ছিল আন্তরিক। ফলে, মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অন্ধ মত্ততা থেকে আশাকে রক্ষা করার সহজ-সংগত চেষ্টা করতে গিয়ে জটিল ঘটনাবর্তে জড়িয়ে পড়ল সে-ও। অন্যদিকে মহেন্দ্রকে নিয়ে বিনোদিনীর উন্মাদনাতে অবসাদ দেখা দিল অচিরে। মহেন্দ্রর মধ্যে প্রবৃত্তির বুভুক্ষা আছে, নেই পুরুষের দৃঢ়তা ও সংযম। অথচ নারী হিশেবে বিনোদিনী ব্যক্তিত্বময়ী ; কেবলই লোভাতুরা নয়। মহেন্দ্রকে সে অকল্পনীয় আয়াসহীনতায় করায়ত্ত করেছে ; তারপর দিনে দিনে বিষণ্ণ বিরক্ত হয়েছে তার দুর্বলতায়।

কাব্য-ধর্মী শিল্প পরিণতি

সেই সঙ্গে কর্তব্য-সচেতন নির্লোভ বিহারীর সুপ্ত ব্যক্তিত্ব তাকে করেছে বিস্মিত, আকৃষ্ট। তারপরে সারা উপন্যাস ব্যাপী ঝড়ের বেগ যখন স্তিমিত হল, শান্ত, আশাহত, অনুতপ্ত মহেন্দ্র তখন ফিরে এসেছে মা'র মৃত্যুশয্যার পাশে ; আশাকে আবার ফিরে পেয়েছে ; কিন্তু সে আশা তার বল্লভা প্রিয়া নয় ; গৃহধর্মের কর্তব্যপরায়ণা কর্ত্রী। বিহারীর প্রীতি এবং শ্রদ্ধাও সে হারিয়েছে ; বিহারী গিয়েছে বালিতে দুঃস্থ কেরানিদের সেবাব্রতে। কিন্তু ততদিনে তার মধ্যেও সুপ্ত পৌরুষ জেগেছে বিনোদিনীর নারীত্বের আঘাতস্পর্শে। তবু বিহারী যখন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চেয়েছে, বিনোদিনী তখন সে আহ্বান বরণ করে নিতে পারেনি। নর-নারী হিশেবে বিহারী-বিনোদিনীর জীবন হয়েছে স্বেচ্ছা-বৃত রিক্ততায় বিচ্ছিন্ন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক দৃষ্টির সীমায়তি সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'চোখের বালি'র শিল্পী আসলে 'নৈবেদ্য'র কবি। জীবনের যৌন

দাবি ও তার জটিল বিকাশ-পন্থাকে স্বীকার করেও তিনি জানেন,—ভোগেই ভোগের শেষ নয়; ভোগের লোভকে স্বশক্তিতে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারাতেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা! বিহারী-বিনোদিনীর জীবনে ট্রাজেডির অন্তরালে এই পূর্ণতার কাব্যিক ব্যঞ্জনা একেবারে দুর্লভ নয়।

'চোখের বালি'র পরের উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ১৩১০-১১ সালের 'বঙ্গদর্শন'-এ ক্রমপ্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাইরের এই হিশেব না জানা থাকলে যে-কোনো পাঠক ভেতরের পরিচয় দেখে 'নৌকাডুবি'কে 'চোখের বালি'র পূর্বের রচনা মনে করতে বাধ্য। উপন্যাস হিশেবে কি কল্পনায়, কি রূপাঙ্গিকে 'নৌকাডুবি' যথার্থই দুর্বল! এই দুর্বলতার কারণ হিশেবে অনেকে মনে করেছেন, 'নৌকাডুবি' কবি-মানসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার বশে লেখা নয়। স্মরণ করতে হয়, কবি-মন তখন সদ্য পত্নী-শোকার্ত। সাময়িকপত্রের তাড়নায় মনকে জোর করে চালাতে গিয়েই এমনটা হয়েছে। 'চোখের বালি'র জীবন-সচেতনা ও বস্তু-বিচার-ক্ষমতা এখানে আবার আচ্ছন্ন হয়েছে রোমান্টিক কল্পনার উচ্ছ্বাসে। তাও বেশির ভাগ কষ্টকল্পনা! বিয়ের পরে বাড়ি

'নৌকাডুবি'

ফেরবার পথে দুটি দম্পতি নৌকা-ডুবিতে বিপন্ন হয়; দুর্ঘটনার ফলে এক বধূ অপর বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে; তারপরে রমেশ ও কমলা দীর্ঘ তিন মাস স্বামি-স্ত্রী রূপে বাস করে। তিন মাসের শেষে রমেশ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল কমলা অপরের বিবাহিতা বধূ—তার নিজের স্ত্রী নয়; অমনি সে তাকে পাঠিয়ে দিলে মেয়ে স্কুলে। কমলা কিছুই জানতে পারল না, ততদিনে রমেশের প্রতি তার দাম্পত্য আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে কমলা, এবং তার যথার্থ স্বামী নলিনাক্ষের মিলন ঘটেছে উপন্যাসের শেষে; সেই সঙ্গে নলিনাক্ষের একনিষ্ঠ শিষ্যা ও সম্ভাবিতা পত্নী হেমনলিনীর আত্ম-অপসারণের কারুণ্য রোমান্সের আর একটি দিককে ঘনীভূত করেছে। অথচ 'নৌকাডুবি'র সমস্যা মোটেই রোমান্টিক নয়; একান্তভাবে নরনারীর যৌন জীবনের জটিল সমস্যা। দীর্ঘ তিন মাস একত্র স্বামি স্ত্রী রূপে বাস করবার পরে দুটি যুবক-যুবতীর আত্মমোক্ষণের সমস্যা কেবল মনের দিক থেকেই আসে না, তার দেহগত জটিলতাও অনস্বীকার্য। যে-মুহূর্তে গল্পটি সেই সমস্যা-কেন্দ্রকে পরিহার করে গেছে, তখনই উপন্যাস-ধর্মের পলায়নবৃত্তি হয়েছে স্পষ্ট।

'নৌকাডুবি'র পরের উপন্যাস 'গোরা' ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ বাংলা সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্র-উপন্যাসসাহিত্যে 'গোরা' অপূর্ব; বাংলা সাহিত্যেও অনন্য। 'গোরা'-কে উপন্যাস আকারে মহাকাব্য বলা হয়; তার পরিধিও মহাকাব্যের মতোই বৃহৎ। অতবড় উপন্যাস কবি আর একখানিও লেখেননি। কিন্তু এটিই বড় কথা নয়। 'গোরা'-র অভিনবতা তার রচনাকালের বহির্বঙ্গ জীবন-প্রভাব ও সমকালীন কবি-মনোভাবের দ্বারা সমপরিমাণে চিহ্নিত

'গোরা'

হয়েছে। এই উপন্যাস রচনার আরম্ভ সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দুই বছর নিঃশেষিত হয়েছে; 'খেয়া' কাব্য রচনারও এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। 'খেয়া'-কাব্যের সূত্রপাত—আগেই দেখেছি—জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র থেকে কবি-মনের বিমুখতার উৎসমূলে। এই বিমুখতাকে পলায়ন-পরতা বলা চলে না কিছুতেই; এ-ছিল কবির পক্ষে আদর্শের সাধনা। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ। আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে কবি অনুভব করেছিলেন, জাতীয়তাবাদের আদর্শ সর্বিক মানবধর্মকে খণ্ডিত করে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাদকে করে তোলে অবারিত। ভারতবর্ষের মানুষেরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে বৃটিশ শক্তিকে আঘাত করতে চেয়েছে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, আবার বৃটিশ জাতীয়তার নামে ইংরেজ শাসক উৎপীড়ন করেছে ভারতীয় প্রজাদের ওপরে। তাতে দ্বন্দ্বের জটিলতাই বাড়ে, মনুষ্যত্ব আহত হয়, মানুষের উদ্ধার হয় না! 'খেয়া'তেই কবি

বুঝেছিলেন,—মানব-ধর্মের মুক্তি মানব আত্মার সমৃদ্ধিতে ; দেশ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন মানব-প্রেমের শক্তিতে। এই সত্যবোধকে বাংলার, তথা ভারতের প্রথম জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে 'গোরা'-র প্লট পরিকল্পনা করা হল। স্বদেশী আন্দোলন সম্পৃক্ত কবিভাবনার সূত্রে উৎসাহিত হলেও 'গোরা'র গল্প-কথা ১৮৫৭-উত্তর ২০-২৫ বছরের সীমায় বাঁধা।

সেকালের স্বাদেশিকতা-বোধের সঙ্গে হিন্দু-চেতনাও অঙ্গাঙ্গিযুক্ত হয়েছিল—সেদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু জাতীয় বুদ্ধি ছিল অভিন্ন। সাহিত্যক্ষেত্রেও 'আনন্দমঠ'এ বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকে হিন্দু শক্তিদেবতার কল্পনায় মণ্ডিত করেছিলেন। বস্তুত, উনিশ শতক থেকেই জাতীয় আন্দোলনে রাষ্ট্রচিন্তা ও হিন্দুধর্ম-চিন্তা অভিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই একদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জাতীয়তাবোধের প্রতিঘাত-স্পৃহা যেমন ছিল, তেমনি হিন্দু-ধর্মবোধের অন্ধ সংস্কারও মাঝে মাঝে জড়িয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। 'খেয়া'-উত্তর কবিমনোঋতুতে নিখিল প্রেমের হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, ধর্ম বলতে মানুষের ধর্মকেই উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন কবি তখন থেকে। সে-ধর্মের প্রতিষ্ঠা নিখিল মানবপ্রেমে। উপন্যাসের নায়ক গোরার জীবনে সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্কারের অর্থহীনতা চিত্রিত করে পরিণামী প্রেম-সৌন্দর্যকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে কাহিনী-শেষে। মানব-মুক্তি সন্ধানের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্ম-চেতনা বা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ কত অর্থহীন, তার জীবন্ত প্রতীক 'গোরা'। জাতিতে সে আইরিশ, ভারতের তৎকালীন শাসক-দেশের নাগরিক। অথচ, আশৈশব হিন্দুপরিবারে প্রতিপালিত হয়ে হিন্দুর নিষ্ঠা ও ভারতীয়ের জাতীয় চিন্তার গোঁড়ামি তাকে অন্ধ করেছিল। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার আর এক রূপ বিভাবিত হয়েছে বরদাসুন্দরী ও হারাণবাবুর সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্ম-ধর্মবোধের অন্ধতায়। এই নীরন্ধ্র গোঁড়ামির মধ্যে গোরার জীবনে প্রথম মুক্তির আলো সুচরিতা। দিনে দিনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্যোগ-ঘন মুহূর্তে গোরা-সুচরিতার প্রেমের বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে ধাপে ধাপে। তবু সংস্কারের গোঁড়ামি ঘুচতে চায় না, সেই চরম মুহূর্তে কৃষ্ণদয়ালের মুখে গোরা নিজের সত্যপরিচয় শুনতে পায়। সামলে নিয়েই সে ছুটে যায় সুচরিতার কাছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন,—সুচরিতাকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে গোরার ভারত-হিত-ব্রতের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, কেবল তার আকার-প্রকার ও আদর্শের বদল হয়েছিল,—"সুচরিতার প্রেমই যেন তাহার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের তেজে গোরার অন্তর্নিহিত সারাংশটিকে বাহ্যসংস্কারের কঠিন বহিরাবরণ হইতে মুক্তি দিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে একান্ত করিয়া লইয়াছে। তাহাদের বিবাহ দুই প্রজ্বলিত মানবাত্মার একান্ত মিলন।" 'খেয়া'র কবি-মনোভাব প্রেমের বাঁধনে মানবাত্মার মিলনমালিকা রচনা করেছে। সেই আদর্শ, সেই প্রত্যয় 'গোরা' উপন্যাসে বাঙালি জীবনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে সর্বজনীন ব্যাপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে। বিনয়-ললিতা, পরেশবাবু, আনন্দময়ী, মহিম ইত্যাদি চরিত্র এবং শহর ও গ্রামবাংলার ব্যাপক জীবন-চিত্রায়ণ একে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি দিয়েছে, সেই সঙ্গে কবির আত্মগত প্রত্যয়ের অবিচলতা তাতে যোজনা করেছে মন্ময় কাব্যের স্বাদ। উপন্যাসের আকারে 'গোরা' কবির লেখা জীবন-কাব্য।

কাহিনী ঃ জীবনাবেদন

(খ) ছোটগল্প

যেমন উপন্যাসে, তেমনি এ-যুগের ছোটগল্পেও আবেগ দিয়ে নয়, বিচার ও অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করার প্রেরণা বিশেষভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে। ১৩০৭ বাংলা সালে

'গল্প' নামে একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল,—আসলে 'গল্পগুচ্ছ' দ্বিতীয় খণ্ডের আদিরূপ এটি। এতে গ্রন্থিত অধিকাংশ গল্পই ১৩০২ সাল বা তার আগে লেখা। এ-গুলো মূলত পদ্মাপারের ফসল,—উল্লেখ্য গল্পগুলির মধ্যে আছে 'জীবিত ও মৃত', 'সুভা', 'অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মেঘ ও রৌদ্র' ইত্যাদি। ১৩০২ সালের পরে লেখা কয়টি মাত্র গল্প আছে, 'দুরাশা', 'অধ্যাপক', 'দৃষ্টিদান' ইত্যাদি। এই সব গল্প ১৩০৫ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছিল—অথ'ং এগুলো 'চিত্রা'-উত্তর আলোচ্য ঋতুর সৃষ্টি। ফলে জীবনকে নিবিড়ভাবে অনুভব ও উপভোগ করার আনন্দই এই গল্পগুলির সব নয়, তাকে বিচাব করে—তার অন্তর্বর্তী মনস্তত্ত্বকে খুঁটিয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এরা স্বাদে ও আঙ্গিকে পদ্মাপারের গল্পগুচ্ছ থেকে বিশেষিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব ও জীবন-সমস্যা বিশ্লেষণের এই প্রবণতা ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করেছিল 'নষ্টনীড'এ। গল্পটি ১৩০৭ সালে লেখা হয়। 'চোখের বালি' উপন্যাস রচনার প্রায় সমকালে। 'চোখের বালি'র প্রায় সমধর্মী জীবনসমস্যা আরো একধাপ যেন এগিয়ে গেছে 'নষ্টনীড়'-এ, তেমনি মানবিক সংবেদনার মধ্যে তা সংহত-ও হয়েছে ছোটগল্পের ব্যঞ্জনাধর্মী সংক্ষিপ্ত আধারে। এ-যুগে লেখা অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের মধ্যে আছে 'শুভদৃষ্টি', 'দর্পহরণ', 'মালাদান', 'মাষ্টারমশায়' ইত্যাদি। 'কর্মফল' গল্প কুন্তলীন পুরস্কারের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল ১৩১০ বাংলা সালে। পুরস্কার পাবার পরে গল্পটি 'কুন্তলীন আফিস হইতে' পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ছোটগল্প

৪। বিকাশ-যুগের গদ্য রচনাবলি

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতোই তাঁর গদ্য নিবন্ধ ও নানা-বিষয়ক গদ্য রচনাও বহু সংখ্যক। সব কয়টির পৃথক আলোচনা সম্ভব নয়। কেবল গ্রন্থিত রচনাবলির প্রসঙ্গ উদ্ধার করেই বর্তমান বিবরণ বিবত হবে। এই পর্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থ 'পঞ্চভূত'-এই (১৩০৪) ববীন্দ্রনাথের গদ্য সৃষ্টির বিশিষ্টতা নিঃসংশয় প্রকাশ পেয়েছে। ১২৯৯ বাংলা সাল হতে ১৩০২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে এই গদ্য রচনাগুলি লিখিত হয়েছিল ; পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয ১৩০৪ সালে। ফলে, রচনাগুলিতে একান্ত কবি-মনোভাবের প্রভাব থাকলেও এদের সৃষ্টির মূলে পরিকল্পনার একটি অখণ্ডতা ছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময়ে কবি সে-কথা বিশদ করেছেন, —শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ, মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটি মানুষের সম্মিলিত ফল। এই পাঁচটি উপাদানকে কবি নাম দিয়েছেন,—ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, সমীর ও ব্যোম। এরা যথাক্রমে পঞ্চভূতের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম। এই পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে একটি তর্ক-সভা গড়ে উঠেছে ; তার সভাপতি ভূতনাথ। ইনি আসলে কবি নিজে; পঞ্চভূতের অধিপতি ইনি। মানবের মধ্যবর্তী বিভিন্ন উপাদান, পাঞ্চভৌতিক উপকরণ নিয়েই অখণ্ড মানুষের প্রকাশ। ক্ষিতির মধ্যে আছে ভৌমিক প্রবণতার উৎস ; অপ্-এর গুণ করুণা, প্রাণের বহমানতা; তেজ-এর ধর্ম দীপ্তি —জ্ঞান, উৎসাহ ; সমীরের অন্তর-চেতনার বৈশিষ্ট্য বায়বীয় লঘুতায় ; ব্যোম ব্যোমচারী ভাবালু। ক্ষিতির সঙ্গে ব্যোম, অপ্ ও সমীরের সঙ্গে তেজ-এর সমন্বয়ের মধ্যেই মানুষের ভাব-সম্পূর্ণতা। 'পঞ্চভূত'-এর ডায়েরিতে জীবনেব যে-কোনো জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করে কবি তার বিচার করেছেন ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদিব খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিতে, তারপরে সকল খণ্ড-ভাবনার অখণ্ড সমাধান খুঁজেছেন ভূতনাথের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। এ কেবল বুদ্ধি নিয়ে খেয়াল-

গদ্য-নিবন্ধ পঞ্চভূত

খেলা নয়,—কবির অনুভব দিয়ে জীবনের বিচার-সিদ্ধ রূপকে অনুভব করবার চেষ্টাও। কবি-মনীষীর বোধ-চেতনার প্রণোদনা অভিনব শিল্প-রূপ পেয়েছে 'পঞ্চভূত'-এর ডায়েরিতে।

বস্তুত সর্বযুগে রবীন্দ্রনাথের সকল গদ্য রচনার মধ্যেই তাঁর কালজয়ী মনীষা কবির অনুভবের ধারায় বিগলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। গোপাল হালদার 'পঞ্চভূত'কে বাংলা ভাষার প্রথম Belle lettres বলেছেন। কবির সব লেখাই তা নয় বটে ; কিন্তু সর্বত্রই, এমনকি বিতর্কমূলক বিষয়ও, তাঁর শিল্পি-প্রাণের স্পর্শে অভিনব কাব্যস্বাদী হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য কাল-সীমায় প্রকাশিত গদ্য-গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য 'আত্মশক্তি' (১৩১২), 'ভারতবর্ষ' (১৩১২), 'রাজা-প্রজা' (১৩১৫), 'সমূহ' (১৩১৫), 'স্বদেশ' (১৩১৫), 'সমাজ' (১৩১৫), 'শিক্ষা' (১৩১৫) ইত্যাদি। এই সব গ্রন্থের নামেই তাদের পরিচয়। সমকালীন বাংলা, তথা ভারতেও, স্বাদেশিকতার তাৎপর্য ছিল স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তির সন্ধান। শেষোক্ত গ্রন্থটি ছাড়া আর সবকয়টিরই বিচিত্র নিবন্ধে সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ-চেতনার আন্দোলনকে উপলক্ষ করে কবির ধ্যানের শাশ্বত ভারত-চেতনা অখণ্ড রূপ পেয়েছে। 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থে ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যার আলোকে শিক্ষার সর্বজনীন চিরন্তন স্বভাবেরই সজীব রূপ-চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই গ্রন্থে অভিব্যক্ত কবির সুগভীর মনীষাদীপ্ত ভাবনা আজও বিশ্ব-শিক্ষাবিদদের বিবেচনার বিষয় হয়ে আছে। স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধীয় আলোচনায় চিন্তার গভীরতা দেশ-কালাতীত মূল্যে সমৃদ্ধ। অথচ এই সব গদ্য লেখায় কবির হাতের শিল্পরচনার স্বাদও সংশয়াতীত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠকের অকুণ্ঠ নিষ্ঠাকে আকর্ষণ করে নেয় কেবল যুক্তির দৃঢ়তা দিয়ে নয়, প্রত্যয়ের একান্ত অবিচলতা বশেই।

'ভারতবর্ষ'-গ্রন্থাবলি ও 'শিক্ষা'

আলোচ্য সময়ের সাহিত্য-আলোচনামূলক গ্রন্থাবলিতে এই বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৩১৩) 'লোকসাহিত্য' (১৩১৪), 'সাহিত্য' (১৩১৪), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৩১৪) ইত্যাদি। প্রথম দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাদের নামেতেই প্রকাশিত। কেবল এই সঙ্গে স্মরণ করি, আধুনিক বাংলা, তথা ভারতেরও, সাহিত্য-ভাবনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাণমূল্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথমে রবীন্দ্রনাথই ; আমাদের উপেক্ষিত গ্রামীণ লোক-সংগীতের স্বর্ণ-লোকেরও দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন তিনি। সংস্কৃত সাহিত্যে শাশ্বত ভারতীয় প্রাণের যে স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে, তার প্রথম নিঃসংশয় প্রমাণ 'প্রাচীন সাহিত্য'র প্রবন্ধগুচ্ছে। অপরপক্ষে বাউল প্রভৃতি লোকসংগীতকে বিশ্বজনীন মর্যাদা দিয়েছিলেন তাঁর হিবার্ট বক্তৃতা ও ভারতীয় দর্শন-সভার সভাপতির ভাষণে। বিখ্যাত গগন হরকরা ছিলেন কবির প্রত্যক্ষ পরিচিত। কেবল মরমিয়া গান নয়, ছড়া, কবিগান প্রভৃতি লোক-সাহিত্যকে কবি অমরতা দিয়েছেন 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে।

সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ

'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'লোকসাহিত্য'

'সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু তত্ত্বের চেয়ে অনুভবের সত্যই যে এই রচনার সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে, এ-কথা কবি নিজেই অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন বারে বারে।

'সাহিত্য' ও 'শব্দতত্ত্ব'

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে আছে বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ইত্যাদি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা-প্রয়াস। বিচারের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে অনুভবের অনন্য গভীরতা যুক্ত হয়ে এই রচনাকে যথার্থ সমালোচনার মর্যাদা দিয়েছে। 'শব্দতত্ত্ব' (১৩১৬) ভাষাচরিত্র নিয়ে মৌলিক ভাবনাসমৃদ্ধ প্রবন্ধের সমষ্টি।

'আধুনিক সাহিত্য'

ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে দার্শনিক ধ্যান-গম্ভীরতায় বিধৃত হয়ে কবির ধর্মচিন্তা একাধারে হয়ে উঠেছে অধ্যাত্ম সত্য, ও দার্শনিক পরাবিদ্যার আকর। আলোচ্য সময়ে সংকলিত গ্রন্থাবলির মধ্যে আছে 'ধর্ম' (১৩১৫), 'শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী' প্রথম আটখণ্ড (১৩১৫-১৩১৬), নবম থেকে একাদশ খণ্ড (১৩১৭ সাল), দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ (১৩১৮ সাল) চর্তুদশ খণ্ড (১৩২১ বাংলা সাল), পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ খণ্ড (১৩২২ সাল)।

'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলি

এ সময়ে আত্মজীবনী ও পর-জীবনীমূলক গ্রন্থও কবি লিখেছিলেন একাধিক। 'চারিত্রপূজা' (১৩১৪) আসলে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিত্বধর্মের নব-আবিষ্কার ও নবীন উদ্‌ঘাটন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'অপরাজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব', রামমোহন রায়ের আত্ম-নিহিত ভারতের পথিক-ধর্ম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানে ঔপনিষদিক জীবনাদর্শের সত্য-রূপকে আবিষ্কার করে তাকেই পূর্ণ মূল্যে উদ্ভাসিত করেছেন কবি পাঠকের সামনে। 'চারিত্রপূজা' ধ্যানীর আবিষ্কার এবং কবির সৃষ্টি ; একই সঙ্গে শিল্প ও সাধনা।

'চাবিত্রপূজা'

'জীবনস্মৃতি'তে (১৩১৯ সাল) কবি নিজের জীবন নিয়ে শিল্প-সাধনার নবীন প্রচেষ্টা করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' জীবনী নয়, নিজের অতীত জীবনের স্মৃতিচারণার মধ্যে কবি-প্রাণের আত্মরহস্য সন্ধান। গ্রন্থারম্ভে কবি বলেছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে।...বস্তুতঃ তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।" 'জীবনস্মৃতি'তে স্মৃতির পটে নিজের জীবনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ,—ইতিহাস লেখেন নি।

'জীবনস্মৃতি'

নিজের জীবন ঘিরে ছবি আঁকবার আব এক অপরূপ চেষ্টা 'ছিন্নপত্র' (১৩১৯)। 'জীবনস্মৃতি'র এক বছরে একই মাসে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থিত হয়েছিল। প্রধানত উত্তর বঙ্গের নদীতীবে বসে লেখা অসংখ্য পত্রকে নিজে অনেক পরে সম্পাদনা করে সংকলন কবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে, সম্পাদকের নির্মম ছুরির আঘাতে কবির ব্যক্তি-মনের স্পর্শ প্রায়ই তিরোহিত হয়েছে। বিশ্বভাবতীর প্রকাশন বিভাগ রবীন্দ্রশতবর্ষে সেই অতৃপ্তি মোচন করেছেন 'ছিন্নপত্রাবলী' প্রকাশ করে। পত্রসাহিত্যের মৌল স্বাদ কবি-সম্পাদিত 'ছিন্নপত্র'তে প্রায়ই দুর্লভ। অনেকে অভিযোগ করেছেন, পরবর্তী কালে কবি তাঁর অতীত জীবনকে যে স্বপ্ন-মূর্তিতে কল্পনা করেছিলেন, তারই আলোকে পুরাতন চিঠিগুলোকে নূতন করে কেটে ছেটে সম্পাদনা করা হয়েছে। বস্তুত 'ছিন্নপত্র'র যথার্থ পরিচয় আসলে,—এটিও স্মৃতির পটে আঁকা জীবনের ছবি। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও অতুল্য ; উন্মেষ-যুগের কাব্য ও ছোটগল্পের অনেকগুলির বচনার মূল-নিহিত প্রবণতা ও পটভূমিকে এই চিঠিগুলি তথ্যের সঙ্গে উদ্ধার করেছে।

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-তে (১৩১৪) কবি নিজের জীবনকে নয়,—আপন অতল-গভীর শিল্পিসত্তাকে নিত্য নূতন করে এঁকেছেন বিচিত্র বিষয়ের মধ্য দিয়ে। এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্বাদী গদ্যের প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

'বিচিত্র প্রবন্ধ'

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

রবীন্দ্র-রচনার পরিণতিযুগ

১। পরিণতি-যুগের কাব্য

'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র ঋতুর পরে রবীন্দ্র-কাব্যে নতুন ঋতুর সূচনা 'বলাকা' নিয়ে। এখানেই রবীন্দ্র-চেতনায় পরিণতির সুর জেগেছে প্রথম। মাটির তলায় বাড়তে বাড়তে বীজ একদিন অঙ্কুর হয়ে দেখা দেয় মাটির ওপরে; তারও পরে চলে তার বেড়ে ওঠার সাধনা,—অঙ্কুর একদিন মহামহীরূহে পরিণত হয়। তারপর সে আর বাড়ে না ; বাইরের বৃদ্ধি ও বিকাশ পূর্ণ হয়ে হয় স্তব্ধ। গাছের অন্তর্নিহিত শক্তি কিন্তু তখনো থেমে থাকে না; বেড়ে ওঠার পর তখন গাছের জীবনে চলতে থাকে হয়ে ওঠার সাধনা। সে হয়ে-ওঠা কেবল ফলে-ফুলে-পত্রে,—বাইরের প্রকাশে নয়,—অন্তরে অন্তরে, নাড়িতে নাড়িতে ঘন থেকে ঘনতর রসের সঞ্চয়ে। রবীন্দ্র-কবি প্রতিভার বিকাশ-পরিণতির পক্ষেও সেই একই কথা। উভয় ক্ষেত্রেই, পরিণতির চরম ক্ষণেও যার বিকাশ, সে ঐ বীজের ভেতরকার মৌল শক্তিরই নিজের বিশেষ দেশ-কালের ভূমিতে দাঁড়িয়ে, আপন চৈতন্যের মধ্যে জীবনের দেশ-কালাতীত সর্বজনীন সত্য স্বরূপটিকে খুঁজে দেখাই রবীন্দ্র-কবি-স্বভাবের মূলগত প্রবণতা,—একথা বলেছি। 'চিত্রা'-যুগে আবেগ দিয়ে, 'নৈবেদ্য'-যুগে জ্ঞান-কর্ম-অভিজ্ঞতার মধ্যে, সেই সত্যের পবিচয় আবিষ্কার করেছিলেন কবি। এবারে, 'গীতাঞ্জলি'-যুগে ভাব ও জ্ঞানের সত্য, উপলব্ধির সত্যে,—আত্মার সত্যে পরিণত হয়েছে :—

রবীন্দ্র-বচনায় পরিণতির স্বরূপ

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

এ কেবল আবেগ-ভরা কামনা নয়, জ্ঞান-দীপ্ত প্রত্যয় মাত্রও নয়। কবির পক্ষে এ-অনুভব আজ একান্তভাবে অন্তরের পরম সত্য ; কারণ আজ আর—

"গোপনে প্রেম রয়না ঘরে
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।
সবার তুমি আনন্দ ধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।"

উপলব্ধির এই আনন্দময় সম্পূর্ণতাই 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'-যুগের পরম সম্পদ। অনাপেক্ষিক শিল্প-বিচারে এই কাব্য-ত্রয়ীর মূল্য যাই হোক, কবি-চেতনার মহীরূহ-রূপ পূর্ণতা পেয়েছে এই পর্যায়ের ক্রমপরিণামে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিবর্তনেব ইতিহাসে এই সত্য একান্ত মূল্যবান। এর পরে বাইরের প্রকাশের একটি মাত্র ধাপ লক্ষ করি,—সে ঐ মানস পরিণতির রূপ-সম্পূর্ণতার। সেই ধাপ বিকশিত হয়েছে 'বলাকা' থেকে 'মহুয়া' পর্যন্ত কাব্য-ধারায়। তারপরে বাইরের দিক থেকে আর পরিবর্তন নেই ; কেবল অন্তর-চেতনার পরিণতি চলেছে কবির মগ্ন চৈতন্যের

পরিণতি-মুখেব কাব্য 'বলাকা'

গহনে; ঘন থেকে ঘনতর রস-শক্তির আনন্দ-সঞ্চয়ে। সৃষ্টির মধ্যে কবি-কর্মের যুগ শেষ হয়েছে 'বলাকা'-পর্বে ; তারপরে নিজের মধ্যে নিজের হয়ে-ওঠার আনন্দ-সাধনা। কিন্তু কবি-কর্মের এই শেষ পর্যায় কর্মসমাপ্তির নয়, কর্ম-সম্পূর্ণতার। তাই 'বলাকা' কাব্যের প্রাথমিক কবিতাবলিতে বন্ধনহীন অকারণ কর্মোচ্ছ্বাসের আবেগ-স্ফীতি রয়েছে। অন্যদিকে এই কর্ম-প্রচেষ্টায় পূর্ণতার,—পরিণামী সত্য-বোধের আনন্দ-সুন্দর রূপ ক্রম-প্রকট হয়েছে 'বলাকা' থেকে 'পূরবী' 'মহুয়া'র পরম্পরিত ধারায়।

'বলাকা'য় নবীন যৌবনের আহ্বান শুনেছেন কবি,—'যৌবনের পত্র' পেয়েছেন :—

"পউসের পাতা ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
*　　*　　*
বহুদিনকার
ভুলে যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে
*　　*　　*
লিখেছে সে —
এসো এসো, চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত উপহার।"

দেহের বহিরঙ্গে বয়সের জীর্ণতা পথ-শেষে এনে দাঁড় করিয়েছে। [illegible] অন্তরঙ্গে জেগে উঠেছে যৌবনের নব অনুভব ; যৌবনের এই শক্তি দেহের রিক্ততার মধ্যে শেষ হয়ে যায় না, দেহাধারকে বিদীর্ণ করে মৃত্যু-তীর্ণ অমরত্বের আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়। অজবামর অক্ষয় সত্যের উপলব্ধিতে বলিষ্ঠ আত্মার এ যৌবন-শক্তি; এবার থেকে এই আত্মশক্তিতেই গতির পথে কবি-প্রাণের নবীন অভিযাত্রা। 'বলাকা'য় তার সূচনা। নবযাত্রা-পথের ইতিহাসে 'বলাকা' আর এক ঋতু-সন্ধির কাব্য। 'গীতাঞ্জলি'-যুগের আত্মগুহায়িত একান্ত আন্তর উপলব্ধির গোপন জীবন-লোক থেকে নিরাবরণ বিশ্বলোকে বেরিয়ে আসার প্রথম বেদনা ও উচ্ছ্বাস এই কাব্যের প্রথমাংশে বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়ে আছে। অবশ্য চেতনার গোপনতা থেকে মনকে টেনে বার করবার এই চেষ্টায় বাইরের প্রেরণারও একটা ইতিহাস আছে।

১৩২১ বাংলা সালে 'বলাকা'-গুচ্ছের কবিতা রচনার শুরু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দানব-লীলার প্রস্তুতিতে তখন অন্ধকার হয়ে আসছে পশ্চিমের আকাশ। তার একবছর আগে নোবেল পুরস্কার দিয়ে প্রতীচ্যের ভাবজগৎ প্রাচ্যের কবিকে বরণ করে নিয়েছিল আপন দেহলিতে। নোবেল পুরস্কার পাবার কিছুদিন আগে কবি ব্যাপকভাবে পশ্চিম ভ্রমণ করে এসেছিলেন। মহাযুদ্ধের মরণপণ প্রস্তুতি তখন চলছে ; একদিকে প্রাণের কী অফুরন্ত শক্তি তার মাঝে দীপ্ত হয়ে

উঠছিল—আর একদিকে প্রাণ দিয়েও প্রাণ-নাশের সে কী ভীষণ সর্বনাশা প্রয়াস! এ অভিজ্ঞতা কবিকে বিব্রত করেছিল। তারপরে যুদ্ধ যেদিন বাঁধল, এবং তার লেলিহ অগ্নিশিখা পৃথিবীর মর্মে মর্মে—মানব-ধর্মের মূলে জ্বালা ধরিয়ে দিল, তখন আপন সত্য-উপলব্ধির দাহহীন আলোক-বর্তিকা নিয়ে মানুষের জীবন-ভূমিতে,—কর্ম-ভূমিতে এসে না দাঁড়িয়ে তাঁর উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মূলত ভাবতীয়তার সাধক-কবি; ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবন-মূল্য তাঁর কাব্য-কবিতায় নবীন বিশ্বাসে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু আজ তিনি বিশ্বের কবি ; নোবেল পুরস্কার দিয়ে কেবল তাঁর অতুল কাব্য-কীর্তিকেই নয়—তাঁর মরণজয়ী প্রত্যয়কেই বরণমাল্য দিয়েছিল মৃত্যু-পথের যাত্রী প্রতীচ্য পৃথিবী। তাই সভ্য পৃথিবীর বিপত্তিকালে অগ্নিদীপ্ত পথে ছুটে বেরোবার নতুন আহ্বান এলো মনে :-

'বলাকা' কাব্যের পূর্বসূত্র ও ভাব-পরিণাম

এ আহ্বান আমোঘ ; নিভৃত আত্মার নির্মোক ভেদ করে কবিকে বেরিয়ে আসতেই হয়েছে। তাতে অপার উচ্ছ্বাস, সেইসঙ্গে নতুনের পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দেবার সাধন-বেদনাও নিরবধি :—

"ওরে কবি তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকার-মুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা
নাড়িতে নাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষে তোর উঠে রণরণি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।"

বেরিয়ে আসার পেছনে বাইরের দাবি ছিল,—কিন্তু একবার বিশ্ব-জীবনের পথে কবি প্রাণ বেরিয়ে যখন পড়েছে, তখন নিজ আত্মার অক্ষয় প্রত্যয়ের পাথেয় দিয়েই পথের কড়ি দিয়েছে মিটিয়ে,—

তখন :—

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।"

তাই,

"এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায় করল মাতাল।"

কিন্তু এই সব চলা,—সব সাধনার পেছনে ছড়িয়ে আছে 'গীতাঞ্জলি'-যুগের উপলব্ধির আনন্দ-প্রত্যয়,—"আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল। নইলে ত এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।"—নিজের সেই অনন্ত পরিচয়কে নব-পরিচিত করবার সাধনার পথে বেরিয়েছেন এবার 'গীতাঞ্জলি'র কবি। 'বলাকা'র একদিকে গতি,—অপর দিকে মুক্ত-পরিণতির ধ্রুব প্রত্যয় সমসূত্রে বাঁধা পড়েছে।

'বলাকা'ব পবেব কাব্য 'পলাতকা' (১৩২৫)। 'পলাতকা' আসলে কবিতাব আধাবে গল্প, নিত্য দিনেব চোখে-দেখা জীবনেব দবদ-স্নিগ্ধ সুবভি-সাব। জীর্ণ দেহেব পর্ণ পুটে যৌবনেব অক্ষয প্রেমানুভব নিযে জীবনেব পথে বেবিযেছেন কবি এবাব,—জীবনেব বিরুদ্ধে নালিশ থাকলেও আক্রোশ নেই কোথাও অথচ তাব প্রতি করুণা ও মমতা অপাব। তাই, দুঃখী জীবনেব তাপ গভীব বেদনা করুণা সুন্দব রূপ পেযেছে 'ফাঁকি', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি কবিতায। 'পলাতকা'ব কবি মনোভাবেব সব 'শেষ গান' এ স্পষ্ট হযে উঠেছে —

পলাতকা

'তাই যাবা আজ বইল পাশে এই জীবনেব সূর্যডোবাব বেলায
তাদেব হাতে হাত দিযে তুই গান গেযে নে থাকতে দিনেব আলো—
বলে নে ভাই এই যে দেখা, এই যে ছোঁওযা, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্না হাসিব গঙ্গা যমুনায
ঢেউ খেযেছি, ডুব দিযেছি, ঘট ভবেছি, নিযেছি বিদায।
এই তো ভালো ফুলেব সঙ্গে আলোয জাগা গান গাওযা এই ভাষায,
তাবাব সাথে নিশীথ বাতে ঘুমিযে পডা নূতন প্রাণেব আশায।"

বিদায-পথ যাত্রী অক্ষুব্ধ কবি প্রাণেব জীবন সম্ভোগেব বস কাব্য 'পলাতকা'। পলাতকা'ব পবে অনেক দিন আব কবিতা লেখা হয নি, তিন বছব পবে ১৩২৮ বাংলা সালে 'শিশু ভোলানাথ'-এব কবিতাগুচ্ছ বচিত হতে আবম্ভ কবে। অনেকদিনেব পবে মনে অকস্মাৎ শিশু চেতনা আবাব জেগে উঠেছে। কিন্তু শিশুমনেব এই জাগবণ অকাবণ নয এই কাব্য বচনাব অব্যবহিত পূর্বে দীর্ঘ দিন যুবোপ আমেবিকায ঘুবে (১৯২০-২১) সদ্য দেশে ফিবেছেন কবি তখন নূতন এই কাব্য বচনাব প্রসঙ্গে পবে তিনি নিজে বলেছেন — 'আমেবিকাব বস্তুগ্রাস থেকে বেবিযে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। কিছুকাল আমেবিকাব প্রৌঢতাব মবুপাবে ঘোবতব কার্যপটুতাব পাথবেব দুর্গে আটকা পডেছিলুম। দেযালেব মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পডলে তবেই মানুষ স্পষ্ট কবে আবিষ্কাব কবে তাব চিত্তেব জন্যে এতবডো অবকাশেব ফাঁকটা দবকাব। সেদিন আমি আবিষ্কাব কবেছিলুম অন্তবেব মধ্যে যে শিশু আছে, তাবই খেলাব ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তবে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায সেই শিশু লীলাব মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশু-লীলাব তবঙ্গে সাঁতাব কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ কববাব জন্যে, নির্মল কববাব জন্য, মুক্ত কববা জন্যে।" এই মুক্তিব আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ শিশু ভোলানাথ'-এব সাবা দেহে ছডিযে আছে।

শিশু ভোলানাথ

এব দীর্ঘ দিন পবে এল পূববী'ব মূল কবিতা গুচ্ছ,—আবো প্রায চাব বছব পবে (১৩৩২)। 'পূববী' কাব্যেব দুটি ভাগ,—এক 'পূববী', আব এক 'পথিক'। 'পথিক' পর্যাযেব কবিতাগুচ্ছ যেমন সংখ্যায, তেমনি ভাবেও মুখ্য। ১৩৩২ বাংলা সালে কবি পেব-সবকাবেব আমন্ত্রণে দক্ষিণ আমেবিকা যাত্রা কবেছিলেন, যাওযা এবং ফিবে আসাব পথে লেখা হযেছিল এই পর্যাযেব অধিকাংশ কবিতা। এখান থেকেই 'কবে-ওঠা'ব সাধনাব ফাঁকে ফাঁকে কবিব 'হযে ওঠা'ব পালা অঙ্কুবিত হতে আবম্ভ কবেছে যেন বাইবে সান্ত, অন্তবে অনন্ত এই নবীন যৌবনেব শক্তি নিযে কবি নিজেব অতীত জীবন-লোকে ফিবে ফিবে তাকিযে দেখেছেন, —বাবে বাবে আবিষ্কাব কবেছেন সেই প্রথম কৈশোব-যৌবনেব অতিক্রান্ত দিনেব নতুন মূল্য। অতীতেব স্মৃতিচাবণেব মধ্য দিযে নতুন কবে নিজেব মধ্যে নিজে হযে উঠেছেন দিনে দিনে —

পূববী

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে মনে হল যেন চিনি—
কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে, বাজাইলে কিঙ্কিণী,
বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের আলোকে তোমারে চিনি।"

নতুন জীবন, নতুন যৌবন,—নতুন করে হয়ে-ওঠার আনন্দ-বিস্ময় ; তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে ফুলের মাঝখানে কালো ভ্রমরের মতো কালো-ঘন বেদনা :—

"দেখো নাকি হায়, বেলা চলে যায়, শেষ হয়ে এল দিন,
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ!"

নতুন অনুভবের আনন্দ-দীপ্তি এসেছে জীবনে,—সেই সঙ্গে ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার; যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল দিলগুলির ওপরে ঘনিয়ে আসবে কালের যবনিকা। তাতে নালিশ নেই ; কবি-চেতনা আজ আত্মসমাহিত। কিন্তু ছেড়ে যাবার উদাস নিষ্ক্রিয় বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে 'পূরবী'র সারা কাব্য-দেহে,—সদ্য বৃষ্টি-ধৌত সূর্যাস্তের রক্তিম বেদনার মতো।

'পূরবী'র পরে 'গানের বই' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাহিণী' (১৩৩২), আর লিখিত হয়েছিল 'লেখন' (১৩৩৪), জাপান ভ্রমণকালে যার প্রথম সূচনা—'কণিকা'র মতো ছোট ছোট কবিতায় কবি-প্রাণের স্বচ্ছ অনুভব অপরূপ ব্যঞ্জনা পেয়েছে 'লেখন'-এর কবিতাগুচ্ছে :-

'লেখন'

"কল্লোল-মুখর দিন ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল পেতে চায় ফল
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে চলিছে চঞ্চল।"

'লেখন'-এর অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়েছিল অটোগ্রাফ দেবার উদ্দেশ্যে।

'বনবাণী' কবিতাগুচ্ছের রচনা শুরু হয় ১৩৩৪ বাংলা সালে; কিন্তু সারা হতে লেগেছিল ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। পরিণতির দিক থেকেও এটি 'মহুয়া'-উত্তর ঋতুর রচনা। 'বলাকা'র যৌবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি 'মহুয়া'তে (১৩৩৬ সাল)। ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ থেকে পৌষের মধ্যে অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়েছিল। 'মহুয়া'র শুরু হয়েছিল 'ফরমায়েস'-এর ধাক্কায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলি থেকে কিছু সংখ্যক প্রেমের কবিতা বেছে বিবাহে উপহার দেবার উপযোগী একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশ করার প্রস্তাব হয়েছিল। কথা ছিল, এই সংকলনের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতাও কবি লিখে দেবেন। কবিতা বাছাই করা হয়েছিল; নামও রাখা হয়েছিল নূতন সংকলনের,—'বরণডালা' বা 'রাখী'। কিন্তু সে-সংকলন প্রকাশিত হয় নি কবির জীবদ্দশায় ; নতুন কয়েকটি কবিতা লিখতে গিয়ে "অনেকগুলি কবিতা" লেখা হয়ে গিয়েছিল। অথচ ততক্ষণে বাইরের ফরমায়েস-এর উদ্দেশ্য কবি ভুলে গেছেন; ভেতরের প্রেরণায় নতুন প্রেমের কবিতা নতুন ঋতুর স্বাদ-গন্ধ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কবি নিজে এ-সম্বন্ধে বলেছেন, "মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমায়েসের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎশক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে।......নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না, নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না।"

'মহুয়া'র উৎস

'মহুয়া' একান্তভাবে প্রেম-কবিতার গুচ্ছ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রেম-কবিতার ইতিহাসে 'মহুয়া' অভূতপূর্ব এবং অনন্য। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগ থেকেই কবির রচনায় প্রেমাকৃতির পরিচয় বিচিত্র আকারে ধরা পড়েছে ; অপরিণতির যুগের রচনাবলিতেও তাই। প্রথম-যৌবনের বাসনা অনাবৃত প্রকাশ পেয়েছে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। ঐটিকে যৌবন-প্রেমোল্লাসের কাব্য বলা চলে। তারপরের প্রায় সকল কাব্যেই রবীন্দ্র-প্রেমানুভবের বিচিত্র পরিচয় বিকশিত হয়েছে। আর, সাধারণভাবে রবীন্দ্র-প্রেমচেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নৈর্ব্যক্তিকতায়। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীকে নাকি কবি বলেছিলেন,—"যাকে তোমরা ভালোবাসা বল, সে-রকম করে আমি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসি নি। আমি বৃহৎ সংসারে বাস করেছি, প্রিয়জনের অন্ত ছিল না, আর আজ তো আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়ে তোমরা যারা পর, তারাই আমার বেশি আপনার হয়ে উঠেছ। কিন্তু একথা ঠিক, বন্ধুবান্ধব সংসার স্ত্রীপুত্র কোনো কিছুই কোনো দিনই আমি তেমন করে আঁকড়ে ধরিনি।.....তা যদি না হত, যদি জড়িয়ে পড়তুম, তা' হলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত। কোনো বন্ধনই আমায় শিকল হয়ে বাঁধে নি কোনোদিন। চিরদিনই আমি মনে মনে উদাসী।"—প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই আলোচনায় স্পষ্ট। কোনো ব্যক্তি বা রূপ-মূর্তিকেই তাঁর প্রেমের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি দেন নি কবি। 'কড়ি ও কোমল'-এ রূপের প্রতি কবির আকৃতি দেখা গেছে,—কিন্তু সে-রূপ কল্পদেহের। 'সোনার-তরী' 'চিত্রা'য় সেই দেহ-বিলাস অসীম-ভাবনায় বিলীন হয়েছে। তারপরে দেহ-মুক্ত প্রেমের সাধনা চলেছে ধাপে ধাপে। 'মহুয়া'-পূর্ব 'গীতাঞ্জলি'র অধ্যাত্ম উপলব্ধি তাঁর প্রেমকে জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত অন্তহীন লোকে বিস্তারিত করেছিল,—'বলাকা'-যুগের কবি-চৈতন্য তাকে দিয়েছিল 'বিশ্বময় ছড়ায়ে'। সহজ-উদাসীন মনে ধ্যানীর মুক্তির আনন্দ ছড়িয়েছিল। 'মহুয়া'র প্রেম বৈরাগী নয়— অন্তহীনতার নিরন্তর উপলব্ধির আনন্দ-সাগরে কবির সে প্রেম চেতনা ভাসমান।

'মহুয়া'র প্রেম-চেতনা

কবি নিজে 'মহুয়া' কবিতাবলিতে প্রেমের দুটি পৃথক রূপ দেখেছেন,—একটিতে "প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য, আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে,—তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই মুখ্য।" কিন্তু উভয়শ্রেণীর কবিতাতেই কবির আসক্তিহীন প্রণয়-চেতনা আপন অনন্ততার প্রত্যয়ে আনন্দিত। 'মহুয়া'র মূল ঋতুর কবিতাবলি ছাড়া সমর্পিতার জন্য 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কয়েকটি কবিতা গ্রন্থিত আছে এই কাব্যে। আরো কিছু কবিতা আছে, —" সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের।"

কবিতা-পরিচয়

২। পরিণতি যুগের নাট্য-সাহিত্য

আলোচ্য যুগে অনেক কয়টি পুরাতন নাটকের নবরূপ দিয়েছিলেন কবি; এই সব রচনার অনেক কয়টিই ভাবের বিচারে, কিংবা নাট্য-রসের স্বাদুতায়, অভিনব নয়। অতএব, তাদের স্বতন্ত্র আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। যে-কয়টি নাটক যথার্থ নূতন হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে আছে 'প্রায়শ্চিত্ত'র কাহিনী-ছায়া অবলম্বনে লেখা 'মুক্তধারা', আর 'রাজা ও রানী'-র রূপান্তর 'তপতী'। যথাস্থানে এদের পৃথক পরিচয় দেওয়া হবে। অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখ্য নাটকগুলির মধ্যে আছে—'গুরু', 'অরূপরতন', 'ঋণশোধ', 'পরিত্রাণ'; এরা যথাক্রমে 'অচলায়তন', 'রাজা', 'শারদোৎসব' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পরিবর্তিত রূপ; পূর্বে এদের প্রাসঙ্গিক পরিচয় দিয়েছি। 'গোড়ায় গলদ'-এর নবরূপ 'শেষরক্ষা'-

নাট্য-রচনায় পূর্বানুসৃতি

ও এই পর্যাযেবই বচনা।

এই পর্যাযেব আবো দুটি দুর্বল নাট্য-বচনা বযেছে 'গৃহপ্রবেশ' (১৩৩২ সাল) ও 'শোধবোধ' (১৩৩৩)। এবা যথাক্রমে 'কর্মফল' ও 'শেষেব বাত্রি' নামে ছোটগল্প দুটিব অতি-বঞ্জিত দুর্বল নাট্য-ৰূপ।

গৃহপ্রবেশ ও শোধবোধ

ববীন্দ্র প্রতিভাব পবিণতি যুগেব প্রথম নাটক 'ফাল্গুনী' (১৩২১)। একদিক থেকে 'শাবদোৎসব'-এ যে নাট্য-ভাবনাব শুৰু, তাবই পবিণতি 'ফাল্গুনী'তে। দুঃখেব মূল্য দিযে আনন্দেব অধিকাব পেতে হবে, এই প্রত্যয শাবদোৎসব' পর্বেব মতো 'ফাল্গুনী'ব-ও প্রধান বক্তব্য। তাহলেও, 'ফাল্গুনী' 'শাবদোৎসব নয , এ টি 'বলাকা' ঋতুব ফসল , কবি এব প্রথম নামকবণ কবেছিলেন বসন্তোৎসব'। বলাকা'ব কবিব জীবনে ও মননে যৌবন-প্রৌঢীব দাহহীন যে দীপ্তি আলোকিত হযে উঠেছিল, তাবই আনন্দৰূপ 'ফাল্গুনী'। তাই, এ নাটকেব উপাদানে সংঘাত ও সংলাপ নেই আছে সংগীত ও সংলাপ গীতি। ধ্যানীব তন্ময়তাব সঙ্গে অন্বিত বসিকেব আনন্দ উল্লাস 'ফাল্গুনী'ব প্রাণ। প্রাণ ধর্মেব সত্যৰূপ ব্যাখ্যা কবে কবি বলেন 'জগৎটাব দিকে দেখলে দেখা যায যে, যদিচ তাব উপব দিযে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে, তবু সে জীর্ণ নয —আকাশেব আলো উজ্জ্বল তাব নীলিমা নির্মল। ধবণীব মধ্যে বিক্ততা নেই তাব শ্যামলতা অম্লান —অথচ খণ্ড খণ্ড কবে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝবছে পাতা শুকোচ্ছে ডাল মবছে। জবামৃত্যুব আক্রমণ চাবিদিকেই চলেছে তবু নবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts এব দিকে দেখি জবা মৃত্যু। Truth এব দিকে দেখি অক্ষয জীবন, যৌবন। শীতেব মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনেব সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তেব অসীম সমাবোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হযে পড়ল কবিব জীবনে শীতেব জডতাকে অতিক্রম কবে যে অতল অক্ষয যৌবনেব দোলা লেগেছি। বলাকায তাবই আনন্দোৎসব ফাল্গুনী'ব বসন্তোৎসবে

ফাল্গুনী

ববীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহে নব চেতনাব প্রকাশ ঘটল আব একবাব মুক্তধাবায (১৩২৮) নতুন জীবন সমস্যাব প্রেক্ষিতে পুবাতন প্রত্যয নবীন মূর্তিতে ও ৰূপে প্রকাশ কবা মুক্তধাবাব মূল কাহিনী-কাঠামো প্রাযশ্চিত্ত নাটক থেকে নেওয়া। কিন্তু তাব আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক বহির্জীবনেব ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ এবং অন্তর্জীবনেব বিশেষ মনোঋতুব প্রভাব এই নাট্য বচনাকে পূর্বাপব থেকে বিশেষিত নূতনত্ব দিযেছিল মুক্তধাবা বচন সমাপ্তিব সময তাবিখ অনুযাযী ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২০ ২১ এ কবি যুক্তবাষ্ট্র আমেবিকা ভ্রমণ কবে এসেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পবে। শিশু ভোলানাথ প্রসঙ্গে দেখেছি— সেখানকাব জীবনযাত্রা তাব সৃজনশীল চিত্তকে ক্লান্ত ক্লিষ্ট কবেছিল। যুদ্ধেব সমযে ছিল মানব মূল্য বোধহীন পৈশাচিক হত্যালীলা। যুদ্ধেব পবে পুনর্গঠনেব নামে আবাব চলল 'দানবীয যান্ত্রিক পেষণ যুদ্ধ সমযেব সকল ক্ষয ক্ষতিকে পুবিযে তুলবাব নামে প্রতীচ্যেব সকল জাতিই যন্ত্রচালিত শিল্প প্রগতিব অন্ধ উজ্জীবনে মেতেছিল। তাতে উন্নতিব নামে প্রচুব বিত্ত ও বস্তুব সঞ্চয গডে উঠেছিল। কিন্তু তাব মূল্য দিতে হচ্ছিল প্রতি দেশেব সাধাবণ মানুষকে জাতীয উন্নতিব নামে স্বেচ্ছাকৃত আত্মবঞ্চনা ও আত্ম পীডনেব বোঝা চাপিযে দেওযা হচ্ছিল তাদেব ঘাডে। কী ধ্বংসেব উন্মত্ততায কী সংগঠনেব অন্ধ নেশায মানবেব মূল্যকে ছাপিযে চলেছিল দানবেব উল্লাস। তাই যন্ত্র সভ্যতাব প্রতি কবিব মন বিমুখ হযে উঠেছিল, সমসামযিক চিঠিতে এ-কথা বাবে বাবে বলেছিলেন। মুক্তধাবা' লেখা হযেছিল দেশে ফিবে। তখন ভাবতবর্ষেও নতুন শক্তিব স্রোত উত্তাল হযে উঠেছে, গান্ধীজি

মুক্তধাবায নবীন জীবন বোধ

আপন আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শেব অনুমত কবে অসহযোগ আন্দোলনেব প্রথম সূচনা কবেছিলেন ভাবতেব স্বাধীনতা-সংগ্রামেব ইতিহাসে। একদিকে পশ্চিমী জীবনেব যান্ত্রিক নৈবাত্মিকতা, আব একদিকে ভাবতীয় জীবনে সাম্রাজ্যবাদী নিপীডনেব সংঘাতকে কেন্দ্র কবে গডে ওঠে 'মুক্তধাবা'ব নাট্য পবিমণ্ডল। সমকালীন জীবন-চবিত্রেব গভীবে বিশ্বসভ্যতাব যে বিপর্যয সম্ভাবনা আত্মগোপন কবেছিল, তাব ভাবব্যঞ্জনাকেও কবি নাটকে আভাসিত কবতে চেয়েছেন।

আত্মভোলা ধনঞ্জয বৈবাগী এই সার্বিক অপঘাতেব প্রতিবোধ কবতে চেয়েছে আত্মসমর্পণশীল সর্বাযত প্রেমেব শক্তিবলে। 'প্রাযশ্চিত্ত' নাটকেব উজ্জ্বল বিস্ময ধনঞ্জয বৈবাগীব অধিকাংশ গান ও সংলাপ ঐখান থেকেই আহবণ কবা হযেছে 'মুক্তধাবা'-তে। ববীন্দ্রনাথ নিজেই একথা স্মবণ কবিযে দিযেছেন, যদিও অনেকেই মুক্তধাবা'ব ধনঞ্জয বৈবাগীব চবিত্রে গান্ধী ব্যক্তিত্বেব ব্যঞ্জনা সন্ধান কবেন। এক সমযে আবাব এমন দাবিও কবা হযেছিল যে 'প্রাযশ্চিত্ত', —অতএব 'মুক্তধাবা' নাটকেবও, ধনঞ্জয-পবিকল্পনাব মূলে ছিল কবিভাবনায বালগঙ্গাধব তিলকেব ব্যক্তিত্বেব প্রেবণা। ধনঞ্জয আসলে ঠাকুবদা, অন্ধ বাউল, ইত্যাদি চবিত্রধাবাবই সগোত্র, ববীন্দ্রকল্পনায মানুষেব ধর্মেব সহজ সাধক মবমিযা মানুষেব ভাব প্রতিনিধি।

যন্ত্রশিল্পী বিভূতি দিযে উত্তবকূটেব বাজা মুক্তধাবা ঝর্ণাব ওপবে মস্ত বাঁধ বাঁধিযেছেন যন্ত্রশক্তিব দাপটে উত্তবকূটেব লোকেবা যত ভয পায ততই অন্ধ ভক্তি নিবেদন কবে ঐ যন্ত্র দানবেবই পাযে। অন্যদিকে শিবতবাই এব গবিব চাষাবা হয নিবন্ন, ঝর্ণাব মুখে যন্ত্রেব বাঁধ তাদেব মাঠকে শুকিযেছে, ফসলকে দিযেছে মেবে, তাদেব তৃষ্ণাব জল কণ্ঠতালুতে শুকিযে

মুক্তধাবাব প্রতীক শিল্পরূপ

যায লুপ্ত হযে যন্ত্রেব শক্তিবশে মদান্ধ বাজা তাদেব প্রাণেব আবেদনকে স্তব্ধ কবতে চায প্রচণ্ড পীডনে। ধনঞ্জয বৈবাগী তাদেব মধ্যে মুক্তিব আন্দোলন জাগিযে তোলে সে মুক্তি বাজাব বিবদ্ধে বিদ্রোহেব নয কেবল নিজেদেব শক্তিব ওপবে দাঁডিযে ওঠাব — আত্মাবও মুক্তিব। ববীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' যাকে বলেছেন তাবই স্মবণেব। চাবিদিকে যখন বিবোধেব ধোঁযা ফাঁপিযে উঠছে তখন অভিজিৎ মুক্তধাবাব তীবে যে মুক্ত শিশুকে কুডিযে পেযে বাজো সন্তানেব আদবে মানুষ কবেছিলেন মুক্তধাবাব সন্তান সেই অভিজিৎ নিজেব আত্মদান কবে বাঁধকে ভেঙে দিয স্রোতেব সঙ্গে নিজেও গেল মুক্তিব চবিতার্থতায ভেসে। এই পবিসমাপ্তিব তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবে কবি লিখেছিলেন — "যন্ত্র প্রাণকে আঘাত কবেছে অতএব প্রাণ দিযেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে যন্ত্র দিযে নয যন্ত্র দিযে যাবা মানুষকে আঘাত কবে, তাদেব একটা বিষম শোচনীযতা আছে কেন না যে মনুষ্যত্বকে তাবা মাবে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদেব নিজেব ভিতবকাব মানুষকে মাবছে। আমাব নাটকেব অভিজিৎ হচ্ছে সেই মাবনেওযালাব ভেতবকাব পীডিত মানুষ। নিজেব যন্ত্রেব হাত থেকে নিজে মুক্ত হবাব জন্যে সে প্রাণ দিযেছে।"

'মুক্তধাবা'ব এই ভাব ব্যঞ্জনা সফল সাংকেতিকতাব মধ্য দিযে গডে উঠেছে। অন্যদিকে উত্তবকূট ও শিবতবাইযেব মধ্যবর্তী স্বার্থ দ্বন্দ্বে নাট্য সংঘাতও হযেছে সুগঠিত।

'মুক্তধাবা'ব এই কবি-চেতনা সম্পূর্ণতব ভাবরূপে বিভাম্বিত হল 'বক্তকববী'তে। এব প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী' পত্রিকায, ১৩৩১ বাংলা সালে, প্রথম গ্রন্থিত রূপ ১৩৩৩-এ। কিন্তু বচনাব খসডা তৈরি হযে গিযেছিল ১৩৩০ সালে, শিলং-এ। তখন বইটিব নাম ছিল 'যক্ষপুবী', পবে গ্রন্থ

প্রকাশের সময় নূতন নাম দেন—'রক্তকরবী'। মাঝে একবার নায়িকার নামে নাটকের নাম নাকি রেখেছিলেন 'নন্দিনী'। গেল য়ুরোমেরিকা ভ্রমণের সময় থেকে মানবঘাতী যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে কবির মন বিষিয়ে উঠেছিল; 'মুক্তধারা'য় এ-বিষয়ে কবি-প্রাণের বেদনার উৎসার ঘটতে দেখেছি। শিলং-এ থাকবার সময়ে প্রায়ই অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যেতেন কবির কাছে। বোম্বাই অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলি ঘুরে শ্রমিকদের অবস্থা নিজের চোখে দেখে তিনি সদ্য ফিরেছেন তখন। কবির কাছে সেই সব তথ্য বলতেন রাধাকমল, কবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতেন। য়ুরোপের যন্ত্র-দানব ভারতের মানব-প্রাণকেও পিষে মারছে.—এই যন্ত্রণানুভবের অব্যবহিত প্রেরণায় 'যক্ষপুরী' 'রক্তকরবী'র জন্ম। কিন্তু, এর মূলে ছিল বিশ্বব্যাপী অগ্রসয়মাণ যান্ত্রিক বীভৎসতার বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবাত্মার প্রতিক্রিয়া। কেবল বিদ্রোহ নয়,—বিপ্লবোত্তর নবজীবনের সংকেতও নিহিত রয়েছে 'রক্তকরবী'র রক্তিমায়। 'রক্তকরবী'র মূল বক্তব্য, 'কর্ষণজীবী' ও 'আকর্ষণ-জীবী' এই দুই সভ্যতার মধ্যেকার মৌল বিরোধ। 'রক্তকরবী'তে কর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক সবুজ ধান,—সবুজ প্রাণে ভরা পল্লী-প্রকৃতির লক্ষ্মীরূপ। সেখান থেকে 'রক্তকরবী'র পাত্র-পাত্রীরা ছিটকে এসে পড়েছে শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দ্বেষ-হিংসা, বিলাস-বিভ্রমে আকীর্ণ যক্ষপুরীর অন্ধ আকর্ষণে! 'লক্ষ্মী' দেবী,—তিনি দেন সম্পদ,—শ্রী এবং হ্রী, সৌন্দর্য এবং কল্যাণ। কিন্তু যক্ষরাজ কুবের উপদেবতা, তিনি দেন ধন,—তাল তাল সোনা, বস্তুর বুকে প্রাণের আলোক-সম্পদ জাগিয়ে তোলার সাধ্য তার নেই। তাই, তার নিষ্প্রাণ ধনলোলুপতা! অন্ধ, কঠিন। মানুষকে যখন ধনলোভের এই প্রাণহীন যক্ষবৃত্তি পেয়ে বসে, তখন অন্ধ শক্তির রাক্ষসী প্রচণ্ডতায় মানুষকে সে মারে,—মারে নিজে নিজেকে। যক্ষপুরীর জালের আড়ালে বাঁধা পড়া রাজা সেই নিজের জালের বন্ধনে যন্ত্রণা-পিষ্ট মানবাত্মা। যন্ত্রের মধ্যে প্রবল শক্তি রয়েছে। কিন্তু মানুষের চেতনা যদি তার তলায় চাপা পড়ে না যায়, তা হলে যন্ত্রের পেষণ-শব্দ ছাপিয়ে মানুষের প্রাণের সংগীতের সুর লাগে তাতে, রঞ্জনের আবির্ভাব যক্ষপুরীর মাটির তলায় সোনার পাহাড়ে সাড়া জাগিয়েছিল; দুঃসাধ্য খোদাই-কর্ম খোদাই নৃত্যে হয়েছিল পরিণত। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র-শক্তির বিরোধী নন, যন্ত্রের আঘাতে মানুষের প্রাণকে শুকিয়ে মারতেই তাঁর আপত্তি ,—"যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের রুদ্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত, সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে,—সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি। ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যে পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল ; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।" সমকালীন পৃথিবীর এক অতি জটিল জীবন-সংস্যাকে নিজের অন্তর্দৃষ্টিবশে প্রত্যক্ষ করে তার শিল্প-পরিণাম নির্দেশ করেছেন কবি। এই নাটকের প্রতীক ব্যঞ্জনা যেমন অপরূপ রস-সমৃদ্ধ, তেমনি তার নাট্যসম্পদও অমূল্য।

'রক্তকরবী'

এই পর্যায়ে আর একটি উল্লেখ্য নাটক 'চিরকুমার সভা' (১৩৩২)। কাব্যে তখন চলেছে 'পূরবী'-উত্তর কাল। কিন্তু 'চিরকুমার সভা'র মূল পরিকল্পনা এই ঋতুর ফসল নয়। ১৩০৭ সালে প্রথম উপন্যাস আকারে এর প্রকাশ 'ভারতী' পত্রিকায়। ১৩১১ সালে 'হিতবাদী সংস্করণ

গ্রন্থাবলী'তে ঐ নামেই পুবো গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয। তাবপবে ১৩১৪ সালে আবাব প্রকাশিত হয ববীন্দ্রনাথেব 'গদ্যগ্রন্থাবলী'তে, তখন উপন্যাসেব নূতন নাম হয 'প্রজাপতিব নির্বন্ধ'।

'চিবকুমাব সভা'

উপন্যাস রূপে 'চিবকুমাব সভা'ব পবিকল্পনা সাময়িক পত্রেব ফবমায়েস-এব মুখে। কবিব কাছে একটি সামাজিক প্রহসন দাবি কবা হয়েছিল 'ভাবতী' পত্রিকাব পক্ষ থেকে। বাংলাব শিক্ষিত সমাজে তখন সন্ন্যাস-ব্রতেব ঘোব লেগেছে স্বামী বিবেকানন্দেব প্রভাবে। সেবাব জন্য, স্বদেশ-হিতেব জন্য বৈবাগ্যেব কঠোব সাধনায় উদ্বোধিত হয়েছিল বাঙালি তরুণেব মন। যে-কোনো কাবণেই হোক না কেন, জীবনে সুখকে অস্বীকাব কবা কবি ধর্মেব আদর্শেব অভিমত ছিল না। তিনি ভোগেব জন্যে সুখকে চাননি কোনোদিন, জীবনেব দুঃখ সাধনা দিয়ে আনন্দকে জয় কবাব ব্রত তাঁব।--তাতে দেহ মনকে উপবাসী বাখলে চলে না। সংগ্রামেব,—আনন্দেব বসদ জোগাতে হয় তাদেব। বস্তুত বাঙালি তরুণদেব এই সাময়িক বৈবাগ্য চেতনাকে প্রহসন রূপ দিতেই 'চিবকুমাব সভা'ব প্রথম জন্ম। 'পূববী'-উত্তব যুগে তা যখন নাট্য রূপ পেয়েছে তখন 'বৈবাগী প্রতিজ্ঞাব লক্ষ্যভেদ'-কবা চিবযৌবনেব সন্ধান পেয়েছে। কবি 'বলাকা' 'পূববী'ব কবিতায় সত্যকে প্রেমেব চিবন্তন রূপকে খুঁজে পাওয়াব আনন্দ বৈভব এই কৌতুক-নাট্যেব সাবাদেহে ছড়িয়ে আছে। তাই 'চিবকুমাব সভা' উপন্যাসেব চেয়ে নাটক অনেক বেশি শিল্প সফল, ববীন্দ্রনাথেব একটি অত্যুজ্জ্বল নাট্য সৃষ্টি এটি।

'চিবকুমাব সভা' ও 'শোধবোধ' এব ক্ষীণ ব্যবধান পেবিয়ে লেখা হয 'তপতী' (১৩৩৬)। এটি 'বাজা ও বানী'ব নব সংস্কবণ, পবিবর্তনেব কাবণ কবিব ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে 'বাজা

ভৈববেব বলি এবং তপতী

ও বানী'ব আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে 'ভৈববেব বলি' নাম দিয়ে প্রচলিত আঙ্গিকেই নাটকটিব রূপান্তব সাধন কবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনে তখন নূতন ঋতুব দোলা লেগেছে পুবাতন ধাবা অচল হল। সম্পূর্ণ রূপান্তব নিয়ে দেখা দিল 'তপতী' নতুন ভাবনাব বার্তা বয়ে। তপতী 'মহুয়া'ব সমকালীন বচনা, একদিকে সাংকেতিকতাব আভাসে নাট্যবস যেমন ঘন হয়েছে, তেমনি প্রেমেব তপস্বী স্বভাবটিও বিমূর্ত হতে পেবেছে বানী সুমিত্রাব ভূমিকায়। এদিক থেকে তপতী নামটিও সার্থক ব্যঞ্জনাময।

নৃত্য নাট্য গুচ্ছ

'তপতী'ব আগেই দুটি নৃত্য নাট্য 'নটীব পূজা' (১৩৩৩) ও 'ঋতুবঙ্গশালা' (১৩৩৪) গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি মনেব এই ঋতুতে লেখা আবো কয়েকটি ঋতু-লীলা বিষযক নৃত্য গীতিনাট্য, 'শেষবর্ষণ' (১৩৩৩), 'বসন্ত' (১৩৩৩), ও 'নবীন' (১৩৩৭)।

৩। পরিণতিযুগের কথাসাহিত্য

ক। উপন্যাস

'চতুবঙ্গ' উপন্যাস দিয়ে এই যুগেব কথা-বচনাব শুরু। পৃথক পৃথক গল্পেব আকাবে 'সবুজ পত্র'তে ১৩২১ বাংলা সালেব চাব সংখ্যায প্রকাশিত হয়েছিল চতুবঙ্গ', যথাক্রমে 'জ্যাঠামশায', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' নামে। গল্প হিশেবে 'জ্যাঠামশায', অর্থাৎ শচীশেব জ্যেষ্ঠতাত জগমোহনেব জীবন চিত্রে একটা স্বযম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু গল্প সেখানে থামে নি,

শচীশ, দামিনী, ও শ্রীবিলাসের জীবন-কথার অংশগুলির সঙ্গে গ্রথিত হয়ে একটি অখণ্ড জীবন-রূপ গড়ে তুলেছে। যেমন আঙ্গিক, তেমনি জীবন-চেতনা ও প্রকাশশৈলীর অভিনবতায় 'চতুরঙ্গ' অপূর্ব। 'চতুরঙ্গ' নামের মধ্যেই ভাবনার সফল ব্যঞ্জনা রয়েছে; গোটা উপন্যাস-এ যে অখণ্ড জীবন-রূপ আভাসিত হয়েছে, তার অঙ্গ চারটি ; জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। গোটা গল্পটির কথক একা শ্রীবিলাস ; কিন্তু প্রত্যেকের জীবন-রূপকে পৃথক্ পৃথক্ স্বাতন্ত্র্যের অখণ্ডতায় পরিচায়িত করেছে সে,—যেন শ্রীবিলাসের জবানিতে নায়ক-নায়িকারা নিজেদের আত্ম-পরিচয় অনাবৃত করেছে। একই মূল প্লট-এর সঙ্গে চারটি জীবনের অখণ্ড যোগ ; অথচ নিজ নিজ জীবনকথা বিবৃত করতে গিয়ে কখনো কেউ-কারো পুনরাবৃত্তি করে নি। গল্প বলার এক অপরূপ দক্ষতা দেখিয়েছেন কবি এতে; সেই সঙ্গে গল্পের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন নাটকীয় সজীবতা।

'চতুরঙ্গ'-র আঙ্গিকরূপ

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রচনাশৈলীর এই অপূর্বতাই সব নয়, এখান থেকেই রবীন্দ্র-উপন্যাসে মনন-দীপ্ত ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্য-উপন্যাস রচনার শুরু। কবির কথা উদ্ধার করে আগে বলেছি, তাঁর গদ্য রচনার মধ্যেও, তথা সব রচনাতেই, প্রকাশ পেয়েছে 'কবিমাত্র'-সত্তার সৃজনশৈলী। 'শারদোৎসব'-এর কাল থেকেই নাটকে বিশেষিত এই কবিতা-ধর্মের উদ্ভব। কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাস সাহিত্যের কাব্য ধর্মিতালাভ সম্পূর্ণ হয়েছে 'চতুরঙ্গ'-তে এসে। তার অর্থ এই নয় যে, উপন্যাস রচনায় বাস্তবকে একান্ত বর্জন করে কবি কেবল কল্পনার স্বপ্ন-লোকে বিচরণ করেছেন। এ-পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে দেখেছি, নিজের সৃষ্টির পসরা নিয়ে কবি এসে বসেছেন চলমান জীবন স্রোতের তীরে। জীবনের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ নিজের চোখে তাকিয়ে দেখার মাধ্যমে ; একান্ত প্রত্যক্ষ সে যোগ। কিন্তু, সেই বস্তু-জীবন-স্রোতের নৈর্ব্যক্তিক ফটোগ্রাফার নন কবি, নিজের শিল্পি-মনের আইডিয়া, আদর্শ, বা জীবন চেতনায় তুলি ডুবিয়ে চোখে-দেখা জীবনকে নতুন করে এঁকেছেন তিনি। এখানে তিনি চিত্রশিল্পী, বস্তু রূপের নয়—চেতনা-সিঞ্চিত বস্তু-স্বরূপের। বলা বাহুল্য, এই চেতনার জন্মভূমি কবির মনোলোক। নিজের চেতনার রঙে রাঙিয়ে চলমান বস্তু-জীবনের অখণ্ড রূপ-রচনা করেছেন তিনি। এতে কবির কল্পনার চেয়ে, মনীষীর মনন ও ধ্যানীর প্রত্যয়ের বর্ণ-বিচিত্রতা কম নয়, বেশি। তাই 'চতুরঙ্গ' থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাসের বাচনভঙ্গি কেবল শব্দার্থময় নয়, প্রতীক এবং সংকেতধর্মী।

কবি-মনীষীর প্রথম উপন্যাস-সৃষ্টি

'চতুরঙ্গ' লেখা হয়েছিল 'বলাকা'-সমকালীন যুগে। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—"বলাকায় যাহা ছন্দ, ফাল্গুনীতে তাহা সংগীত, চতুরঙ্গে তাহাই কাহিনী।" 'বলাকা'র মননশীলতা, গতি ও মুক্তিকামনা, এবং বিশ্বজনীন অমূর্ত প্রেম-চেতনায় 'চতুরঙ্গ'ও উজ্জীবিত। শচীশের জ্যাঠামশাই জগমোহন তাকে রক্ষা করেছিলেন পৈতৃক ধর্মসংস্কারের অন্ধ নিষ্ঠুরতা থেকে। জগমোহন মানবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, আনুষ্ঠানিক ধর্ম বিচারে তিনি ছিলেন নাস্তিক। শচীশ জ্যাঠামশায়ের আদর্শকে একদিন প্রাণপণে গ্রহণ করেছিল; তার জন্যে মূল্যও দিতে চেয়েছিল জীবনে। অথচ জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে সেই জীবনাদর্শ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো ঝরে পড়ল তার চেতনা থেকে। রসের সাধনায় সে ডুব দিল লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব নিয়ে। ঐ আদর্শের জন্যেও প্রাণ দিতে পারত শচীশ সেদিন। এমন সময় এল বিধবা দামিনী। রস-সাধনার অন্ধ আকুলতার প্রতি তার বিদ্বেষ ও ঘৃণা অপরিসীম ; কিন্তু শচীশের প্রতি তার নারী-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা ছিল উদাত্ত। ধর্মের উন্মাদনায় শচীশ একদিন পালিয়েছিল দামিনীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে; আবার ফিরে এসেছিল তারই নারী-রূপের আকর্ষণে।

শচীশেব অনুবোধে দামিনী এবাব নিজেকে জডিযে দিল লীলানন্দেব বস সাধনায, কিন্তু সে সব লণ্ডভণ্ড হযে গেল নবীনেব স্ত্রীব আত্মহত্যায। একদিন নিভৃত পর্বতগুহায দামিনীব প্রেম মিনতি করুণ বক্ষে পদাঘাত কবে শচীশ নিজেকে মুক্ত কবে আনল সেই আঘাতেব আলোকে দামিনী প্রেমেব যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কাব কবল শ্রীবিলাসেব অন্তবতলে। তাবা বিবাহিত হল দামিনীব অনুবোধে শচীশ এল সমর্পণ কবতে। দামিনী শ্রীবিলাসকে বলেছিল, 'আমাব গুরুকে আমি বাববাব প্রণাম কবি। তিনি আমাব স্বপ্নেব ঘোব ভাঙাইযা দিযাছেন। সুন্দবকে মাবিতে গিযাছিল তাই অসুন্দবটা বুকে লাথি খাইযাছে।' বুকে লাথি খেযে দামিনাব বুকে সুন্দব জেগে উঠেছিল মনেব গহনে, তাই শ্রীবিলাসেব হাতে তাব আত্মসমর্পণ প্রেমেব বেদাতে জীবনেব শেষ অঞ্জলি। এই অনুভূতিকে প্রকাশ কবে শ্রীবিলাস দামিনীব মৃত্যু শেষে বলেছে— আমি গৃহী হইবাব সময পাইলাম না আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না সে মাযা হইল না সে সত্য বহিল সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। আব দামিনীব মধ্যে সুন্দবেব এই প্রকাশ তাব গুরুব —শচীশে সুন্দব চেতনাব পবিণাম। জ্যাঠামশাযেব বস লীলানন্দেব বস দামিনাব আকর্ষণ —সব কিছু জীর্ণ হযে গিযে শচীশেব মধ্যে [illegible] বস সবজন [illegible] প্রেমেব বিশ্বরূপে বিকশিত হতে চেযেছে। শেষ অবধি শচীশ অনুভব কবেছে — একদিন বুদ্ধিব উপব ভব কবিযা দেখিলাম সেখানে জীবনেব ভাব সয না। [illegible] একদিন [illegible] উপব ভব কবিলাম দেখিলাম তলা বলিযা জিনিসই নাই [illegible] আমাব অনুযা [illegible] আমাব পথ দিযাই আনাগোনা কবেন—ওবব পথ ওবব [illegible] ওই যাওযাব পথ [illegible] জ্যাঠামশাই বা লীলানন্দ স্বামী [illegible] কালো গুবগিবিই [illegible] [illegible] আবিষ্কাব কবে [illegible] তিনি [illegible] আসিতেছেন আমবা [illegible] তাঁদেব এই [illegible] দিকে ছুটিতে হয় তিনি মুক্ত তাই তাব [illegible] আমি [illegible] আমাদেব আনন্দ মুক্তিতে [illegible] রূপ ধ্যানী মানব চৈতন্যে [illegible] কবিব মনোলোকে এসে [illegible] হযেছে [illegible] যদি [illegible] হয তাব জীবন [illegible] সুষম [illegible] সম্পূর্ণ

[illegible] চতুবঙ্গ [illegible] বচনা [illegible] সালেব [illegible] থেকে এগাবো মাস [illegible] উপন্যাসটি সবুজপত্র [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible] বচনাকে অনেকটা [illegible] কবেছিলেন কবি [illegible] কল্পনায কবি ধর্মিতা আবো [illegible] চতুবঙ্গ-ব চেযে সুগঠিত কাবণ [illegible] কালে [illegible] জন্মগ্রহণ কবেছে সেই [illegible] লেখকেব ভিতব দিযে হযতো আপন উদ্দেশ্য খুঁজিযে

ঘাবে [illegible] তুলেছে [illegible] লেখকেব চিত্তেব মধ্যে [illegible] কাজ কবছে অর্থাৎ সমকালীন জীবনেব একটি সামাজিক পাবিবাবিক সমস্যা নবনাবীব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাব প্রেক্ষিতে নব রূপাযিত হযেছে অবশ্য, সেই জটিলতা এব সমস্যাব রূপাযণ ও পবিণতিব পথে শিল্পীব তুলিকা মনাযী কবি ভাবুকেব চেতনাব দ্বাবা অনুবঞ্জিত হযেছে।

উপন্যাসটি লেখা হযেছে নিখিলেশ সন্দীপ ও বিমলাব ডাযাবিব আকাবে। চতুবঙ্গ তে শ্রীবিলাসেব জবানিতে বিভিন্ন চবিত্র নিজেদেব কথা বলেছে। এখানে ঔপন্যাসিক চবিত্রগুলিব বক্তব্য প্রকাশিত হযেছে তাদেব নিজ নিজ ডাযাবিব মাধ্যমে। নিখিলেশ মধ্যযুগীয বনেদি

পবিবাবেব সন্তান , পুরুষেরা সেখানে আতসবাজি খেলেছেন পবিবাবেব অর্থ ও লালসা নিযে। নাবীদেব তাবা পত্নীব মর্যাদা দেন নি, কিন্তু স্বামীব অধিকাব নিযে কবেছেন উৎপীডন। নিখিলেশ এই পবিবাবেব ছেলে হলেও উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক রুচিতে দীপ্ত , মানবতাব আদর্শবাদে দৃঢবিশ্বাসী। সেই আদর্শবাদ অনেকটা হযত বাল্যেব অভিজ্ঞতাব প্রতিক্রিযা হিশেবেই বাস্তবতাব সীমা ছাডিযে উন্মার্গ মুখী হযেছিল। বিমলাকে বিযে কবে তাব নৈতিক নিষ্ঠা ছিল অবিচল। কিন্তু স্বামীব অধিকাবকে বৈবাহিক বন্ধনেব দাবিকে, সে কখনও উপস্থিত কবেনি স্ত্রীব কাছে। তাব ফলে, ববং, নিজেব যথার্থ ভূমিকাটিকে বিমলাব মনে সুদৃঢ কবাব কর্তব্য থেকেও বিচ্যুত হযেছে। বিমলাকে সে বলেছিল,—"আমি চাই, আমি কথাও কইব না চুপও কবব না, তুমি একবাব বিশ্বেব মাঝখানে এসে সমস্ত বুঝে নাও। এই ঘবগডা ফাঁকিব মধ্যে কেবল মাত্র ঘব-কবনাটুকু কবে যাবাব জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যেব মধ্যে আমাদেব পবিচয যদি পাকা হয, তবেই আমাদেব ভালোবাসা সার্থক হবে।" কিন্তু সত্যেব পবিচয আবির্ভাব কবতেই নিখিলেশ ভুল কবেছিল জীবনে। 'ভালোবাসা কিছুটা অত্যাচাব কবে, কিছুটা অত্যাচাব চায ও।' প্রসঙ্গান্তবে এ কথা বলেছিলেন স্বযং কবিই। নাবী প্রেমেব পক্ষে এ কথা আবো বেশি সত্য , পুরুষেব জীবনে তাব অন্নপূর্ণাব আসন। কিন্তু নিজেব অধিকাবেব অকুণ্ঠতায সে আসনে প্রতিষ্ঠালাভ কবা তাব পক্ষে অসম্ভব। পুরুষেব প্রেমেব অভিষেকে, তাব দাবি ও আকাঙ্ক্ষাব আলোকে, জীবনেব বেদীতে নাবী-ভূমিকাব প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। বিমলা বাঙালি নাবীব সেই সহজ সুন্দব ভূমিকাব অলোক সামান্যতা প্রত্যক্ষ কবেছিল নিজেব মাযেব মধ্যে তাই বঞ্চিতাব দীর্ঘশ্বাস দিযে তাব কথাবস্তু, মাকেই স্মবণ কবে :—"মাগো, আজ মনে পডে তোমাব সিঁথিব সিঁদুব।" —স্বামীব প্রেমেব দাবিব বক্তিমাভায তাব নিজেব সিঁথিব সিঁদুব তেমন উজ্জ্বল হযে ওঠে নি। এমন সমযে, অন্নপূর্ণাব বিক্ততাব মুহূর্তে, এল সন্দীপ। প্রথম থেকেই নাবীব বক্ত মাংসেব দেহ মনেব প্রতি তাব ইমোশন্যাল আকাঙক্ষা ও দাবি সীমাহীন- অকুণ্ঠ। কিন্তু সন্দীপ সুকৌশলী, এক মুহূর্তেই চিবাচবিত জীবন সংস্কাবেব কেন্দ্রভূমিতে আঘাত কবে না সে। নাবীব কাছে পুরুষেব প্রথম দাবি সে উপস্থিত কবে স্বদেশ-মাতৃকাব নামে। বিমলাব মধ্যে 'অন্নপূর্ণা নাবী' হতাশায ব্যর্থ হযে বসেছিল তাব সব দেবাব প্রবল আহ্বান কোনোদিন আসে নি কোনো বলিষ্ঠ পুরুষেব অন্তব ভূমি থেকে। ফলে, এই প্রথম আহ্বান তাকে পাগল কবে দিলে, সন্দীপেব কৃত্রিমতাকে আবিষ্কাব কববাব সাধ্য ছিল না তাব। অন্যদিকে দেশকে সে চেনে না, কিন্তু নাবী চিত্তেব ভাবালু অন্ধতা ছিল দেশপ্রীতিব অনুভবকে কেন্দ্র কবে। একে সন্দীপেব আহ্বানে ছিল দ্বিধাহীন কামনাব অমোঘতা , তাব সঙ্গে স্বদেশ-সেবাব প্রসঙ্গ যুক্ত হযে, বিমলাব নাবীত্বেব দ্বাবে এ যেন এল রুদ্রেব আহ্বান। সে পথে নামল , সমাজ, সংস্কাব,—সর্বশেষে নিজেব হৃদযকেও ভাঙতে লাগল। নিখিলেশেব পক্ষ থেকে চবম মুহূর্তেও প্রতিবোধ এল না,—এল না স্ত্রীকে বক্ষা কববাব পৌরুষ-প্রবৃত্তি। অথচ সে সবই দেখছিল, বুঝছিলও সবই , এবং সেই বেশি বোঝা-জানাব যন্ত্রণা বহন কবছিল প্রাণে-প্রাণে। অবশেষে স্বদেশেব নামে সন্দীপেব জন্যে টাকা চুবি কবতে গিযে, এবং চুবি কবে দুঃসহ দুর্ঘটনাব মধ্য দিযে বিমলা আত্মস্থ হবাব সুযোগ পেল , অনুভব কবল, স্বামীব প্রেমেব ঘবে,—নিজেব হৃদযেব ঘবেও সে চুবি হতে দিযেছিল। দুর্যোগেব মধ্য দিযে নিখিলেশেবও আদর্শবাদী মনে বাস্তবেব স্বরূপ ধবা পডল। কিন্তু সকল ভুলেব যেখানে অবসান, সেখানে মিলল কি দুজনে ঠিক ।

বস্তু-জীবন ও আদর্শ কল্পনা

জীবন-সমস্যাব এই সাংকেতিক জিজ্ঞাসাব মুখে উপন্যাসেব সমাপ্তি। 'ঘবেবাইবে'ব গঠন

ও শৈল্পিক অখণ্ডতা প্রশ্নাতীত ; 'চতুরঙ্গ'র গঠন বৈচিত্র্য এখানে সংশয়াতীত সংহতি পেয়েছে। তবু এই উপন্যাস নিয়ে একদা প্রবল তর্কের ঝড় উঠেছিল; কারণ সন্দীপ চরিত্রে অনেকে দেখেছিলেন সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃ-রূপায়ণ। অভিসন্ধি, ইমোশন, উচ্ছ্বাস এবং লোলুপতা সন্দীপকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে জীবনের যে পথে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামীর মূর্তি বলে স্বীকার করলে ইতিহাসের দরবারে অপরাধী হতে হবে। সেকালের জীবন-ইতিহাসে বস্তুত সন্দীপ থাকতেও পারে, না-ও থেকে থাকতে পারে ; 'ঘরেবাইরে'-র পক্ষে সে প্রসঙ্গ অপরিহার্য নয়। আসল কথা, কবি লক্ষ করছিলেন,—স্বদেশ-প্রেমের নামে সংকীর্ণ জাতীয়তার উন্মাদনা প্রেমকে খণ্ডিত, হৃদয়কে বিমূঢ় করে তুলতে চাইছিল; রাজনৈতিক ধর্ম, তথা ব্যক্তিক ধর্মের নামে বিশ্ব-প্রেমের ধর্মকে অস্বীকার করার বিভীষিকাময় সম্ভাবনা সন্দীপের মধ্যে ধরা পড়েছে; আর সেই বিশ্বজনীন প্রেমেরই সাধক-রূপ প্রত্যক্ষ করি নিখিলেশের আদর্শে। তার সঙ্গে বিমলার তপস্যার আকাঙ্ক্ষা যেদিন যুক্ত হল, সেই দিনই 'ঘরেবাইরে'র দ্বন্দ্বাবসান।

'ঘরেবাইরে'র শিল্প-স্বরূপ

'ঘরেবাইরে'র পরের উপন্যাস 'যোগাযোগ' রচিত হয় প্রায় বারো বছর পরে ; ১৩৩৪ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শুরু হয় এর প্রথম প্রকাশ। 'ঘরেবাইরে' রচিত হয়েছিল 'বলাকা'-উত্তর যুগে ; 'পলাতকা' লেখার সূচনা হয় নি তখনো। আর 'যোগাযোগ' রচনার সমকালে শুরু হয়েছে 'মহুয়া'র কবিতা লেখা। যেমন 'ঘরেবাইরে'-তে, তেমনি 'যোগাযোগ'-এও নরনারীর জীবন-সমস্যার সমকালীন স্বাতন্ত্র্য-জটিল পরিচয় সন্ধান করে ফিরেছে শিল্পি-মনীষীর সন্ধিৎসু মন। মধুসূদন ঘোষাল অর্থ-প্রমত্ত, একপুরুষে ধনী। ধন-সঞ্চয়ও প্রাণের জন্যেই; সে কথা অনুভব করবারও আগে ধনের অন্ধ সাধনায় সে প্রমত্ত হয়েছিল। তাই ধনের অঙ্ক যতই গগনচুম্বী হতে লাগল, মনে রসের গভীর উৎস ও অনুভব তত তিলে তিলে গেল শুকিয়ে ; ধনের তলায় মানব প্রাণ হয়ে এল মুমূর্ষু! এমন সময় কুমুদিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হল,—বিগতযৌবনে। কুমুদিনী বিপ্রদাসের বোন এবং শিষ্যা। এদের পরিবারে লক্ষ্মীর আসন অবিচল ছিল দীর্ঘদিন,—লক্ষ্মী ছিলেন বরদাত্রী; তাঁর দানের কল্যাণ-আলোকে এদের পারিবারিক প্রাণশক্তি হয়েছিল নির্বাধ। বিপ্রদাসের যুগে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল; কিন্তু যুগ-যুগব্যাপী প্রাণের উজ্জ্বলতা সেই ক্ষতির সঙ্গে তাল রেখেই যেন হয়ে উঠেছিল আরো প্রদীপ্ত। কুমুর সঙ্গে প্রথম থেকেই মধুসূদনের সংঘাত বাধল; প্রাণের সঙ্গে ধনের! কুমুর সংস্পর্শে মধুসূদনের মধ্যে পৌরুষের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে : সে দিতে চায়, পেতেও চায়। কিন্তু তার জানা নেই,—পেতে হলে দিতেও জানতে হয়। আর বারে বারেই তার দানের চেষ্টা রূঢ় ব্যর্থতার মধ্যে বিবর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ দাতা মধুসূদন প্রাণের ভাষা জানে না ; বোবা, মরা ধনের সাধনাই তো সে করেছে কেবল ! চরম সংঘাতের মধ্যে কুমু দাদার কাছে ফিরে এসেছিল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেছিল, স্বামীর ঘরে যাবে না আর। তবু যেতে হল ভাগ্যের যোগাযোগ-এ। দিনকয় পরেই তার জানতে বাকি ছিল না,—মধুসূদনের ছেলেও তখন তার মাতৃ-গর্ভে।

'যোগাযোগ'

সেই ছেলের,—অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনে গল্পের সূত্রপাত হয়েছিল।—'বিচিত্রা'-য় তাই এ-উপন্যাসের প্রথম নাম ছিল 'তিনপুরুষ'। মধুসূদন, তার পিতা আনন্দ ঘোষাল ও পুত্র অবিনাশ মিলিয়ে তিন পুরুষের গল্পই ফেঁদেছিলেন কবি মনে মনে। কিন্তু সমকালীন জীবন-চিন্তার প্রভাবে গল্প মোড় ফিরেছে,—নামও তাই আপনা থেকে গেছে পাল্‌টে।

'শেষের কবিতা' রচিত হয়েছিল ১৩৩৫ বাংলা সালের শেষভাগে,—'যোগাযোগ'-এর পরের রচনা এটি। শিল্প-কর্ম হিশেবে 'শেষের কবিতা' নিখুঁত রচনা ; আর রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় সুন্দরতম সৃজনরূপ। এর কারণ, উপন্যাসের আঙ্গিক-নিরপেক্ষভাবে 'শেষের কবিতা' একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর কবিতা-রূপ; অথচ গল্পের প্রচ্ছদে, জীবন-চিন্তার অখণ্ডতায়, এবং চরিত্র-চিত্রণের নির্বন্ধন গতিশীলতায় উপন্যাসের স্বাদও অভঙ্গ হয়ে আছে গোটা গ্রন্থে। 'মহুয়া'-র প্রায় সমকালীন রচনা 'শেষের কবিতা'; 'মহুয়া'র ঋতু মনে নেমেছে পুরোপুরি। তাই প্রেমের সাধন-দীপ্ত সত্যস্বরূপ 'শেষের কবিতা'-তেও নূতন আকার পেয়েছে।

'শেষের কবিতা'

বিশেষত প্রেম-সত্যের দেহ-বন্ধন-মুক্ত, রূপহীন দ্যুতি সম্বন্ধে কবির সমকালীন নিঃসংশয় প্রত্যয় অখণ্ড কাব্য রূপ পেয়েছে মিতা ও বন্যার যৌথ-জীবনে। 'মিতা' ও 'বন্যা' নাম দুটির মধ্যেও নর-নারীর প্রেমানুভবের ব্যঞ্জনা-সংকেত রয়েছে বলে মনে করি। লাবণ্যের নারী-চেতনার অতলে অমিত কেবল 'মিতা',—বস্তুক সম্পর্কের দাবি সে অনুভবের পক্ষে কেবল অবান্তর নয়, অস[illegible]-ও। মিতার কাছে লাবণ্য কেবল 'বন্যা' ; প্রাণের গভীরে প্রেমের পাত্রকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে তোলে সে,—কিন্তু সেই পূর্ণতার মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকে না, দেয় না ধরা। তাই কেতকীকে জীবনের যে ভূমিকায় গ্রহণ করে অমিত, লাবণ্যের ভূমিকার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই ; একটির দ্বারা অপরটি খণ্ডিত বা বঞ্চিত হয় না ; কোনোটিতেই লাগে না অসত্যের বিন্দুমাত্র স্পর্শ। অন্যদিকে শোভনলালের সঙ্গে বিবাহিত হয়েও লাবণ্য অমিতকে লিখতে পারে,—"তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান।"

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা 'Platonic love'-এর তত্ত্ব আলোচনা করে থাকেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পক্ষে বড় কথা,—নিজের বা পরের প্রতিপাদ্য কোনো তত্ত্ব-কথাই তাঁর রচনায় প্রধান হতে পারে নি কখনো। কবির জীবন-সম্ভব প্রত্যয়ের অখণ্ডতা 'শেষের কবিতা'য় বিমল সম্পূর্ণতা পেয়েছে। তাই 'শেষের কবিতা' সফল কথাসাহিত্য নয় কেবল,—সফলতর জীবন-কবিতাও।

(খ) ছোটগল্প

এই পর্যায়ের ছোটগল্পের মৌল স্বভাব রূপ পেয়েছে 'গল্পসপ্তক' নামক সংকলনে। রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের নানা সংস্করণে গল্প-সূচীর অদলবদল করেছেন বারে বারে। সেই পরিবর্তন বর্তমান প্রসঙ্গে অবশ্য-আলোচ্য নয়। কবি-মানসের সমকালীন ঋতু-পরিচয়ের সন্ধান 'গল্পসপ্তক' এই পাওয়া যাবে। 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি' ও 'অপরিচিতা',—এই কয়টি গল্প নিয়ে 'গল্প সপ্তক'। সব কয়টি গল্পই ১৩২১ বাংলা সালে লেখা ; কালের দিক থেকে সেটা 'গীতালি'-উত্তর 'বলাকা'র ঋতু। গল্পের মননে

ছোটগল্পে পরিণতির ধর্ম

প্রেম ও জীবন-চেতনার অনন্ত ব্যাপ্তির ব্যঞ্জনা দুর্লভ নয় প্রায়ই,—বিশেষ করে 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', ইত্যাদিতে। বিশেষ বলেই এদের পৃথক উল্লেখ করা গেল—সব গল্পেই চেতনার সাধারণ সার্ধম্য আছে। অন্যদিকে শরীরে যেন রয়েছে 'পলাতকা'র গল্প-বলার আঙ্গিক। প্রেমের মুক্তি-কামনায় পরিচিত সমাজ-সম্পর্কের বন্ধন-মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নারী-চিত্তের আবর্তময়তার মধ্যে নবীন জীবনার্তির সৃষ্টি করেছে। 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র',—ইত্যাদি গল্পে এই ভাবনার বিশেষিত প্রকাশ। আবো

গোটাসাতেক গল্প রচিত হতে দেখি ১৩২৪ থেকে ১৩২৬ সালের মধ্যে; নবতর প্রত্যয় বা রূপ-চেতনার পরিচয় তাতে সুদৃঢ় নয়।

৪। পরিণতি যুগের গদ্য রচনা

আলোচ্য পর্যায়ে গ্রন্থিত প্রথম দুটি পুস্তক 'সঞ্চয়' এবং 'পরিচয়' ১৩২৩ বাংলা সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও এদের ভেতরকার প্রবন্ধগুলি আসলে পূর্বঋতুর ফসল ; এদের অধিকাংশের মূল রচনাকাল ১৩১৮-১৯ বাংলা সাল। 'গীতাঞ্জলি' উত্তর সে যুগে কবির মন সত্য-উপলব্ধির দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মস্থ। ফলে, ধর্ম ও মানব-জীবন-মূল সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বোধ ও ব্যাখ্যা এই সময়ে নিঃসংশয়ে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। 'নৈবেদ্য'-যুগে ভারতীয় ঔপনিষদিক ধর্ম-চেতনারই অনুবর্তন করেছিলেন; এবারে তাকে কবি মিলিয়ে নিলেন আত্মার স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা ও উপলব্ধির অনুসারে। এই ধর্মবোধের আলোকে সমকালীন সমাজের নানা আন্দোলন ও আদর্শের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। ফলে, প্রবন্ধগুলি কেবল ধর্ম-বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, সমাজ-সমস্যার নানাদিককেও উন্মোচিত করেছে। এইসব প্রবন্ধগুলিতে দার্শনিক-মনীষীর মননের সঙ্গে ধ্যানী কবির উপলব্ধি যুক্ত হয়ে স্বাদ এবং রূপের অনন্যতা সৃষ্টি করেছে।

'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়'

তাছাড়া পুরোনো ভাবনার প্রতিফলন সহ নতুন গ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'ছিন্নপত্র' (১৩১৯)। 'সোনার তরী'-'চিত্রা' যুগে হঠাৎ পল্লীজীবন-অভিজ্ঞতার বিস্ময় ভরে কিশোরী ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে চিঠি লিখেছিলেন একের পর এক। তারই কবি-সম্পাদিত সঙ্কলন 'ছিন্নপত্র'—ঐ সময়কার কবিকৃতি ও কবিভাবনার ঐতিহাসিক সম্পদে সমৃদ্ধ।

এছাড়া, এই সময়ে যাত্রা-পথের দুটি দিনলিপি ও দুটি পত্র-সমষ্টি প্রকাশিত হয়েছিল, 'জাপানযাত্রী' (১৩২৬), 'বতায়নিকের পত্র' (১৩২৬) এবং 'যাত্রী' (১৩২৬) ; আর প্রকাশিত হয়েছিল 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৩৩৬)। এইসব লেখার মধ্যে একদিকে পাওয়া যায় কবির সমকালীন জীবন-যাত্রা ও রচনা-প্রবাহের খুঁটিনাটি পরিচয়। ইতিহাসের দিক থেকে এরা অমূল্য। তাছাড়া এইসব লেখায় ব্যক্তি-কবি প্রায়ই ধরা পড়েছেন নিজের গোপন স্বভাবধর্ম নিয়ে। রবীন্দ্র-পাঠকের পক্ষে এইটুকু সবচেয়ে বড় লাভ। কারণ, নিজের বিপুল সৃষ্টির মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে আড়াল করার দিকেই কবির ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর শিল্প-রচনাবলির মধ্যে পাই কবিকে ; আর এইসব গদ্য রচনায় দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে।

দিনলিপি ও পত্রাবলি

এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা 'লিপিকা' (১৩২৯)। সমগ্র রবীন্দ্র-সৃষ্টির ইতিহাসে এই গদ্যকাব্য তুলনা-রহিত। কবি নিজে একে তাঁর গদ্য-কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন ; বলেছেন, গদ্য কবিতার সাজ এর নেই। "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতে খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" লক্ষ করলে দেখব,— "লিপিকা'র অনেক রচনাতেই চেষ্টা করলেও গদ্য-কবিতার রূপ পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। সেখানেই বরং তাদের স্বাদের অভিনবতা। গদ্যের দেহে কবিতায় এমন প্রাণ-উজাড়-করা আত্মদান অভিনব কেবল নয়,—অবিশ্বাস্য! রবীন্দ্র-রচনাতেও ঐ একবারই তা সম্ভব হয়েছিল, তারপরে আর হয় নি। 'লিপিকা', গদ্য, না গদ্য কবিতা, এ-সংশয় জাগে

'লিপিকা'

কেবল একটি কারণে,—রূপের বিচার তার শিল্প-প্রাণের পক্ষে অবান্তর হয়ে গেছে। অরূপের আনন্দলীলার অনির্বাচ্যতা যার মর্মগত, রূপের প্রসঙ্গে তাকে চিহ্নিত করা গেল না,—'লিপিকা'র স্বাদুতার বৈশিষ্ট্য এখানেই। প্রথম সৃষ্টির সময়ে এই রচনাগুলিকে কবি 'কথিকা' নাম দিয়েছিলেন। কিছু কথা বা 'গল্প-কণা', কিছু আবেগ, কিছু অনুভব ও উপলব্ধি ; আর সব কিছুতেই কথার মাধ্যমে নিরঙ্গ সৌন্দর্যের বাসনাহীন তৃষ্ণার উজ্জ্বলতাকে ধরে তোলার ধ্যানী-লীলা,—এই সবেতেই 'লিপিকা'র পূর্ণ পরিচয়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়
রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতা-র যুগ

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে পরিণতি-যুগের পরে এসেছে পূর্ণতা। মানুষের জগতে,—জীব-জগতেও দেখি, প্রথমে চলে একটানা বিবর্তন ও পরিণতি। তারপরে, পরিণতি যখন একবার শেষ হয়, অর্থাৎ দেহ-মনের আরো পরিণত হবার সম্ভাবনা যখন হয় নিঃশেষিত, তখনই—তৎক্ষণে শুরু হয় বিনষ্টির ধারা। কিন্তু রবীন্দ্র-কবিচেতনায় বিনষ্টির অবসাদ বা ক্লান্তি কোথাও একান্ত হয়ে পৌঁছয়নি। দেহে রোগ-জরা-মৃত্যুর পরোয়ানা এসেছে ক্রমে ক্রমে, কিন্তু কবির মনকেও যদি-বা তা কখনো কখনো স্পর্শ করে থাকে, তাঁর কবি-আত্মা ছিল সকল জৈব স্পর্শের অতীত। জীবজগতে বিচরণ করেও কবি সেই আত্মার সত্যকে,—জীবন-ধর্মের মূলগত অজরামর সত্যকেই খুঁজে ফিরেছেন,—আবিষ্কার করেছেন 'সোনার তরী'-'চিত্রা', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' এবং 'বলাকা'-'পূরবী'-'মহুয়া'-ঋতুর ধাপে ধাপে। এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে একবার যখন সেই অক্ষয় সত্য-ধর্মে তাঁব প্রত্যয় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন থেকে আরো নূতন পরিণতির সম্ভাবনাও ছিল না,—প্রয়োজনও লুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু, সেই সত্য-বোধের আলোক-লোক থেকে কবি আর বিচ্যুত-ও হন নি। একে কোনো লোকোত্তর প্রত্যয় বা শক্তি বলে মনে করবার কারণ নেই। মানুষের আদি-অন্তহীন জীবন-ধারাকে ইতিহাসের অখণ্ডতায়, বিজ্ঞানের তথ্য-দৃষ্টিতে, দর্শনের যুক্তি-চিন্তায় প্রতিফলিত করে, সম্পূর্ণ করে দেখবার ধী-লোকে সুস্থিত হয়েছিল কবির মগ্ন-চৈতন্য। অনুভব, বিচার, মনন, সবকিছুর সংহতি সাধিত হয়েছিল গভীর উপলব্ধিতে। তাই, বিশ্ব-জীবনের চিরকালীন স্বভাবকে কেবল আবেগ দিয়ে নয়, জ্ঞান দিয়ে, ধ্যান দিয়ে সুনিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তিনি। ফলে, আরো জানবার, আরো পাবার প্রেরণা যেমন লুপ্ত হয়েছিল,—তেমনি সত্যের ধ্রুবত্বে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকার সাধনাও চলছিল মনে মনে। সমকালীন ইতিহাসের বিচিত্র প্রেক্ষাপটে সেই অক্ষয়, ধ্রুব সত্য-বোধকেই নিত্য-নূতনরূপ দিয়েছেন কবি। এই পর্যায়ের রচনাবলির ধ্যান এবং বিশ্বাস মূলত অবিচল, অনন্য; তাদের যা-কিছু অভিনবতা, সে কেবল জীবন-প্রেক্ষিতের বিচিত্র নবীনতায়।

রবীন্দ্র-প্রতিভায় পূর্ণতাব স্বরূপ

১। পূর্ণতাধর্মী কাব্য-কবিতা

এই পূর্ণতাবোধের ধ্রুবতপস্যার শুরু 'বনবাণী'তে (১৩৩৮ বাংলা)। নিজের আশ্রম-গৃহের চার পাশে যে সব "বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক" কবির মনে পৌঁচেছে। সেই ডাকের মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন বিশ্বের আদিমতম সত্য-জিজ্ঞাসার আকুলতাকে; সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর নিভৃত আত্মার জীবন-জিজ্ঞাসুতা অন্বিত হয়েছে ;—"আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ — প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে

কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে?....সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নব-নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?" নিজের প্রাণের গভীরে প্রথম প্রাণ-প্রৈতির সুনিশ্চিত বিশুদ্ধ অনুভব নিয়ে কবিচেতনা এখান থেকেই পূর্ণতার মুক্তিদিশারি পথে পদক্ষেপ করেছে। প্রকৃতির মূলে মহাপ্রাণের অতলতা এবং অনন্ত ব্যাপ্তিকে কবি নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করেছিলেন। সেই সঙ্গে উদ্ভিদ-প্রাণের প্রকৃতি সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কবির উপলব্ধির সূত্রে যুক্ত হয়ে প্রত্যয়কে প্রমাণিত করে দেখার আনন্দ-সাধনায় লিপ্ত হয়েছে।

'বনবাণী'

'বনবাণী'র পরে 'পরিশেষ' (১৩৩৯) থেকে নতুন ঋতু না হলেও, নতুন স্বাদ ও রূপের কবিতা দেখা িতে আরম্ভ করেছে। 'বনবাণী' আসলে 'মহুয়া'-ঋতুরই অগ্রসৃতি ; 'মহুয়া'র তপঃপূত রুদ্র-প্রেমানুভূতি বিশ্বের গহন অতল থেকে নতুন বাণী নতুন বিশ্বাস-প্রেরণা নিয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এবারে, 'পরিশেষ' রচনার কাল থেকে কবি-চিত্ত পৃথিবীর গহন-গোপনে নয়, আত্মার নিভৃত মর্মলোকেও নয়,—সমকালীন পৃথিবীর ওপরতলায় তার অজস্র-জটিল সমস্যার পাকে পাকে নিজের সত্যোপলব্ধিকে জড়িয়ে নবীন কবিতার ধারাকে উৎসারিত করেছে। একদিক থেকে এই পর্যায়ের রচনাবলিতে কবির বস্তু-সচেতনতা এবং সমকালিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততাবোধ ছিল অতুল্য—অসাধারণ। 'পরিশেষ'-এর অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়েছিল ১৩৩৯ বাংলা সালে ; কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ঐ একই বছরে। খ্রিস্টাব্দের হিশেবে সে ছিল ১৯৩২। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কবি তখনকার সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। সেকালের পৃথিবীর পক্ষে বিপ্লবী রুশ-রাষ্ট্রের নবজন্ম ছিল এক অপার বিস্ময়। মহামৃত্যুর অমারাত্রি পেবিয়ে নূতন জীবনাদর্শ-বোধের অরুণালোক তখন নতুন আশা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করছিল সবে। ইতিহাসের সেই আদর্শ-স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ঘটে ওঠেনি তখনো। সেই সময়ে রাশিয়ার সাম্যের আদর্শ,—সর্বমানবের কল্যাণের আগ্রহে গুটিকয় উচ্চ-শীর্ষ মানুষের অতি-উন্নতি নিরোধের আগ্রহ কবির চিত্তকে দোলায়িত করে তুলেছিল। কবির পক্ষে সেই অকল্পিত-পূর্ব অনুভবেব বিস্ময়-দোলা ঐতিহাসিক রূপ পেয়েছে 'রাশিয়ার চিঠি'তে (১৩৩৮ সাল)। সমকালীন শিল্প-সৃষ্টিতেও এই বিস্ময় ভাবনার ছাপ পড়েছে। ফলে, অনেকে মনে করেছেন, রুশ-বিপ্লবের প্রভাবই আজন্ম কল্প লোক-বাসী কবিকে বস্তু-জীবনের অভিমুখী করেছিল। এই উপলক্ষে, এমন কি, কবি-কর্মের ওপরে রাজনৈতিক মতবাদের দম্ভ-স্ফীতি স্রষ্টাব ধ্যানকে পর্যন্ত আপন কুক্ষিভুক্ত করার অসঙ্গত প্রয়াস করেছে। অথচ রুশদেশ কিন্তু সেদিনো কবিকে প্রত্যক্ষ করেছে, "avoiding all political struggle, absorbed in his deep meditation."

'বনবাণী'-উত্তব সৃষ্টিব নবীনতা

মূল কথা, আদি-অন্তে সম্পূর্ণ বিস্তারিত কবিচেতনার বিকাশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি বিশেষ পর্যায়কে অতি মূল্যায়িত করে দেখতে গেলে বিভ্রান্তি এবং অনৃত-কথন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে, এ-পর্যন্ত আলোচিত ইতিহাসের ধারা লক্ষ করলে দেখব,—রবীন্দ্র-কবিচেতনা কখনোই বস্তুজীবন-বিমুখ ছিল না। নিজের দেশ-কালের দ্বারা বিশেষিত জীবন-স্রোতের তীরভূমিতে বসে অনন্ত দেশ-কালের,—চিরন্তন সত্য-জীবনের ধ্যান করেছেন কবি। ফলে, তাঁর সকল রচনাই সমসাময়িক জীবনের বৃন্তে শাশ্বত সর্বজনীন জীবন-ধর্মের কোরক-রূপকে ধারণ করে রেখেছে।

'বনবাণী'-উত্তর সৃষ্টির জীবন-ভূমি

এদিক থেকে রবীন্দ্র-রচনার সকল পর্যায়েই বস্তু-স্পর্শ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িয়ে—ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য-কালে,—কবি-জীবনের শেষ দশ বছরের সৃষ্টির মধ্যে বস্তু-চিন্তা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতা পেয়েছে, তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে কবির তদানীন্তন সোভিয়েত রাষ্ট্র সন্দর্শনের প্রভাব কতটা, কে জানে। কিন্তু ঘটনাকেই সকল মূল্যের শ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে গেলে একদেশদর্শিতার দোষ ঘটবেই ঘটবে। আসলে পৃথিবীতে জীবন-ধারণের জৈব প্রয়োজন নির্বাহের সমস্যা সর্বাপেক্ষা জটিল হতে আরম্ভ করে সে-যুগ থেকেই সর্বপ্রথম। ১৯১৪-১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পীড়ন পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবন-মানের ওপর সর্বপ্রথম রূঢ়তম আঘাত হানে। তারপর ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পৃথিবী-ব্যাপী অর্থনৈতিক ভারসমতার প্রায় সার্বিক অবক্ষয় করাল রূপ ধরে সারা ভাবতে ; বাংলাদেশেও ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের মূলভূমিতে তা ভাঙন সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। অথচ উনিশ শতকীয় বাঙালি-রেনেসাঁসের জন্ম, বিকাশ ও সম্পূর্ণতার একটিমাত্র ভিত্তি ঐ মধ্যবিত্ত সমাজ। পৃথিবীব্যাপী এই সর্বময় বিনষ্টির অংশীদারিত্বেই সেকালের ভারতের বাস্তব জীবন-জটিলতার শেষ হয় নি। নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ভারতের পরাধীনতার যন্ত্রণা ও স্বাধীনতা লাভের সর্বস্বপণ সংগ্রামের মধ্যে। ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টসাল নেহরু কংগ্রেসের যুগ,—ভারতের নবজাগরণ ও ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রজাপীড়নের ইতিহাসে এক নবতর অধ্যায় সূচিত করেছিল। সারা পৃথিবীতে, তথা ভারতের ইতিহাসে, বস্তু-সচেতন জীবন-জটিলতার সেই অতুল্য বিক্ষেপ কবি-মনকে নূতন মতে ও পথে আলোড়িত করে তুলেছিল। তাঁর চিরপুরাতন,—চিরন্তন জীবন-প্রত্যয় সেই অপূর্ব আলোড়নের পথ বেয়ে নবীন স্বাদের, নতুন গন্ধের ফল-ফুল সৃষ্টি করেছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

'পরিশেষ' আসলে ঋতু-সন্ধির কাব্য, নবীন প্রকৃতির কবিতা রচনার সৃজন-লোকের প্রবেশ-দ্বার। তাই এই কাব্যের কবিতাগুচ্ছে ভাব ও রূপের বিচিত্রতা রয়েছে। কিছু-সংখ্যক কবিতায় আছে আত্মসন্ধান ও আত্ম-মূল্যায়ণের প্রয়াস। বৃহৎ বিশ্বের প্রেক্ষিতে নিজের সৃষ্টির চিরন্তন মূল্য সন্ধান করে ফিরেছেন কবি তাঁর রচনা-প্রবাহের ধাপে ধাপে। পূর্ণতা পর্বের একটি সাধারণ লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে বিশ্বধ্যানী কবির এই আত্ম-সন্ধিৎসা। পৃথিবী থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে নিজের পূর্ণ পরিচয়টুকু যাচিয়ে দেখে নেবার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এই চেষ্টার মূলে। সেই সঙ্গে বিশ্ব-বিবর্তনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান ও বিশ্ব সত্তার নির্বিশেষ সম্পর্কে কবির ধ্যানময় উপলব্ধি নিজের সম্বন্ধেও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের প্রয়াসী হয়েছে এই পর্যায়ে। এই ধ্যান-সমৃদ্ধ প্রজ্ঞা নিয়ে আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করলেন কবি :—

নিখিলের অনুভূতি
সংগীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতি পথ-প্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্য ক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।"

'পরিশেষ'

'পরিশেষ'-এর কিছু সংখ্যক কবিতা প্রিয়জনের বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত। কিন্তু ঐ সব ক্ষেত্রেও 'পরিশেষ'-ঋতুর নৈর্ব্যক্তিক ধ্যান ও উপলব্ধির ছাপ প্রায়ই অস্পষ্ট নয়। আর এক শ্রেণীর কবিতায় সমকালীন ভারতীয় জীবন-ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গ-ক্ষেপ কবি-মনের দৃঢ় বিশ্বাসে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এদের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে 'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' এবং 'প্রশ্ন' কবিতা দুটি। প্রথমটির ভাব-বিষয় কবিতার নামেই প্রকাশিত;

দ্বিতীয় কবিতাটি লিখিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পরে গান্ধীজির অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারের পর। বাস্তব সংঘাতের বিক্ষেপে উদ্দীপিত কবিতাবলিতেও বস্তু-স্বরূপদর্শী কবির অবিচল প্রত্যয় এই কবিতাগুলিতেও অসংশয়িত ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

'পরিশেষ'-এর পরে 'পুনশ্চ'—একই বছরে প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ। 'পুনশ্চ'তেই গদ্য কবিতা রচনার প্রথম সুচিহ্নিত প্রয়াস। তার আগে, আগে দেখেছি, 'লিপিকা'য় গদ্যকবিতা রচনার প্রথম চেষ্টা চলেছিল বলে কবি জানিয়েছিলেন, যদিও কবিতার রূপসজ্জা তাতে অনুপস্থিত। আসলে গদ্য কবিতার ভাব-রূপের পূর্ণতা সাধিত হয় 'পুনশ্চ'তে। গদ্য কবিতার দেহ-মনের ধর্ম ব্যাখ্যা করে 'পুনশ্চ'র ভূমিকাতে কবি বলেছিলেন,—"গদ্য কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য কাব্যে ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।" গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে 'পুনশ্চ'-র সকল কবিতাতেই 'গদ্য রীতির' এই 'অসংকুচিত' গতি অবারিত হয়েছে। 'পুনশ্চ'র অনেক কয়টি কবিতাই কথিকাধর্মী। তাতে সাধারণ বস্তুময় জীবনের প্রতি কবির সুগভীর মমতার পরিচয় জড়িয়ে আছে,—'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে' ইত্যাদি কবিতা তার নিদর্শন। তাছাড়া, নিরবধি কালের দরবারে নিজের সাধনার নৈর্ব্যক্তিক মূল্য সন্ধানের যুগ-প্রবণতাও রয়েছে কিছু সংখ্যক কবিতায়। 'নূতন কাল'কে ডেকে কবি বলেছেন,—

গদ্যকবিতাগুচ্ছ ও 'পুনশ্চ'

"আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে ;
তাকে রেখে দিয়ে গেলাম পথের ধারে পান্থশালায়
পথিকবন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।
. যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটলো তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগলো তোমাদেরও মনে।"

'বিচিত্রিতা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪০ বাংলা সালে ; এটি কবিতা ও ছবির সমন্বয়। এর আগে দেশে-বিদেশে কবির চিত্র-প্রদর্শনী প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল; কিছু সংখ্যক চিত্রকে উপলক্ষ করে এবার কবির কল্পনা মুক্ত-পক্ষ হয়েছে 'বিচিত্রিতা'য়। ৩১টি কবিতা ও ৩১টি ছবির সমন্বয় ঘটেছে এতে। কবিতাগুলি এবারে এসেছে পদ্যের সাজ পরে। কাব্যটি শিল্পগুরু নন্দলাল বসুকে উৎসর্গিত।

'বিচিত্রিতা'

'বিচিত্রিতা'র পরের গ্রন্থিত কাব্য 'শেষসপ্তক' (১৩৪২ সাল) ; ভাব ও রূপের দিক থেকে এটি 'পুনশ্চ'র অনুবৃত্তি; সেই ধারার পরিণতি-ও। 'শেষসপ্তক', আসলে, 'শেষ-রাগিণীর গান'; —কবি অন্তত তাই মনে করেছিলেন। তাঁর ৭৪ বছরের জন্মদিনে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে আর হয়ত লেখা হবে না,—কথার উৎসের সঙ্গে নিশ্বাসটুকুও হয়ত স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই একদিকে সকরুণ মমতাবোধ নিয়ে অতীতের জীবন-লোকে চলে স্মৃতি-চারণ। আর একদিকে সমাগতপ্রায় মৃত্যু সম্ভাবনা সত্ত্বেও মোহমুক্ত মনে নিজের সত্য মূল্য সন্ধানের করুণাঘন নৈর্ব্যক্তিক প্রয়াস কবিতাগুলির দেহে এবং প্রাণে সৃষ্টি করেছে ধূসর গৈরিক এক অপরূপ উৎকণ্ঠা :—

"যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা
শুনব সব সুর
চলন্ত দিন-রাত্রির কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে,
যেখানে নিমেষের অন্তরালে।
সহস্র বৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।"

'শেষ-সপ্তক' প্রকাশিত হয়েছিল পঁচিশে বৈশাখে ; আর 'বীথিকা' প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের ভাদ্রমাসে। এতে আগের দুবছরের প্রায় ছাপান্নটি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে,—ঐ গুলিতে 'মহুয়া', 'পরিশোধ', 'বিচিত্রিতা'র সুর জড়িয়ে আছে। ২২টি কবিতা লেখা হয় ১৩৪২-এর আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—ঐ বাইশটি আসলে "বীথিকা কাব্যের খাস দরবারের মধ্যে পড়ে।" 'বীথিকা'র কবিতা লঘু, মুক্ত পদাছন্দে লেখা। ভাব-চেতনা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতনকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে,—তাতে আছে অতীত জীবন ও অনাগত সম্ভাবনায অপাব বিস্তৃত আত্ম-সত্যকে খুঁজে দেখাব প্রয়াস , সেই সঙ্গে জীবনের সত্য প্রেক্ষিতের স্বরূপ-চেতনাও অনাবৃত হয়েছে।

'বীথিকা'

'বীথিকা'র পরে 'পত্রপুট' (১৩৪৩) ; তারপরে 'শ্যামলী'ও গ্রন্থিত হয়েছিল ঐ একই সালে। 'পুনশ্চ' ও 'শেষ-সপ্তক'-এর গদ্যকবিতা রচনার প্রকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এই দুটি কাব্যে। এর পরে বিশুদ্ধ গদ্যকবিতায় কাব্য আর লেখেন নি কবি। এই দুটি কাব্যের কবিতায মনীষী, ধ্যানী এবং কবির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে যুগপৎ। বস্তু-বিশ্বের যথার্থ রূপ-চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল-নিহিত শাশ্বত বিশ্বসত্যের ধ্যান, এবং সেই সঙ্গে আত্মসংবিৎ-এর আলোকে প্রতিফলিত করে তাদের শিল্প রূপায়ণ! অখণ্ড অবিনাশী সত্য-সুন্দরের যুগলরূপ মূর্তি ধরেছে এই দুটি কাব্য-কবিতায়! 'পত্রপুট'-এর সুখ্যাত 'পৃথিবী' কবিতা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—"এই কবিতাটি যেন পৃথিবীর স্তব—গদ্য-ছন্দে লিখিত বলিয়া রসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না, এমনই তাহার গতিচ্ছন্দ। যে সৌন্দর্য-সম্ভোগ কবির আবাল্যের সংস্কার ও সাধনা তাহারই ভাষাময়ী মূর্তি এই কবিতা।" কেবল সুন্দরী পৃথিবীর কল্পস্তোত্র নয় এই কবিতা,—ইতিহাসের যুগে যুগে যে পৃথিবী 'ললিতে কঠোরে' বিপরীত,—তার শাশ্বত নৈর্ব্যক্তিক রূপায়ণের ভিত্তির ওপরে আত্মস্থাপন করে ধ্যানী কবি বলেছেন,—

'পত্রপুট ও 'শ্যামলী'

"শুভে-অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষত-চিহ্ন-লাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।"

'পত্রপুট'-এর 'পৃথিবী' যেমন বন্দনাগান,—'শ্যামলী'র 'আমি'-ও তেমনি আত্মস্তোত্র ; সোঽহং তত্ত্বের, সত্যরূপ কবির 'চেতনার রঙ'এ হয়েছে নিত্য কালের রসসিক্ত ;—পান্না হয়েছে সবুজ, চুণি উঠল রাঙা হয়ে।

'ছড়ার ছবি' কাব্যটি শিশুদের জন্যে লেখা ; ১৩৪৪ সালে দ্বিতীয়বার আলমোড়া বাসকালে

লেখা হয়েছিল। নন্দলাল বসুর আঁকা কয়টি ছবির প্রেরণাকে আশ্রয় করে ছড়ার আকারে শিশু-কবিতা লেখা শুরু হয়। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন,—"নন্দলালের ছবিগুলি কবিতা লিখিতে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল নিঃসন্দেহেই ; কিন্তু কাগজে আঁকা ছবির বাহিরে বৃহত্তর চলতি ছবিও তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা লিখিতে উদ্রিক্ত করে।"

'ছড়ার ছবি'

পূর্ববর্তী শিশু-কবিতাবলি বা অন্যান্য কাব্য থেকেও এই কাব্যের স্বাদের অভিনবতা সম্পাদন করেছে ছড়ার ছন্দ। কবি লিখেছেন,—"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়া ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে।" ছড়ার ছবিতে ছেলেমি প্রলাপের অর্থহীন গভীর অর্থবহতার দোলা বাইরের রূপে ও মনের অনুভবে নতুন রকমের দোল দিয়েছে।

'প্রান্তিক' প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের পৌষ মাসে। এরই মধ্যে ভাদ্র মাসে কবি মুমূর্ষু হয়েছিলেন ; সমগ্র পৃথিবী তাঁর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিল। রোগ-ভোগ থেকে সেরে উঠেই 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুচ্ছ লিখতে আরম্ভ করেন। মৃত্যু-তীর্ণ নবজীবনে অনুপ্রবেশের উৎকণ্ঠা এই কবিতাগুচ্ছের সাধারণ লক্ষণ। তাছাড়া সদ্য-পরিচিত মৃত্যু-অনুভবের অবচেতন স্মৃতিকে অনেকটা তত্ত্বের আধারে টেনে তোলার চেষ্টাও আছে 'প্রান্তিক'-এ :—

'প্রান্তিক'

"আজি মুক্তি মন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক চিত্ত মম,
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম।"

'সেঁজুতি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৫ বাংলা সালে। 'ছড়ার ছবি'র সময় থেকে এ-পর্যন্ত একটি-দুটি করে সঞ্চিত, অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত , কবিতা ধরা হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। নামকরণ সম্বন্ধে কবি লিখেছিলেন,—"সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিশেবে ও'র মানেটা ভালো।" এর থেকেই কবিতাগুচ্ছের ভাবমূল্য স্পষ্ট হতে পারবে। বিশেষ করে 'প্রান্তিক'-উত্তর কালে লেখা জীবন-মৃত্যুর রহস্য-সন্ধানী কবিতাগুলি 'সেঁজুতি'-র সুরের স্পষ্ট স্বভাব-ব্যঞ্জক। 'জন্মদিন' কবিতাটি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'সেঁজুতি'

'সেঁজুতি'র পরের কাব্য 'প্রহাসিনী', ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। নামেতেই কাব্য-স্বভাবের পরিচয় আছে। 'প্রহাসিনী'র কবিতাগুচ্ছ লঘু সহাস। কবি-ভাবনা কিন্তু সর্বত্র লঘু নয়, আপাত পেলবতার অন্তরালে সমকালীন জীবন-চিন্তার প্রবাহ বয়ে গেছে ফল্গু-ধারার মতো। 'প্রহাসিনী' থেকেই দেখি, তার আগেও আছে ক্বচিৎ-কখনো, আত্মপরিচয়-সন্ধানী কবি বিরোধিপক্ষের দৃষ্টির আলোকে নিজের মূল্য নতুন করে যাচাই করে দেখতে শুরু করেছেন। 'পরিশেষ'-পূর্ব সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যৌবন-মানসিকতায় অবিশ্বাস অবারিত হয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকার (১৩৩০) তরুণ লেখক গোষ্ঠিকে আশ্রয় করে এই অবিশ্বাসী আবেগ প্রথমে উদ্বারিত হয়ে ওঠে। তারপর দেখা দিতে চেয়েছে বস্তুবাদী নতুন বিশ্বাসের অঙ্কুর। বিদেশী জীবন-ভাবনার প্রতিধ্বনিও তাতে যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া ছিল 'ভঙ্গি'-প্রাধান্য; আর শিল্প-চেতনার অসংশয়িত অন্বয়হীন উদ্‌ভ্রান্তি। তাতে আগন্তুকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি শংকা প্রকাশ করেছেন ;—অন্যদিকে নিজের আজীবন সাধনার মূল্য সন্ধান করতে চেয়েছেন বিদ্রোহী তরুণ-মনের বিরূপতার আলোকে। বস্তুবাদী কবিতার নামে 'প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য'-কৃতির অপূর্ণতার প্রতি কটাক্ষ আছে 'প্রহাসিনী'র শেষ কবিতায়।

'প্রহাসিনী'

'আকাশ প্রদীপ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৬ বাংলার বৈশাখ মাসে। এই কাব্য-স্বভাবের সফল পরিচয় দিয়ে ড. সুকুমার সেন বলেছেন,—এতে "কবিচিত্ত পুরানো দিনের স্মৃতির দেওয়ালি সাজাইয়া আছে।"—

'আকাশ প্রদীপ'

"ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে,
ভাবখানা মনে আছে,—বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আমকাঁঠালের ছায়ে।
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।।
বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল আধোজাগা কল্পনার শিহর দোলায়,"—

'আকাশ প্রদীপ'-এর পরের গ্রন্থিত কাব্য 'নবজাতক', প্রকাশকাল ১৩৪৭ বাংলার বৈশাখ,—খ্রিস্ট বছরের সেটি ১৯৪০ অব্দ। পৃথিবী-ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বসমরের অগ্নিতাণ্ডব তখন এগিয়ে গেছে বহুদূর। এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় সমকালীন পৈশাচিকতার ছবি কলমের একটি-দুটি আঁচড়ে আশ্চর্য সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছে :—

'নবজাতক'

"উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমি গর্ভের রাতে
ক্ষুধাতুর আর ভূরি ভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্য নামিক পাতালে যেথায় জমেছে
লুটের ধন।"

জীবনের কদর্য বীভৎসতাকে যত দেখেছেন, ততই তাকে সম্পূর্ণ করে ভ াব আগ্রহ জমছে মনে মনে। কোথাও-বা জীবনের সদ্য-প্রখর অশুচি-অসুন্দর স্বভাবের মুখোমু. . হতে চেয়েছেন জীবনস্রষ্টার কৃপাণ হাতে—'অপূর্ণ', 'রোমান্টিক' ইত্যাদি কবিতায় এই ধরনের মনোভাবের সফল প্রকাশ। সেই সঙ্গে এই দুঃখ-নির্জিত অন্ধকার থেকে মুক্তি-দাতা নবীন মুক্তিদূতকে,—'নবজাতক'কে আহ্বান করেছেন. "নবীন আগন্তুক,—নবযুগ তব যাত্রার পথে চেয়ে আছে উৎসুক!"

'নবজাতক'-এর পরে 'সানাই' (১৩৪৭)। বিশ্বব্যাপী 'মানুষ-পশুর হুহুংকার' তখনো জীবন-শিল্পীর প্রাণের যন্ত্রণাকে উত্তপ্ত করে রেখেছে; তবে প্রথম আঘাতের আচ্ছন্নতা অনেকটা গেছে কেটে। সমকালীন জীবনের আবিলতা আঘাত করলেও কবি-চৈতন্যকে আপ্লুত করতে পারে নি ; এই পরিচ্ছন্নতা-বোধ পূর্ণবাঞ্ছিত হয়ে আছে 'সানাই' কাব্যে। কবি নিঃসংশয়ে বলতে পেরেছেন,—". . গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমান্টিক।"

'সানাই'

'রোগশয্যায়' কবিতাগুচ্ছ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৭ বাংলা সালের পৌষমাসে। মৃত্যু-রোগ দেহের ভেতরে দিনে দিনে ক্ষীণ-দুর্বল করে আনছিল প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে। অথচ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর অতীন্দ্রিয় স্বরূপকে কবি তো চিরকাল উপভোগ

করেছেন ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে। তাই দেহের অবসাদ মনেও ক্লান্তি জড়িয়ে আনে। এমন সময়ে শারদ অবকাশে, কালিম্পঙ গিয়ে হঠাৎ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি তাকে কলকাতায় আনতে হয়। এই সময়কার রোগশয্যাতেই 'রোগশয্যায়'-কবিতাগুচ্ছ লেখা হয়েছিল। রোগ-পাণ্ডুরতার সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ অতীতচারণ ও করুণা-উৎকণ্ঠিত ভবিষ্য ভাবনা 'রোগশয্যায়'-এর কবিতাগুচ্ছকে বিশেষিত করেছে।

'রোগশয্যায়'

'রোগশয্যায়' থেকে সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন 'আরোগ্য' (১৩৪৭) কবিতার গুচ্ছ। পূর্ণ সুস্থ আর কখনোই হন নি ; মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বল্প-নীরোগতার অবকাশে সুস্থ দৃষ্টিতে পৃথিবীকে আর একবার,—শেষবার,— দেখে নিতে পারার সকরুণ আনন্দময় তৃপ্তি জড়িয়ে আছে এই কবিতাগুচ্ছে :—

'আরোগ্য'

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।"

'জন্মদিনে' কবির জীবদ্দশায় গ্রন্থিত শেষ কাব্য। শেষ জন্মদিনের মুখোমুখি পৌঁছে,—১৩৪৮ বাংলা সালের ১লা বৈশাখে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। নিজের জীবন ও সাধনার শেষ বিচারের চেষ্টা আছে এই কাব্যের কবিতাগুচ্ছে। 'ঐকতান' নামক কবিতার আলোচনা-বিচার প্রায় ঐতিহাসিক প্রাধান্য পেয়েছে। এই কবিতাটি আসলে 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' বলেই মনে হয়। 'মানসী' কাব্যে এই নামে একটি কবিতাও কবি লিখেছিলেন। এখানেও বলেছেন,—

'জন্মদিনে'

"তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

ড. সুকুমার সেন বলেছেন,—"এ ক্ষোভ নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শুধু চিরন্তন মানবজীবনকেই নয় বিশ্ব-প্রকৃতির মহাপ্রাঙ্গণকেও উদ্ভাসিত করিয়াছে আনন্দলোকে। যে গুহায় সে আলোক পৌঁছায় নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা।" মনে হয়, কবির মর্মমূলেও এ আক্ষেপ দানা বাঁধে নি কখনো ; এমন কি, 'ঐকতান' কবিতা রচনার বিশেষ মুহূর্তটিতেও নয়। জগতের বৃহত্তম সংখ্যক গণ-জনতার জীবন-দৈন্য বাস্তব মূর্তিতে আপন স্থান খুঁজে পায় নি কবির রচনায়,—তথাকথিত বস্তুবাদী শিল্পীদের এই নিন্দার উত্তরে কবি নিজের সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন,—

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভেতরে প্রবেশ করি সে সাধ্য ছিল না একেবারে।"

জীবনের বিশেষিত গণ্ডিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও, অপরতর জীবনের প্রাঙ্গণ-সীমা পর্যন্ত কবির সাধনা নিজের অধিষ্ঠানকে অবিচলিত করেছে। তার পরেও আরো দূরে যাবার যে আহ্বান,—তা কবির যুগ-ইতিহাসে এসে পৌঁছায় নি। যথাকালে সেই অনাগত শিল্পীর ঐতিহাসিক অভ্যুদয়কে কবি আগে থেকে অভ্যর্থনা করে গেছেন। সেই সঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন পরনিন্দক

'ভঙ্গি'-সর্বস্ব বাস্তববাদীদের অসংগত বিভ্রান্তি বিরচনের প্রতি। সাহিত্যে জীবনের সৃষ্টি ইতিহাসের হাতের দান ; জীবন-ইতিহাসের বিশেষিত পরিণতির অপেক্ষা না রেখে, আগে থেকে মতবাদ-পুষ্ট রচনাকে জোর করে গড়তে গেলে শিব না হয়ে তা হয় আর কিছু ; এ-কথা এই সময়কার পত্র-প্রবন্ধাদিতে কবি বার বার বলেছেন। 'ঐকতান' সেই প্রজ্ঞার কাব্যরূপ।

'শেষলেখা'

সবশেষের কাব্য 'শেষলেখা',—কবির মৃত্যুশেষে প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালে। শেষতম কবিতাগুচ্ছের সংকলন এটি। শেষ কবিতাটিতে মৃত্যুর তমসালীন আলোকে জীবনের করুণ আর্তধ্বনিটিকে শেষবারের মতো জাগিয়ে তুলে বিদায় নিলেন যেন,—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।"

২। পূর্ণতাধর্মী নাটক

পূর্ণতাধর্মী নাটক

রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ণতাধর্মের পরিচায়ন উপলক্ষে দেখেছি, এ-যুগে কোনো নূতন প্রবণতার পরিণতি ঘটেনি কোথাও। সকল পর্যায়ের সকল ভাব সমবেত ফলশ্রুতি অখণ্ড পূর্ণতা পেয়েছে এই যুগেব রচনায়। এই পর্যাযে লিখিত নাট্য-নাটিকার সংখ্যা মোটামুটি সাতটি , তাতে মাত্র দুটি ছাড়া আর সব কয়টিই পুরাতন বচনার পুনরাবৃত্তি। তবে এদেব স্বাদে নবীনতা আছে ; কবি-চেতনার পূর্ণতার অনুভব ছড়িয়ে আছে রচনাসমূহের ভাব ও রূপে।

'শাপমোচন'

এই পর্যায়ের প্রথম নাটক 'শাপমোচন'-এব মূক অভিনয় হয় ১৩৩৮ বাংলা সালে, কবির সত্তর বছরের জয়ন্তী উৎসবে ছাত্রদেব সম্বর্ধনার অঙ্গ হিশেবে। "যে আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া 'রাজা' নাটক, তাহারই কাব্যরূপে 'শাপমোচন' কবিতা, এবং তাহারই আভাস লইয়া এই দৃশ্যরূপ।"—বলেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়।

'কালের যাত্রা'

তার পরের নাটক 'কালের যাত্রা'-তে দুটি পূর্ব-রচিত নাটিকার নবরূপ গ্রাহ্বিত করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপহার দেন তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে (১৩৩৯)। 'কালের যাত্রা'-তে সংকলিত নাটিকা দুটি হচ্ছে,—(১) রথের রশি ও (২) কবির দীক্ষা। প্রথমটি ১৩৩০ বাংলা সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়,—নাম ছিল 'রথযাত্রা'। 'কবির দীক্ষা' নাটিকার পূর্ব পাঠ 'শিবের ভিক্ষা' নামে মুদ্রিত হয়েছিল ১৩৩৫ বাংলা সালের 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়। 'রথের রশি'-র গল্পে আছে,—রথযাত্রার দিনে হঠাৎ 'মহাকালের রথ' হল অচল। পুরুতের হাতের স্পর্শে রথ চলল না, রাজাও রশি ধরে তাকে চালাতে পারলেন না। অবশেষে ডাক পড়ল চির উপেক্ষিত, চির-অবদমিত শূদ্রদের। তাদের সমবেত শক্তির টানে এবার রথ এগিয়ে চলল অবলীলায়। কাহিনীর অন্তর্বর্তী ভাব-ব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করে কবি স্বয়ং লিখেছেন,—"মহাকালের রথ অচল, মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে-মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের

বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদের-ই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।"—সাম্যবাদের আদর্শ কবি-চেতনার হাতে নূতন রূপ পেয়েছে এই নাটকে ; ইতিহাসের বিচারে লক্ষ করতে হয়, এই নাটিকার প্রথম পরিকল্পনা ও রচনা সমাপ্ত হয়েছিল কবির রুশযাত্রার পূর্বে।

কবির দীক্ষায় "যাহা আছে তাহা শুধু একটা তত্ত্ব, ত্যাগের কাব্যীয়-দর্শন।"—বলেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়। এতে নাট্যগুণের চেয়ে রূপক রচনার আগ্রহই বেশি প্রবল।

এর পরে প্রায় একসঙ্গে প্রকাশিত হয় 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা',—দুটিরই প্রকাশ কাল ১৩৪০ বাংলা সালের ভাদ্র মাস। প্রথমটির নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে গল্পগুচ্ছের 'একটি আষাঢ়ে গল্প'-কে আশ্রয় করে ; গল্পটি ১২৯৯ বাংলা সালের রচনা। আপাত-দৃষ্টিতে একটি লঘু কৌতুক-রসান্বিত নাটিকা হলেও 'তাসের দেশ'-এর মূলে আছে সমকালীন বিশ্বজীবন-ভাবনার ব্যঞ্জনাঘাত। 'তাসের দেশ'-এর লোকেরা বাইরের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলতে চলতে নিজেদের ভেতরকার প্রাণ-শক্তিকে ক্ষীণ,—মুমূর্ষু-প্রায় করে তুলেছিল। রাজপুত্র-সদাগরপুত্রের দল বাইরে থেকে নতুন প্রাণের শক্তি নিয়ে এল অন্ধকার পুরীতে,—বিদ্রোহের পথ দিয়ে নবচেতনার আলোক প্রবেশ করল, কৃত্রিম সংকীর্ণতার অচলায়তনকে দিল চূর্ণ করে। ভারতীয় চেতনার এক সময়কার রক্ষণশীল শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রতি হয়ত ব্যঞ্জনাময় কটাক্ষ রয়েছে এই নাটিকার কল্পনায়।

'তাসের দেশ'

'চণ্ডালিকা' এই যুগের প্রথম নাটক, যার মধ্যে কোনো পূর্ব-রচনার ছায়াপাত ঘটে নি। বৌদ্ধ কথিকার একটি গল্পের সূত্রকে কবি নিজের মনোমত করে ঢেলে সেজেছেন। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির হাতের জলপান করেছিল,—তাকেই কেন্দ্র করে অস্পৃশ্যতার আদর্শকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে মানবধর্মকে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই নাটিকায়। পাঁচ বছর পরে এই নাটিকাই 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'-র নূতন নাম ও রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়।

'চণ্ডালিকা'

'বাঁশরী' এই যুগের একমাত্র নাটক যা কবি-চেতনার অমিশ্র-মৌলিক কল্পনার দান। রবীন্দ্র-নাট্য হিশেবেও এটি অনন্য-সদৃশ ; নর-নারীর প্রণয়সমস্যার সামাজিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে এমন নাটক কবি লেখেন নি এর আগে। অথচ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সমকালীন চিন্তা-কল্পনার কাব্যব্যঞ্জনাময় সাংকেতিকতা। কেবল নাট্য-সাহিত্যের সীমার মধ্যে বেঁধে দেখলে 'বাঁশরী'-কে আকস্মিক রচনা বলে মনে হবে ; কিন্তু এসময়কার গল্প-কবিতার সঙ্গে এই নাট্য-ভাবনার সংযোগ ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে, মনে হয়, 'বাঁশরী' যেন 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' নামক গল্পগ্রন্থিকা দুটির-ই ভাবানুবর্তন। প্রথমে লিখেছিলেন 'দুইবোন' (১৩৩৯-ভাদ্র) ; কয়মাস পরে, ঐ একই সালে লেখা হয় 'মালঞ্চ' ; আর 'বাঁশরী' নাটিকা শান্তিনিকেতনে পড়ে শুনিয়েছিলেন ১৩৪০ বাংলা সালের বৈশাখ-প্রারম্ভে। এই রচনা তিনটিতে কালের সান্নিধ্য যেমন ঘনিষ্ঠ, ভাবের অনুষঙ্গ-ও তেমনি নিবিড়। নর-নারীর প্রেম, তথা, বিবাহ-বন্ধনের পৃথক স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য খুঁজেছেন কবি এই তিনটি রচনায়; প্রেম ও দাম্পত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন নিজের ভাবনা ও অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে।

'বাঁশরী'

'শেষের কবিতা'য় দেখেছি, নারীর প্রেম দাম্পত্যের দাবিকে অস্বীকার করেও সর্বজয়ী হয়েছে ; অমিত এবং লাবণ্যের প্রণয়-মধুরতা সংসার-জীবনের বন্ধন অস্বীকার করেই হয়েছে সর্বাতিগ, সর্বকালীন। বাঁশরী এবং সোমশংকরের জীবনেও হয়েছিল তাই। গুরু পুরন্দরের

অজ্ঞাত ইচ্ছা ও আদর্শ-সাধনের বেদীতে আত্মদান করেছে সোমশংকর ও সুষমা; তাদের বিবাহ-বন্ধন অনুরাগ-লেশহীন,—প্রয়োজন-সর্বস্ব। সে প্রয়োজনের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তাদের,—পুরন্দরের আদেশই হয়েছে একমাত্র সম্বল। অথচ বাঁশরীর দুর্লভ নারী-প্রাণের প্রচুরতা প্রাণ-চঞ্চল করেছিল সোমশংকরকে। সোমশংকরের বিবাহ-কথা বাঁশরীর প্রেমকে যেন চাবুক দিয়ে মারে, তবু বাইরে সে কঠিন ; অবিচলতার ভান করে। সব সত্ত্বেও চাপা কান্নার আভাস গোপন থাকে না তার কথায় ; প্রতিশোধ নেবার জন্যে ক্ষিতীশের সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করে নেয়। অথচ ক্ষিতীশের দুর্বল পৌরুষকে সে উপেক্ষাভরা করুণার চোখেই দেখেছে চিরকাল। বিয়ের নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেয় সোমশংকরের কাছে। কিন্তু সোমশংকর যখন শান্ত কণ্ঠে বলে তার প্রেম ও ব্রত বিভিন্ন ; ব্রতের কর্তব্য প্রাণের প্রেমকে কোনো ন স্পর্শও করতে পারবে না, সেইদিন বাঁশরী শান্ত হয়ে যায়,—দাবাগ্নিমুক্ত ঘন বনানীর মতো। কারণ সে নিশ্চয় করে জানে,—"ভালবাসার নীলামে সর্বোচ্চ দরই" পেয়েছে সে। মিলনের বন্ধনে নয়, প্রাণের তপস্যাতেই প্রেমের মুক্তি। তাই সুষমাকে আর হিংসা করে না বাঁশরী,—বরং তাকে করুণা করে।

'বাঁশরী'-র বক্তব্য আসলে কবি ভাবনার একটি দার্শনিক কল্পনাংশ।—কিন্তু বাঁশরী চরিত্রের প্রাণোত্তাপ সমস্ত নাটকটিকে দিয়েছে যুগপৎ গতি এবং সুষমা। রবীন্দ্র-নাট্য রচনার ইতিহাসে 'বাঁশরী' অভিনব,—অস্বচ্ছ হলেও অতুল্য।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

'বাঁশরী'র পরে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য-নাটিকা নূতন নৃত্যনাট্য-রূপ পায় ১৩৪২ বাংলা সালে ; পুরাতনের নবরূপ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা',—নূতন ভাবনারও বাহন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—যৌবনের "এ যেন সেই শক্তি, যাহার মধ্যে আলো আছে, তাপ নাই,—তেজ আছে দাহ নাই।"

শ্যামা

'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' নামক কাব্য-কথাকে নৃত্যনাট্যরূপ দিয়ে ১৩৪৩ সালে কলকাতায় অভিনয় করা হয় নৃত্যনাট্য 'পরিশোধ'-এর। পরে বারে বারে পরিবর্তিত করে অবশেষে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' প্রকাশ করা হয় ১৩৪৪ বাংলা সালে।

৩। পূর্ণতা পর্যায়ের গল্প-উপন্যাস

এ পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচিত হয়নি বলাই ভাল। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'-কে উপন্যাস বলা হয়, আকৃতি ও প্রকৃতিতে এদের মধ্যে গল্পের লক্ষণই বেশি। একমাত্র উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে 'চার অধ্যায়'-কে (১৩৪১)। কিন্তু তা-ও আসলে কবির লেখা গল্প। উপন্যাসের সমস্যা-বিস্তারিত জীবন-পরিচয় রচনা করেন নি কবি এতে; অন্ত-এলার প্রেম-রোমাঞ্চকে করেছেন ঘন-নিবিষ্ট। কবিও বলেছেন,—"চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের ভোলায় সে ওর কবিতা-অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি যাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায়, সেটা ঠিক গদ্যের বাহন নয়। অন্ত আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা। নভেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়ত দেরি হবে।" বাংলার অগ্নিযুগের রক্তিম পটভূমি প্রণয়-রোমান্সের লিরিক লালিমাকে যেন আরো উজ্জ্বল-দীপ্ত করে তুলেছে। গদ্যে-লেখা জীবন-লিরিক হিশেবে 'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রসাহিত্যেও এক স্ব-তন্ত্র রচনা.

একটি উপন্যাস ঃ 'চার অধ্যায়'

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' 'চার অধ্যায়'-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী রচনা। উপন্যাস হিশেবে

সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও, আগেই বলেছি,—ঐ দুটিকে আমরা গল্পরূপেই বিচার করব। উপন্যাসের জীবন-বিস্তার এবং অনপনেয় জটিলতার আভাসও নেই এদের প্লট-এ। বরং 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসা যেন এখানে পূর্ণতা-পর্যায়ের অটুট প্রত্যয়ে আলোকিত হয়ে গীতধর্মী গল্প-রূপ পেয়েছে। 'দুইবোন'-এর-শিল্প-পরিণতি 'মালঞ্চ' ; আসলে দুটি গল্পের প্লট একটিই। শর্মিলা বিয়ে করেছিল ; স্বামী শশাঙ্ক-র জীবনে নিজের নারীত্বকে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে পুরুষের প্রেমকে সে লুঠে নিয়েছিল, শশাঙ্ককে করেছিল দেহ-মনে চরিতার্থ। এমন সময় বিধির দুর্জয় আঘাত নেমে এল শর্মিলার শরীরে। আর তখনই ছোট বোন উর্মিমালা এসে শশাঙ্ককে দিতে চাইল নূতন মুক্তি,—নিজের দেহে-মনে ; সেই সঙ্গে নিজে বাঁধা পড়ল শশাঙ্কের আকর্ষণে। শর্মিলা সবই বোঝে ; নিজের স্বামীকে নিঃসহায়ে হারিয়ে ফেলার দীনতায় তার মধ্যেকার 'নারী' ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার তার নিজেরই অন্তরের 'দিদি' ছোটবোনের জন্যে সব হারাতে পারার তৃপ্তিতে স্মিত হাস্যে হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। এমন সময় চরম মুহূর্তে শর্মিলা সাবলীল হয়ে ওঠে অতিলৌকিক শক্তির বলে, শশাঙ্ক-শর্মিলা পুনর্মিলিত হয়,—উর্মিমালা ছুটে যায় য়ুরোপের পথে।

'দুইবোন

'দুইবোন'-এর প্লট-এ যেমন, কবি-কল্পনাতেও তেমনি বিস্রস্ততা রয়েছে। একই বিবাহিত পুরুষের প্রতি তার স্ত্রী এবং দ্বিতীয়া নারীর প্রণয়-সংঘাত তীব্র হতে পারে নি দুটি বোনের মধ্যে ; তা-ছাড়া শেষ মুহূর্তে শর্মিলার রোগমুক্তির আকস্মিকতা এবং সেই প্রসঙ্গে অতিলৌকিক শক্তির ব্যবহার গল্পের বাস্তব রসকেও ফিকে করেছে। 'মালঞ্চ'-তে সেই অভাব পূরিত হল। এখানে নীরজা ও সরলার প্রণয়-দ্বন্দ্ব শশাঙ্কর বদলে কেন্দ্রিত হয়েছে আদিত্যর মধ্যে। পুরুষ হিশেবে আদিত্য অনেক বেশি সক্রিয়,—বলিষ্ঠ এবং জীবন্ত। তাছাড়া নীরজা ও সরলার নিঃসম্পর্কতা নীরজার রুগ্ন দেহমনের ঈর্ষাকে জ্বালাতপ্ত করেছে। নীরজার যন্ত্রণা যেমন মানবিক, তেমনি তার নাটকীয় সমাপ্তি ট্রাজেডি-নিবিড়। প্লটের এই সহজ পরিণতি গল্প-রসকে যেমন হৃদ্য করেছে, কবি-কল্পনার অবাধ গীতি-সুধাপ্লাবন আর মালঞ্চ-পটভূমির পুষ্প-সুরভিত সৌন্দর্য 'মালঞ্চ'কে ঘনতর সুন্দর করেছে।

'মালঞ্চ'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—'দুইবোন', 'মালঞ্চ' ও 'বাঁশরী'-র জীবন-চিন্তার সমসূত্রে গাঁথা আছে শেষ গল্পের বই 'তিন সঙ্গী'। ১৩৪৬-৪৭ বাংলা সালে সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজনে লেখা তিনটি গল্পকে একত্র করে 'তিন সঙ্গী' নাম দেওয়া হয়। গল্প তিনটি যথাক্রমে 'রবিবার', 'শেষ কথা' এবং 'ল্যাবরেটরি'। নর-নারীর প্রণয় ও তার সামাজিক এবং দৈহিক জটিলতা নিয়ে কবির কল্পনা, ধ্যানীর জিজ্ঞাসা, ও মনীষীর বিচার শিল্প-সৃষ্টির এক অভিনব বিস্ময়-লোকে উত্তীর্ণ করেছে এই গল্প তিনটিকে।

'তিন সঙ্গী'

শেষ পর্যায়ের গল্প গ্রন্থগুলির মধ্যে 'তিন সঙ্গী' একদা প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কবির লেখা সর্বশেষ গল্প-সংকলন 'গল্পসল্প'-র গ্রন্থন কাল ১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। আশ্চর্য হাল্কা-ভঙ্গির গল্পগুলির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে আছে অতীন্দ্রিয়-প্রায় গভীর জীবনানুভবের স্পর্শ। বাইরে থেকে মনে হয় বুঝি হাল্কা মেজাজের শিশু-গল্প ; কিন্তু কবি নিজে বলেছেন,—ছেলেরা এই গল্পের জগৎ দখল করতে চাইলেও "হাত ফস্কে যায়, আসলে এর ভেতরের খবর বড়দের জন্যই।"

'সে', 'গল্পসল্প' ইত্যাদি

'গল্পসল্প' বাইরে থেকে শিশুমনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তবু অন্তরে অন্তরে গল্পগুলি বড়দেরই। আর 'সে' গল্প-গ্রন্থে ছোটদের গল্পের ভেতর থেকে বড়দের জন্যেও ভেসে আসে ইশারা। 'সে'-র গ্রন্থনকাল ১৩৪০ বাংলা সাল। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীর পালিতা কন্যা

নন্দিনীর (ডাকনাম পুপে) জন্য রচিত হয়েছিল গল্পগুলি। অপরূপ শৈলীগুণে গল্পের জগতে বড় এবং ছোটদের মহলের বেড়া ভেঙে দিয়ে এক সর্বজনীন আনন্দলোক রচনা করে গেছেন কবি এই শেষ পর্যায়ের গল্পে।

এছাড়া আরো একটি সম্পূর্ণ গল্প আর দুটি গল্প-কাঠামো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থিত হয় নি দীর্ঘদিন। পরে 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ডের অঙ্গীকৃত হয়েছে।—তাদের নাম যথাক্রমে 'প্রকৃতির পরিহাস', 'শেষ পুরস্কার' আর 'মুসলমানীর গল্প'। বিখ্যাত 'বদনাম' গল্পটি ১৩৪৮ সালের 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল,—অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' এবং চতুর্থ খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ'তে গ্রন্থিত হয়েছে।

৪। পূর্ণতা পর্বের গদ্য-রচনাবলি

পূর্ণতাপর্বেব গদ্য

যেমন অন্যান্য ধারায়, তেমনি এ-যুগের গদ্য রচনাতেও কবির কল্পনা এবং মনীষীর ভাবনা পূর্ণতার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁচেছে। পূর্ব-পূর্ব বারের মতো এই পর্যায়েও বচনার বৈচিত্র্য ও সংখ্যাবাহুল্য প্রাচুর্যে পূর্ণ ফলে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কেবল সমুল্লেখ্য গদ্য-গ্রন্থ্গুলিরই আলোচনা সম্ভব, পৃথক্ পৃথক্ রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

'মানুষেব ধর্ম

আলোচ্য [illegible] প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মানুষেব ধর্ম' ১৩৪০ বাংলা সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রথম কমলা বক্তৃতা। এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্র ও আচার-সর্বস্ব ধর্মের সংস্কারকে অস্বীকাব করে মানুষেব আত্মার ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ যেখানে আত্ম-চেতনাময়,—সেখানে সর্বসাধারণের থেকে সে পৃথক্—একমেবাদ্বিতীয়। তাই নিজেব ধর্মকে তখন নিজের আত্মার ভেতর থেকেই উদ্ভূত করতে হয়,—কাবণ, ধর্ম তো আত্মাকে ধারণ করে রাখবারই মৌল শক্তি। 'আমাব ধর্ম' নামক প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, শাস্ত্রের ধর্ম, বিশেষিত আচার ও রীতি-নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, তাঁব নিজের ধর্ম নয়, সে ধর্ম রয়েছে তাঁর আত্মার গভীরে। সর্বমানবের প্রসঙ্গে এই আত্ম-ধর্মের কথাই তিনি বললেন এবারে 'মানুষের ধর্ম'-তে। দার্শনিকের গভীর মনন কবির উপলব্ধির সূত্রে গাঁথা পড়ে ভাবে এবং ভাষায় দুর্লভ সংবেদনার [illegible]ষ্ট করেছে।

'ছন্দ' ও 'বাংলা ভাষা-পবিচয'

১৩৪৩ বাংলা সালে গ্রন্থিত হয় 'ছন্দ' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলি। কবি যে শুধু বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টাই নন, বৈজ্ঞানিক রূপ-জিজ্ঞাসুও,—তার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে এই গ্রন্থে। বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে যুক্তির আনুপূর্বিকতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি, অথচ সাহিত্যের উপভোগ্যতা ও উপলব্ধি-ময়তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই রচনারও সর্বাঙ্গে। এই সঙ্গে, এখানেই স্মরণ করে রাখি, 'বাংলা ভাষাপরিচয়' গ্রন্থিকার কথা। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) এটি প্রথম প্রকাশিত হয়,—ছন্দতত্ত্বের পরে এই গ্রন্থে সঞ্চিত হয়েছে ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক রূপায়ণ।

ভ্রমণকাহিনী ও দিনপঞ্জী ইত্যাদি

এই সময়কার ভ্রমণ-কাহিনী বা দিনপঞ্জীর মধ্যে আছে,—'জাপানে পারস্যে' (১৩৪৩), 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' (১৩৪৩), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৩৪৫) এবং 'পথের সঞ্চয়' (১৩৪৬)। 'জাপান যাত্রী' এবং 'পারস্য',—এই দুটি রচনা সংকলিত হয় প্রথম গ্রন্থে। 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (পরিবর্তিত সং) আর 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী'র (পুনর্মুদ্রিত) দ্বিতীয় খণ্ড একত্র সংকলিত হয়। 'পথের সঞ্চয়'-এ আছে ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত প্রবন্ধাবলি। সকল

রচনাতেই কবির ব্যক্তিত্ব-সুনিবিড় পথিক মনের পরিচয় রসান্বিত প্রকাশ পেয়েছে,—যেমন বর্ণনা, তেমনি ভাষা-ভঙ্গিতে।

এ-সময়কার সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সাহিত্যের পথে' সংকলিত হয়ে প্রথম প্রকাশ লাভ করে ১৩৪৩ বাংলা সালে। 'সবুজপত্র'-র শুরু থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রায় কুড়ি বছরের সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধাবলিকে বাছাই করে এই প্রবন্ধ-সংগ্রহে সংকলন করেছিলেন স্বয়ং কবি। তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক পুরাতন ভাবনা পরিণততম,—চিরন্তন রূপ পেয়েছে এই রচনাগুচ্ছে। যেমন মনন, তেমনি রস-গভীরতায় এরা গভীর-সুন্দর। 'প্রাক্তনী' নামে প্রাক্তন-ছাত্রদের সভায় কথিত কবির অভিভাষণাবলির এক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালেই।

'সাহিত্যের পথে' ও 'প্রাক্তনী'

শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধও এই পর্যায়ে লিখিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে আছে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'শিক্ষার বিকিরণ', 'শিক্ষার ধারা' ইত্যাদি।

শিক্ষাবিষয়ক নিবন্ধ

রবীন্দ্র-জীবনে পূর্ণতা-পর্যায়ের সবচেয়ে বিস্ময়কর গদ্য রচনা দুইটি,—এক 'কালান্তর', আর এক 'বিশ্বপরিচয়'। দুইটি পুস্তকই গ্রন্থিত হয় ১৩৪৪ বাংলা সালে। প্রথম গ্রন্থে আধুনিক বিশ্বের সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক সর্ববিধ সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করে,—কবি-মনীষীর দৃষ্টিতে তাদের ব্যাখ্যা, রূপায়ণ ও সমাধান করার প্রয়াস রয়েছে। মানব-ইতিহাস ও আধুনিক সভ্যতার এমন অনুপুঙ্খ, অথচ অখণ্ড সম্পূর্ণ পরিচয় রচনা এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা।

'কালান্তর'

তার চেয়ে কম বিস্ময়কর নয় আজীবন সুন্দর-শিল্পীর পক্ষে বার্ধক্যের উপান্তে বসে 'বিশ্বপরিচয়' জিজ্ঞাসা। এই গ্রন্থটি বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কারের সমষ্টি। বিজ্ঞান-চিন্তায় কবি আত্মনিয়োগ করেছেন, তাও পরিণত প্রৌঢ়ীতে,—এ এক অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের মৌল-স্বভাব প্রথমাবধি লক্ষ করলেই দেখব,—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল সর্বদাই ছিল অশেষবিধ। অথচ বিশ্ব-পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিছক নিরঙ্গ কল্পনার ওপরে নির্ভর করেন নি কখনোই। বিশ্ব-বিষয়ে ইতিহাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের তথ্যকে জেনে তারই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন বিশ্ব-সত্যকে। বিশ্ব-ইতিহাস ও বিশ্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল বাল্যাবধি। 'কালান্তর'-এ—অন্যান্য বহু গ্রন্থের মতো কবির ইতিহাস-চেতনা আর একবার রূপ ধরেছে। 'বিশ্বপরিচয়'-এ বৈজ্ঞানিক অন্বেষাবৃত্তি কবির হাতে পেয়েছে প্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ।

'বিশ্বপরিচয়'

এই সময়কার আর একটি অবিস্মরণীয় গদ্য-রচনা 'সভ্যতার সংকট' কবির মৃত্যু-পূর্ব কালে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৮ বাংলা সালে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অন্ধ তমসাবৃত অমালগ্নে মানব সভ্যতার সংকট ও তার পরিত্রাণের মহা আশ্বাস রচনা করে কবি বিদায় নিলেন বিশ্বমানবের সভা-ভূমি থেকে।

'সভ্যতার সংকট'

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ : প্রথম পর্যায়

রবীন্দ্রনাথ কেবল শিল্প-সাহিত্যের নিরন্তর রচয়িতা ছিলেন না; নিজের দেশ-কালের জীবনকে বিচিত্র ভাবে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন। আর বাংলা ভাষার সাহিত্য-সাধনা সেই প্রভাবের বলেই দীর্ঘকাল তাঁর সৃজনধর্মের চারপাশে প্রত্যালোকিত তারকামালার মতোই বিকশিত হয়েছে। আগে দেখেছি, জীবনানুভব ও প্রকাশকলার আনুপূর্বিক বিকাশের সূত্রে স্বতন্ত্রতার চরিত্র-লক্ষণ যেখানে নবীন পরিণতির প্রতিশ্রুতিভরে স্বত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেখানেই সাহিত্যের নূতন যুগ সূচনার পদপাত। রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাবনায় মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগের মানব-মূল্যবোধ এক নূতন অতীন্দ্রিয় মাত্রায় উন্নীত হয়েছিল। 'অতীন্দ্রিয়' অর্থ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে 'অলৌকিক' নয় একেবারেই , [illegible] যে স্পন্দন ইন্দ্রিয়ের সীমায় অনুরণিত হয়ে চলে, অথচ ইন্দ্রিয়বোধের সীমিত পরিসরে ধরে যার পূর্ণ পরিচয়টি অবধারণ করা চলে না কিছুতে। রবীন্দ্র-ভাবনা, এবং রবীন্দ্র-রচনায়, মানুষ তার অব্যবহিত শারীর বৃত্তে সংস্থিত থেকেও সেই বৃত্তের সীমান্ত উত্তরণে আগ্রহী। ঠিক একই প্রেরণাবলে রবীন্দ্র-কবিতার ভাষা বাগর্থের বন্ধন-সীমাকে অতিক্রম করে এক নূতনতর তাৎপর্য মাত্রায় উন্নীত হতে চেয়েছে। রবীন্দ্র-গদ্যের চরিত্রেও সেই আগ্রহ ক্রমপ্রসারিত হতে দেখি।

রবীন্দ্রযুগ : স্বভাব ও স্বাতন্ত্র্য

আখ্যায়িকা এবং গীতিকাব্য নির্বিশেষে মধুসূদনের কাব্যবাণী এবং কাব্য-ভাষার গোত্রান্তর ঘটে গিয়েছিল 'সন্ধ্যাসংগীত'-এই , তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্য রচনার গৌরবসূত্রে রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে, তরুণ কালকে সংবর্ধিত করেছিলেন। আর ঐ 'সন্ধ্যাসংগীত' ও তদুত্তর রচনাবলির অভিনব চরিত্রবৈশিষ্ট্য ঘিরে বাংলা কাব্যে 'রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধ'-এর বিচিত্র প্রবণতা ক্রমে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ, গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে, 'রাবীন্দ্রিকতা'র স্বীকৃতি বা প্রতিবাদ নিয়েই বাংলা সাহিত্যের নব নব প্রবণতা গড়ে উঠেছে কবির জীবৎকালে , এবং তারপরেও দীর্ঘ দিন ধরে। এই অর্থেই বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল ইতিহাসের একটা যুগ একান্তভাবেই রবীন্দ্র-প্রভাব চিহ্নিত:— রবীন্দ্রযুগ।

রবীন্দ্রবরণ · রবীন্দ্রবিরোধ

কালানুক্রম তথা চারিত্র বিবর্তন সূত্রে এই যুগপ্রবণতাও দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হতে পারে। প্রথম পর্যায় যদি 'সন্ধ্যাসংগীত' এর কাল থেকেই সূচিত হয়ে থাকে, তার পদচিহ্ন সুস্পষ্ট হয়েছে 'মানসী'-উত্তর পর্যায়ে; 'বরণ' এবং 'বিরোধে'র রূপরেখা তখন হতেই যথাক্রমে 'সাধনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রতিফলিত। এ-ধারার অবসান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিক্ষেপ প্রভাবে (১৯১৪-১৯১৮)। ঐ বিন্দুতে উনিশ শতকের রেনেসাঁস-প্রবণতারও চূড়ান্ত উদ্‌যাপন; আগে দেখেছি, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র ভাবকল্প সাধনায়! তারপর হতে যে নূতন ধারা দেখা দিয়েছে, তাতে

রবীন্দ্রযুগের দুই পর্যায়

রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রজন্মের উত্তর পুরুষদের চিত্তমন্থনে 'বরণ'-'বিরোধ'-এর আলোড়ন প্রখরতর হয়েছিল। এই দুই স্তরে শিল্পবাণী এবং শিল্পরূপেরও আপেক্ষিক পার্থক্য অনায়াস-লক্ষিত। এই দুই পর্যায়ের বিকাশধারার অনুসরণ সূত্রে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক রূপরেখাটি বলয়িত হয়ে উঠতে পারে। একথা মনে রেখেই এই দুই পর্যায়ের মুখ্য সূত্রগুলোকেই কেবল অনুসরণ করা যেতে পারে অতঃপর। তা না হলে সম্পূর্ণ রচনাতালিকা গড়ে তোলার প্রয়াসও দুঃসাধ্য; আর ইতিহাস প্রত্নতত্ত্বের অনুপুঙ্খ তালিকা নয় কখনোই!

১। প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রবরণের রূপরেখা :

(ক) ঠাকুর বাড়িতে : গদ্যেপদ্যে

'রবীন্দ্রবরণ' ঃ সূচনা

'রবীন্দ্রবরণ' অর্থে ঐকান্তিক রবীন্দ্র-অনুসরণের কথা কখনোই ভাবা উচিত নয়। সকল ক্ষেত্রেই সার্থক শিল্পীর আত্মপ্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, এবং দেশ-কাল-পাত্রের অভিজ্ঞতাপ্রভাবিত হলেও বহুলাংশে স্বাধীন। রবীন্দ্রভাবনায় উদ্ভাসিত মানুষের নূতন মাত্রা-পরিচয়, তথা, তাঁর প্রকাশ-প্রকরণের প্রতি শিল্পি-চিত্তের সহজ অনুকূলতা যেখানে রয়েছে, সেখানেই সৃষ্টির ধারায় সেই আন্তরিক আনুকূল্য রবীন্দ্রবরণের আগ্রহে সঞ্জীবিত।

'বালক'

সচেতন ভাবে এই সঞ্জীবন সঞ্চারের উল্লেখ চেষ্টা হয়েছিল—না বুঝে হলেও—রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ বছর বয়সে। ১২৯২ বাংলা সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' পত্রিকার প্রকাশ করেছিলেন, প্রধানত ঠাকুরবাড়ির পরবর্তী প্রজন্মের বালকবালিকাদের চিত্তোৎকর্ষ সাধনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুখ্য লেখক। ঐ সূত্রেই যাঁদের সাহিত্যবোধ পরিশীলিত হয়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে উল্লেখ বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এবং প্রতিভা, হিরণ্ময়ী ও সরলাদেবী। এঁদের রচনা 'বালক' এবং পরবর্তী কালের 'ভারতী ও বালক'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এঁদের মধ্যেও সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা যাঁদের ঘটেছিল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-৯৯) তাঁদের অন্যতম মুখ্য। গদ্য-পদ্যের উভয় ধারাতেই তাঁর লেখনী সাবলীল ছিল ; দুই ধারাতেই মনোভাবনা আর রচনার শৈলী ছিল রবীন্দ্র-প্রকরণের একান্ত সন্নিহিত। রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির প্রতি একান্ত আকৃষ্ট ছিলেন, এবং অন্তত তাঁর গদ্য রচনায় প্রচুর সহযোগিতাও করেছিলেন। জীবদ্দশায় বলেন্দ্রনাথের দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—'মাধবিকা' (১৩০২) এবং 'শ্রাবণী' (১৩০৪)। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের ভাবরূপের ছায়াসম্পাৎ এই কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়। কবিতাগুলি অনতিপ্রখর রোমান্স-ভাবনায় আবিষ্ট। তাহলেও, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্য প্রবন্ধের লেখক হিশেবেই বলেন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয়তা : তাঁর সহজ ছন্দ-স্পন্দিত, নমনীয়, বিচিত্র-বিষয়চারী গদ্যরচনার নিজস্ব আবেদন অনস্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুর বাড়িতে এই নূতন প্রজন্মের লেখকগোষ্ঠির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের (১৮৬৯-১৯১৯) স্বাতন্ত্র্য তাঁর ছোটগল্প রচনার দক্ষতায়। 'বৈতানিক' (১৯১২) এবং 'দোলা' (১৯১৩) নামে দুখানি কবিতার সংকলনও শিল্পী প্রকাশ করেছিলেন ; তাতে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টির আভা প্রতিফলিত। 'যে কোনো বিষয় নিয়ে যা খুশি গল্প' লিখে অনায়াসে রূপ-রসোত্তীর্ণতা অর্জনের সাফল্যে বাংলা ছোটগল্পের

জগতে তাঁর এক নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। 'মঞ্জুষা' (১৯০৩), 'চিত্রালী', 'চিত্ররেখা' (১৯১০), 'করঙ্ক' (১৯১২) নামে চারখানি ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম স্বাধীন স্ব-তন্ত্র প্রকাশভূমি 'সাধনা' পত্রিকার (১৮৯১-৯৫) প্রথম সম্পাদক রূপে কবি নিজেই সুধীন্দ্রনাথকে বরণ করেছিলেন।

'বালক' কিংবা 'ভারতী ও বালক'-এর যুগে লিখবার কথা যিনি কল্পনাও করেন নি, ঠাকুর বাড়ির সেই অপরূপ শিল্পি-সব্যসাচী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ ১৯৫১) গদ্যে-পদ্যে, বিশেষ করে বিচিত্র-বাহন গদ্যে, অতুল্য নির্মাণ ক্ষমতার পরিচয় রেখে গেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা বশেই শিশুগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন তিনি—'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬)। ধীরে ধীরে অবনীন্দ্রনাথের গল্পবলা ছোটদের আসরে বড়দেরও ডাক দিলে :—রাজপুত কাহিনী-গড়া 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), বিদেশী গল্প-ভাঙা 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৯১৬), 'আলোর ফুলকি' (১৯১৯), 'বুড়ো আংলা' আটপৌরে মুখের কথার সর্বাঙ্গ জুড়ে সুর আর রঙরূপের ঝিলিক তুলে বাংলা গদ্যের মাদকতা-নিবিড় এক নূতন চরিত্র জাগিয়ে তুলেছিল।

প্রাচীন পুথি-সাহিত্যের আদলে লিখেছিলেন 'চাই বুড়োর পুথি', 'মারুতির পুথি'—রূপকথা আর রূপক-কথা জড়িয়ে 'ভূতপত্রীর দেশ'। পুরোনো যাত্রা সাহিত্য অবনীন্দ্রনাথের হাতে শিল্পরূপে পুনর্জন্ম ... করেছিল। 'পথে বিপথে' (১৯১৬) লিখেছিলেন বড়দের গল্প। আবার 'বাংলার ব্রত' এবং 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'র মতো রচনায় সুরচিত্রের স্বপ্নমগ্ন শিল্পীর মননজাত উপলব্ধি যেন কাব্যরূপ ধরেছে। কবিতাও লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ নানা রকমের; তার মধ্যে বিশেষ করে গদ্য ছন্দে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই।

গদ্যে পদ্যে অজস্রকর্মা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ এবং প্রতিপদেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল অমেয়। তাহলেও, মনে প্রাণে তিনি রবীন্দ্রবরণের দলেই, রবীন্দ্র-প্রবর্তিত বাগর্থের বন্ধনমুক্ত মুক্তপক্ষ গদ্য রচনার এক নিজস্ব পথ গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

(খ) কাব্য-কবিতায়

ঠাকুর বাড়ির বাইরে রবীন্দ্রকাব্য তরুণ সমাজের একটা স্তরে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এঁদের মধ্যে মুখ্য স্মরণীয়তা সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪) এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২)।

ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের উদ্বেলিতমনা পাঠক সতীশচন্দ্র অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনায় রত হন। তাঁর কবিতার খাতা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, 'অল্পবয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বল ভাবে প্রচ্ছন্ন।' শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের এই

সতীশচন্দ্র রায়

সমর্পিত-প্রাণ শিক্ষক রবীন্দ্রকবিতাধর্মে ওতপ্রোত নিমগ্ন হয়ে ধীরে ধীরে পরিমার্জিত রচনার প্রকরণ আয়ত্ত করছিলেন। নিসর্গপ্রেম ও রোমান্টিক কবিপ্রাণের একাত্মতা সতীশচন্দ্রের কবিতায় কখনো কখনো মরমিয়া ভাষায় সঞ্চারিত হয়ে ফিরেছে। ছোট কয়েকটি আখ্যায়িকা-কবিতাও তিনি লিখেছিলেন; 'চণ্ডালী' তেমনি একটি; রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কাহিনী নিয়ে লেখা। একই গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, পরবর্তী কালে, তাঁর 'চণ্ডালিকা' নাটকে।

সতীশচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্রানুরক্ত মনের গড়া রবীন্দ্র-অনপেক্ষিত স্বাধীন কবিতাকলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। কবির অকালমৃত্যুতে সে সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে।

রবীন্দ্র-অনুরাগী অথচ রবীন্দ্র-অনুসরণ-নিরপেক্ষ কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতা রচনায় একাধারে তিনি অজস্র এবং বিচিত্রকর্মা ছিলেন। কবিতার রূপকলা, তথা, ছন্দ-সৌন্দর্যের প্রতি কবির আগ্রহ ছিল আত্যন্তিক। বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজি ছন্দ নিয়ে কবিতায় ইনি নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অনুবাদ-কবিতাও লিখেছিলেন প্রচুর। সমসাময়িক ঘটনা কিংবা ব্যক্তিত্ব নিয়েও কবিতা কম লেখেন নি। আসলে, মনে হয়, অন্তর্লীন রোমান্টিক মনঃপ্রবণতাকে প্রচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ যেন কবিতা-রূপ ও কবিতা-বিষয়ের প্রতি স্বতন্ত্র মাত্রায় আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত গদ্যপ্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র ছিলেন তিনি ; আর ঐ উত্তরাধিকারের সার্থক ব্যবহার করতে পেরেছেন কবিতা-বিষয়ে মননশীল জ্ঞান-সিদ্ধ প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তাঁর উল্লেখ্য কবিতা সংকলনগুলির মধ্যে আছে : 'সবিতা' (১৯০০), 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬) 'হোমশিখা' (১৯০৭),'তীর্থ সলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'অভ্রআবীর' (১৯১৬), 'হসন্তিকা' (১৯১৭) ইত্যাদি। নামেই প্রকাশ —'হসন্তিকা' হাসির কবিতার গুচ্ছ। 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু' অনুবাদ কবিতার সমষ্টি।

সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন, কিংবা অব্যবহিত স্বল্প বয়স্কদের মধ্যে কবিতায় একান্তভাবে রবীন্দ্রানুসরণের দাবি নিয়ে একদল কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। পক্ষান্তরে তাঁদের 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবিও বলা যেতে পারে। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের ১৬ বছর বয়সে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরে ঠাকুর বাড়ির স্বজনদের মধ্যে সম্পাদনার দায়িত্ব হাত ফেরত হয়েছে বারে বারে—সর্বত্রই সামর্থ্যের স্বাক্ষর ছিল তর্কাতীত। ১৯১৫-২২ খ্রিস্টসাল অবধি অবনীন্দ্র-জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁরই উদ্যম এবং অসামান্য দক্ষতায় রবীন্দ্রানুরাগী এক তরুণ সাহিত্য-শিল্প-গোষ্ঠীর সমবায় ঘটেছিল 'ভারতী'র 'আড্ডা'য় ; এরা ভারতী গোষ্ঠীর শিল্পি-সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

'ভারতী'-গোষ্ঠী

'সোনার তরী'-'চিত্রা'র সময় হতে রবীন্দ্রকবিতা আশ্রয় করে সমকালীন বাংলা কাব্যে পল্লীনির্ভর প্রকৃতি-জীবন উজ্জ্বল স্বাধিকারবশে প্রবেশ লাভ করে। প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, অগণিত মানুষের আন্তরিক সরলতা ও সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা—সব কিছু মিলে পল্লীজীবনের আবিষ্কার যৌবনদীপ্ত রবীন্দ্রভাবনায় এক অতীন্দ্রিয় মোহাবেশের সঞ্চার করেছিল, যার অনেকটাই রোমান্টিক ভাবাকুলতা প্রবণ। এসবই উনিশ শতকের সীমান্ত-কথা। রবীন্দ্র-ভাবনায় সেই পল্লী ও রোমান্টিক জীবনপ্রীতি নিয়ে বিশ শতকের সূচনা লগ্নে এই কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রানুসরণে প্রয়াসী হন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-কলাধর্মের সূক্ষ্ম-সুনিপুণ স্পর্শাতুরতা তাতে আভাসিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাশৈলী অনেকের অনেক লেখায় অনুসৃত হয়েছিল বেশি করে।

'রবীন্দ্রানুসারী' কবিকুল

এই কবিগোষ্ঠীর অগ্রজ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) পল্লীবাসী পল্লী-প্রিয় কবি রূপেই বিখ্যাত। পল্লীপ্রকৃতির বহিরঙ্গ সুষমা তাঁর কবিতায় ছন্দের বিচিত্র চঞ্চলতায় প্রকাশ পেয়েছে। 'বঙ্গমঙ্গল' (১৩০৮), 'প্রসাদী' (১৩১১), 'ঝরাফুল' (১৩১৮), 'শান্তিজল' (১৩২০) প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লীপ্রীতির আন্তরিক আত্মমগ্নতার সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল কুমুদরঞ্জন মল্লিকের (১৮৮২-

১৯৭১) কবিতায়। তাঁর কবি-মন কখনোই নিজের দেশ-কালের অধিবাসী হতে পারেনি। একান্ত বৈষ্ণব অনুরক্তি-গাঢ় তাঁর ভাবনা চৈতন্যলীলা-পরিকর গ্রামীণ পরিবেশে স্বপ্ন-বিচরণ করে ফিরেছে। মধ্যযুগের কাব্যবাণীর মতোই তাঁর কবিতার ভাষাও সরল, অনাড়ম্বর, কিন্তু আন্তরিক। 'বনতুলসী' (১৩১৮), 'উজানী' (১৩১৮), 'বীথি' (১৩২২), 'নুপুব' (১৩২৮) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য কবিতা-সংকলন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

যতীন্দ্রমোহন বাগচির (১৮৭৮-১৯৫৫) পল্লীপ্রীতি দীর্ঘ শহরবাসের অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ের তুলনায় উদ্বেল আবেগের সহজতা তাঁর কবিতাকে অনেক সময়ে হৃদয়গ্রাহী করেছিল। প্রকৃতির মনোবম রূপায়ণ আছে তাঁর কবিতায়, সেই সঙ্গে সহজ জীবনযাপনের অনুষঙ্গী ছোট ছোট আবেগ, মুহূর্তগুলি উজ্জ্বল তারার মতো ফুটেছে। তাঁর কল্পনা ও প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রচ্ছায়া স্পষ্টতর। 'লেখা' (১৩১০), 'রেখা' (১৩১৭), 'অপরাজিতা' (১৩২০) ইত্যাদি ছাড়া 'মহাভারতী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী'ব ভাব-ভাষার আদর্শ অনুসরণে কবি পুবাণ-কথার নব মানবায়ন সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

কবি কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) পেশায় শিক্ষক, বিশ্বাসে বৈষ্ণব, এবং অধ্যয়নসূত্রে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁব কবিতায় সহজ হৃদয়ানুভব অনাড়ম্বর সবল ভাষায় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল। জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা-অনুভব তাঁর কবিতায় অনতিতীব্র ভাবাবেগের সঞ্চার করে থাকে। 'কুন্দ' (১৩১৫), 'কিশলয' (১৩১৮), 'বল্লরী' (১৩২১), 'বজ্রবেণু' (১৩২২) ইত্যাদি কালিদাস রায়েব কয়েকটি উল্লেখ্য কাব্য।

কালিদাস বায

ববীন্দ্রানুসারী কবিতা রচনার ধারায় প্রিয়ম্বদা দেবীর (১৮৭১-১৯৩৫) স্থান বিশিষ্ট। রবীন্দ্র-নৈকট্য লাভ করেছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজে সুমিত কবিতার ওপরে কখনো কখনো লেখনী চালনা করেছিলেন। ফলে, এক সময়ে, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর কিছু নামছুট কবিতা ভুল করে নিজের রচনা বলেও সনাক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাহলেও, প্রিয়ম্বদার গীতিকবিতা রচনায় নারীচিত্তের কুণ্ঠিত প্রেমানুভবের আসঙ্গে নিবিড় প্রকৃতি-মগ্নতা তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় গড়ে দিয়েছিল। 'রেণু' (১৯০১), 'পত্রলেখা' (১৯১১), 'অংশু' (১৯২৭) এবং মৃত্যুত্তর প্রকাশনা 'চম্পা ও পাটল' (১৯৩৯) কাব্যে তাঁর বেশ কিছু কবিতা সংকলিত হয়ে আছে।

প্রিয়ম্বদা দেবী

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) মুখ্যত সংগীত-রচয়িতা; তাঁর স্বদেশী সংগীত পরাধীনতা-মুক্তির ইতিহাসে একদা উত্তাল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল ; তাঁর মর্মমাঙ্গিত ভক্তি-সংগীত যুগপৎ ধর্ম ও সাহিত্যভাবনার সার্থক নিদর্শন। কবি হিশেবে তাঁর স্বতন্ত্র ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কবিতাগুলির সমধর্মী কবিতা-কণা রচনার সফলতায়। আপন ব্যথিত চেতনার গভীর সমর্পণ ঐ কবিতা সমূহে স্বত-উদ্ধারিত।

বজনীকান্ত সেন

(গ) গল্প-উপন্যাস

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯৩২) অবতীর্ণ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায়। তাঁর সৃজনী প্রতিভার প্রথম প্রকাশ মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় অজস্র কবিতা লিখে। রবীন্দ্র-কাব্যেব সানুরাগ সমালোচনা উপলক্ষে তিনি গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই তাঁর গদ্য রচনার সূত্রপাত।

প্রধানত ছোটগল্প লিখেই প্রভাতকুমাব একদা প্রভূত জনপ্রয়তা অর্জন কবেছিলেন। জীবনেব অনতিগভীব নিয়ে সহজ সমস্যা সরল ভাবাবেগভবা গল্প রচনাতে তাঁর এক ধরনের সহজাত দক্ষতা ছিল। যে-কোনো বিষয় নিয়েই প্রভাতকুমাব গল্প লিখতে পাবতেন, এবং তা তাৎক্ষণিক মনোহাবিতায় জনপ্রিয় হয়ে উঠত। কিছু গল্প কৌতুকপ্রধান, কিছু জটিল সমস্যাব প্রসঙ্গবদ্ধ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবল বেখায় বাহিত। ববীন্দ্রনাথেব দেওয়া প্লট নিয়ে লেখা 'দেবী' গল্পে প্রভাতকুমারের এই প্রবণতার পবিচয় স্পষ্ট।

প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়

তাঁব লেখা অনধিক ১২টি গল্প সংকলনেব মধ্যে 'নবকথা'(১৯০০), 'ষোড়শী' (১৯০৬),'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), গহনাব বাক্স'(১৯২১),'হতাশ প্রেমিক' (১৯২৪) ইত্যাদি রয়েছে।

গল্প ছাড়া উপন্যাস বচনাতেও হাত দিয়েছিলেন প্রভাতকুমার, এবং কবিতা গল্পেব মতো সাহিত্য ও পত্রিকাকে উপলক্ষ কবে তাদেব প্রকাশ। নিজেও তিনি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনেব সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁব প্রথম উপন্যাস 'বমাসুন্দবী' গ্রন্থিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে। অপবাপব উপন্যাসেব মধ্যে আছে 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২) 'সিঁদুব কৌটা'(১৯১৯) 'সুখেব মিলন' (১৯২৭), 'গবীব স্বামী' (১৯৩০) ইত্যাদি।

জমাট গল্প বলাব দিকেই প্রভাতকুমাবেব ঝোঁক ছিল। ফলে কৌতুক গল্প, পশুজীবন নিয়ে লেখা গল্প, স্বল্প আবেগে আন্দোলিত ভাবালু গল্প এই সব মিলিয়েই তাঁব বচনা এক কালে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং একালেও তাব সুখপাঠ্যতা অনস্বীকার্য। ঐ একই প্রবণতাব বশেই তাব উপন্যাসবাজি গালগল্পেব আবেদন সীমা কদাচিৎ অতিক্রম কবতে পেবেছে।

শিল্প-চেতনাব গভীবে ববীন্দ্রানুবাগ, তথা, আপন সৃষ্টি ধর্মেব মূলে ববীন্দ্রকলা ববণেব আগ্রহ সত্ত্বেও স্বাতন্ত্র্যেব দীপ্তিতে ভাস্বব স্মবণীয়তম নাম কথাশিল্পী শবৎচন্দ্রেব (১৮৭৬ ১৯৩৮)। একসময়ে শবৎ প্রতিভাকে বাংলা কথা সাহিত্যেব ধাবায় বিস্ময়কব, আকস্মিক আবির্ভাব বলে গণ্য কবা হত। কিন্তু শিল্পী স্বয় অকুণ্ঠিত ভাষায় দাবি কবেছেন, ববীন্দ্রনাথেব চোখেব বালি পড়ে তিনি সৃজনকর্মে উদ্দীপিত হয়েছিলেন, ববীন্দ্রনাথেব গোবা কণ্ঠস্থ কবে স্বাধীন গদ্য বচনাব অধিকাব কবেছিলেন আয়ত্ত। সবচেয়ে বড় কথা, শবৎচন্দ্রেব শিল্প চেতনাব মজ্জায় ছিল ববীন্দ্র প্রত্যয়েব সাধর্ম্য –'মানুষেব শক্তিকে অবিশ্বাস কবা' তিনিও 'পাপ বলেই মনে কবতেন।

শবৎচন্দ্র

এ সব সত্ত্বেও ববীন্দ্র বচনা হতে শবৎ সাহিত্যেব স্বাদুতাব স্বতন্ত্রতা স্বতঃস্ফুট। 'আধুনিকতা' প্রণোদিত নবজাগবণ যুগেব বাংলা সাহিত্য আসলে ছিল ইংবেজি শিক্ষিত নাগবিক মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভব, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীব গ্রামীণ কিংবা শহবেব উপান্তবাসী মানুষেব জীবন এ সাহিত্যে শিল্পরূপ পেয়েছে কদাচিৎ। বঙ্কিমযুগে তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েব বচনাসমূহ গ্রাম্য জীবনেব তথ্যচিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রেব সামাজিক উপন্যাসেব গোটা প্রচ্ছদটিই গ্রামে প্রসাবিত, কিন্তু গ্রামেব জীবন সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। ববীন্দ্র উপন্যাসে কবুণা', 'চোখেব বালি, 'নৌকাডুবি' 'গোবা'তে গ্রামেব জীবন অংশত উপস্থাপিত বয়েছে, কিন্তু গ্রামজীবনেব গভীবে স্বভাবত-ই কবি প্রবেশ কবতে পাবেন নি। নবজাগবণেব জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, শহর-গ্রামে, 'বডলোক' 'ছোটলোকে' এই দূবত্ব গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিকতাব অভিঘাতে। শবৎচন্দ্রেব অসাধাবণ সুবিধে হয়েছিল ব্রাহ্মণ পবিবাবে জন্মে, মধ্যবিত্ত সংস্কাবেব অন্তর্ভুক্ত হয়েও, গ্রামে শহবে ছড়ানো সাধাবণ– 'পতিত নবনাবীব অন্তবঙ্গ জীবনস্পর্শ তিনি লাভ

করেছিলেন আপন আবাল্য অভিজ্ঞতার বিচিত্র সূত্রেই। ফলে, পতিতা পদস্খলিতা নারী, 'চরিত্রহীন' পুরুষ, শরৎ-সাহিত্যেই প্রথম নায়ক-নায়িকার ভূমিকা পেল। অথচ আপাতভ্রষ্টতার আবরণ ভেদ করে তাদের ব্যক্তিত্বে সমুন্নীত এক নূতন মানবিক মাত্রার উদ্ভাস ঘটিয়ে তুলেছেন শিল্পী সর্বত্র। বারবণিতা চন্দ্রমুখী সেখানে 'পারুর চেয়েও বড়', পিয়ারী বাইজী লক্ষ্মীপ্রতিমা রাজলক্ষ্মী, কুলত্যাগিনী সাবিত্রী 'সীতা-সাবিত্রীর'ও বাড়া! আস.ল জীবনের অন্ধকারময় অপূর্ব অভিজ্ঞতার আস্টেপৃষ্ঠে মধ্যবিত্ত মূল্যচেতনার উজ্জ্বল আলোকে বিচ্ছুরণ ঘটাতে পেরেই শরৎচন্দ্র শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্তের সাহিত্যে অবিচল প্রতিষ্ঠায় অমর হয়ে আছেন।

শরৎচন্দ্র নিজে বলেছিলেন, "লোকে বলে পতিতাদের আমি সমর্থন করি। সমর্থন আমি কিছুই করিনে। কেবল অপমান করতেই মন চায় না। আমি বলি, এরাও মানুষ ; এদেরও নালিশ জানাবার অধিকার আছে।" এই মানবিক মাত্রার স্বীকরণ এবং সংযোজনা শরৎসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শরৎচন্দ্রকে দারিদ্র্য লাঞ্ছিত সর্বহারা জীবনের শিল্পী রূপেও সংবর্ধিত করা হয়। নিজে তিনি বলেছিলেন —"এ জীবনে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসেব নিলে না কখনো, তাদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে।" এখানেও শরৎচন্দ্র আসলে লাঞ্ছিত মানব-আত্মারই সহৃদয় রূপকার।

একালে অর্থা...কেই দারিদ্র্য, তথা মানবিক দৈন্যেরও স্বাভাবিক কারণ বলে মনে করা হয়; শরৎচন্দ্রের রচনাতে দরিদ্রের সংখ্যাও অগণন। তাহলেও তাঁর গল্প-উপন্যাসের গহন হতে যে দারিদ্র্যের আর্তি ভেসে এসেছে, সে মানবাত্মারই, আর্থিক অনটনের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। 'চরিত্রহীন' এ সাবিত্রীকে দেখি সতীশের কাছে ছুটে আসতে হয়েছে মাত্র ত্রিশটি টাকা চাইবার জন্যে নতুন মনিব তার অসুখের সময়ে ওষুধ পথ্যে যে-খরচ করেছিলেন, তা মিটিয়ে দিতে। কিন্তু এই অর্থাভাব কোনো দীনতার ছাপই রেখে যেতে পারে নি তার দেহ-মনে। সতীশের অনুপস্থিতিতে তারই ঘরে স্নান-ধৌত দেহ মন নিয়ে দেবী সাবিত্রীর মতোই তাকে মহীয়সী দেখাচ্ছিল। 'পল্লীসমাজ'-এ আকবর সর্দার দরিদ্র ছিল, কিন্তু দারিদ্র্যকে সে করেছিল মহীয়ান। 'জ্যেঠাইমা'র পরেই 'পল্লীসমাজ'-এর মহত্তম মানুষ আকবর সর্দার। দুজনেই শিল্পীর ভাবাবেগে বিকম্পিত।

আর্থিক দারিদ্র্যের আঘাত শরৎচন্দ্রের একটি ছোট ও একটি বড় গল্পের পরি... মকে প্রভাবিত করেছে,—প্রথমটি 'মহেশ', আর দ্বিতীয়টি 'অরক্ষণীয়া'। কিন্তু 'মহেশ' গল্পে গফুর-এর ট্র্যাজেডির সবটুকুই তার অর্থাভাবের জন্যে নয়। সমাজের হাতে,—উচ্চ-জ উচ্চবিত্ত মানুষের হাতে, হৃদয়হীন নির্মমতার আঘাত তার ভেতরকার মানুষটিকে জর্জরিত করেছিল। সেই মর্মান্তিক আঘাতের ক্রমিক রূঢ়তা গফুরের মানব-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে, মুহূর্তের জন্য তার মধ্যে জেগে উঠেছিল পাশব হিংস্রতা ; তারই যূপবেদীতে নিহত হয়েছে প্রাণের বাড়া নিরীহ জীব মহেশ। এ সব কিছুই মুহূর্তের আত্মবিস্মরণের ফল, ঠিক পরমুহূর্তেই গফুরের মধ্যে ব্যথাহত মানব-প্রাণ আবার জেগে উঠেছে মর্মমন্থনের সঙ্গে। এখানে অর্থ-হীন গফুর, আর অর্থ-প্রাচুর্যময়ী 'পল্লীসমাজ'-এর রমা শরৎ-শিল্পচেতনায় অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। গফুরের মতোই সর্বহারা হয়েছিল রমা,—গফুরের মতোই রিক্ততার লজ্জা... যাতনা নিয়ে তাকেও ঘর ছাড়তে হয়েছিল। 'অরক্ষণীয়া'র কথাও প্রায় একই। শরৎচন্দ্রের সকল রচনাতেই মানবতার দরবারে নির্যাতিত মানব-প্রাণের আর্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সকল লাঞ্ছনা, সকল গ্লানির অতল থেকে মানব-আত্মার অজরামর দ্যুতিকে আবার আলোক দীপ্ত করে তুলেছেন তিনি। এখানেই শিল্পী শরৎচন্দ্র কেবল দীন-দরদী নন, শাশ্বত মানব-দরদীও। পরাভূত মানবতার বিজয়-

কেতনধারী শরৎচন্দ্র জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে রবীন্দ্র-প্রেমধর্মেরই দীপ্ত উত্তরাধিকারী।

জীবন-চৈতন্যের সাধর্ম্যে কবি ও কথা-শিল্পী অভিন্ন। তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে জীবন-দৃষ্টির স্বকীয়তায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে সার্বিক জীবনাদর্শের বর্ণে অনুরঞ্জিত করে নির্বিশেষ বিশ্বজনীনতা দিয়েছিলেন। একদা বঙ্কিম-উপন্যাসের চন্দ্রশেখর-প্রতাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, "তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি ও দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই।" রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে আরো ব্যাপক অর্থে বলা যেতে পারে,—সর্বদেশ-কালের অভিজ্ঞানে তা শাশ্বত সর্বজনীনতায় বিশেষিত। শরৎচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টি এর বিপরীত, তিনি যেন একান্তভাবে 'বাঙালি আঁকতে'ই বসেছিলেন। বাংলাদেশের সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি-ধর্মকে পৃথক্ ভাবে, নিবিড় সম্পূর্ণ করে জানা না থাকলে শরৎ-সাহিত্যের রসাস্বাদন প্রায় অসম্ভব হয়। দেশীয়তা ও কালানুগতার ছাপ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে একদিকে বাঙালির প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনানুভবেব সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়েছে এই সাহিত্য-প্রবাহ। আর একদিকে, বিশেষ দেশকালের সঙ্গে একান্ত অচ্ছেদ্যতার দরুন অনিবার্য এক সীমায়িতির সম্ভাবনাও জেগেছে তাতে। ফলে, সীমিত গণ্ডিতে বাঁধা জীবন-চিত্রায়ণ হেতু শরৎ-সাহিত্যের আবেগের উৎস যেমন তীব্র, তেমনি গভীর। রবীন্দ্র-কাব্যভাবনায় সহজ আবেগের ব্যাপ্তি ঘটেছে বিশ্বচারণের অনন্ত নভোলোকে ; রবীন্দ্র-রচনায় অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যেও অতল গভীরতা লাভ সম্ভব হয়েছে কবির ধ্যান-মনীষাদীপ্ত বিশ্বচৈতন্যের প্রভাবে। শরৎচন্দ্রের জীবনাবেগে গভীরতা আছে, কিন্তু বাঙালি জীবনের সীমিত গণ্ডির বাইরে তার ব্যাপ্তি নেই। তাই, তাঁর বচনার শিল্পদেহে সুচিন্তিত অবয়ব-বিন্যাস নেই, আবেগের স্ফীত উচ্ছ্বাস আপনা থেকেই আপনি যেন অঙ্গ ধরে গল্পকে তার ঈপ্সিত পরিণাম-মুখে পৌঁছে দিয়েছে।

প্রথমাবধি শরৎচন্দ্রের সকল রচনারই এই বৈশিষ্ট্য; বহিরাঙ্গিকের শিথিলতা আর অন্তরঙ্গে আবেগের প্রগাঢ়তা। শরৎচন্দ্রের রচনায় ছোটগল্প নেই বড় একটা। তার কারণ এই নয় যে, জীবনের খণ্ড-ক্ষুদ্র মুহূর্তকে তলিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার সাধ্যের বিন্দুমাত্র অভাবও ছিল তাঁর ; তবু মুহূর্তের অনুভবকে অখণ্ড জীবন-মূল্যে উদ্ভাসিত করার রূপ-দক্ষতা বা পরিচ্ছন্ন আঙ্গিক-মগ্নতা তাঁর আবেগ-স্ফীত কল্পনার পরিপন্থী ছিল। তাই, 'বড়দিদি', 'পথনির্দেশ', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' ইত্যাদি সব কয়টি গল্পই আসলে সংক্ষিপ্ত আকারের উপন্যাস; বড়গল্প। 'চন্দ্রনাথ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই' প্রভৃতি গ্রন্থ-ও তাই। শরৎচন্দ্রের একমাত্র সার্থক ছোটগল্প 'মহেশ', সেই গল্পের দেহেও আবেগের সহজ স্ফীতি মাত্রা অতিক্রম করেছে।

'মন্দির' নামক গল্পটি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা,—বেনামিতে ছাপা হয়েছিল (১৩১০)। ১৩০৯ বাংলা সালের কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল গল্পটি। দ্বিতীয় প্রকাশিত রচনা 'বড়দিদি' ১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকার তিন সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম ছিল না ; তখন অনেকেই বলেছিলেন,—গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের নাম মুদ্রিত হয়। ১৩১৯ বাংলা সাল থেকে সাহিত্য-সাধনা ও রচনা-প্রকাশে নিয়মিত ভাবে তৎপর হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। ছোট-বড় আকারের গল্প ও রোমান্স-এর কথা ছেড়ে দিলে 'চরিত্রহীন', চারখণ্ড 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', এবং 'শেষপ্রশ্ন' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। চার খণ্ডে সমাপ্ত দ্বিতীয় গ্রন্থটি শিল্পীর জীবনীমূলক রচনা বলে অভিহিত হয়। হৃদয়দ্রাবী sentiment রচনায় 'দেবদাস' ও 'পল্লীসমাজ'-এর জনপ্রিয়তাও প্রায় অতুলনীয়।

সকল রচনাতেই নিজের ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পীর আবেগে গলিয়ে জীবন্ত রূপ

দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। আর আগে বলেছি, তাঁর নিজের আবেগ-অভিজ্ঞতা, সব কিছু বাঙালি জীবনের সীমার মধ্যেই আস্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। তাই তাঁর অসংখ্য গল্প-উপন্যাসে নর-নারীর চরিত্রে একই জীবন-রূপের type অঙ্কিত হয়েছে যেন ; তাদের মধ্যে পৃথক্ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের নিশ্চিত পদক্ষেপ নেই। পুরুষ চরিত্রগুলি সুকঠিন দেহ এবং মনোবলের অধিকারী হয়েও প্রাণের অতলে অসহায় উদাসীন; অনেকটাই সতীহারা শিবের মতো। নারী সেখানে অন্নপূর্ণা। রুদ্র-পৌরুষের আত্মবিস্মৃত, এমন কি কখনো কখনো আত্মনাশী শক্তিকে প্রাণের উত্তপ্ত আশ্রয় দিয়ে কল্যাণ-স্নিগ্ধ সুন্দরতায় ভরে তোলার সাধনাই শরৎ-সাহিত্যে নারীর একমাত্র ভূমিকা। এই উপলক্ষে নারীকে অনেক সময়েই সমাজ-ত্যক্ত, লাঞ্ছিত মূর্তিতে অঙ্কন কবা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলির অনেক কয়টিই নায়কের বৈধী পত্নী নয়,— কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমেব ব্যক্তিত্বে তারা সতী-সাবিত্রীর বাড়া। অনিলা দেবী-র ছদ্মনামে লেখা 'নারীর মূল্য'-তে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যে যদি স্থান না পায়,—এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায় ?" বাইজি পিয়াবী ও কুলত্যাগিনী সাবিত্রীর জীবনে সাহিত্যেব এই সত্যকেই অমর করেছেন শরৎচন্দ্র।

কেবল জীবন-চিন্তার বিশিষ্টতায নয়, প্রকাশ-ভঙ্গির স্বকীয়তাতেও তিনি ছিলেন অনন্য। আগে বলেছি, কি রচনাঙ্গিক, কি ভাষা সৃষ্টি, কোনো ক্ষেত্রেই সচেতন রূপ-চিন্তার অবকাশ শরৎ-চেতনায় ছি... ... প্রাণে... আবেগে প্রাণের কথাই বলতে গিয়ে তার প্রাঞ্জলতা যেমন মর্মস্পর্শী হয়েছে, তেমনি বিশেষ কবিত্বগুণ-হীনতা সত্ত্বেও ভাষা-ভঙ্গি হয়েছে প্রাণরসে উচ্ছল—সুন্দব।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রানুবাগের আওতায় এসেই প্রত্ন-পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০) উপন্যাস রচনাতেও উৎসাহিত হয়েছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যাযের 'ভারতী'-গোষ্ঠিব অংশীদার হয়েছিলেন তিনি। প্রধানত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস-কথা রচনা করে একদা তিনি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিলেন। 'শশাঙ্ক' (১৯১৪), 'ধর্ম্মপাল' (১৯১৫), 'ময়ূখ' (১৯১৬), 'করুণা' (১৯১৭) এই সব রচনার অন্তর্গত।

অনুরূপা দেবী

মহিলা লেখিকাদের মধ্যে এই সময়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ... রূপাদেবী (১৮৮২-১৯৫৮)। ইনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী এবং রবীন্দ্রদুহিতা মাধুরীলতার বান্ধবী ছিলেন। হিন্দু রক্ষণশীল আদর্শের পরিপোষণে অনুরূপা একদা অজস্র দীর্ঘকায় উপন্যাস লিখেছিলেন। নারীসুলভ আবেগ-মন্থন ও আদর্শ-উপদেশ বর্ষণের অতি প্রয়াসে সচেতন তাঁর রচনাগুচ্ছ বহুল ভারাক্রান্ত। 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১), 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০) তাঁর একদাখ্যাত উপন্যাসগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দিবা দেবী

অনুরূপার অগ্রজা ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯-১৯২২) গল্প লিখে এক সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, প্লট পরিকল্পনায়, এবং বিন্যাসে সবত্রই নারীহস্তের স্নিগ্ধতা, স্পষ্টতা জড়ানো। 'নির্মাল্য' (১৯১৫), 'কেতকী' (১৯১৫) এবং 'ফুলের তোড়া' তাঁর তিনটি গল্পসংকলন গ্রন্থ।

নিরুপমা দেবী

গল্পে যেমন ইন্দিরা, উপন্যাসে তেমনি নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) তাঁর মেয়েলি মনের ছোঁয়া দিয়ে এক সময় সহৃদয় আকর্ষণ গড়ে তুলেছিলেন। 'অন্নপূর্ণাব মন্দির' (১৯১৩) তাঁর প্রথম উপন্যাস ; 'দিদি' (১৯১৫) এবং 'শ্যামলী' (১৯১৮) জনপ্রিয়তা-সিদ্ধ।

নিরুপমার একটি কবিতাগ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ :'গোধূলি' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)।

নিরুপমা শেষপর্যন্ত 'ভারতী' গোষ্ঠির লেখিকা বলেই স্বীকৃত। কিন্তু শরৎ-বলয়ের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক সংযোগের প্রসঙ্গও স্মরণীয়। ভাগলপুরে শিল্পিক উদ্দীপনায় উদীয়মান শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একদল কিশোর শিল্পি-প্রতিভার কোরকমোচন সংঘটিত হয়ে চলেছিল। এঁদের সঙ্গে পরবর্তী কালের মনোরম গল্প-উপন্যাসের লেখক কলকাতা নিবাসী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও (১৮৮৩-১৯৬০) পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন; বিখ্যাত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রের সম্পাদনাও তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্টের সঙ্গে নিরুপমাও অল্প বয়সে অন্তরাল হতে এই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন ভাগলপুরেই।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮ - ১৯২৯) প্রবর্তনায় গড়া 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কথাব চিয়তাদের মধ্যে তাঁর নিজের ভূমিকাও ছিল স্মরণীয়। এই সময়ে মহাদৈশিক সাহিত্য. -- 'কন্টিনেন্ট্যাল লিটারেচার' এর প্রতি নতুন আগ্রহে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন অনেকেই। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সঞ্চার প্রধানত বাঙালি শিক্ষিতজনের ইংরেজি উদ্দীপনায় প্রভাবিত। এবারে য়ুরোপ এবং এশিয়া মহাদেশের. নানা সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে সংযোগ প্রসারিত করে, নতুন মাত্রা যোজনায় উৎসুকতা দেখা দিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর তীর্থসলিল অনুবাদ কাব্য গড়েছিলেন 'জগতের সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দুবিন্দু' সংগ্রহ করে। তাঁর আরো দুটি অনুবাদ কাব্যেও একই উৎসুকতার পরিচয় রয়েছে। তাছাড়া 'ভারতী'-গোষ্ঠীব মণিলাল স্বয়ং, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়(১৮৮৪-১৯৬৪), সত্যেন্দ্রনাথ এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) যথাক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসি, নরউইজান এবং র্জামান ভাষায় লেখা উপন্যাসেব ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ করেছিলেন বাংলায়। এ সময়কার গদ্যে-পদ্যে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগ প্রধানত বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদকেই ভিত্তি করে। মণিলাল নিজে বেশ কিছু অনুবাদ-গল্পের সঙ্গে কয়েকখানি মৌলিক গল্পের সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন।

ভারতী গোষ্ঠী ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সৌরীন্দ্রমোহন 'ভারতী' সম্পাদনায় দীর্ঘদিন স্বর্ণকুমারীর সহযোগী ছিলেন ; এবং পরে মণিলালেরও। গল্প, নাটক, উপন্যাস রচনায় তাঁর জনপ্রিয়তা একদা ব্যাপক হয়েছিল। গল্প লিখে একাধিকবার সেকালের মর্যাদাসূচক 'কুন্তলীন' সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। মৌলিক উপন্যাসের সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক অনুবাদ উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন প্রধানত ফরাসি এবং রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা অবলম্বন করে। কখনো মূলানুবাদ, কখনো অনুবাদের অনুবাদ।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথেব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। দুইখণ্ড 'রবিরশ্মি' জুড়ে রবীন্দ্র-কবিতা পাঠনের এক বিপুল আয়োজন তিনি করেছিলেন।এবং প্রশ্ন করে করে রবীন্দ্রনাথকেও তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। প্রধানত সে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভূমিকা থেকে তাঁর জ্ঞানান্বেষণার ফল। তাছাড়া কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর রচনা ছিল রীতিমতো ভূরি পরিমাণ। বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিকতা'র নতুন মাত্রা সন্ধানে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অংশীদারদের মধ্যেও চারুচন্দ্রের উৎসাহ ছিল প্রধান। একদিকে মুখ্যত য়ুরোপের 'কন্‌টিনেন্ট্যাল' সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সাযুজ্য বিধান, আর একদিকে দারিদ্র্য, উপেক্ষা ও সামাজিক লাঞ্ছনা-তাড়িত নিচের

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তলার মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যে বাস্তবিকতার এক নতুনতর মাত্রা নির্মাণে চারুচন্দ্রের উৎসাহ ছিল ব্যাপক। বলেছি, কন্‌টিনেন্ট্যাল সাহিত্যের মূল ভাষা সমূহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ এ সময়ের লেখদের মধ্যে অনেক সময়েই ছিল না। তেমনি, চারুচন্দ্রেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল না নিচু মানের জীবন সম্পর্কে। তাহলেও কিছুটা আধুনিকতার নতুন মাত্রা সন্ধানে আগ্রহ, বহুলাংশে ভাবালু কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব-মনোহর সমাজ-নিষিদ্ধ-প্রায় কাহিনী গড়ার দিকে তাঁব ঝোঁক ছিল বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাছেও গল্প-উপন্যাসের প্লট পেয়েছিলেন বেশ কয়েকটি।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

অন্যপক্ষে 'ভারতী'-গোষ্ঠীরই প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০ ১৯৬৬) কোনো প্রকাব পূর্বাদর্শের আগ্রহে নয়, সহজ সম্পৃক্ততা, ও সহৃদয়তার সূত্রেই, সমাজের নিচের তলার, অন্ধকার মহলেরও কাহিনীর, গল্পে-উপন্যাসে, সহজ সাবলীল রূপ দিয়েছিলেন। রচনায় মিতভাষী তীক্ষ্ম তির্যকতা বশে তাঁর গল্পের আবেদন মর্মভেদী হয়েছে অনায়াসে। স্বল্পপ্রসূ ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী , কিন্তু গল্প, উপন্যাসে, উভয়ত-ই স্বকীয়তাব উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা 'মহাস্থবির জাতক' বাংলা উপন্যাসে এক নতুন চরিত্র সংযোগ করেছিল।

দীনেন্দ্রনাথ রায়

মণিলালেব হাতে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর পত্তনেরও অনেকটা আগে, 'ভারতী' পত্রিকাতেই, দীনেন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৯ ১৯৪৩) পল্লীজীবনেব বাস্তবছবির মালা গেঁথেছিলেন ধারাবাহিকক্রমে, কথিকাব আকারে। পরে অনেক কয়েকটি লেখাই 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য', ইত্যাদি চারখণ্ড সংকলনে গ্রন্থিত হয়ে কথাসাহিত্যে নতুন স্বাদুতা সঞ্চার করেছিল রবীন্দ্রনাথেব 'গল্পগুচ্ছ'ব পল্লী-জীবনচ্ছবির প্রভাব নয়, তবু আদল তাতে চোখে পড়ে। তার চেয়েও বেশী স্মরণীয়তা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বাংলা ডিটেকটিভ গল্পের মোহময় অক্লান্ত রচনায়। 'রহস্যলহরী সিরিজ'এ দুশোরও বেশী উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পরাগত হলেও আরো দুজন স্বতন্ত্র-স্বভাব কথাশিল্পীর রচনা পরিচয় এখানেই স্মরণ করে রাখা ভালো। তাঁদের লেখায় আলোচ্য [illegible]র জীবনানুভবের প্রেরণাই প্রধানত কার্যকর হয়েছিল। রচনা-চরিত্রে দুজনের লেখাই হাস্যরস [illegible]গারী , তাহলেও দুজনেই ছিলেন রবীন্দ্রানুরক্ত, রবীন্দ্র সংবর্ধিত।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) মজার গল্প লিখতে আরম্ভ করেন নিজের ৫৬।৫৭ বছর বয়সে। আর সে-গল্পের পেছনে ১৩০০ বঙ্গাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অন্তরঙ্গ অনুভব এবং মূল্যবোধ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কেদারনাথের গল্পের আপাত আবেদন হাস্যলঘু; মজার গল্পই লিখেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর গভীরে একটি মূল্যবোধ, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ী বেদনা, ভোরের শুকতারার আভাস নিয়ে বর্তমান। কেদারনাথের গল্প আসলে গালগল্প—আখ্যায়িকার চরিত্র বিশিষ্ট। স্বতন্ত্র-স্বভাব হলেও রবীন্দ্রনাথের সন্তর্পণ মানবপ্রেম-চেতনার সগোত্র ছিল তাঁর জীবনপ্রেম। 'অ[illegible]শা কি ও কে' (১৯২১), 'কবুলতি' (১৯২৮) থেকে 'মা ফলেষু' (১৯৩৬), 'নমস্কারী' (১৯৪৪) ইত্যাদি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর।

রাজশেখর বসুও (১৮৮০-১৯৬০) 'পরশুরাম' ছদ্মনাম নিয়ে সরস গল্প রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন চল্লিশ-উর্ধ্ব বয়সে ; ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম কৌতুক-গল্প 'বিরিঞ্চি বাবা'র প্রকাশ ঘটে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। রাজশেখর অধ্যয়নসূত্রে বিজ্ঞানী; পেশায় যৌথ শিল্প-

ব্যবসায়ের পরিচালক। তাঁর হাসির গল্পের মেজাজ কেদারনাথের গল্পের চেয়ে গভীর। নিছক মজা নয়, প্রধানত কটাক্ষ সে-সব রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কখনো তা জীবনের দুর্বলতার প্রতি অনতি-প্রখর ব্যঙ্গচকিত, কখনো কেবলই কৌতুক-চপল। এই ধরনের লেখার মূলে লেখকের তীক্ষ্ণ-অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও তির্যক মনন-দৃষ্টির প্রভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। জীবনের উপান্ত বেলা পর্যন্ত অনবদ্য হাসির গল্পের সরবরাহ করে গেছেন শিল্পী, যার গভীরে নিহিত সামাজিক, কিংবা কখনো কখনো, ব্যক্তিক দুর্বলতা সম্পর্কে শিল্পীর অবহিত দৃষ্টি। একই হাস্যরস গল্পের পরিবেশ এবং গাল্পিকের মেজাজের ওপর নির্ভর করে গাঢ়-ফিকে নানা রকমের স্বাদুতা সঞ্চার করে ফিরেছে।

বাজশেখর বসু

প্রথম গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' (১৯২৫) প্রকাশিত হতেই রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে প্রকাশ্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সমাজ-জিজ্ঞাসুতার সঙ্গে ভাষা-জিজ্ঞাসাও মনস্বী বিজ্ঞানী রাজশেখরের আরো এক সহজ প্রবণতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে বাংলা বানান নির্ধারণ সমিতি গঠিত হয়েছিল তার সদস্য হিশেবে সমূহ প্রয়াসে এক প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজশেখর। 'চলন্তিকা' অভিধান সেই উদ্যমের অসাধাবণ ফসল। বাল্মীকিব রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারতের গদ্য সারানুবাদও তাঁর কঠোর শ্রমশীল মনস্বিতার আর এক সার্থক নিদর্শন।

তাঁর গল্প সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে আবো বয়েছে 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' থেকে 'নীলপদ্ম ইত্যাদি গল্প', 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' প্রভৃতি।

(ঘ) প্রবন্ধ ও গদ্য রচনায়

প্রবন্ধ-ভাবনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের উদ্যম উল্লেখ্য ছিল। 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের (১৮৬৫-১৯১৫) সহযোগে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক পত্র-প্রবন্ধ রচনার এক নূতন ধারার সূচনা করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্র-সুহৃদ প্রিয়নাথ সেনও (১৮৫৪-১৯১৬) সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধেব ক্ষেত্রে নূতন মান যোজনা করেন ; রবীন্দ্র-রচনার সমালোচনায় তাঁর সামর্থ্যের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল। তাছাড়া, বলেন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্র-প্রেরণা এবং রবীন্দ্র-সহযোগিতাব প্রসঙ্গ আগে উল্লিখিত হয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও (১৮৫৮-১৯৩৭) বিজ্ঞান-কথা, এবং ভাবুকতাশ্রিত একাধিক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রণোদনা তার পেছনে না থাকলেও, জগদীশচন্দ্রের মানসিকতাও ছিল রবীন্দ্র-বরণোন্মুখ।

ববীন্দ্রযুগেব প্রবন্ধ সূচনায ববীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধে রবীন্দ্রযুগ-প্রেরণা যাঁর রচনায় সবচেয়ে প্রস্ফুট হয়েছিল, তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। ভারতীয় সাধনার প্রাচীন সম্পদকে আধুনিক য়ুরোপের বিজ্ঞান-চিন্তার সূত্রে গেঁথে সামগ্রিকতা-সমৃদ্ধ জীবন-ভাবনার সন্ধানই ছিল রবীন্দ্র-অন্বেষার মূল কথা। বাংলা গদ্য প্রবন্ধের জন্মযুগে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেখেছি, একই সঙ্গে 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' লিখেছিলেন ; আর ঐ দুটি রচনাই প্রতীচ্য মনীষিগণের রচনা-নির্ভর। বিজ্ঞানের ছাত্র, তথা হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের ঐতিহ্যাধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের গভীরে ভারতীয় দার্শনিক জিজ্ঞাসার রহস্য সন্ধান, এবং সমন্বয় সাধনের মননশীল আয়াস করে গেছেন

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ জুড়ে। জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে চৈতন্য-লোকের যোগানুসন্ধান ও আবিষ্কারের চেষ্টা প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়েও তাঁর বিভিন্ন রচনা সর্বায়ত মনন-চিন্তার গভীরতার দ্যোতনাবহ। 'প্রকৃতি' (১৩০৩) তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন ; 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'মায়াপুরী' (১৩১৮), 'বিচিত্র জগৎ' (১৩২৭) এবং 'জগৎকথা' (১৩৩১) শীর্ষক প্রবন্ধগুচ্ছে প্রাচ্যপ্রতীচ্য দর্শনবিজ্ঞানের সমন্বয়-চিন্তার বিদ্যুৎদীপ্তি ক্রম-বিচ্ছুরিত। 'চরিত কথা' (১৩২০) মহৎ চরিত্র স্মরণে রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্রপূজা'র সগোত্র রচনা; 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৩২১), 'শব্দকথা' (১৩২৪), 'নানা কথা'তে (১৩৩১), ভাষা-সাহিত্যাদি বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৩১২) স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে প্রচলিত ব্রতকথার আদর্শে লেখা এক অনন্য সৃজনীকর্ম।

এই 'স্বদেশী' ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৩১২ বঙ্গাব্দ তথা ১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ'-বিধানের অনেক আগে থেকেই। বারুদ স্তূপ সংগৃহীত হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে ; ১৯০৫-এর কার্জনি অভিঘাত তাতে কেবল আগুন ধরিয়েছিল। আর সে বারুদের অন্তঃশক্তি উদ্ভূত হয়েছিল জাতীয় গৌরব চেতনা ও আত্মমহিমা আবিষ্কারের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। সেই যুগ-প্রবণতার দুই প্রধান উদ্গারক ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২-১৯৩০), আর দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

অক্ষয়কুমারের আগ্রহ ছি·। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে। ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের লিখিত ভারত-ইতিহাসে জাতীয় গৌরব গোপন কিংবা লাঘব করবার যে প্রবণতা ছিল, তার নিরসন করে সমুচিত নূতন তথ্য সহযোগে জাতীয় গৌরব-চেতনার প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর সকল উদ্যমের প্রধান কাম্য। বাংলা দেশের ইতিহাসের প্রতিই লেখকের ঝোঁক ছিল একান্ত। এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখ্য গ্রন্থরাজি 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩০৪), 'মীরকাশিম' (১৩১২), 'গৌড়লেখমালা' (১৩১৮), 'সীতারাম রায়' (১৩৩৫) ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র 'সিরাজদ্দৌলা' প্রবন্ধরাজি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই প্রথম প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে 'সাধনা'র পৃষ্ঠায়। 'সাধনা'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে কবির আগ্রহেই রচনার বাকি অংশ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের 'ধনা রবীন্দ্র-উৎসাহে পুষ্ট।

দীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিচয় গ্রথিত করে বিস্মৃত ঐতিহ্য-গৌরবের সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির চেতনাকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১৩০২ বাংলা সালে প্রকাশিত হতেই চতুর্দিক থেকে উৎসাহিত সংবর্ধনা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পড়ে লেখককে সংবর্ধনা জানিয়ে চিঠি লেখেন ; গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতেই একটি পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা-প্রবন্ধও লিখেছিলেন। গদ্যে-পদ্যে, গল্পে-প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্রের লেখনী ছিল অবারিতগতি। তাঁর লিখিত কিংবা সম্পাদিত গ্রন্থ সংখ্যা অন্যূন ৩৯। বাংলাদেশ ও তার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে লেখা দীনেশচন্দ্রের আরো দুখানি উল্লেখনীয় গ্রন্থ দুইখণ্ডে বিন্যস্ত 'বৃহৎবঙ্গ' (১৩৪১, ১৩৪২) এবং 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' (১৩২৯)। কথাসাহিত্যেও সাবলীল লেখনী চালনা করেছিলেন তিনি।

২। রবীন্দ্র 'বিরোধ'-এর প্রথম পর্যায় : রূপরেখা

রবীন্দ্র-বিরোধের প্রাথমিক বিবরণ

প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্ররচনার বিমুখতা ব্যক্তিগত প্রতিপাক্ষিকতার চেয়ে সাহিত্যিক আদর্শ-প্রেরণার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা কাব্য-কবিতাতেই নয়, বাংলা সাহিত্যের সকল ধারাতেই ভাব এবং ভাষার এক নূতন মাত্রা যোজনা করেছিলেন। কবিকল্পনার ক্ষেত্রে বাস্তবিকতার চেয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বরূপকে সন্ধান করা ছিল তাঁর কবি মনের সহজ প্রবণতা। অনেকটা সেই সূত্রেও ভাষাকে বাগর্থের বন্ধন-মুক্ত এক স্বতন্ত্র তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল।

কথাটা সহজে বোঝা যেতে পারে ছোটগল্পের প্রসঙ্গ ধরে। 'হিতবাদী' পত্রিকার (১২৯৮ সাল) শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখে চলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে যায়। আয়োজকদের অন্যতম দাবি ছিল, আরো 'লঘু ভাবের' গল্প লেখার , কোনো কোনো পাঠকের পক্ষ থেকে স্পষ্টতর প্লট-এর দাবিও ছিল। 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত অনেক গল্পই কাহিনীমুখ্য—কিন্তু 'পোষ্টমাষ্টার' একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ঐ ভাব, ভাষা এবং বাণীই রবীন্দ্রনাথের অনন্য স্বাতন্ত্র্যের দিশারি।

কাব্যে-সাহিত্যে এই স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার দাবি নিয়েই রবীন্দ্র-বিরোধিতার একটি সুনির্দিষ্ট, এবং কিছুটা সমবেত আয়োজন শুরু হয় 'সাহিত্য' পত্রিকাকে অবলম্বন করে। পত্রিকার সূচনা ১২৯৭ সালে, পরবর্তী বর্ষে সে পূর্ণায়তন হয়ে ওঠে , সে ঘটনা রবীন্দ্রনাথের 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক ছেড়ে 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের প্রায় সমকালীন।

একদিকে 'প্রচার' এবং 'নবজীবন', আর একদিকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ঘিরে হিন্দু ব্রাহ্মের সংঘাত বিতর্ক প্রবন্ধের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছিল আগে হতেই। 'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্র বিমুখ সংগঠনের মূলে তার প্রচ্ছন্ন প্রভাব থেকে থাকলেও, মুখ্যত রুচি ও আদর্শের বিমুখতাই হয়েছিল প্রধান। রবীন্দ্র-কবিতায় অর্থের অস্পষ্টতা—তথা 'হেঁয়ালি', তাতে নৈতিক মূল্যমানের স্খলন, এবং সাধারণ ভাবে গল্পসাহিত্যের গঠনশৈলী নিয়েই বিরোধিতার সূত্রপাত। অমৃতলাল বসু, চন্দ্রনাথ বসু, এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যেও কেউ কেউ এই আয়োজনে উৎসাহ বোধ করেছিলেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

তাহলেও, একাই সর্বমুখী আয়োজনের প্রধান হোতা ছিলেন 'সাহিত্য'-পত্রিকা সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০ - ১৯২১)। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারায় ছোটগল্প যথোচিত রূপ ধরতে পারছে না ভেবে প্রমথ চৌধুরীকে দিয়ে তিনি তাঁর পত্রিকায় ফরাসি গল্পের অনুবাদ করিয়েছিলেন প্রথম (১২৯৮)। তারপর হতে ক্রমশ বাংলায় অনুবাদ-গল্প রচনার একটা উৎসাহ জেগেছিল , যদিও তা রবীন্দ্রানুগ মৌলিক গল্পরচনা সামর্থ্যের প্রতিস্পর্ধী প্রায় কখনোই হতে পায় নি। সুরেশচন্দ্র নিজে কয়েকটি মৌলিক গল্প লিখেছিলেন। তার সংকলন 'সাজি', রচনা হিশেবে উল্লেখ্য নয় ; কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিমুখী আদর্শের একটা নিদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১ ১৯৪০) প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ছিলেন, 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর কিছু কবিতা প্রকাশিত হয় , 'স্বপ্নসংগীত' (১২৮৯) নামক 'গীতিকাব্য'ই তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। উত্তরপশ্চিম ভারতে ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনা করে ইনি খ্যাতিমান হন। বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক হিশেবেই তাঁর পরবর্তী পরিচয়, এবং রবীন্দ্রবিরোধিতাতেও, 'সাহিত্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায়, তিনিই স্বনামে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, 'কৈ-বিচিত্র্য' নামক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-প্রবন্ধ লিখে। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য'

পত্রিকাতেই তার জবাব পাঠান, এবং সম্পাদকীয় বিদ্রূপ মন্তব্যের সঙ্গে তা প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রনাথ সাতখানি উপন্যাস এবং কিছু গল্পও লিখেছিলেন, তিনটি সংকলনে যা সংগৃহীত। সে সবই প্রায় বড় গল্প। প্রাথমিক রচনায় বঙ্কিম পন্থাই শিল্পী অনুকরণ করেছিলেন—রোমান্টিক কাহিনী পরিবেশনের কাব্যাবিষ্ট উদ্যমে। তাঁর 'তমস্বিনী' (১৩০৭) উপন্যাসে 'উন্মুক্ত Realism-এর অবতারণা'র উদ্যম ও প্রকরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেছিলেন প্রিয়নাথ সেনকে লেখা এক ব্যক্তিগত পত্রে। উভয়ের সাহিত্যাদর্শগত পার্থক্য তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প রচনাগুচ্ছের মধ্যে উল্লেখনীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৬৬ ১৯৩১) গল্পাবলি। মজার গল্প লেখায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা অবিস্মরণীয়, যদিও আজ তা বিস্মৃত হয়েই আছে। 'ছোট ছোট গল্প' (১৩২২) এবং 'কর্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৩) নামে তাঁর দুখানি গল্পের সংকলন গ্রন্থিত হয়েছিল। তাতে মজার গল্পের শৈল্পিক স্বাদুতাই উপভোগ্য। রবীন্দ্র-বিরোধ রবণের সঙ্গে শিল্পীর অভিপ্রায়ের কোনো যোগ ছিল না।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র বিপরীত স্পষ্টতাদর্শের মুখপাত্র ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রুচির বিতর্কেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২ ১৯৪৯)। এক সময়ে তিনি রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন, এবং রবীন্দ্রানুকরণ প্রয়াস তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'কণিকা' কাব্য উৎসর্গ করেন। পরবর্তী কালে তিনি মুখ্যত দ্বিজেন্দ্রানুসারী এবং রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে পড়েন। সাহিত্য রচনায় প্রমথনাথ নিরলস ছিলেন সমসাময়িক অনেক সাহিত্য পত্রিকাতেই তাঁর লেখা সেকালে প্রকাশিত হত কবিতা ও নাটক ছিল তার রচনার মুখ্য বিষয়। 'পদ্মা' (১৮৯৮), 'দীপালী' (১৯০১), 'আরতি' (১৯০২) ইত্যাদি তার প্রাথমিক কবিতা সংকলন গ্রন্থ।

আলোচ্য পর্যায়ের রবীন্দ্র বিরোধের ধারায় উত্তাপ উত্তেজনা যত ছিল, সার্থক সমতল সৃষ্টির উৎসাহ তত নয়। পত্র পত্রিকার বিচ্ছিন্ন রচনায় কিংবা এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো কটাক্ষে বিদ্রূপের ভাগই ছিল প্রধান কখনো ও কোমল. 'প্রকাশিত হতেই প্রধানত রুচিবোধ নিয়ে প্রতিবাদী ... ... নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালিদাস সমা... ...' প্রবন্ধ, কিংবা বাহু' ... লেখা ... প্রসন্ন কালীপ্রসন্নদের 'মিঠে কড়া' কবিতা, অমৃতলাল বসুর '...বীমা' নাটকের সংলাপে প্রাসঙ্গিক কটাক্ষ এ সবই সেকালের রবীন্দ্রবিরোধিতার অবলম্বিত, —কখনো কখনো অশোভন প্রকাশের কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা 'আনন্দবিদায়' প্রহসন ... আক্রমণে অশালীনতার সে মাত্রাও ছাড়িয়েছিল আসল চিত্রটি ছিল রবীন্দ্র প্রবর্তিত নূতন সৃজনধর্ম যখন ... প্রতিভাকে উৎসাহিত উদ্বোধিত করে চলেছিল, তারই পাশে পুরাতন পন্থা প্রকরণের শিথিল অনুসারিতার সঙ্গে স... সংঘবদ্ধ রবীন্দ্র বিরোধিতাই ছিল এই পর্যায়ের প্রধান প্রবণতা

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগ : দ্বিতীয় পর্যায়

রবীন্দ্র যুগের দ্বিতীয় পর্যায়

আগে বলেছি, রবীন্দ্রযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা মোটামুটি ১৯১৪-সমকাল হতে। নানা দিক থেকেই এই ক ালটি তাৎপর্যবহ। নূতন যুগচেতনার মূল্য পরিমাপ, আগেও দেখেছি, নূতন ভাবাদর্শের দাবিতে নূতনতর রূপপ্রকরণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালির চেতনায় নবজাগরণের যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, সকল দিক থেকেই তার পূর্ণাহুতি এবং যুগপৎ নির্বাপণ ১৯১১-তে 'বঙ্গভঙ্গ' তথা 'স্বদেশী' আন্দোলনেব অবসানে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষীয়মাণ মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আবেগ-স্ফীত মূল্যবোধের দুর্বল আশ্রয়টি কোনো রকমে ধরে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল 'স্বদেশী'র উন্মাদনায়। তা শেষ হতেই, রেনেসাঁসের জীবন-প্রেরণা আমূল ভেঙে পড়ে।

শিক্ষিত তরুণের সামর্থ্য চাকুরির চাহিদায় একান্তবদ্ধ। চাকুরিহীন বেকার জীবনেব শূন্যতাবোধ, স্বদেশী-উত্তরকালে পুরাতন আবেগ ও ভাবাদর্শের প্রকট ব্যর্থতা, আর সেই সঙ্গে হঠাৎ ঘনিয়ে আসা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, সব মিলিয়ে এক নূতন হতাশা, সংশয় এবং বিভ্রান্তির অভিব্যক্তিতে ক্রমশ মুখর হয়ে উঠতে থাকে বাংলা সাহিত্যে, এই সময় হতেই। রবীন্দ্রনাথ আশা-ভরসার কবি, 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্বীকৃতি লাভ, সব কিছু মিলে এই দিশেহারা পরিবেশে রবীন্দ্র-বিরোধিতার একটা উচ্ছ্বাস অনেকটা দুর্বার হয়েছিল একই সময়ে। তাহলেও ঐ কালের রবীন্দ্র-বিরোধী তরুণ শিল্পীদের অনেকেই রবীন্দ্র-উন্মুখ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি-সুষমা, তাঁর পরিণামী বিশ্বাস-ভূয়িষ্ঠতা, এই সব শিল্পীর কৈশোর, বয়ঃসন্ধি-উন্মুখ যৌবনকে মথিত—উদ্বোধিত করেছিল। কিন্তু মনে যে ভরসার স্বপ্ন ধরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনে তাকে ধরা যায় না ; এই আক্ষেপ হতেই একটা বিরোধিতার সঞ্চার ঘটেছিল ; নানা স্তরে, নানা মাত্রায়। সেদিন রবীন্দ্রবরণের দলে মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই ; প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ছিলেন প্রধান সেনানী। রবীন্দ্রনাথ তরুণ জীবনের অভাবিত নূতন সমস্যাকে অন্তর-গভীরে অনুভব করে তারই স্বরূপ সন্ধান ও রূপায়ণে ব্রতী হলেন পদ্যে গদ্যে। কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধে, সর্বত্রই অন্ধকারের উৎসমূলে খুঁজে দেখতে চাইলেন আলোকেব উৎসার-বিন্দুটি। রবীন্দ্র-বিরোধীরা সেই মূল্যায়নকে স্বীকার করেও গ্রহণ করতে পারলেন না। এইভাবেই চলেছে একালের (১৯১৪-৪১) বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-বরণ-বিরোধের বিচিত্র ধারা। 'বরণ' হতে বিরোধে সেই আনাগোনার ছবিটার ছকটুকুই কেবল এখানে দেখা যেতে পারে।

১। রবীন্দ্রবরণে 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রনাথ

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ তথা ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসেই 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ; প্রথম সংখ্যাতেই 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে নতুন

যুগের ব্যাধির উৎসটা ধরে দিয়েছিলেন সঠিক। 'স্বদেশী' উদ্দীপনার শেষে বাঙালি জীবনে তখন "সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।"—তখন থেকেই 'বাঁধি বোলের' ঐ আঁধি কাটিয়ে দেবার জন্যেই লেখনী চালনা করে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই দুঃসাধ্য সাধনে 'সবুজপত্র' হয়েছিল প্রথম হাতিয়ার। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে ক্লৈব্যঘাতী গাণ্ডীবের ভূমিকাতেই পরিকল্পনা করেছিলেন। পদ্যে-গদ্যে বাঁধ-ভাঙার প্রয়াস ওখান থেকেই উৎসারিত হয়েছিল ; কবিতায় 'বলাকা'র মুক্তক ছন্দে গাঁথা মুক্তবাণীর তরঙ্গ, গল্পে 'হালদারগোষ্ঠী', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদিতে বন্ধনমোচনের দুরন্ত প্রয়াস ; 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতা-পীড়াক্রান্ত আধুনিক বাঙালি তারুণ্যের পথ খোঁজার দুর্বার অভিযান—এই সবই 'সবুজপত্র'-র পৃষ্ঠায় উদ্ভাসিত। পরে 'বলাকা' থেকে 'শেষ লেখা' ; 'হালদারগোষ্ঠী'-'স্ত্রীর পত্র' থেকে 'তিনসঙ্গী' গল্পমালা কিংবা 'মুসলমানীর গল্প' ; তথা 'চতুরঙ্গ' থেকে 'শেষের কবিতা' পেরিয়ে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই সংশয়াক্রান্ত, বিলুপ্ত-প্রত্যয় নতুন যুগের আত্মদীর্ণতার মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের পথ খুঁজে ফিরেছেন। এ-সব খবরই পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-রচনার ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে। তাকে নতুন করে, স্পষ্ট করে, বলার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা হল, এইসব রবীন্দ্রবরণ এবং রবীন্দ্র-বিরোধের মনোভাব দানা বেঁধে উঠেছিল ধীরে ধীরে ; অবশ্যই তারও পশ্চাৎপটে রয়েছে পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-রচনাবলির সম্পর্কে নতুন কালের বিচিত্র মনোভঙ্গির প্রভাবও।

'সবুজপত্র'তে রবীন্দ্রনাথ

নূতন যুগে 'সবুজপত্র'-র নতুন ভূমিকা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী একেবারে প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছিলেন, 'বাংলার মন যাতে বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে', তার ব্যবস্থা করাটাই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'সবুজপত্র'-র সম্পাদক রূপে, এবং 'বীরবল'-এর ভূমিকাতেও, বাঙালির মনকে অনতিতীব্র আঘাতে-চমকে জাগিয়ে রাখার দায়টা স্বীকার করেছিলেন তিনি। একটা স্তরে রবীন্দ্র-বিরোধের রক্ষণশীল প্রয়াসকে প্রতিহত করতেও উদ্যত হয়েছিলেন। গদ্যে-পদ্যে তাঁর লেখনীর প্রভাব ছিল অকুণ্ঠিত ; এবং আপন চরিত্রে প্রায় দ্বিতীয়-রহিত।

'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরী

ফরাসি সাহিত্যের বিদগ্ধ রসিক প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলার মনঃপ্রধান সাহিত্যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবিতা সঞ্চারের উদ্যম; হৃদয়ানুভবের পরিবর্তে মনন-চিন্তনের প্রতিষ্ঠা সাধন। কবিতায় 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) এবং 'পদচারণ' (১৯১৯) নামক সংকলন দুটিতে বাঙালি কবির অতিভাবালুতা এবং শিথিল রূপ-রচনার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। 'সনেট সঞ্চাশৎ' কেবল বাচ্য বিষয়েই চমকপ্রদ নয়, কবিতা-রূপের বাঁধুনিতেও বিদগ্ধ কাব্যচিন্তার পরিচয় তাতে স্পষ্ট। কথাসাহিত্যে সেই বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'চারইয়ারী কথা'য় (১৯১৬)। বাংলা গল্পে গড়ে-ভাঙার এক নির্মায়িক কৌতুক-খেলা খেলেছেন প্রমথ চৌধুরী আগাগোড়া। 'চারইয়ারী কথা' যথোচিত সংহতি পেতে পারলে গোটা একটি উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত, যেমন হয়েছিল 'সবুজপত্র'-এই প্রথম প্রকাশিত রবীন্দ্র-উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'। কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পকেই তার নিগূঢ় ক্রান্তিমুহূর্তে ভেঙেচুরে দিয়েছেন শিল্পী হঠাৎ , ব্যর্থ প্রণয়ের চারটি কাহিনীই মাঝপথে কেমন থমকে দাঁড়িয়েছে যেন। এক সূত্রে আলতো শিথিল ভঙ্গিতে বাঁধা যেন চারটি গল্পের একগুচ্ছ। প্রণয়ের বেদনার চেয়ে প্রণয়-দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষেই যেন গল্পের পরিণামী আবেদন। গভীর আবেগকে নৈর্ব্যক্তিক

প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলি

বুদ্ধির হীরার ধারে কেটে চৌচির করার এক ধরনের কৌতুক-দৃষ্টি তাঁর সকল গল্পেই সাধাবণ লক্ষণ হয়ে ধরা পড়েছে। প্রমথ চৌধুরীর অজস্র, এবং 'সবুজপত্র'-যুগে প্রায় নিরলস ভাবে লেখা, প্রবন্ধগুচ্ছেরও একই বৈশিষ্ট্য। তার প্রবন্ধাবলি পরবর্তী কালে দুই খণ্ডে অতুল গুপ্ত-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাধু ভাষার বদলে চলিত ভাষার সার্বিক ব্যবহারের প্রচলনেও 'সবুজপত্র', প্রমথ চৌধুরী, তথা রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ তখন একাগ্র হয়েছিল।

'সবুজপত্র' গোষ্ঠিতে বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবিতা-পসারি শ্রেষ্ঠ প্রমথানুসারী ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)। তাঁর ভাবনা ও প্রকাশের প্রকরণে প্রমথ চৌধুরীর ছাপ স্পষ্ট ; অথচ স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নও আগাগোড়াই সুগোচর। রবীন্দ্রানুরক্তিও লেখকের মজ্জাগত ছিল। সংস্কৃতি-সংগীতাদি বিষয়ে ওঁর অনেক লেখা রবীন্দ্র-সংসর্গের ফল; রবীন্দ্র-কবিতার একটি ছত্রকে শিরোনাম করে একটি গল্পও লিখেছিলেন—'একদা তুমি প্রিয়ে'। আসলে এই প্রণয়-সম্ভাষণটিকে যেন বুদ্ধির ধারে কেটে কেটে তার রহস্য বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছেন শিল্পী। প্রামথিক ধরনের এ-এক স্বাধীন অভিব্যক্তি। 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩) তাঁর একমাত্র গল্পের সংকলন। 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) এবং 'মোহানা' (১৯৪৩) খ্যাততম উপন্যাস ত্রয়ী , 'চিন্তয়সি', 'কথা ও সুর' প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধের সংকলন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-বিরোধের নূতন মেজাজ
(ক) কাব্য-কবিতায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য আসলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির জীবন-অভিজ্ঞতা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফসল। আগে দেখেছি, উনিশ শতকের নবজাগরণ-উদ্দীপনার অবক্ষয় আলোচ্য স্তরের বাঙালি ভাবনায় নৈরাশ্য, সংশয় এবং ক্ষোভের সঞ্চার করছিল দিনে দিনে। দৃষ্টিভঙ্গিরও তফাত হতে লাগল তার ফলে। তাই একালের কাব্য-কবিতায় শূন্যতার বোধটুকুই প্রবলতর হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে পল্লী বাংলার খুব কাছে চলে এসেছিলেন। প্রকৃতির উদার অসীম সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত করেছিল, অশেষ দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মানুষের স্বভাব-সরলতা ও ঋজুতা করেছিল বিস্মিত। একদিকে এদের দারিদ্র্য-পীড়ার লাঘব বিধানের জন্য অজস্র উদ্যমে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন ; অপরদিকে তাঁর সৌন্দর্য-পূর্ণতা-সন্ধানী মন প্রকৃতি এবং মানুষের বৈভবেরও মুগ্ধ বন্দনা করেছে। নতুন কালের দৃষ্টি তাতে অসংগতিই লক্ষ করেছে। নতুন ভাবনার কাছে সব কিছুই একটানা অন্ধকারে ঢাকা ; সৌন্দর্যের কল্পনা এর মধ্যে কেবল অবাস্তব-মনোহারিতারই সঞ্চার করে।

রবীন্দ্রবিরোধে নতুন মেজাজ

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বঙ্গ পল্লীর শারদ প্রকৃতিকে বন্দনা করেছিলেন :—

"আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।"

তাই ভেঙে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭ ১৯৫৪) লিখলেন :–

"আজি কি তোমার বিধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ভরে গেছে খানা ডোবাতে।"

এখানেই নতুন কালের নতুন মেজাজ স্পষ্ট প্রতিভাত। চোখে-দেখা শূন্যতার অভিজ্ঞতা 'বাস্তব' বলে গৃহীত হল, অনুভব-সিদ্ধ সৌন্দর্যের বৈভব পরিত্যক্ত হল 'রোমান্টিক' বলে। পরবর্তী কালের তরুণতর শিল্পীরা এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দাবি উত্থাপিত করেছিলেন ; তাই নিয়ে আলোচ্য সময়ের রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রাথমিক বনিয়াদ। তার সংঘবদ্ধ সংহত রূপ মূর্ত হয়েছিল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কবিকুলকে ঘিরে। সে কথায় পরে আসা যাবে ; আপাতত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা নিয়ে ইতিহাসের মোটা রূপরেখাটির অনুসন্ধান শুরু করা যেতে পারে।

যতীন্দ্রনাথ 'মরুর কবি' নামে একদা বহুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন ; তাঁর প্রথম তিনখানি কাব্য সংকলনের নাম 'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭) এবং 'মরুমায়া' (১৯৩০)।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মরুভূমির রুক্ষ শূন্যতাবোধে তাঁর কবিতা-বাণী ধূসর। ভাষাতেও নতুন দ্রুততা সঞ্চারী সাবলীলতা রয়েছে, স্বভাব বশে যা সহজ জীবনের সহজ কথারই বাহন হতে পারে। মানুষের দৈন্যের জন্য হতাশা এবং ক্ষোভ, মানুষের কল্যাণ সাধনে আবেগ-প্রখর ঐকান্তিক আগ্রহ, ঈশ্বরের মঙ্গলকর শক্তির অমোঘতায় সংশয়,—এই সব মিলিয়েই যতীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু অন্তরে অন্তরে রবীন্দ্রানুগ সৌন্দর্যপিপাসা যতীন্দ্রনাথ এবং তদুত্তর কবিকুলেরও মজ্জাগত ছিল। উত্তরকালের 'সায়ম্' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮) এবং মরণোত্তর কালে প্রকাশিত 'নিশান্তিকা'তে (১৯৫৭) ধীরে ধীরে সংশয়িত ভাবনার গহনে সৌন্দর্য-শোভনতার বাসনা ক্রমশ আভাসিত হয়ে চলেছিল।

যতীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র-বিরোধ স্বভাবসিদ্ধ হলেও রবীন্দ্রানুরাগও ছিল তাঁর আন্তরিক। কিন্তু কবি হিশেবে মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) আত্মঘোষণাই করলেন সচেতন রবীন্দ্র-বিরোধীর ভূমিকায়। রবীন্দ্র-কবিতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ—প্রেমভাবনার পাণ্ডুরতা।

মোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় রক্তমাংসের উত্তাপ ক্ষীণ,—অতীন্দ্রিয় ভাবকৃতির গভীরে দেহের কামনা-বাসনা বাষ্পীভূত হয়ে পড়ে। এই প্রতিবাদী ভাবনার সহযোগে মোহিতলাল সম্ভোগপিপাসু প্রেমের উদ্দাম দাবি, তার অন্তহীন বিষজ্বালা, এবং সেই দহমানতার অনিবার্যতায় আক্ষিপ্ত ফেনিল আলো[illegible]নকেই মুখ্য আসন দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। কবিতার রূপবিন্যাসে সংযম ও শৃঙ্খলার এক স্ব[illegible]বর্তিত আত্মশাসন তিনি স্বীকার করেছিলেন। সনেট রচনার দক্ষতায় কবির রূপনির্মাণ-সামর্থ্যের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। মোহিতলাল অধ্যাপনাজীবী। পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত মননের সঙ্গে কবি-মনোভাবনা জড়িয়ে গিয়ে কাব্যবাণীকে অনেক সময় অতি-পীড়িত করে তুলেছে। 'স্বপনপসারী' (১৩২৮) 'বিস্মরণী' (১৩৩৩), 'স্মরগরল' (১৩৪৩) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের পরবর্তী কালে রবীন্দ্র-বিরোধের প্রবণতা এক স্বতন্ত্র মাত্রা আয়ত্ত করেছিল পরতর প্রজন্মের কবিকুলের মধ্যে। 'কল্লোল', 'কালিকলম' এবং 'প্রগতি' সাহিত্যপত্র প্রকাশ করে এঁরা নিজস্ব-নতুন কাব্যকৃতির প্রকাশ, প্রচার ও সমর্থন করেছিলেন। 'কল্লোল'-এর সংঘশক্তিই ঘনিষ্ঠ ছিল বলে এঁরা 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর রচয়িতা রূপে প্রতিষ্ঠিত।

এই রচয়িতাদের মধ্যে উদ্দীপনার প্রবলতা সূ[illegible] সর্বাধিক স্মরণীয় অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-ত্রয়ী ;—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) এবং বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৯)। এঁদের প্রধান দাবি ছিল কাব্য-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্চার করতে পারার। বৈজ্ঞানিকতা অর্থে প্রধানত বিশেষ ধরনের মনস্তত্ত্বানুসারী যৌন ভাবনাভিত্তিক প্রেম ও জীবনদর্শনের ওপরে চাপ ; শব্দ-চয়নে এবং প্রযুক্তির প্রকরণেও

তার প্রতিফলন ঘটেছিল স্বভাবত। অন্যপক্ষে ভিক্টোরিয় যুগের ইংরেজি কাব্যাদর্শ ছেড়ে বৃহত্তর য়ুরোপের কাব্যসাহিত্য হতে ভাবের সংগ্রহ ও সংগ্রন্থনের প্রথম সচেতন প্রয়াস এঁদের কারো কারো মাধ্যমেই যথার্থ প্রসার পেল বাংলা সাহিত্যে, 'ভারতী'-গোষ্ঠীর প্রাথমিক ভাবনাগ্রহের পরে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং তাঁর অপর ভাবসঙ্গী দুজন—সকলেরই লেখনী ছিল গদ্য-পদ্যে বিচিত্রচারী। একেবারে প্রথম দিকে, 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে অচিন্ত্যকুমার 'প্রবাসী' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। রোমান্টিক আগ্রহ তাঁর কবি-ধর্মের অন্তর্লগ্ন ছিল। কিন্তু যুগ-প্রভাবিত, এবং বহুলাংশে ব্যক্তিগত, মরবিডিটির চাপ তাতে যৌনতাক্লিষ্ট ক্ষয়িষ্ণু অবসন্নতার যোজনা করেছিল। আরো একভাবে অচিন্ত্যকুমারের কবিতায় সহজ আবেগের অভিব্যক্তি কখনো কখনো চমকপ্রদ হয়েছে—সে তাঁর ধ্বনিঝঙ্কার-মিশ্রিত শব্দানুষঙ্গ-কামনায়। 'অমাবস্যা' (১৯৩০), 'আমরা' (১৯৩৩), 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (১৯৩৬), 'নীল আকাশ' (১৯৪৯) আচিন্ত্যকুমারের কয়েকটি উল্লেখ্য কবিতাগ্রন্থ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা লিখেছেন কম। তাহলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছোটগল্পের তুলনায় তাঁর কবিকর্মও বিন্দুমাত্র দুর্বল নয়। যৌনতা অপেক্ষা জনতার নিকটবর্তী হতে চাওয়ার দুর্দম উচ্ছ্বাসভরে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' (১৯৩২) প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে যুগের আক্ষেপ, বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে ধীরে ধীরে আপন চেতনায় সংহত করে একটি জীবন-প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হতে পারার আন্তরিক প্রয়াস করেছেন কবি। প্রকাশের রীতিতেও পরিমিতি এবং তির্যক সাংকেতিকতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গদ্য-পদ্য রচনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন।

বুদ্ধদেব বসু

বন্ধুত্রয়ের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সর্বাধিক সক্রিয়। কবিতা, গল্প-নাটক, এবং সর্বোপরি সাহিত্য-আলোচনাতেও তার সুচিহ্নিত স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের মগ্নমনা পাঠক ছিলেন বুদ্ধদেব; মনে মনে ছিলেন ঐ সাহিত্যলোকেরই নাগরিক। ডি. এইচ. লরেন্স আর বদলেয়র তাঁর সৃজনীভাবনাকে মন্থন করেছিলেন। জীবনে যৌবনের রহস্য সন্ধান—যৌন-আকৃতি যার চাবিকাঠি—বুদ্ধদেব বসুর কবিকল্পনা সাধারণ ভাবে তারই অভিমুখী ছিল। অন্যপক্ষে ভাষার পরিচ্ছন্ন স্পষ্টতার সঙ্গে অভিব্যক্তির নিটোল পারিপাট্য ছিল তাঁর 'ক্রীড়্'। সুচিন্তিত পদক্ষেপে ভাবরূপগত এই প্রবণতাব ক্রমিক বিন্যাস বুদ্ধদেব বসুর কবিতাগুচ্ছের সম্পর্কে ঐতিহাসিক কৌতূহলকেও অনিবার্য করে তোলে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও বেশি দিন 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা করে 'কল্লোল'-প্রভাবিত 'আধুনিক কবিতা'র চারিত্রিক মাত্রাটিকে তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন। 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪২), 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য কবিতা সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

জীবনানন্দ দাশ

'কল্লোল'-ত্রয়ী ছাড়া, কিংবা তাঁদের কথা ভেবেও, 'কল্লোল'-এর ভাবপ্রেরণা যে-কবির সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পেয়েছে তিনি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপে বৈনাশিকতা-লাঞ্ছিত 'আধুনিক চেতনা'র যে নতুন মাত্রা উন্মোচিত হয়েছিল তার অনুভব বাংলার নিসর্গ-মদিরতা আর বাঙালি মানুষের ঘরোয়া জীবন-[illegible] ঘেরা কারুণ্যে সংবেদিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। বিশশতকীয় [illegible] মনের বৃন্তচ্যুতি জনিত সংশয় অবসাদ অবদমন জীবনানন্দের কবিতায় অপঘাত বিশৃঙ্খল

নিরুদ্দেশ প্রত্যাশার প্রচ্ছন্ন আক্ষেপে গুমরে ফিরেছে। মগ্ন চৈতন্যের গভীরে পরাবাস্তব অতৃপ্তির এক মর্মান্তিক বেদনাবিদ্ধতা, আর সেই সঙ্গে উৎসুক জিজ্ঞাসুতা, সে কবিতার অন্তর্লগ্ন হয়ে আছে। প্রকাশের শৈলীতে আছে অধরা মাধুরীময় সংকেত ব্যঞ্জনা।

'ঝরাপালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'বনলতা সেন' (১৯৫২), 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৪) এবং মরণোত্তর কালে প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা'য় তাঁর বিভিন্ন ভাবনা ও সময়ের কবিতাগুচ্ছ সংকলিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে তাঁর কথাসাহিত্যিক রূপের নতুন পরিচয় মিলেছে ; উপন্যাসগুলিতে কবির স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ওতপ্রোত, প্রকাশরীতি স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল।

অজিত দত্ত

অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৮) 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদনে বুদ্ধদেব বসুর সহযোগী ছিলেন, তাহলেও তাঁর কাব্যকবিতায় 'প্রগতি' তথা 'আধুনিকতা'র কোনো সচেতন আরোপণ নেই। সনেট রচনার সামর্থ্যে তাঁর একটি নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। অনতিপ্রখর আবেগ সঞ্চালিত আন্তরিক অনুভবকে হৃদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করার দক্ষতায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'কুসুমের মাস' (১৯৩০), 'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্টচাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্ণবা' (১৯৪৭), 'ছায়ার আলপনা' (১৯৫১) ইত্যাদি তাঁর কবিতার বই। গদ্য, লঘু প্রবন্ধ এবং গবেষণা-নিবন্ধ-গ্রন্থও রচনা করেছিলেন এই অধ্যাপক-কবি।

পরিচয় গোষ্ঠির কবি

'কল্লোল'-গোষ্ঠির উদ্যম ও উৎসাহে উদ্দীপিত 'আধুনিক কবিতা'র ধারা একেবারেই এক স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছিল 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক পত্রিকার (১৯৩১) কবিকুলকে আশ্রয় করে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) তাঁদের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তিত্ব। 'কল্লোল'-এর কবিতাধারা অবদমন-পীড়ার উচ্ছ্বাসে প্রথমাবধি ছিল পরিস্ফীত ; 'পরিচয়' মননশীলতা, চিন্তা-সংহতি এবং নতুন ধ্বনের সংকেত-বহতার পন্থানুসারী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সম্পাদক। এঁরা কোনোভাবে, কোনোসময়েই রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সম্পর্কে অনুরাগ এবং বিস্ময় পোষণ করেও, কালের, এবং অল্পবিস্তর অন্তরের, প্রেরণাতে রবীন্দ্রনাথ হতে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন। আসলে 'কল্লোল'-এর কবিতাও রবীন্দ্র-বিরোধের আপাত [illegible] সত্ত্বেও রবীন্দ্র-বিমুখ ছিল না—বরং ভেতরে ভেতরে ছিল রবীন্দ্র-সমুৎসুক। এক অর্থে এই [illegible] ব কবিতাই নতুন কালধর্মে প্রবর্তিত রবীন্দ্রোত্তরণেরই সাধনা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতাকে বৃহত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যের কাছে নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মালার্মের কাব্যাদর্শের প্রতি অনুরাগের কথা স্বয়ং তিনি স্বীকার করেছেন ; বুদ্ধদেব বসু যেমন অনেকটাই সঞ্জীবিত হয়েছিলেন বদলেয়রের প্রেরণাসূত্রে। কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ শব্দের শক্তি-পরীক্ষায় নিয়োজিত হয়েছিলেন; তাঁর কবিতার আপাত দুরূহতা কঠিন আভিধানিক শব্দের সচেতন বিন্যাস জনিত। কিন্তু এই রূপকাঠিন্যের অন্তরালে বিশশতকীয় বিনষ্টিবোধের চাপ এক ব্যাপক পরিসরে সংহত উদ্বেজনার উদ্ভাস সঞ্চার করেছে অনেক সময়ে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা তাঁর নিজস্ব ; তবু মালার্মে-কে যেমন সচেতন ভাবে সেই ভাবনার অনু[illegible] রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে তেমনি বরণ করেছিলেন অন্তরের আগ্রহে। তাঁর কালচেতনা-প্রমথিত বিনষ্টিবোধের গভীরেও রবীন্দ্রভাবনার সংরাগ অসাধারণ গাঢ়তা সঞ্চার করেছিল। তাঁর কবিতা রূপবন্ধে দৃঢ়, অনুভবগুণেও পূর্ণবৃত্ত। 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৩) ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় কবিতা-সংকলন।

গদ্য প্রবন্ধও লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ—ভাবনার চেয়েও যার ভাষাবিন্যাস সুকঠিন। দেশি-বিদেশী কবি-প্রসঙ্গ, কাব্যভাবনা ও সমালোচন ঐসব গ্রন্থের মুখ্য উপাদান।

বুদ্ধদেব যেমন বদলেয়র অনুরাগী, সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের,—তেমনি, কিংবা তারও চেয়ে স্পষ্টতরভাবে, টি. এস. এলিয়টকে আদর্শ করে বিষ্ণু দে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কবিতায় তীক্ষ্ণধী মননের প্রতিফলন তাঁর কবি-ধর্মের মূল প্রবণতা ; এলিয়ট-এর প্রকাশরীতিতে তার প্রথম বাঁধুনি। বিষ্ণু দে-র কবিতাকর্মের বিবর্তন কবি-প্রতীতির একাধিক জন্মান্তরের সমতুল। আর সেই প্রতীতির পরিণতিতে মার্কসবাদের আদর্শ এবং রবীন্দ্র-কবিতার প্রত্যয়-চেতনা যুগপৎ তাঁকে উদ্বোধিত করেছে নিগূঢ় ভাবে। এই নংযোগ-সমন্বয় বিষ্ণু দে-র ভারি চালের কবিতাতে আন্তরিক সংবেগও সঞ্চার করেছে। গদ্যে-পদ্যে অজস্রকর্মা বিষ্ণু-দে-র মুখ্য কবিতাগ্রন্থের মধ্যে আছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০) ইত্যাদি।

বিষ্ণু দে

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) 'পরিচয়'-গোত্রের কবি নন, রবীন্দ্র-উত্তরণের কোনো আত্যন্তিক উৎকণ্ঠাও নেই তাঁর কবি-চেতনায়। রবীন্দ্রনাথের সচিব ছিলেন অনেক কাল ; রবীন্দ্রানুরাগ মজ্জাগত। ইংরেজি সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত; য়ুরোপীয় সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপন্ন। সহজ মনীষাকে স্বতঃস্ফূর্ত কবি-ভাবনায় অন্তরঙ্গ করে তাঁর কবিতায় 'আধুনিক কবিতা'র এক নতুন মেলবন্ধন হয়েছে। বাংলার প্রকৃতি-পরিবেশ—বাঙালির জীবনধারার সঙ্গে বিশ্বপথিক-বিশ্বজীবনপথিক কবি-চেতনার যোগ নিবিড় আন্তরিক। সব কিছু মিলে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এক নতুন ব্যঞ্জনা—নতুন মধুরিমা। 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'পারাপার' (১৯৫৩) ইত্যাদি তাঁর কবিতা-সংকলনগ্রন্থ।

অমিয় চক্রবর্তী

রবীন্দ্রোত্তর কালচেতনার স্পর্শ কোনো কোনো কবির প্রকৃতি ও প্রত্যয়কে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গড়ে তুলেছিল; বরণ-বিরোধের সচেতন কোনো অতিরিক্ত উদ্দীপনা তাতে ছিল না। সহজ সাধনার অধিকারে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন এমন এক অদ্বিতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭) । আরো একজন অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ, স্বল্পজীবী, সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)।

নজরুল ইসলামকে অনেকে বলেছেন রবীন্দ্রকল্পনার 'মাটির কাছাকাছি' কবি। আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বে মাটির সেই মৌল গন্ধটুকুর সঙ্গে সমন্বয়ের—সংগ্রন্থনের এক অসাধারণ সামর্থ্য নিহিত ছিল। বর্ধমান জেলার গ্রামে আত্যন্তিক দারিদ্র্যের মধ্যে কবির কৈশোর কেটেছে ; তাহলেও তাঁর মন জেগেছিল বনের সতেজ সূর্যমুখী গাছটির মতো। প্রখর সূর্যালোকের অভিমুখে তাঁর অনমিত সহজ দৃষ্টি ; উত্তাল প্রাণাবেগে পরিস্ফীত; আপন সীমায় সে আবেগকে সংবরণ করে চলা কবির সাধ্যের অতীত। যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন নজরুল; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। হাবিলদারির ভূমিকায় থেকেই কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন কলকাতার পত্রিকায়। যুদ্ধের সতেজতম ঘোড়াটির মতোই তাঁর কবিতার দুর্বার উচ্ছ্বসিত গতি। আর নজরুল ইসলামের অকম্পিত উচ্ছ্বাস তাঁর অনাবিল চিত্তবৃত্তির সহজ উৎস হতে উৎসারিত—যার এক কোটিতে ছিল অন্তহীন জীবনপ্রেম, আর এক কোটিতে দারিদ্র্য-অসাম্য-পরাধীনতার নিপীড়ন। আন্তরিক প্রেমানুভব, আর কাল এবং পরিবেশ-প্রবর্তিত মর্মপীড়া, এ'দুয়ের অনিবার মন্থনে উৎসারিত হয়েছিল নজরুল ইসলামের অজস্র গদ্য-পদ্য

নজরুল ইসলাম

রচনা। প্রকাশে অসংবৃত, ভাবে অতিস্ফীত, নজরুল-কবিতার আসল জোর ঐ দুর্বার মর্মমন্থনের জোরেই। আর তার মধ্যে স্বল্পবিত্ত গ্রামীণ মানুষের অনুভবের সঙ্গে পরিশীলিত মধ্যবিত্ত ভাবাদর্শের, হিন্দু-পুরাকথার অন্তরঙ্গে আন্তরিক ইসলামি প্রত্যয়কে জড়িয়ে এক সর্বভারতীয় জীবন-ঐতিহ্যের লালন এবং উন্মোচন ঘটেছে নজরুলের কবিতায়। রোমান্টিক সৌন্দর্য এবং প্রণয় পিপাসা, দারিদ্র্য-অসাম্য-অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, এবং এক পরিণামী সত্যের কাছে আত্মসমর্পণের আগ্রহ, সবার ওপরে সতেজ সহজ বিক্ষোভাহত জীবন-প্রেম, এই নিয়েই নজরুল ইসলামের রচনা।

প্রকৃতির হাতে নির্জিত হয়েছিল তাঁর প্রতিভার দুর্বারগতি। ১৯১৯-এ প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের—'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', ঐ বছরেই অল্প পরে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি'। আর ১৯৪২-এ তাঁর চেতনা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। এই ২৩-২৪ বছরের শিল্পি-জীবনে অন্তত সাড়ে পাঁচশ রচনা তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ; ঐ সময়ে প্রকাশিত গদ্য-পদ্য গ্রন্থের সংখ্যা ৪৯ ; শেষ পর্যন্ত ৬২ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা-গান, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং শিশুনাটিকা রয়েছে ঐসব রচনার অঙ্গীভূত হয়ে। 'অগ্নিবীণা' (১৯২৩) নজরুলের অগ্নি-সারথি কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত স্বীকৃতি সাধন করে ; অমনি বিক্ষুব্ধ বৈপ্লবিক আবেগে গাঁথা হয় 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙ্গার গান' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৪), 'সর্বহারা' (১৯২৬) ইত্যাদি। 'দোলন চাঁপা' (১৯২৩), 'ছায়ানট' (১৯২৫) 'সিন্ধু হিল্লোল' (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্যে রয়েছে উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্যপিপাসু কবিমনের হিল্লোল। 'ব্যথার দান' (১৯২২), ও 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪-২৫) প্রেম-স্বাধীনতার ভাবনামদির কয়েকটি উচ্ছ্বসিত আবেগ-গল্পের সংকলন। 'বাঁধন হারা' (১৯২৭) পত্রোপন্যাস, তাছাড়া রয়েছে 'মৃত্যুক্ষুধা' প্রভৃতি উপন্যাসও। নজরুল ইসলামের গদ্য রচনাশৈলীর জ্বলজ্যান্ত ছবি আছে 'রাজবন্দীর জবান- বন্দী'তে।

নজরুলে যে-বেদনার বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাস, সুকান্ত তে তাই বিমূর্ত যন্ত্রণাবোধে দুর্বার। কালবাহিত অবিচার-অনিয়ম-অসাম্য-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নজরুল বিদ্রোহী; সুকান্তর প্রতিহত কৈশোর-যৌবন-চেতনায় অনিবার্য বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি। ভেঙে গড়ার স্বপ্ন নজরুলেরও ছিল, তাহলেও ভাঙার প্রতিজ্ঞাভবেই তাঁর প্রতিভা দুর্দমনীয় হয়েছিল। সমন্বয়ধর্মী স্ গঠনের আকাঙ্খা ছিল—কিন্তু তীরের দিশা মেলেনি। অনেক পরে এসে সুকান্ত সেই দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন। কবিতার মুক্তি সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের মুক্ত আকাশে ; তেমনি সুরেখ প্রত্যয়ের আশ্রয় মিলেছিল সুকান্তর কবিমনের, মার্কসীয় জীবনচিন্তার মূলে। কোনো মতবাদের প্রশ্ন নয়, কোনো তাত্ত্বিক বিচার-বিতণ্ডার প্রসঙ্গও না ; মার্কসীয় ভাবাদর্শে গভীর জীবন-স্বপ্নের আশ্রয় পেয়েছিলেন কবি; সেই সঙ্গে রবীন্দ্র অনুরাগের স্ফূর্ত বিবেকিতা। সবে মিলে অসাম্যের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ সংগ্রাম-প্রখর বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি, এবং কদাচিৎ তদুত্তর স্বপ্নের আভাস, সুকান্তর দুর্বার লেখনী-মুখে আগ্নেয় প্রকাশ পেয়েছে। 'ছাড়পত্র', 'পূর্বাভাস', 'ঘুম নেই', 'মিঠেকড়া' ইত্যাদি সব কয়টি রচনাই কবির মৃত্যুত্তর সংকলন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্র-বিরোধ-বরণের বিচিত্র মেজাজ

রবীন্দ্রোত্তর প্রজন্মের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-বিরোধের কথাসাহিত্যিক উদ্যমও স্পষ্টোচ্চারিত হয়েছিল 'কল্লোল'-এর উদ্ভাসিত আবেগের মুখে। তাহলেও কাব্যে যেমন যতীন্দ্রনাথ-

মোহিতলাল, তেমনি কথাসাহিত্যেও 'কল্লোল'-এর পূর্বসূরিতা দাবি করতে পারেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নতুন কালের প্রধান অনুযোগ ছিল 'প্রেমের চিত্রণে রক্ত-সংরাগের অভাব,' বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা-রহিত আদর্শবাদ। মরগ্যান, হ্যাভলক এলিস এবং সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্-এর তত্ত্বকে প্রমাণ হিশেবে সামনে রেখে একালের কতিপয় শিল্পী যৌন লিপ্সা-কেন্দ্রিক জীবন-রহস্য সন্ধানে আগ্রহী হয়েছিলেন। নরেশচন্দ্র গল্প লিখেই রবীন্দ্র-প্রতিবাদ করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-ভাঙা তাঁর প্রথম গল্প 'ঠানদি'। কিন্তু এ-সবই কেবল তাত্ত্বিক বিতর্ক। নরেশচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিতর্কের ঝড়ো আবহাওয়াই জমাট করেছিলেন 'ার্থকভাবে। না হলে অবয়বে যথেষ্ট সংহত নয় ওই সব লেখা। আর, তার বাইরেও একটা কথা থেকেই যায়,—রবীন্দ্রনাথের মূলভাবনা উনিশ শতকের রেনেসাঁস-এর ফসল—সরল জীবনযাত্রা এবং উচ্চ-ভাবনায় নিয়ত উদ্বোধিত। কিন্তু বিশ শতক সেই 'নবজাগরণ'-নির্বাপণোত্তর আক্ষেপ, অবদমন, ব্যর্থতাবোধে বহুলাংশে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ। সেই ঐতিহাসিক অনুভবের বিচঞ্চলতা রবীন্দ্রনাথ ধরতে চেয়েছেন 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'শেষের কবিতা'-তেও। কিন্তু সে তাঁর উনিশ শতকীয় দৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রোত্তর প্রজন্ম ও বাংলা কথাসাহিত্য : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিশ শতকের জীবনবোধ তারই ভাবে-ভাষায় যাঁর কথা-রচনায় সবচেয়ে সহজে প্রকাশ পেল, তিনি শিল্পী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। 'কল্লোল'-এর পক্ষ থেকে এই বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরাগত শিল্পীর সগোত্রতা দাবি করা হয়েছে। তাহলেও তাঁর লেখায় যৌনতত্ত্ব প্রাধান্য পায়নি তত। অপরপক্ষে প্রচলিত কল্যাণ, সত্য, আদর্শ-চেতনার প্রতি শিল্পীর অবিশ্বাস এবং বিমুখতা ছিল আন্তরিক ভাবে তীব্র, নিরেট কঠিন। তাঁর গল্পে-উপন্যাসে সেই প্রখর অবিশ্বাসী বিশ্বাস জীবনের বিভিন্ন ভয়ঙ্কর রূপ রচনায় জ্বলজ্যান্ত প্রত্যক্ষতা সঞ্চার করেছে। বস্তুত 'কল্লোলের যা মূল-বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল, তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত।' ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই তাঁর বাণী ও বাক্-বিন্যাসের চূড়ান্ত সফলতা ; এবং সৃষ্টি-ভঙ্গির দূরত্ব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প রচনার সামর্থ্যের প্রশংসা করেছিলেন। জীবন সম্পর্কে এমন অনমিত নিষ্ঠুর দৃষ্টিভঙ্গী বাঙালি পাঠকের সহ্যশক্তিতে আঘাত করে থাকবে; তাই জগদীশ গুপ্তের সাফল্যের তুলনায় জনপ্রিয়তা স্বল্পতর। আর গল্পের তুলনায় উপন্যাসে শিল্পি-প্রকৃতির কুশলতা তুলনামূলক ভাবে স্বল্পপ্রভ। তাহলেও গল্প উপন্যাসের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর রচনার পরিমাণ লঘু নয়। 'বিনোদিনী' (১৯২৭) তাঁর প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থ ; আরো আছে—'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক' (১৯২৯), 'উপায়ন' (১৯৩৪), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৫), 'মেঘাবৃত অশনি' (১৯৪০) ইত্যাদি আরো কয়েকটি ; উল্লেখ্য উপন্যাস—'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯), 'দুলালের দোলা' (১৯৩১), 'রতিবিরতি' (১৯৩৪), 'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৯৫২) ইত্যাদি।

জগদীশ গুপ্ত

'কল্লোল' পত্রিকা, তথা 'কালিকলম'-এর সঙ্গে জন্মাবধি কথাশিল্পী 'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২-১৯৭৬) যোগ ছিল অন্তরঙ্গ। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ওঁর গল্প ছাপা হয়েছিল। 'কালিকলম'-এর প্রারম্ভলগ্নে তিনিও ছিলেন তিন সম্পাদকের একজন। শৈলজানন্দ-র আসল নাম ছিল শ্যামলানন্দ। 'প্রবাসী' পত্রিকায় গল্প ছাপাবার উৎসাহে ডাক নাম 'শৈল'র সঙ্গে 'জা' যোগ করে হয়েছিলেন 'শৈলজা'। বিখ্যাত ঐ পত্রিকায় মহিলাদের রচনার বিচারে 'ছাড়' ছিল অনেক। অচিন্ত্যকুমারও তাই 'প্রবাসী'তে প্রথম গল্প ছাপিয়েছিলেন নীহারিকা দেবী হয়ে। পরবর্তী কালে শ্যামলানন্দ-র 'আনন্দ' শৈলজার সঙ্গে যোগ করে নতুন পরিচয়ে

জাগলেন শৈলজানন্দ।

বাংলা গল্প-সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কয়লাকুঠি'র জীবনচিত্রণের পথিকৃৎ হিশেবে। ছোটগল্পের রূপেগুণে অনেক কয়টি রচনাই উতরেছে সার্থক হয়ে। তারও চেয়ে বড় কথা, বাংলা সাহিত্যের পড়ুয়াদের কাছে অচেনা এক জীবনরূপ উদ্ঘারিত করে দিলেন তিনি, আদিমতার গভীরে চিরজীবনের আশ্বাস যেখানে নিভৃতে দোলে। শৈলজানন্দ মূলত ছিলেন বীরভূমের গ্রামের বাসিন্দা ; নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। দরদ দিয়ে সহজ, কিন্তু গভীর রেখায় সেই জীবনের নিটোল ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর কিছু কিছু গল্পে। সাময়িক পত্রে তাঁর একটি গল্প পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকাই যেন বীরভূমকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ওই গল্পটিও তারাশঙ্করের পরবর্তী রচনাপ্রবাহের মৌল এক প্রেরণা। উপন্যাসও লিখেছিলেন শৈলজানন্দ ; সেগুলো বড়গল্পের মাত্রা পেরোতে পারে নি। 'প্রায় পৌনে শতাবধি' গ্রন্থের শিল্পী তিনি। মুখ্যত ছোটগল্পেরই সহৃদয় শিল্পী। তাহলেও 'কল্লোল'-এর বিখ্যাত ত্রয়ী-শিল্পী, এবং অপরাপর অনেকের মতো-ও, মতচেতনা-প্রভাবিত নূতন কোনো মাত্রা-চিন্তা শৈলজানন্দের লেখায় আরোপিত হয়ে নেই। সহজে সংবৃত শিল্পী ; নতুন কাল-প্রবণতার ছিলেন সহজ সঙ্গী।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তাঁর ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি : 'অতসী', 'বধূবরণ', দিনমজুর.' 'অপরূপা' '[illegible]' ইত্যাদি। 'মাটির ঘর', 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', 'কাঁকনতলার মেয়ে', 'বিজয়া' ইত্যাদি উপন্যাস।

গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এবারে 'কল্লোল'-ত্রয়ীর ভূমিকা স্মরণীয়। অচিন্ত্য সেনগুপ্তর প্রাথমিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'মিথুন প্রবৃত্তির পৌনঃপুনিকতা' লক্ষ করেছিলেন—সম্ভাবনাময় শক্তির গভীরেও। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের আরো এক বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গির বিন্যাসে। বিদগ্ধ অনুপ্রাস-ঝংকৃত ধ্বনি-চকিত গদ্যে কথকতার ঢঙ্ জড়িয়ে এক ধরনের মাদকতাময় আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়াস স্পষ্টগোচর তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। প্রণয়বৃত্তি এবং বিধি-বিরোধী যৌন প্রেমের অনিবার্যতাই প্রাথমিক রচনার প্রধান বিষয় ছিল। পরে কর্মসূত্রে জীবন-অভিজ্ঞতার বিস্তার সূত্রে সমাজের নিচু তলার, অন্ধকার জগতের, মানুষের জীবনচিত্রকে অনাবৃত করার দিকেও ঝোঁক পড়েছিল। নর[illegible]য়র ঔপন্যাসিক ন্যুট হামসুনের 'প্যান' অনুবাদ করে অচিন্ত্যকুমার যাত্রা শুরু করেছিলেন ; সে[illegible] আদর্শেরই অনুসরণে লিখেছিলেন 'বেদে' ; ঐটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থ (১৯২৮)। তাঁর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' (১৯৩১) এবং 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৯৩৩) উপন্যাস দুটি অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তাঁর প্রথম গল্পের বই 'টুটাফুটা' (১৯২৮), তার পরেরটি 'ইতি' (১৯৩৩) ; আরো আছে—'অকালবসন্ত' (১৯৩২), 'নায়ক নায়িকা' (১৯৩৪), 'ইনি আর উনি' (১৯৪২), 'যত্নবিবি' (১৯৪৩), 'কাঠ খড় কেরোসিন' (১৯৪৫), 'হাড়িমুচি ডোম' (১৯৪৮) ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে আরো স্মরণীয় 'কাক জ্যোৎস্না' (১৯৩১), 'ঊর্ণনাভ' (১৯৩৩) ইত্যাদি।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধকাম শিল্পী; সমকালীনদের মধ্যে রূপরাগ রচনার সাফল্যে পুরোধা। কোনো আরোপিত মতচেতনা কিংবা প্রকরণ-চিন্তা তার শুদ্ধ জীবনবোধকে স্পর্শ করতে পারেনি। সমকালীন জীবনের হতাশা, [illegible]বদমন, এবং প্রতিকারহীন ব্যর্থতাবোধের সামগ্রিক স্বভাবটিকে স্থপতির মতো নিটোল রূপ দিতে দিতেও মনের গভীর হতে উঁকি দিয়েছে উত্তরণের অস্ফুট দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। তীক্ষ্ণ-তির্যক ভাষণে, সাংকেতিকতায় আভাসিত আপাত নির্মায়িক বিকৃতির গভীরে একটি সন্তর্পণ জীবনপিপাসু

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবিমনের স্পর্শ ওতপ্রোত জড়ানো। ছোটগল্পের যথার্থ রূপবিন্যাসেও অ-সাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন শিল্পী। তাঁর হ্রস্বকায় উপন্যাসগুলিও আসলে টেনে বাড়ানো গল্পই। তাঁর বহু সংখ্যক গল্প সংকলনের মধ্যে আছে—'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩১), 'পঞ্চশর' (১৯৩৪), 'মহানগর' (১৯৩৭), 'ধূলিধূসর' (১৯৩৮), 'প্রেমই ধন্বন্তরী' (১৯৫৮), 'নানা রঙে বোনা' (১৯৬০) ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'বাঁকালেখা', 'আগামীকাল', 'প্রতিশোধ' ইত্যাদি।

আগেও দেখেছি, কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে, প্রবন্ধ এবং নাটক রচনাতেও বুদ্ধদেব বসুর লেখনী ছিল অবিরামগতি। মনে প্রাণে তিনি সাহিত্যালোকের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন, সাহিত্যরসের সৌরভ ছিল তাঁর নিশ্বাসের অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা। আর সকল ক্ষেত্রেই সতেজ স্বাতন্ত্র্যে স্বধর্মনিষ্ঠ ছিল তাঁর রচনা। তাঁর কবিকর্মের রূপরেখায়িত পরিচয় এরই মধ্যে নির্হিত রয়েছে। গল্প-উপন্যাসও লিখেছিলেন এক সময়ে প্রচুর। গল্পের কথায় বলেছিলেন, এমন গল্প তাঁর কমই আছে যার প্লট মুখে মুখে বলে দেওয়া যায়। উপন্যাস সম্পর্কেও একই কথা বলা সমান যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধদেব নিয়ত সঞ্জীবিত ছিলেন তাঁর অন্তর্বদ্ধ কবিভাবুকতার নির্যাস ভরে। তার গভীরে গ্রন্থিও ছিল, কিছু কালস্বভাবের অবদমন-প্রভাবিত, আরো কিছু ব্যক্তিগত আত্মমর্ষণ-প্রসূত। সেই ব্যক্তিকতার স্পর্শই তাঁর গল্প-উপন্যাসের আবেদন-উৎস ; কথার চেয়ে ভাব, এবং আত্মপ্রহরারত ভাবুকতার প্রভাব তাতে সচেতন ভাবেই প্রতিফলিত।

বুদ্ধদেব বসু

একদিকে জীবন-যৌবনের বিকাশে যৌন ভাবনার গ্রন্থি, আর একদিকে রবীন্দ্র-রুচি-বলয়িত ভাষার মধুরিমা,—বুদ্ধদেবের গল্পের এই দুই মুখ্য সম্পদ; দুটিই তাঁর নিজস্ব ; স্বী-কৃত। তবু রবীন্দ্রনাথের কথা-কবিতাংশের ব্যবহার বুদ্ধদেবের অনেক বই এর শিরোনামে—'রডোডেনড্রনগুচ্ছ', (১৯৩২), 'হে বিজয়ী বীর' (১৯৩৩), 'যেদিন ফুটল কমল' (১৯৩৩) , এমনি আরো অনেক। সতেরো বছর বয়সে প্রথম গল্প লিখেছিলেন বুদ্ধদেব—'রজনী হল উতলা' ; অশ্লীলতার অভিযোগে এ-গল্প উত্তাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—'এরা ওরা এবং আরো অনেকে' গল্পের বই নিষিদ্ধ হয়েছিল ঐ একই অভিযোগে। পরিণতির সূত্রে শিল্পী ক্রমশ আতিশয্যের গ্রন্থিমুক্ত হয়েছেন ; তাহলেও শিল্পচেতনার স্বকীয় চরিত্রে সংলগ্ন হয়েই ছিলেন চিরকাল। তাঁর গল্পসংগ্রহের মধ্যে আছে 'অভিনয় অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩০), 'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১), 'এরা ওরা আরো অনেক' (১৯৩২), 'ঘরেতে ভ্রমর এল' (১৯৩৫) ইত্যাদি।

প্রথম জীবনেও নাটক লিখেছিলেন বুদ্ধদেব—'অসামান্য মেয়ে' এবং 'মায়ামালঞ্চ'। পরবর্তী কালে এদিকে ঝোঁক বেড়েছিল —'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', 'কলকাতার ইলেকট্রা' ও 'সত্যসন্ধ' এই পর্যায়ের উল্লেখ্য রচনা।

নিছক গদ্যশিল্পী হিশেবেও বুদ্ধদেবের অনন্য ভূমিকা রয়েছে বাংলা সাহিত্যে—তাঁর সাবলীলতম প্রকাশ গদ্যপ্রবন্ধাদি জাতীয় রচনায়। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'আমি চঞ্চল হে', 'সবপেয়েছির দেশে' ইত্যাদি সুললিত ভ্রমণ বিবরণ;—'কালের পুতুল', 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', 'কবি রবীন্দ্রনাথ', 'সাহিত্যচর্চা' ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত প্রবন্ধের বই।

রবীন্দ্র-উত্তরণের স্ফূর্ত প্রবণতা : কথাসাহিত্যে

আগে দেখেছি, 'কল্লোল'-গোষ্ঠির শিল্পী যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধের ধুয়ো তুলেছিলেন, রবীন্দ্রানুরাগ ছিল তাঁদের অনেকেরই মজ্জায়; কালবাহিত বিক্ষেপ তার গোত্রান্তর সাধন করেছিল। কিন্তু কালের যাত্রাপথ আসলে নিরঙ্কুশ ; নতুন অভিজ্ঞতা নতুন জীবনপ্রবণতার সঙ্গে অমোঘ পদক্ষেপে বিস্তীর্ণ হয়েই চলেছিল সকল দিকে। নতুন কালে তাই এমন কথাশিল্পীর দেখা মিলতে লাগল—জীবনের টানেই যাঁরা মন এবং লেখনীর চালনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এঁদের অনেকের অনুরাগই ছিল বেশি ; তাহলেও সচেতন রবীন্দ্র-ছায়াসম্পাৎ —পক্ষে বা বিপক্ষে—এঁদের রচনায় যথেষ্ট উপস্থিত নেই ; যদিও রবীন্দ্র-সংবেদিতা চেতনার গহনে বহুলত-ই প্রচ্ছন্ন ছিল। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সীমানাকে উত্তীর্ণ হয়েই, এঁরা স্বাধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

কেবল জীবন-অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়েও রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ হয়ে যিনি রয়েছেন বাংলা সাহিত্যে, তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। তাঁর রচনায়, গল্প এবং উপন্যাস নির্বিশেষে, 'আধ্যাত্মিকতার সুঘ্রাণ' অনুভূত হয়ে থাকে।

বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতা বাংলার গ্রামজীবনের নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের চারপাশে। রবীন্দ্রনাথের ... পরে, তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা পেরিয়ে, গ্রাম-পরিবেশের দারিদ্র্য আরো বেড়েছে। কিন্তু চোখে-দেখা সেই শূন্যতাকে মনের প্রত্যাশাকুল কামনা-কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে তোলার—বস্তুগত অভাববোধের গহন হতে আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের মুক্ত আকাশে উত্তরণের এক অতুল্য প্রবণতা ছিল বিভূতিভূষণের। দে...'-এর (১৯৪৪) মতো উপন্যাসও লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ ; কিন্তু তাঁর চেতনা-নিহিত আধ্যাত্মিকতা একান্ত ভাবেই অলৌকিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। শিশুর মতো মুক্তসঙ্গ মন নিয়ে প্রকৃতির, কিংবা অতিপরিচিত সাধারণ জীবনের ইন্দ্রিয়গোচর অভিজ্ঞতার মাঝখান হতেই তিনি অনায়াসে ছড়িয়ে পড়তে পারতেন অতীন্দ্রিয় সুরভিময় কল্পলোকে। 'পথের পাঁচালী'-র (১৯৪৪) অপুর মধ্যে সে পরিচয় ধরা আছে ; আসলে তা শিল্পীর নিজের জীবনানুভবেরই প্রতিচ্ছবি। জীবনের চিত্রণে 'রূপ হতে ...বে অবিরাম যাওয়া আসা'র এই নিজস্ব প্রকরণটি রবীন্দ্র-প্রবণতার সগোত্র।

বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস এবং গল্প দুইই লিখেছেন বিভূতিভূষণ। ছোটগল্পের রূপ কদাচিৎ তাঁর আয়ত্ত হয়েছে ; উপন্যাসের দেহেও নতুন প্রকরণের যোজনা ঘটেছে। গল্প-উপন্যাস দুই-ই বিবৃতিমূলক। উপন্যাসে স্বয়ম্পূর্ণ সংঘট্ট, একের পিঠে আরেক জড়িয়ে দিয়ে, কথার মালা গেঁথেছেন শিল্পী ; আর তার সবটা মিলে সমগ্রজীবনের চালচিত্রটি গড়ে তুলেছেন ; সে কেবল ব্যক্তিরই নয়—ব্যক্তি এবং তার পরিবেশ মিলিয়ে একটা যৌথ গোষ্ঠি জীবনেরও। অনেকে ভাবেন 'পুঁইমাচা' গল্পের সূত্র টেনে টেনেই 'পথের পাঁচালী'র বিস্তার। তাঁর অপরাপর উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ্য 'আরণ্যক' (১৯৩৮), 'ইছামতী' (১৯৪৯) ইত্যাদি। গল্পের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে আছে 'মেঘমল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'কিন্নরদল' (১৯৩৮) ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭২) জীবন...ত্যয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী ; কিন্তু নিবিড় জীবন-অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তর ভূমিতে তিনি স্বয়ম্পূর্ণ। প্রথম উল্লেখ্য গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায় ; তাহলেও কল্লোল-গোষ্ঠিতে গ্রন্থিবন্ধন ঘটেনি। 'রসকলি' গল্পের প্রেরণা নির্দেশ করে তারাশঙ্কর নিজের কথাটি বলেছেন '

দীঘিতে ঢেউয়ের উপর নাচতে থাকল পদ্মফুলের মত। 'জৈবরস'-এর একান্ত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের অমন করে জানবার কথাই নয় ; কিন্তু অব্যবহিত জীবনকে জৈবতামুক্ত পদ্মফুলের মধুরতায় আবিষ্কার, তথা উত্তীর্ণ করাই তো তাঁর কবিধর্ম। ঐখানে তারাশঙ্কর পৃথক্ দেশকালের হয়েই রবীন্দ্রোত্তর।

আর, তারাশঙ্করের দেশ-কালচেতনাটি ছিল ঐকান্তিক—তাঁর জীবনবোধ এবং জীবন বিন্যাসে তাই মহাকাব্যের ব্যাপ্তি এবং অমোঘতা। বীরভূম জেলার ব্রাহ্মণ জমিদার চালিত গ্রামে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মে গ্রাম-জোড়া, তথা পরিপার্শ্বগত, দরিদ্র-অশিক্ষিত আদিবাসী মানুষের জীবনের সঙ্গে খুঁজে পেয়েছিলেন অন্তরের যোগ। আরেকদিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জমিদারি অভিজাত্যের সামাজিক বনিয়াদ ভেঙে গিয়ে চারপাশে গড়ে উঠছিল অর্থগৃধ্নু আত্মসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা—সমাজ ভেঙেই যার জন্ম। সেই সঙ্গে শিল্পী আকৃষ্ট হয়েছিলেন গান্ধীপন্থী আন্দোলনে। সমাজে অর্থ-রাজনৈতিক বিপত্তির ঐতিহাসিক তবঙ্গটির সঙ্গেও যোগ তাঁর ছিল আন্তরিক। প্রধানত আপন গ্রামজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অমেয় পুঁজির সংযোগে গল্প-উপন্যাসের থীম গড়েছেন তারাশঙ্কর। তার সঙ্গে কালের ওঠাপড়াকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে নিয়ে জীবনের একটা পরিব্যাপ্ত সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন উপন্যাসে ; এবং গল্পেও। সেই জন্যেই গল্পগুলো সঠিক ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি—উপন্যাস ধরতে চেয়েছে মহাকাব্যের অবয়ব। রূপের নিটোলতায় নাহোক, জীবন-সংবেদনের অমোঘতায়, তারাশঙ্কর তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ উত্তীর্ণ শিল্পী; আর সে-জীবন একান্তভাবে শিল্পীর পরিচিত বীরভূমের আঞ্চলিক জীবন। 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), 'জলসাঘর' (১৯৩৭), 'রসকেলি' (১৯৩৮), 'বেদেনী' (১৯৪০) তাঁর প্রথম জীবনে লেখা অবিস্মরণীয় গল্পগুচ্ছের কয়েকটি সংকলন। প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১), তাছাড়া 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) তারাশঙ্করের উপন্যাস রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের প্রথম রচনা একটি কবিতাগ্রন্থ 'ত্রিপত্র' (১৯২৬) ; গল্প-ভাঙা মঞ্চসফল কিছু নাটকও লিখেছিলেন শিল্পী—'কবি' (১৯৪১), 'দুই পুরুষ' (১৯৪২) তাদের মধ্যে প্রধান।

আঞ্চলিক উপন্যাস লিখে আরো একজন কথাশিল্পী অসামান্য সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন ; তিনি সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২)। সরোজকুমারের সামর্থ্য যত ছিল, প্রকাশের উদ্যম তত মুখর কিংবা অনবচ্ছিন্ন হতে পায় নি। তাহলেও, রচনায় তাঁর বৈচিত্র্য ছিল ; আর বিষয় ও বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য ছিল সাবলীল প্রসাদগুণ ; গল্প-উপন্যাসের সকল ক্ষেত্রেই। সরোজকুমার মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ জন্মভূমির অভিজ্ঞতা নিয়ে এপিকধর্মী ত্রয়ী উপন্যাস লিখেছিলেন 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৩৬), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭), 'সোমলতা' (১৯৩৮) ; তিনে মিলে একটি উপন্যাস—সামগ্রিক নাম 'নতুন ফসল'। তাহলেও 'এপিক'-এর 'প্রযত্নোচ্চারিত প্রগাঢ়তা' অতিশয়িত নয় 'নতুন ফসল'-এ, বরং স্নিগ্ধতা এবং আন্তরিকতার একটি মধু-রসময় আবহাওয়ায় তরতরিয়ে চলেছে গল্পের গতি। বৈষ্ণবীয় জীবনভাবনায় ডুবিয়ে সরোজকুমার আঞ্চলিক উপন্যাস লিখেছিলেন।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সমসাময়িক জীবনের, এমন কি রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও, শিল্পীর কেবল ভাবগত নয়, ব্যক্তিগত যোগও ছিল আবহমান। তাই রাজনৈতিক বিক্ষেপ ঘিরে যেমন লিখেছেন 'বন্ধনী' (১৯৩১-প্রথম গ্রন্থ), 'শৃঙ্খল' (১৯৩২)-এর মতো বই, তেমনি বিশ শতকীয় ভঙ্গুরতার অক্ষয়

স্বাক্ষর রয়েছে 'শতাব্দীর অভিশাপ' (১৯৩৮) কিংবা 'কালোঘোড়া'র (১৯৪৬) মতো উপন্যাসে। 'মনের গহনে' (১৯৩৩), 'দেহ যমুনা' (১৯৩৩), 'ক্ষণবসন্ত' (১৯৩৪), 'বহ্ন্যুৎসব' (১৯৩৭), 'সন্ধ্যারাগ' (১৯৬১) ইত্যাদি তাঁর ছোটগল্পের সংকলন।

বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪) লেখনী নানা পথচারী। কথাসাহিত্য—গল্প এবং উপন্যাস—আর বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থে ভূয়িষ্ঠ তাঁর রচনাবলিতে কবিতা, ছড়া এবং নাটকও রয়েছে। আপন শিল্প-প্রতিভার মৌলিকতার গর্ভারে অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে আহরণ করেছিলেন নতুনতর দৃক্‌কোণ হতে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সাধর্ম্যের উৎস তাঁর আধা-রোমান্টিক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি-মগ্নতায় ; অন্নদাশঙ্কর মননতীক্ষ্ণ অনুভবে রবীন্দ্র-জীবন-চেতনাকে ধরতে চেয়েছেন তাঁর বিশ্বমানব-বোধেব বিস্তীর্ণ মাত্রায়। নিজে তিনি স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর দ্বারা তাঁর ভাবনা বিচলিত হয়েছিল; গান্ধীর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বেশি। আর মনন ও সৃজনের করণ-কৌশলে তাঁকে আকর্ষণ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী—'সবুজপত্র'-র 'বীরবল'। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ নির্মাণে সেই ভাষার ছাঁচটুকু রয়েছে ; চিন্তনের ধরন যদিও সংহত এবং সামগ্রিক।

অন্নদাশঙ্কব বায

বিশশতকীয় জীবনের অবক্ষয় এবং সমস্যা-ক্লিষ্টতাকে অন্নদাশঙ্কর যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন সকল দিক হতে ; তবু সব কিছুর গভীরেই মনেব সত্যের স্ফুরণের প্রত্যাশা রেখেছেন অমোঘভাবে। 'হিউম্যানিজম' ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির সংস্কারে উনিশ শতকীয় জীবনাদর্শবোধেব দান। বিশ শতকে তার ব্যত্যয় এবং ব্যর্থতার হাহাকারই প্রধান। ঐ নতুন পটভূমিকে ধরেই মানবসত্যের তাৎপর্য সন্ধানে নিয়োজিত হয়েছিলেন শিল্পী ; যার উজ্জ্বলতম প্রতিফলন ছয়খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে (১৯৩২-১৯৪২)। য়ুরোপের পটভূমিতে গল্পের ভিত্তি ; বিস্তার য়ুরোপ এবং ভারত জুড়ে। এক সময়ে অন্নদাশঙ্কর ইচ্ছে করেছিলেন, প্রবন্ধের প্রথম বইটি প্রকাশের পরে পাঁচ বছর অন্তর একটি করে প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করে পরীক্ষা করবেন—তাঁর মতের পরিবর্তন কতটা হয়েছে। তা আর হয়ে ওঠেনি ; কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনধাবার আবর্তে মানবসত্যের মৌল বোধ কিভাবে কতটা বিবর্তিত হচ্ছে নতুন নতুন সংকটের মুখে, তার পরীক্ষায় ঔপন্যাসিকের মন উৎসুক বলে মনে হয় ; তিন খণ্ড 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসে (১৯৫৬-১৯৭২) তার প্রথম স্বাক্ষর। অন্নদাশঙ্করে অপরাপর উপন্যাসের মধ্যে আছে 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩), 'না' (১৯৫১) ইত্যাদি।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই প্রবন্ধের : 'তারুণ্য' (১৯২৮)। তাছাড়া আরো আছে 'জীবন শিল্পী' (১৯৪১), 'বিনুর বই' (১৯৪৪), 'দেশ কাল পাত্র' (১৯৪৪), 'আধুনিকতা' (১৯৫৩) ইত্যাদি। প্রায় সকল লেখা দেশ-কাল-জীবন ও আত্মসমীক্ষা মূলক।

ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৪৪), 'দুকান কাটা' (১৯৪৪) 'হাসন-সখী' (১৯৪৫), 'কামিনী কাঞ্চন' (১৯৫৪) ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্করের নিজের স্বীকৃতি মতোই তাঁর শিল্পাদর্শ ছিল—প্রথমে মানুষ, তারপরে প্রেম, তারপরে আর্ট। গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে এই তিনের মেলবন্ধনের আকাঙ্ক্ষাই আলোড়িত হয়েছে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)—'বনফুল' ছদ্মনামে লেখনী চালনা করেন। বিচিত্র-চরিত্র রচনা-ধারার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোজনা করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। ভাবনার সঙ্গে মননের সংযোগে অন্নদাশঙ্কর জীবনের অন্তর্লীন সত্যকে

খুঁজেছিলেন; বনফুল মানব-মহিমায় সুদৃঢ় আন্তরিক প্রত্যয় নিয়ে বিশশতকীয় বিভগ্ন জীবনকে খুঁটিয়ে—নেড়েচেড়ে দেখেছেন। ঐ প্রত্যয়টুকুর সাধর্ম্যেই তিনি ছিলেন প্রগাঢ় রবীন্দ্রানুরক্ত ; কিন্তু জীবন-দেখায়, জীবন-চিত্রণে স্বাতন্ত্র্য ছিল আমূল। রবীন্দ্রনাথই তাঁকে 'বিজ্ঞানী মেজাজের শিল্পী' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। চিকিৎসক বনফুল ছিলেন রোগ-নিরীক্ষাজীবী—'প্যাথোলজিস্ট'। চোখে-দেখা জীবাণু নিয়ে ছিল তার মৌল কৌতূহল—শিল্পী হিশেবেও জীবনকে চোখের ওপরে মেলে ধরেছেন—খুঁটিয়ে দেখেছেন ; তারপরে সংযোজিত করেছেন তাকে আপন বলিষ্ঠ মানব-প্রত্যয়ের প্রেক্ষিতে। বনফুলের এই জীবন-অন্বীক্ষা ছিল বিজ্ঞানীর মতো অন্তর্ভেদী—শিল্পীর মতো সংবেদনশীল। স্বভাবে সে গভীঃ ভাবগর্ভ, কিন্তু প্রকাশে সংবৃত এবং সুনিয়মিত। তার সুযোগ রচনা করেছিল তাঁর অতন্দ্র জীবন-জিজ্ঞাসুতার সঙ্গে অন্বিত নিরন্তর নতুন রূপ-নির্মাণের প্রবণতা।

বনফুল

কবিতা, গদ্য, গল্প-উপন্যাস-নাটক—সকল ধরনের লেখাই তিনি লিখেছেন। কখনো সে লেখা পরিহাসপটু ; কখনো গাঢ় সংবেদনবাহী। গদ্য-পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় এই দ্বিমুখী মেজাজের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু বনফুলের পরিহসিত রচনাও লঘু রচনা নয় কখনোই ; তির্যক কটাক্ষ এবং তীব্র ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ। জীবনের অসংগতির প্রতি বনফুলের মমতা ছিল নিবিড়ঃ ছদ্মবেশী আত্মবঞ্চনার সঙ্গে আপোশ করতে পারা ছিল তাঁর অসাধ্য। তাই একই লেখনী মমত্বের সংরাগ এবং বিদ্রূপের হুল ছড়িয়ে-ফুটিয়ে একাকার করেছে।

অল্প বয়স হতেই বনফুলের সাহিত্যকীর্তি স্বীকৃতি-পুষ্ট ; স্কুলে পড়বার সময়েই 'প্রবাসী'র মতো পত্রিকায় তাঁর কবিতা বেরিয়েছে নিয়মিত। আরো একটু বেশি বয়সে ডাক্তারি পড়ুয়া বনফুল একই পত্রিকায় ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেন। বাংলা সাহিত্যে সংক্ষিপ্ততম গল্প লেখার সাফল্যে যেমন তিনি প্রদীপ্ত, তেমনি অতি-দীর্ঘ উপন্যাস সৃষ্টির চমৎকারিতাও তাঁর বরণীয় কীর্তি। আবার জীবনীমূলক নাটক রচনাতেও এক নতুন সম্ভাবনার উন্মোচন করেছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে তথাকথিত 'আধুনিক' ভঙ্গিমার প্রতি বিমুখ ছিলেন ; তাহলেও তাঁর অকুণ্ঠিত কাব্যবাণীর মতোই কাব্য-শরীরও সাবলীল। সকল ক্ষেত্রেই শিল্পীর অভিব্যক্তি সুনিশ্চিত স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছে—অবশ্য কথাসাহিত্যের জগতেই তাঁর লেখনী অধিকতর মুখর।

কবিতাগ্রন্থের মধ্যে আছে—'বনফুলের কবিতা' (১৯২৯), 'অঙ্গারপর্ণী' (১৯৪০), 'চতুর্দশী' (১৯৪০), 'করকমলেষু' (১৯৪৯) ইত্যাদি। 'বনফুলের গল্প' (১৯৩৬), 'বনফুলের আরো গল্প' (১৯৩৮), 'বিন্দুবিসর্গ' (১৯৪৪), 'তন্বী' (১৯৫২), 'দূরবীণ' (১৯৬১) ইত্যাদি ছোটগল্পের সংকলন। উপন্যাসের মধ্যে স্মরণীয়—'তৃণখণ্ড' (১৯৩৫), 'দ্বৈরথ' (১৯৩৭), 'কিছুক্ষণ' (১৯৩৮), 'নির্মোক' (১৯৪০), 'রাত্রি' (১৯৪১), 'স্থাবর' (১৯৫১), তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'জঙ্গম' (১৯৪৩-১৯৪৫) ইত্যাদি।

জীবনীমূলক অবিস্মরণীয় দুখানি নাটক 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১)। পরবর্তী কালে নতুন ধরনের নাটক লিখেছেন 'শৃণ্বন্তু' (১৯৬৪) স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে। তাছাড়াও 'রূপান্তর' (১৯৩৮), 'কঞ্চি' (১৯৪৫) 'দশভান' ইত্যাদি বিচিত্র পরিকল্পনার নাটকও লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে স্মারক বক্তৃতা. ও 'মনন' নামে আরো একটি প্রবন্ধের বইও প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র ; বনফুলের মতো নানারসের নানা রকমের লেখা লিখেছেন তিনি। গুরুগম্ভীর উপন্যাস, তির্যক ব্যঙ্গ-কটাক্ষপূর্ণ হাসির গল্প, এবং বিচিত্র রসের কাব্যকবিতার রচনায় তাঁর বিদগ্ধ দক্ষতা স্বাতন্ত্র্য-

চিহ্নিত। প্রবন্ধ রচনায়—রবীন্দ্র-বিষয়ক সমালোচনায় তাঁর লেখনী একদা প্রায় অক্লান্ত ছিল ; বঙ্কিম-আলোচনার বইটি—'বঙ্কিম সরণী'—সারাজীবনের বঙ্কিমপ্রীতির পরিণত প্রকাশ। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব নিয়েও লেখক বিচার বিবেচনা করেছেন। সর্বত্রই তাঁর রচনা এবং ভাবনা চমকপ্রদ—কি চিন্তনে, কি বিন্যাসে! নাটক রচনার প্রয়াস বার্নার্ড শ-র সমানধর্মিতার প্রতি আগ্রহে সচকিত। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৭), 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস। 'ডাকিনী' (১৯৪৫), 'গালি ও গল্প' (১৯৪৫), 'প্র-না-বি-র নিকৃষ্ট গল্প' 'নিকৃষ্টতর গল্প', (১৯৫১-১৯৫৩) ইত্যাদি ছোটগল্পের সঙ্কলন।

প্রমথনাথ বিশী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) প্রধানত মজার গল্পের জন্যই স্মরণীয়। কিন্তু জীবনের প্রতি গভীর মমতা, গূঢ় অনুভব-দক্ষতারও অভাব ছিল না। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কিংবা 'নীলাঙ্গুরীয়'র (১৯৪২) মতো উপন্যাসে তার পরিচয় সুমুদ্রিত। তাঁর হাসির গল্পেও জীবনের প্রতি আন্তরিক অনুরাগই দমকা হাওয়ার খুশিতে ঝরেছে ; প্রায় সর্বত্রই শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ঘিরে তাঁর নিজের নিভৃত ভাবনা—কখনো বা নিজের ব্যক্তিত্বই গল্পের ভিতরে আনাগোনা করেছে। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ', 'তৃতীয় ভাগ', (১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৪০), 'রাণুর কথামালা' (১৯৪১), 'বরযাত্রী' (১৯৫২) ইত্যাদি তাঁর একদা জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থের গুচ্ছ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৯০৮-১৯৫৬) নিয়ে আমাদের ইতিহাস-সন্ধানের চেষ্টা আপাতত শেষ হতে পারে। রবীন্দ্র-সমকালীন তথা রবীন্দ্রোত্তর পর্বের যে-কজন লেখকের কথা স্মরণ করা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের চেয়ে বহু বহুগুণ বেশি জন রয়েছেন অনুল্লিখিত। তার কারণ এ-নয় যে, রচনাগুণগত মান অনুসারে কোনো বিবেচনা এখানে করা হয়েছে। আসলে জীবনে বিস্তার, বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অমেয় রচনা-পরিমাণ সঞ্চিত হয়েছে, তার আনুপূর্বিক তালিকা রচনা গড়ে তোলাও অসাধ্য না-হোক, দুঃসাধ্য-সাধন। আর বর্তমান প্রচেষ্টা তো সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের পূর্বাপর গতিরেখাটিকে বিশেষ দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে ধরে দেখার চেষ্টা। সেই দিশারি আলোটির সীমানায় যতটুকু ধরা পড়েছে, ও মধ্যে কেবল মোটা দিক্‌চিহ্ন গুলি অবলম্বন করে চলাতেই বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই হিশেবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বাংলা কথাসাহিত্যের এক সাম্প্রতিক দিগন্ত চোখে পড়ে। 'কল্লোল'-এর শিল্পীরা কালাবাহিত যে অবক্ষয়ী পীড়নের অভিঘাতে অবদমিত, বিশশতকীয় বিনষ্টি-চেতনার শিকার সেই হতাশা, ইন্দ্রিয়মন্থন, এবং আত্মমর্ষণের আমূল উচ্ছ্বাস হতে জীবনের গভীরে উত্তরণের সাধনা তাঁর। 'কল্লোল' এর শিল্পীরা অনেকেই মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতা-বোধে পীড়াক্রান্ত ; তাঁদের মুখ্য যন্ত্রণা বহমান জীবনধারার সংসর্গচ্যুতি। তাই তাঁদের 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি' পুথিপড়া মাত্র তাত্ত্বিক সংস্কার, কিংবা বিদেশী সাহিত্যাদর্শের হাতে সংগৃহীত দান।

ঐখানেই ছিল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভ। 'কল্লোল'-গোষ্ঠির শিল্পীরা 'বৈজ্ঞানিক' মেজাজের ধুয়ো তুলে 'আধুনিকতা'র দাবিতে মুখর হয়েছিলেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল নালিশ ছিল,—'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিতে সাহিত্য একেবারেই রচিত হচ্ছে না। তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক শ্রেণীর অঙ্কের ছাত্র প্রবোধকুমার হঠাৎ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গল্পের লেখনী ধরলেন ; প্রথম গল্প 'অতসীমামী' 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (পৌষ, ১৩৩৫

বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। শিল্পীর নতুন নামটি আসলে ছিল তাঁর পরিবার মহলে ব্যবহৃত।

বুদ্ধদেব বসু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পরাগত কল্লোলীয়' বলেছিলেন। একথা অংশত সত্য, সত্য যদি মোটেই হয়। অবক্ষয়ী অভিজ্ঞতার সাধর্ম্য এবং নীরন্ধ্র আশাহীনতার আক্ষেপে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনাও প্রথমাবধি শায়কবিদ্ধ। কিন্তু তার থেকে উত্তরণেব আকাঙ্ক্ষা শিল্পীর অন্তর্লোকে নিরন্তর। রিরংসা-বীভৎসতার অভিজ্ঞতায়, এবং তার রূপায়ণে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলীয়দের চেয়ে অনেক সতেজ—অনেক নিষ্ঠুর। তার প্রধান কারণ তিনি জীবনের মূল হতে কথা বলেছেন। সমাজের অন্ধকারতম গুহাবাসী মানুষের ভয়ানক জীবনের ছবি ছিল তাঁর মর্মে গাঁথা। অমন অনমনীয় অভিজ্ঞতা, কিংবা আন্তরিক একাত্মতার পুঁজি কল্লোলীয় শিল্পীদের কারো অনুভবেই ছিল ·া। যুবনাশ্ব-র 'পটলডাঙার পাঁচালী'-তেও ওপর হতে দেখা বিকারকে যন্ত্রণাদগ্ধ মধ্যবিত্ত ভাবুকতার আবেশ ভরে গড়া হযেছে। মাণিক ঐ জীবনেব সঙ্গে মিলে মিশে অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। ঐকান্তিক জীবন-সংযোগে বাংলার কথাসাহিত্যিক সমাজে তিনি শবৎচন্দ্র-তারাশঙ্করেরই সগোত্র ; অথচ মধ্যবিত্ত মানসিকতার নির্মোকটি তাঁর চেতনায প্রথম থেকেই খসে পড়তে চেয়েছে। তারই ফলে 'পদ্মানদীব মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাস, কিংবা 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) অথবা 'সরীসৃপ'-এব (১৯৩৯) মতো গল্পগুচ্ছে, অমন নগ্ন হয়েও জীবন তার ভারসমতা হারায় নি—না চিন্তনে, না প্রকাশে। বরং এই জীবনকে নিয়েও পেরিয়ে যাবার ঝোঁক আছে শিল্পীর মজ্জায়। পরবর্তী কালে সেই উত্তরণের নতুন দিশা মিলেছিল শিল্পীব প্রত্যযে—মার্কসবাদকে স্বীকার করে। তাতেও বাইরে-ভেতরে দ্বন্দ্ব ঘোচে নি। সঙ্গে ছিল জটিল-অনপনেয় শারীর পীড়া। সব কিছু মিলে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব কথাসাহিত্য—গল্পে উপন্যাসে—আধুনিকতম অবক্ষয়ী চেতনার অভিঘাতে মর্মাহত—অথচ সেই আঘাত-পীড়ন হতে উত্তরণের সংগ্রামী আয়াসে নিয়ত সক্রিয়। জীবনের অনুভব-অভিজ্ঞতার প্রগাঢতা, উত্তরণস্পৃহার অনমনীয়তা, তাঁর প্রকাশরীতিতে যোজনা করেছে অনন্য এক দৃঢতা এবং ঋজুতাও ; কিন্তু তা দূরব্যাপ্ত হয়ে ওঠে নি নানা কারণে।

তাঁর প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থ 'অতসীমামী' (১৯৩৫), প্রথম উপন্যাস 'দিবাবাত্রিব কাব্য' (১৯৩৫)। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'সহরবাসেব ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস। ছোটগল্প সংকলনেব মধ্যে আরো আছে 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'হলুদ পোড়া' (১৯৪৫), 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

মর্মে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবি ছিলেন ; কথাসাহিত্য তার সেই গহনচাবী কবিসত্তার কঠিন অভিজ্ঞতাহত বিচ্ছুরণ। কবিব জীবৎকালের বহু পরে দিশারি সেই কবিতাবলি প্রকাশিত হতে পেরেছিল।
